

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রচ্ছদ :
শ্রীরঞ্জিত দাস

মুদ্রাকর :
শ্রীনিশীথকুমার ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : কুড়ি টাকা মাত্র



বিপ্লবী-নায়ক প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী



অনুশীলন সমিতির তৎকালীন সদস্যবৃন্দের সাথে লেখক
(মাঝের সারিতে বাঁদিক থেকে ৬ষ্ঠ স্থানে)

॥ উৎস সন্ধানে ॥

(পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে
পথে চলা সেই ত তোমার পাওয়া,
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া ;
চায় না সেজন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে,
যার পরাণে লাগল পাগল হাওয়া।
···রবীন্দ্রনাথ)

আমি আজ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় উপস্থিত। পূর্বাহ্ণের গতিপথ নাতিদীর্ঘ ষাট বছরের উজান পথে। যে পরিবেশের মধ্যে সে জীবন-ধারা বয়ে এসেছে তা আজকের কর্মপদ্ধতি, আদর্শ, এমন কি জীবনের মূল্যবোধ—সবকিছু থেকেই যেন আলাদা। একটা সমাজ বা জাতির জীবনে ষাট বছরের পরিক্রমা অতি নগণ্য, কিন্তু এ ব্যবধানেই কেমন করে এমন একটা বিপ্লব ঘটে গেল তা মনকে বিস্মিত করে। কিন্তু কোন কিছুই আকস্মিক ঘটে না। কখনও বা চোখের সামনে, কখনও বা অন্তরালে যে প্রস্তুতি চলতে থাকে, তাই যখন সহসা আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় তখন ভাবি এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না !

আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বালকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগত বা জাগান হ'ত—এই জীবনের উদ্দেশ্য কি, কিসে হবে এর সার্থকতা ? জীবনটা কি কেবল আহার, নিদ্রা, বিবাহ এবং সংসার প্রতিপালন মাত্র ! এ ছাড়া কি আর কোন আদর্শ বা কাম্য নেই ! চিন্তাধারা এমনি মহৎ পর্যায়ে উন্নীত করবার কৃতিত্ব অবশ্য ছিল বিপ্লবী পথিকৃৎদের। চরিত্রগঠন, সদাচরণ, ধর্মবিশ্বাস এ সবই মনে হ'ত মনুষ্যজীবনের ভিত্তি। এই বনিয়াদই হ'ত জীবনপথের পাথেয়। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গুরুজন, সমবয়সী, শিক্ষক-সহপাঠী, সকলের সঙ্গেই আচরণ নিয়ন্ত্রিত হ'ত একই নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে।

এইভাবে চলতে গিয়েই সমিতিবদ্ধ হয়ে পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে জীবন-গঠন সহজ হয়ে আসত। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হ'ত। ক্রমে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ'ত। সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপ, বোমা, পিস্তল, গুপ্তসমিতি, ব্রিটিশ বিতাড়নের কথা আসত অনেক পরে। বহু বৎসর বিপ্লবী সমিতির বিশ্বাসী দায়িত্বশীল সভ্য থেকেও একটা বোমা বা পিস্তল দেখে নি, হাতে ধরা তো দূরের কথা, এমন লোক অনেক ছিল। আর এ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলেই ক্রমে মনপ্রাণ দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জন বা কারাগারে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয়, সর্বোপরি ফাঁসির মঞ্চে কিংবা গুলীবিদ্ধ হয়ে আত্মদান করে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেত। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, পরিচালকরাই হতেন এমনি বিপ্লবী চরিত্রের আদর্শ স্বরূপ।

যে কাহিনী বলতে গিয়ে এত কথার অবতারণা করলাম, সে আমার নিজের জীবনে এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না যা রূপায়িত করে রাখবার মত। বিপ্লব এবং বিপ্লবী-জীবন গঠনের ইতিকথা ভিন্ন আর কিছুই নিজের বলে স্মরণ করতে পারছি না। আমার বয়স তখন তের কি চৌদ্দ। ১৯০৬ সালে একদিন আমার পিতৃদেবের আদেশে অনুশীলন সমিতির প্রাঙ্গণে গিয়ে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হলাম—প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। অনেকগুলি প্রতিজ্ঞার সূত্রই সেদিন গ্রহণ করতে হয়েছিল, তার মধ্যে এ কয়টিও ছিল—"এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না; সর্বদাই সমিতির নিয়মাধীন থাকিব; দেশের, ক্রমে জগতের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইব।" বিদেশী ইংরেজের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত গ্রহণ করলাম। কায়মনোবাক্যে এই কার্যে ব্রতী হব, প্রয়োজন হলে সর্বস্ব, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে কর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হব।

সেই যে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে অজানাপথে চলতে শুরু করেছি, আজও সেই চলার যেন শেষ হ'ল না। এই বন্ধুর পথে বারে বারে নিভে গিয়েছে আলো, পথে নেমে এসেছে ঝড় ঝঞ্ঝা দুর্যোগের তিমির রাত্রি। তখন সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ তাণ্ডবকেই সাথী করে এগিয়ে গিয়েছি। নৈরাশ্য কিংবা অবসাদে পথে ভেঙে পড়ি নি। 'পথে চলা সেই তো তোমার পাওয়া'—এই আনন্দই প্রাণকে সজীব রেখে চলার গতি করে তুলেছে দুর্বার। কেন যে এমনি করলাম, এ বয়সী ছেলেদের দ্বারা এ কেমন করে সম্ভব হ'ল সে কথাই খুলে বলতে চেষ্টা করছি।

আগেই বলেছি কার্যকারণ সম্বন্ধ বিরহিত আকস্মিক কিছুই ঘটে না। আর একটা কথা এই যে, কোন একটা মানুষকে আর সমস্ত-কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে গেলে কিছুই বোঝা যায় না। সমাজের ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যে, কখনও বা বৈপ্লবিক সংঘাতের মধ্যে, এবং নানা প্রতিবেশের আওতার মধ্যে ঠিক তদ্রূপ মানুষই সৃষ্টি হয়। আমার জন্ম ও পুষ্টি হয় বৈপ্লবিক পরিবেশ এবং আবহাওয়ার মধ্যে। একটা সদ্যজাগ্রত জাতির আত্মচেতনা লাভের কলকোলাহলে আমার প্রথম নিদ্রাভঙ্গ হয়। সেই স্রোতের মধ্যে নিজের জীবনধারা মিশিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ বছরেরও ওপর বৈপ্লবিক জীবনযাপন করে আজ এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি। কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে যে সূত্রে সবকিছু গাঁথা তার যেন সমস্ত সন্ধান করে উঠতে পারছি না।

বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় বাস করে, বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জীবনসমস্যার সম্মুখীন হয়ে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গলাভ করেছি, কতরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে গিয়ে জীবনের কত বিচিত্র আস্বাদ গ্রহণ করেছি, তারা সবাই আজ আমার স্মৃতির দুয়ারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই এসে হাজির হয়েছে এমন কথা বলতে পারিনে। কত মানুষ, কত ঘটনা যা এক সময় জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার অনেক দাগ আজ মুছে গিয়েছে বা লুপ্তপ্রায়। তথাপি যে সব মানুষের ছবি আমার মনে আজও সুস্পষ্ট, যে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছি, যা কিছু আমার বিপ্লবী-জীবন গড়ে তুলেছে বলে আমার মনে হয় তারই কতকটা পরিচয় দেবার জন্যে এই কাহিনীর সূত্রপাত করলাম। এর মূল্যনিরূপণ জনসাধারণের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

প্রথমেই প্রণাম করি আমার মামাবাড়ী ত্রিপুরা জেলায় চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত হরিণা চালিতাতলী গ্রামকে। কেন না, সেখানেই আমার জন্ম হয় বাংলা ১৩০১ সালের ৩রা বৈশাখ। আমার পিতৃকুল এখন পর্যন্তও নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রম মতে ব্রাহ্মণই বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তদুপরি হাজার বছর আগে বল্লাল সেন যে সমাজ-ব্যবস্থা করে যান তাতে কুলীনরা পরিগণিত হ'ল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে।

"আচারো, বিনয়ো, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা, বৃত্তি, স্তপোদানম্, নবধা কুললক্ষণম্॥"

যদিও কৌলিন্যের এই নয়টি লক্ষণ ছিল, কিন্তু তথাপি আজ মূর্খ হলেও কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে কুলীনই থেকে যায়, আবার যত গুণবানই হোক না কেন চণ্ডালের ছেলে চণ্ডালই হয়।

বল্লাল সেনের পরে ব্রাহ্মণসমাজের পুনর্গঠন করে যান দেবীবর ঘটক। চার কি পাঁচশ' বছর আগে। খড়দহ, ফুলিয়া, আচার্যসাগরী, সর্বানন্দ প্রভৃতি নানা-প্রকার মেল-বন্ধন করে যান। এর মধ্যে আবার খড়দহ ও ফুলিয়া মেল শ্রেষ্ঠ এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। বোধ হয় তিনিই ব্যবস্থা করে যান যে, কুলীনদের মধ্যে যারা কোনপ্রকারে ভঙ্গ হয় নি—অর্থাৎ একেবারে নিকষ, তারাই গণ্য হবে নৈকষ্য কুলীন হিসেবে।

একেই তো হিন্দুসমাজ নানাবর্ণে বিভক্ত। তদুপরি নানাপ্রকার মেল-বন্ধন ও উচ্চ-নীচ শ্রেণী বিভাগের ফলে ব্রাহ্মণরাও শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আর তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ঘটকসমাজ হ'ল প্রবল প্রতাপান্বিত। তাঁরাই ছিলেন হিন্দুসমাজ-কুলশাস্ত্রের রক্ষক ও ব্যাখ্যা-কর্তা। কে ছোট, কে বড়, কার কি দোষ আছে, তার খবরই যে শুধু এঁরা রাখতেন তা নয়, সমাজে প্রচারও করতেন বটে। এমনকি এক জোট হয়ে ইচ্ছা করলে যে কোন বংশকে ওঠাতে কিংবা নামাতে পারতেন। গল্প শুনেছি যে, অর্থলোভে ঢাকা জেলার ভাওয়ালের ব্রাহ্মণ জমিদার বংশকে এঁরা উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেছিলেন; এবং তন্তুবায় নন্দলাল বসাককে কায়স্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে জনসাধারণের মনে কম কৌতূহল হয় নি। লোকে ব্যঙ্গ করে বলত:

"তাঁতি ছিল, কায়েত হ'ল মুন্সী নন্দলাল;
ভাওয়ালেতে উদয় হ'ল বজ্রযোগিনীর পুসিল্লাল।"

এই 'মুন্সী' উপাধি মুসলমান আমলের স্মৃতিবিজড়িত। তখন অনেক হিন্দু নিজ নিজ ব্যবসা বা চাকুরি অনুযায়ী পারিবারিক উপাধি গ্রহণ করেছিল। মুন্সী, বক্সী, চাক্লাদার, খাসনবিশ, খাঁ, মজুমদার প্রভৃতি উপাধি আজও হিন্দুদের উপর মুসলমান রাজত্বের প্রভাব ঘোষণা করছে। কেবল হিন্দুরাই নয়, মুসলমানরাও এ উপাধি বংশানুক্রমে ব্যবহার করে আসছে। ছড়ায় বজ্র-যোগিনীর কথা উল্লিখিত আছে। এই বজ্রযোগিনী ঢাকা জেলার পুরবিক্রম পরগণার একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। আর এই গ্রামের 'পুসিল্লাল' ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পূর্বেই বলেছি আমার জন্ম হয় মামাবাড়ীতে। এ ঘটনা আকস্মিক না

হলেও এর মধ্যে একটা সামাজিক বৈচিত্র্য লুকিয়ে আছে। পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বাসস্থান কুলীনদের বড় একটা থাকত না। তার কারণস্বরূপ বলা যায় যে, তাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। সকল স্ত্রী নিয়ে ঘর করা সম্ভব হ'ত না। তা ছাড়া তখন কুল ও সামাজিক বন্ধন ছিল বিবাহের প্রেরণা। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে কারুর বিবাহ হওয়া না হওয়ায় আজ-কালকার মত এত কড়াকড়ি ছিল না। সুতরাং কিছু-সংখ্যক লোকের পক্ষে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালন ছিল অসম্ভব। তারা হ'ত ঘরজামাই। কখনও বা বিত্তশালী শ্রোত্রীয় পরিবার কুলীনে কন্যা বিবাহ দিয়ে কন্যা-জামাতাকে সম্পত্তি দান করে স্বগ্রামেই কুলীন স্থাপন করতেন। শ্রোত্রীয়দের মধ্যে এমনি কুলীন স্থাপন একটা সম্মানের কাজ বলে পরিগণিত হ'ত। তাছাড়া ছেলেও ঘরজামাই হওয়ার অপবাদ থেকে রেহাই পেত। আমার মামাদেরই বাড়ী ও সম্পত্তির একাংশের অধিকারী ছিল এমনি কুলীন জামাতার বংশধরগণ।

ঢাকা জেলার দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কীর্তিনাশা পদ্মা। প্রতি বৎসর গ্রামের পর গ্রাম এর করাল গ্রাসে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনপুরুষের মধ্যে পদ্মার ভাঙনে বাসগৃহ বদলাতে হয় নি এমন পরিবার কমই আছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী ছিল বিক্রমপুর অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রামে। তা আজ পদ্মার গর্ভে বিলুপ্ত। হিন্দুরাজা চাঁদ রায় কেদার রায়ের আমলের রাজবাড়ীতে ছিল একটা বিশালকায় মঠ। এ মঠ বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিল। নদীর বুকের উপর দিয়ে স্টীমারে কিংবা নৌকোয় যেতে যেতে এই প্রকাণ্ড মঠ যাত্রীসাধারণকে কৌতূহলী করে তুলত। তাও আজ কয়েক বছর পূর্বে পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে।

সে যাই হোক, যে কথা বলতে গিয়ে এসব অবতারণা করলাম, তা হচ্ছে এই যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কখনও কখনও কুলীনরা শ্বশুরালয়েই বসবাস করতে বাধ্য হ'ত। সন্তানাদি মামাবাড়ীতেই মানুষ হয়ে সেখানেই স্থায়িভাবে থেকে যেত। আমাদের বর্তমান বাড়ী পিসতুত ভাই শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও বাড়ী। আবার শ্রীশবাবুর ভাগিনেয়রাও সেই বাড়ীতেই বাস করছে। আমার খুড়তুত বোনদের ছেলেদেরও এই বাড়ীই বাসস্থান। অর্থাৎ মামাবাড়ীই আপন বাড়ীতে পরিণত হয়েছে।

আমরা আজও নৈকষ্য কুলীন। বহু-বিবাহ করতেন বলে কুলীনদের যে

বদনাম বা সুনাম ছিল তা থেকে আমাদের পরিবারের যে সবাই একেবারে মুক্ত ছিল এমন কথা বলতে পারি নে। তবে আমাদের পরিবারে এক কাকা ভিন্ন আর কেউ এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করেন নি। বিপত্নীক হয়ে আমার পিতামহ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেছিলেন।

আমার এক অনাত্মীয় বৃদ্ধকে দেখেছি যাঁর তখনও আটটি স্ত্রী বর্তমান। তবে আমার আত্মীয়দের মধ্যে অনেকের একাধিক স্ত্রী বর্তমান দেখেছি। খুড়তুত ও পিসতুত বোনেদের অনেকেরই সপত্নী ছিল। স্বামীরা মাঝে মাঝে এসে বেড়িয়ে যেত। একাধিক বিবাহ অনেক সময় এরা বাধ্য হয়ে করত। কুলীন ছেলেদের শ্রোত্রীয় বংশের মেয়ে বিয়ে করতে কোন বাধা ছিল না। পরন্তু আগেই বলেছি, শ্রোত্রীয়রা নিজেদের কন্যা কুলীন করবার জন্যই ব্যগ্র থাকত। কিন্তু মুশকিল হ'ত এই যে, শ্রোত্রীয় ছেলেরা কুলীনের মেয়ে বিয়ে করতে পারত না। তার ফলে কুলীনের ঘরে যেমন মেয়ের সংখ্যা বেশী হ'ত, তেমনি শ্রোত্রীয়দের মধ্যে ছেলে হ'ত বেশী। তাই অনেক সময় বদল বিবাহ করতে বাধ্য হ'ত—এক স্ত্রী বর্তমান থাকতেও। অর্থাৎ নিজের বোন বিয়ে দিয়ে সেই পরিবারের কন্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ত। একই সঙ্গে তিন ভগ্নীর বিবাহ একই লোকের সাথে এ আমি নিজেই দেখেছি।

তখনকার সেই কৃষিজীবী-সমাজে নানাবিধ গৃহকর্ম সম্পন্ন করতেও অনেক সময় একাধিক বিয়ে করতে লোক প্রলুব্ধ হ'ত। তা ছাড়া, স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের আবার নানা মেল-গোষ্ঠী বন্ধনের কড়াকড়িতে বিবাহাদির ব্যাপারে কঠোর বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হ'ত বলে পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে সমাজসংস্কার বজায় রাখতেন। কেন না, বিবাহ তখনকার দিনে ধর্মসম্প্রদানের অঙ্গ ছিল। অনূঢ়া নারী সমাজে নিন্দার বিষয় ছিল। আমার এক আজন্মপাগল অস্পষ্ট-ভাষী মামাত বোনের একটা যেমন-তেমন বিয়ে দেওয়া হয়েছিল—অবশ্য কুলশীল বজায় রেখে। পাত্রটি কুলশ্রেষ্ঠ হলেও বিয়ে করা ছিল তার পেশা। এ লোকটি পঁচিশ টাকা নগদ, একজোড়া ধুতি ও জুতোর বদলে একেবারে সজ্ঞানে অর্থাৎ সব জেনে-শুনেই, আমার পাগল মামাত বোনকে বিয়ে করে তাকে সমাজে পতনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল!

যেসব কারণে সমাজে বহু-বিবাহ প্রচলিত হয়েছিল তারই ফলস্বরূপ বা প্রভাবে বাল্যবিবাহ স্বীকৃতি পেয়েছিল। শুনেছি, আমার জন্মের পূর্বে কুলীন-সমাজে শিশুকে থালায় বসিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি নিজে এমন

কোন বিবাহ দেখি নি। তবে আমার এক দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়াকে দেখেছি যার বিয়ে হয়েছিল মাত্র ছ'মাস বয়সে। আর বিধবা হন আড়াই বছরে। তিনি বেঁচে ছিলেন একশ' দশ বৎসর। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ১৯৩৯ সালে। তিনি এসেছিলেন কলকাতায় তাঁর চক্ষু চিকিৎসার জন্য। তখন তাঁর বয়স একশ' পাঁচ। ভাবতেও অবাক লাগে! এমনি কলঙ্কিত সমাজের ভালর দিক যে ছিল না তা তো নয়।

কুলীনসমাজে বাল্যবিবাহ যেমন প্রচলন ছিল, তেমনি বেশী বয়সে বিবাহও খুব নিন্দনীয় ছিল না। চিরকুমারীর দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। আসল কথা, কুলশীল বজায় রেখে বিয়ে দাও ভাল কথা, তা না হলে বয়স নিয়ে সমাজে খুব একটা আলোড়ন কিছু হ'ত না। আমার আত্মীয়দের মধ্যেই দেখেছি পঁচিশ, তিরিশ, এমন কি পঞ্চাশ বছরে মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এসব কারণে কুলীনের ঘরে মেয়েদের চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী অনেক সমাজের অপেক্ষা।

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিন্তু এমনটি হওয়ার উপায় ছিল না। যথাসম্ভব রজঃদর্শনের আগেই বিয়ে দিতে হ'ত। ঘরে যুবতী অনূঢ়া মেয়ে থাকলে সমাজে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

বিবাহের ব্যাপারে আজকের মত সেদিনও পণপ্রথার প্রচলন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কম-বেশী সকলের মধ্যেই ছিল। কিন্তু কুলীনসমাজে পণপ্রথা এক রকম চরমেই উঠেছিল বলা যায়। এজন্য কত যে করুণ কাহিনীর অবতারণা হ'ত তার অন্ত নেই। শুনেছি, স্নেহলতা নামে একটি মেয়ে তার বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্নেহলতার কথা আলোচিত হতে লাগল। পণপ্রথা খারাপ, একথা একবাক্যে সবাই প্রায় স্বীকার করল। আমাদের ছেলেবেলাতেই পণপ্রথা নিবারণের জন্য প্রবল আন্দোলন হয়। এমন কি তখন অনুশীলন সমিতির নেতৃবর্গের মধ্যে একবার এ আলোচনাও হয়েছিল যে, যারা পণপ্রথা গ্রহণ করবে তাদের শাস্তিবিধান করে সমাজসংস্কারের সাহায্য করা উচিত হবে কি না! অবশ্য কর্তব্য মনে করেও নানাদিক বিবেচনা করে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি।

কুলীনদের অনেক দোষই ছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে তাঁরা একটা মর্যাদার সমতা মেনে চলতেন। কুলীন কন্যার বিবাহ হ'ত কুলীন ছেলের সঙ্গেই। কিন্তু

বরের পক্ষে শোভাযাত্রা হ'ত অশোভন। কেন না মিছিল করে গেলে বরকে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়ে যায়। বর নিজেই মেয়ের বাড়ী এসে বিয়ে করে যাবে। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে কোনরূপ মর্যাদা আদায়ের ব্যবস্থাই থাকত না এমন বিবাহে। দানসামগ্রীর মধ্যে খাট-পালঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস দান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কুলীন যখন শ্রোত্রীয় কন্যা বিয়ে করত, তখন কিন্তু বরপক্ষ পূর্ণ মর্যাদা আদায় না করে ছাড়ত না। আজও এ প্রথা একেবারে উঠে যায় নি।

কুলীনের বাড়ীতে বোনের আদর ও প্রতিপত্তি থাকত খুব। তারাই ছিল ভ্রাতার বংশ-গৌরবের মাপকাঠি। ছোট বংশে বোন বিয়ে দিলে ভ্রাতারা বংশে নেমে যেত। আগেই বলেছি, ভাগনে-ভাগনীরা মামাবাড়ীতেই মানুষ হ'ত এবং অতি আদরেই। তাই তো আজও আদর-আবদারের তুলনা দিতে লোকে বলে —"যেন মামাবাড়ীর আবদার।" এর মধ্যে মাতৃপ্রধান (matriarchal) সমাজের চিহ্ন থেকে গেছে। দক্ষিণ-ভারতের মালাবারে এখনও কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে ভাগনেরা পিতৃ-পদবীতে পরিচিত হয় না। মামাবাড়ীর পরিচয়ই তাদের পরিচয়।

আমার জন্ম মামাবাড়ীতে হলেও পৈতৃক ভিটা ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত চুড়াইন গ্রামে। যদিও সেখানে জায়গা-জমি পাকাবাড়ী সবই আমার পিতৃদেব করেছিলেন কিন্তু চুড়াইন গ্রামে বসবাসের গোড়াপত্তন করেন আমার পিতামহী বিশ্বরূপা দেবী। তিনি ছিলেন সাহসী, জেদী এবং সঙ্কল্পে অটল।

ঠাকুরমা ছিলেন প্রসিদ্ধ এক জমিদার বংশের কন্যা। কিন্তু আমার পিতামহ রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্রের সন্তান। দরিদ্র হলেও তিনি ছিলেন গৌরকান্তি সুপুরুষ মানুষ। সদানন্দ পরোপকারী আত্মভোলা বলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। পরের কাজে মন দিতে গিয়ে ঘরের কাজ নাকি তিনি কোনদিনই করতে পারেন নি। অবশ্য এ সবই আমার শোনা কথা। কেন না তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আমার পিতৃদেবের মাত্র ষোল বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার পিতামহকে না দেখলেও ঠাকুরমার সান্নিধ্য লাভ করেছি প্রচুর এবং তাঁর প্রভাব যে আমার জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। ঠাকুরমার যখন বিয়ে হয় তখন ঠাকুরদার অপর এক স্ত্রী বর্তমান।

বিশ্বরূপা দেবীর পিতা চাইলেন না কন্যা দরিদ্র স্বামীর সংসারে গিয়ে থাকুক। আমার পিতামহীরও বোধ হয় সতীনের সঙ্গে ঘর করার ভয় ছিল। সুতরাং আমার পিতামহ ঘরজামাই থেকে গেলেন। ঘরজামাই হলে কি হয়, ঠাকুরমার প্রখর আত্মসম্মানবোধ থাকায় তিনি স্বামীর অসম্মান হতে পারে এমন কোন ব্যবহার সহ্য করেন নি। এমনকি এক সময় বাড়ীর লোকের কি একটা ইঙ্গিত তাঁর কাছে মর্যাদাহানিকর বলে মনে হওয়ায় নিজ কর্তব্য স্থির করে স্বামীর হাত ধরে একবস্ত্রে পিতৃগৃহের সুখৈশ্বর্য পরিত্যাগ করলেন। পিতামাতার অশ্রুজল, আত্মীয়-গুরুজনের অনুরোধ, উপরোধ কিছুই তাঁর পথরোধ করতে পারল না।

তখন পর্যন্ত স্টীমার চলাচল তেমনভাবে প্রবর্তন হয় নি। স্বামীকে সঙ্গে করে তিনি নৌকাযোগে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। অনেক ছোট-বড় নদী পার হলেন, কত জায়গায় গেলেন, কিন্তু কোথাও উপযুক্ত স্থান মিলল না। অবশেষে চুড়াইন গ্রামে এক দূর-সম্পর্কিত আত্মীয়ের বাড়ীতে কোনরকমে কুটীর তৈরি করে বসবাস করতে লাগলেন।

স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন যে শক্তিতে বলীয়ান হয়ে, তাই তাঁকে রক্ষা করেছে অপরের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে। উপবাসী থাকলেও পরের দ্বারস্থ হন নি। খোঁজ করে পিত্রালয় থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়, কিন্তু তিনি যে শুধু সেখানে ফিরে যান নি তা নয়, প্রচণ্ড দরিদ্রতার মধ্যেও তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

পরে যদিও পিতৃদেবের আমলে চুড়াইনে জায়গা-জমি রেখে পাকা বাড়ী তৈরি হয়, কিন্তু বিশ্বরূপা দেবী ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। গৃহ-প্রবেশের শুভদিনে আমার খুল্লতাতের সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হওয়ার ফলে তিনি এক-দিনের জন্যও সেই অট্টালিকায় বাস করেন নি। নিজের জন্য নির্মিত একটা সাধারণ টিনের ঘরেই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যাপন করে গেছেন।

এই তো গেল তাঁর জেদের কথা। তিনি রাজপুতরমণীদের মতই সাহসী ছিলেন। নিজের অধিকার রক্ষা করবার জন্য নিজ হাতে লাঠি ধরতে কসুর করেন নি। ব্যাপারটা এই—

আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একটা রাস্তা ছিল। আমরা দাবি করতাম ওটা

আমাদের বাড়ীর অন্তর্গত এবং এ নিয়ে একটা মামলাও চলছিল। এমনি অবস্থায় বাড়ীর লোকের আপত্তি সত্ত্বেও গ্রামের এক বাড়ীর বিয়ের শোভাযাত্রা ঐ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জেদ ধরেন সে বাড়ীর কর্তা। তিনি ছিলেন পুলিশ কর্মচারী, আর পুলিশের ছিল তখন প্রবল প্রতাপ। এমনিতে ঐ রাস্তা দিয়ে লোক যাতায়াতে আমাদের পক্ষের কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু শোভাযাত্রা যেতে দিলে অধিকার নষ্ট হয়ে সর্বসাধারণের রাস্তায় পরিণত হবে। এ জন্য আমাদের আপত্তি।

তখন আমাদের বাড়ীতে পুরুষের মধ্যে ছিলেন মাত্র আমার এক কাকা এবং দু'জন পিসতুত ভাই। এমতাবস্থায় গায়ের জোরে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়, বিচার করে প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করা ছাড়া আর উপায় রইল না। এমনি অবস্থা জেনেই অপরপক্ষ জয়ধ্বনি করে শোভাযাত্রা নিয়ে বাড়ীর ঐ রাস্তায় প্রবেশ করল। অশীতিপর বৃদ্ধা পিতামহী অধিকার রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প। বাড়ীতে পুরুষ মাত্র তিনজন। এত বড় জনতার সম্মুখীন হতে তারা ইতস্ততঃ করছিল। ঠাকুরমা পুরুষদের উদ্দেশ করে বললেন, "তবে তোরা ঘরেই বসে থাক। আমি ঘরের বউদের ও মেয়েদের নিয়েই যাচ্ছি বাধা দিতে।" আমার কাকা কিংবা পিসতুত ভাইরা কেউ ভীরু ছিলেন না। ঠাকুরমা নিজে তাঁর পুত্র ও দৌহিত্র-দ্বয়ের হাতে লাঠি তুলে দিয়ে অনতিদূরে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ভীষণ দাঙ্গা বাধল, শোভাযাত্রার পরিচালক পুলিশ কর্মচারীটির মাথা ফেটে গেল। অনেকে আহত হ'ল, এবং শেষপর্যন্ত শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমার কাকা রক্তাক্ত দেহে গৃহে ফিরলেন। বৃদ্ধা ঠাকুরমার চোখে জল, কিন্তু মুখ তখন জয়ের গর্বে উদ্ভাসিত।

তখনকার দিনে ঠাকুরমা-দিদিমারা নাতি-নাতনীদের নিয়ে রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে কিংবা বারান্দায় বসে মালা জপ করতে করতেই ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা এবং নানা দেশের গল্প বলতেন। ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন ঠাকুরমা, পিসিমা বা মায়ের কাছেই হ'ত। আমিও রামায়ণ-মহাভারতের গল্প এঁদের কাছেই শুনেছি।

ঠাকুরমা বলতেন, "ভারতভূমি পুণ্যভূমি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবরা এদেশে বাস করত। আমরা হলাম গিয়ে জ্ঞানী, সর্বত্যাগী, মানবহিতে দারিদ্র্য-ব্রতধারী মুনি-ঋষির সন্তান।" তাঁদের অলৌকিক শক্তির যে কত গল্প শুনেছি তার আর ইয়ত্তা নেই! কতবার নাকি দৈত্যদানব-রাক্ষসরা এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ধ্বংস

করেছে, মানুষের উপর কত নির্যাতন করেছে, মুনি-ঋষিদের আশ্রম ভেঙে দিয়েছে এবং ধর্মকার্যে বাধা দিয়েছে ; কিন্তু মুনি-ঋষিদেরই পুণ্যফলে ভগবান বার বার মনুষ্যদেহ ধারণ করে দেশবাসীকে একত্র করে দৈত্যদানবদের পরাস্ত করে দেশ ও ধর্ম রক্ষা করেছেন।

আমার ঠিক মনে আছে, একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা ঠাকুরমা, দৈত্যদানব-রাক্ষসরা গেল কোথায়? এখনও কি তারা আছে?" তিনি বলেছিলেন, "আছে" এবং আমাদের নারায়ণগঞ্জের বাড়ীর সামনে রাস্তার অপর-দিকে ইউরোপীয় ক্লাবের ইংরেজদের দেখিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলতেন, "এরা সর্বভুক্, এরাই আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অধর্মের রাজত্ব স্থাপন করেছে।"

যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা ও ধর্মপ্রাণতা, ভীম, অর্জুন ও কর্ণ প্রভৃতির বীরত্ব-গাথা, ভীষ্মের মহত্ত্ব ও আত্মদান, দ্রৌপদীর দুর্জয় সংকল্প, রামের আদর্শ চরিত্র, লক্ষ্মণের বীরত্ব, সীতার সতীত্ব, শিবি রাজার পারাবত রক্ষার্থে আত্মদান, হরিশ্চন্দ্রের হাসিমুখে সর্বস্বদান, দধীচির অস্থিদান—এমনি আরও কত কথা, কাহিনী ঠাকুরমার কাছে শুনে হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে। এখনও আমার এই বৃদ্ধ বয়সে যেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই বৃদ্ধা আমার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে পুরাণের কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি সেই শিশু তার কোল-ঘেঁষে বসে তন্ময় হয়ে শুনছি সেসব অপূর্ব গাথা।

বল্লাল সেন, আদিশূর, সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণের কাণ্বকুব্জ থেকে বাংলাদেশে আগমনের কিংবদন্তী, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন ও মুসলমানের বঙ্গজয়, মুসলমান বাদশাহদের অপকীর্তি, কালাপাহাড়ের ধ্বংসলীলা এমনি আরও যে কত গল্প শুনেছি আজ তার অনেক কিছুই মনে নেই। যা মনে আছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলে রামায়ণই হয়ত হয়ে যাবে এ কাহিনী। তবে এটুকু বলতে পারি যে, যা তিনি বলতেন তার সব কথাই ইতিহাসসম্মত ছিল না। তা না হোক, তিনি সেগুলি ইতিহাসের মতন এমন জ্বলন্ত করে তুলেছিলেন যে, আজও দু'একটার কথা উল্লেখ না করে পারছি নে।

বল্লাল সেনের সঙ্গে নাকি মুসলমান আক্রমণকারীদের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। মুসলমানরা হয় পরাজিত। রণক্লান্ত বল্লাল সেন এক গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় এক মুসলমান ফকির গুপ্তভাবে পেছনে এসে বল্লাল সেনের যুদ্ধ-পারাবত তার পিঠে বাঁধা খাঁচা থেকে উড়িয়ে দেয়। বল্লাল সেন

ক্ষোভে, দুঃখে, নৈরাশ্যে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। ব্যাকুল হৃদয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন রাজধানীর দিকে। কিন্তু তার অনেক আগেই পারাবত উড়ে এসে প্রাসাদশীর্ষে বসল। পুরনারীরা মনে করলেন যুদ্ধে রাজার পরাজয় ঘটেছে। বিদেশী বিধর্মীর হাতে মর্যাদাহানির ভয়ে তাঁরা পূর্ব-নির্দেশমত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত উদ্‌যাপন করলেন। ঐতিহাসিক সত্যতা এর পেছনে যাই থাক্ না কেন, ঠাকুরমার মুখে ঐ কাহিনী এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে, আমার শিশুমনকেও উদ্বেলিত করেছিল।

তিনি বলতেন, দেবাদিদেব মহাদেবকে নাকি ম্লেচ্ছরা মক্কায় আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। যদি কোন আচারনিষ্ঠ, শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ বন্দী শিবের মাথায় বিল্বপত্র দান করতে পারে, তবেই মহাদেব রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ম্লেচ্ছদের ধ্বংস করবেন। শিবের মুক্তির জন্য অনেকেই ব্যাকুল। কিন্তু মুশকিল হ'ল বিশুদ্ধতা রক্ষা করে মক্কায় গিয়ে শিবের নিকটবর্তী হওয়া। সে নাকি কিছুতেই সম্ভব ছিল না। গল্প শুনতে শুনতে শিশুমন উদ্বেলিত হয়ে উঠত সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত অজানাদেশে গিয়ে নীলকণ্ঠের উদ্ধার কামনায়।

বিষ্ণু কল্কি-অবতারে কিভাবে ধূমকেতুর মত করালমূর্তি ধরে তরবারির দ্বারা ম্লেচ্ছকুল নিধন করে ভারত-ভূমিকে পুনরায় পুণ্যভূমিতে পরিণত করলেন তার সবিস্তার বর্ণনা শুনতাম।

আজ আমার বাষট্টি বছর বয়সেও দেখতে পাচ্ছি সেই পাড়াগাঁয়ে টিনের ঘরে গাছপালায় পরিবৃত হয়ে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে। ঝিঁঝিপোকার আওয়াজে রাতের নিস্তব্ধতা যেন আরও গভীর হয়ে উঠেছে। ঘরের কোণে জ্বলছে তেলের মাটির বাতি। ঠাকুরমা ঘরের দাওয়ায় বসে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করছেন। আমি চিরশিশু তার কোল ঘেঁষে বসে নিবিষ্টচিত্তে গল্প শুনছি। মালা ফেরাতে ফেরাতেই তিনি এসব গল্প করতেন।

এ সমস্ত গল্প সেদিন শিশুমনে যে স্বপ্ন জাগিয়ে তুলত তাই হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনের মানুষটাকে চিরাচরিত জীবনযাত্রার বিপরীত দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পরের জীবনে—দ্বীপান্তরে, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শৃঙ্খলিত বন্দীদশায়, নানা দুঃখ-লাঞ্ছনায় এবং নানা প্রলোভনের মধ্যেও যে শির উন্নত রাখতে সমর্থ হয়েছি, তার জন্য সেই অন্ধকার-নির্জন-কুঠরীতে মালাজপরতা ঠাকুরমার উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানাই।

যদিও চুড়াইন গ্রামের বাড়ীতে আমাদের পাকাবাড়ী ছিল এবং দোতলা করবার জন্য সমস্ত মালমসলা কেনা হয়েছিল ; কিন্তু তবুও বাবা এবং কাকাদের ও-গ্রাম তেমন পছন্দসই ছিল না। সেজন্য, প্রায়ই তাঁরা সে গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্য কোন গ্রামে চলে যাওয়ার পরামর্শ করতেন। এমনকি মাদারীপুরের অন্তর্গত শেওলাপট্টি গ্রামে জায়গা-জমি ও একটা তালুকও কেনা হয়েছিল। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত আর কোথাও যাওয়া হয় নি। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গ্রাম ছেড়ে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা শহরে গিয়ে বাস করতে লাগল। প্রধানতঃ এ কারণেই আর আমাদের গ্রাম পরিবর্তন করা হয় নি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তার আগে থেকেই পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাতে এসে এবং অন্যান্য কারণে আমাদের দেশেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা আস্তে আস্তে কায়েম হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আমাদের সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্যসমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তখন টলটলায়মান। কেবলমাত্র চাষবাসের উপর নির্ভর করে আর গ্রাসাচ্ছাদন হয় না। জীবিকার জন্য লোক শহরমুখী হ'ল। এ বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই হ'ল অগ্রণী।

পিতামহের আমলে গ্রাম ছাড়ার কথা আমাদের পরিবারে কেহ কল্পনাও করে নি। কোন প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু আমার পিতা মাত্র ষোল বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে শহরে গেলেন ইংরেজী লেখাপড়া শিখে পরিবার প্রতি-পালনের জন্য অর্থোপার্জনক্ষম হতে। লেখাপড়া শিখে আমার কাকা গেলেন শহরে পাটের অফিসে চাকরি করতে। পিসতুত ভাইরাও শহরে গেলেন লেখা-পড়া শিখতে।

গ্রামে আমাদের যে জমিজমা এবং আম-কাঁঠালের বাগান ছিল তাতে গ্রাম্য-জীবনের মোটাভাত মোটাকাপড় হয়ত জুটে যেত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে জীবনযাত্রার প্রণালী তখন বদলাতে শুরু করেছে। এর ফলেই গ্রাম্যজীবন ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল। সুতরাং আমার পিতৃদেব ও পরিবারের অনেকের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও গ্রামে থাকা তো হ'লই না, ক্রমে আকাঙ্ক্ষাও নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

লোক শহরমুখী হলেও তখন পর্যন্ত চাকরির মোহ সকলের মধ্যে তীব্র হয়

নি বরং অনিচ্ছাই ছিল। এখনকার দিনের অনেক আকাঙ্ক্ষিত চাকরিও তখন লোকে চাইত না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের গ্রামে শ্যামাচরণ ও চিরঞ্জীব নামে দুই মামাত-পিসতুত ভাই ছিলেন। তাঁরা সম্ভবতঃ আমার পিতৃদেবের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। তখন তাঁদের পূর্ণ যৌবন। সুগঠিত দেহে স্বাস্থ্য টলটল করছে। একবার তাঁরা ঢাকা শহরে গিয়ে পাঁচ আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ এঁদের নিয়ে গেল থানায়। কর্তৃপক্ষ যুবকদ্বয়ের সুগঠিত দেহের দিকে তাকিয়ে শাস্তি দেবার কথা ভুলে গিয়ে আদেশ করলেন—"এদের দারোগা বানিয়ে দাও।" ওঁদের তো এদিকে মুখ ম্লান হয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে লাগল। প্রথমেই চিরঞ্জীবকে দারোগা বেশে বিভূষিত করা হ'ল। সবাই যখন তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত তখন সুযোগ বুঝে শ্যামাচরণ প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে সেই যে ছুটতে শুরু করলেন, ষোল মাইল দূরে বাড়ী পৌঁছবার আগে আর কোথাও থামেন নি। রাস্তায় বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, ইছামতি এই তিনটি নদীতে খেয়া পার হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ী পৌঁছেই চিরঞ্জীবের মাকে বললে—"পিসীমা, সর্বনাশ হয়েছে, চিরঞ্জীবকে দারোগা বানিয়ে দিয়েছে। আমি কোনমতে পালিয়ে এসেছি।" বৃদ্ধ বয়সে শ্যামাচরণবাবুকে এজন্য আপশোষ করতে শুনেছি।

কি কথায় কি কথা এসে গেল। নিজের গ্রাম চুড়াইনে আজ বহু বছর যাইনে। কিন্তু মনে আছে আমার সতর বছর বয়স পর্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই একবার করে বাড়ী যেতাম। দেশ বিভাগের ফলে আজ তা বিদেশ হয়েছে। যেতে চাইলেও প্রয়োজন পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি নানা পরিচয় ও অনুমতিপত্র। 'দুই বিঘা জমি'র আজ আমরা দরিদ্র প্রজা!

বাধা যতই থাক না কেন, অন্তরের ছবি কোনদিনই ম্লান হবে না। মনে পড়ে আমাদের গ্রামের সেই ছোট্ট নদী ইছামতিকে। নৌকো করে ভেসে গ্রামের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। দূরে ঐ দেখা যায় পঞ্চবটী—বট ও অশথ আর সবার উপর মাথা তুলে যেন চারদিকে নজর দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। নদীর কোল-ঘেঁষা ক্ষেতগুলি ধান পাট ও নানান শস্যে ভরপুর। গৃহস্থের মুখে ফুটে উঠেছে সম্পদের আনন্দ-আভা।

পঞ্চবটীর ঘাট বউঝিদের কলকোলাহলে মুখরিত। কারুর কাঁখে কলসী, কেউবা করছে অবগাহন স্নান। অপরিচিত পুরুষ দেখে ঈষৎ ঘোমটা টেনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ঐ যে নৌকোখানা ঘাটে এসে ভিড়ল তা থেকে

হাসিমুখে নেমে গেল মেয়ে—বাপের বাড়ী এলো। আবার তার পাশেই বাঁধা নৌকোতে উঠছে কোন মেয়ে—চোখের জল ফেলতে ফেলতে, শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্য। চাষী ছাতিফাটা রোদে কাজ করতে করতে কপালের ঘাম মুছছে। পঞ্চবটীর শ্মশান ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। বটমূলে জ্বলছে ধূনি। সন্ন্যাসী পাশে বসে গাঁজায় দম দিচ্ছে। সামনেই উপবিষ্ট সতৃষ্ণ নয়নে গ্রাম্যভক্তের দল। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সন্ন্যাসীও দেখছি। চারিদিকে কত খাবার, কিন্তু সন্ন্যাসী তা থেকে কণিকামাত্র গ্রহণ করে আর সব বিলিয়ে দিচ্ছেন ভক্তদের।

আমবাগানের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলছি গ্রামের দিকে। সবাই জিজ্ঞেস করছে কুশল-প্রশ্ন। বাড়ী পৌঁছে সর্বপ্রথম ঠাকুরমাকে প্রণাম করে মাথায় ছোঁয়ালাম তাঁর পদধূলি।

গ্রামের অপরদিকে বিপুল মাঠ। সে মাঠের প্রায় শেষ প্রান্ত হতে আরম্ভ হয়েছে প্রসিদ্ধ আড়িয়াল বিল। পাশঘেঁষে চলেছে আঁকা-বাঁকা রাস্তা। গাছে গাছে পাখীর ডাক আজও যেন কর্ণে মধু বর্ষণ করছে।

ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের গ্রামে দরিদ্র বলতে বড় একটা কেউ ছিল না। অধিকাংশই ছিল সম্পন্ন গৃহস্থ। কেউ কেউ বা কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করে, উকিল-মোক্তার বা ডাক্তার হয়ে পয়সাকড়ি উপায় করছিল। এদের পরিবারের লোকেরা আস্তে আস্তে কৃষির উপর কম নির্ভরশীল হতে লাগল। অবশ্য সবই এক পুরুষের কথা। কোন কোন ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের বিধবাদের দেখেছি টাকা সুদে খাটিয়ে দু'পয়সা উপায় করতে।

ভাত-কাপড়ের অভাব তেমন না থাকায় গ্রামখানা যেন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত থাকত। আমাদের বাগানেই যে কত আম-কাঁঠাল হ'ত তার অন্ত নেই। কোন বাড়ীতেই এ সব ফল, দুধ, দই, ক্ষীর, চিড়া, মুড়ির অভাব ছিল না। কারুর খাওয়ার কোন নির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকত না। যে যত পারত খেত। আজকালকার মত দু'চারটা আম কেটে বাড়ীর সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার প্রশ্ন উঠত না। সব বিষয়েই যেন একটা সচ্ছলতার ভাব ছিল। গ্রামে গিয়ে দরিদ্র নিরন্ন মানুষের মুখ দেখেছি বলে আজ মনে করতে পারছি না।

আমাদের পিতৃদেব ওকালতি করে তখন বহু সহস্র টাকার মালিক হয়েছিলেন। আমার কাকাও পাটের অফিসে চাকরি করে বছরে বিশ সহস্রাধিক টাকা উপায় করতেন। কাজেই তখন আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। আমরা বাড়ী গেলে শুধু আমাদের বাড়ী নয়, সমস্ত-গ্রামেই যেন

উৎসব স্বরু হ'ত। দেখেছি পৈতে, অন্নপ্রাশন এবং বিবাহাদি উৎসবের পর মাটিতে দুধ ও দই ঢেলে কাদা খেলা হ'ত।

আমার কাকা এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকে মদ্যপান করতেন। পয়সাওলা লোকের মধ্যে এ দোষ ছিল না এমন লোক তখন খুবই কম ছিল। গ্রামে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের মধ্যে গাঁজার প্রচলন ছিল।

গ্রীষ্ম কিংবা পুজোর ছুটিতে বাড়ী গেলে দেখেছি বাইরের প্রাঙ্গণে চলত মদ খাওয়া, তাস, পাশা বা দাবা খেলা অথবা থিয়েটার। অবশ্য ঠাকুরমাদের জন্য মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করতে হ'ত রামায়ণ, মহাভারত, কথকতা বা চণ্ডীপাঠ।

বাহির প্রাঙ্গণে যতই মদ চলুক না কেন ভেতর-বাড়ীতে তা প্রবেশের সাধ্য থাকত না, কিংবা মত্ত অবস্থায় কেহ ভেতরে আসতে পারত না। মেয়েদের শালীনতা, শুচিতা এবং সম্মান রক্ষার দিকে বাড়ীর কর্তাদের প্রখর দৃষ্টি থাকত। ছোট বড় একসঙ্গে বসে মদ খেলেও ছোটরা বড়র সামনে খানিকটা নলচে আড়াল করে তামাক খাওয়ার মত একটা সম্ভ্রম রক্ষা করে চলত।

আমার পিতৃদেব ৺মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু ছিলেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনি যে শুধু কখনই মদ্য পান করেন নি তা নয়, কখনও কোনরূপ নেশার বশীভূত হন নি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সাধু প্রকৃতির মানুষ। এজন্য তিনি ছিলেন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি বাড়ী থাকলে মদ্য-পানাদি কিছুই হতে পারত না।

তখন পর্যন্ত আমাদের গ্রামে কোন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল না। একটি পাঠশালা ছিল মাত্র। সরকারী ডাক্তারখানা তখনও স্থাপিত হয় নি। শুধু কবিরাজী চিকিৎসা চলত। পোস্ট-অফিস তখন সবে মাত্র স্থাপিত হয়েছে।

আমার কাকিমা, পিসিমারা কেউ লিখতে বা পড়তে পারতেন না। আমার মা বিয়ের পর বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন। গ্রামে তখন মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা তেমন ছিলই না। আমার আপন বোনেরা শহরে থাকত বলে লেখাপড়া শিখেছিল। অবশ্য পরে আমার খুড়তুত পিসতুত বোনেরাও নিজেদের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া ভাল করেই শিখেছিলেন। মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শেখে এটা আমার ঠাকুরমা পছন্দ করতেন না। খুড়তুত বোনেরা নাটক নভেল নিয়ে পড়তে বসলে ঠাকুরমা খুব রাগ করতেন। রেগে বলতেন, "হ্যাঁ, যেন এরা এখন লেখাপড়া শিখে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হবেন, বিদেশে চাকরি করতে যাবেন!

রামায়ণ-মহাভারত পড়, হিসাবপত্র রাখ, দলিল-দস্তাবেজ পড়তে শেখ; তা নয়, ঘরের কাজকর্ম ফেলে নভেল নাটক মুখে গুঁজে বসে আছেন !”

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত তিনি শুনতেন খুব খুশী ও পবিত্র মনে। তখনকার দিনে, বোধ হয় আজকালও, শাস্ত্রগ্রন্থ লোকে শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যই পড়ত না; পড়লে, শ্রবণ করলে, এমন কি ঘরে রাখলেও পুণ্য হয়, এই ছিল তাদের বিশ্বাস।

অর্থোপার্জন ক্ষমতা লাভ করা লেখাপড়া শেখবার একটা মুখ্য কারণ। সেকালে লোকের আর্থিক অবস্থা এতটা খারাপ হয় নি যাতে করে মেয়েদের টাকা রোজগার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। একান্নবর্তী পরিবার থাকার ফলে পুরুষদের মধ্যেই অনেকের অর্থোপার্জন প্রয়োজন হ’ত না। অর্থনৈতিক কারণেই সেদিন স্ত্রী-শিক্ষার তেমন প্রচলন হয় নি। কিন্তু আজকাল অবস্থা একেবারে পাল্টে গিয়েছে। যে কারণে সেদিন মেয়েদের বাইরে আসার সামাজিক সমর্থন থাকত না, সেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দূর হয়ে যাওয়ার ফলে, জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণে বর্ধিত হওয়ার ফলে, এখন আর পুরুষদের রোজগারে সকল অভাব মেটে না। মেয়েদের সহযোগিতা চাই পুরোপুরি। এ অবস্থায় পর্দা-প্রথা যে বিদূরিত হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে !

আগেই বলেছি আমার পিতৃকুল ছিল নৈকষ্য কুলীন এবং মাতৃকুল ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারের সিদ্ধপুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুরের বংশ। এঁরা ছিলেন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং গুরুবংশ। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের এঁরা ছিলেন কুলগুরু। মত ও পথে তাঁরা তান্ত্রিক শাক্ত ব্রাহ্মণ। এঁদের কথা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমার পিতৃদেব ছিলেন মত, পথ, বিশ্বাস ও আচরণে ব্রাহ্ম, একেশ্বরবাদী, অস্পৃশ্যতাবিরোধী। এককথায় সর্বপ্রকার সামাজিক কুসংস্কার বর্জিত। খুব ছোটবেলা থেকেই পিতৃদেব আমাকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত নিয়ে যেতেন। ব্যক্তিগত চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে যাতে আমার মন শুদ্ধচারী এবং সর্বপ্রকার কুসংস্কারবিরোধী হয়ে গড়ে ওঠে সেই চেষ্টাই সব সময় করতেন।

পিতৃদেব ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উকিল। সেখানে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য। শুধু বড় উকিল বলে নয়, কিংবা কেবল জ্ঞান ও বিদ্যা-

বুদ্ধির জন্যও নয়। সাধুতায়, সততায় তিনি ছিলেন সে যুগের ব্যতিক্রম। হাজার হাজার টাকা উপায় করেও যে লোক সে যুগে মদ খায় না, বা পতিতালয়ে যায় না, তার প্রতি স্বতঃই মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে। যে অর্থ তিনি উপায় করতেন তা শুধু আমাদের জন্যই ব্যয় বা সঞ্চয় করেন নি। অনেক আত্মীয়-স্বজনও প্রতিপালন করেছেন। তথাপি মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পুত্রদের অঋণী এবং লক্ষ টাকার মালিক রেখে গিয়েছেন।

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে পিতাই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তাঁর চার বোন এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনীদের সহ সকলের প্রতিপালনই তাঁকে করতে হ'ত। এমনকি পিসিমাদের সতীন-কন্যাদের ভরণপোষণ এবং বিয়ে দেওয়ার দায়ও পিতৃদেবের উপরেই ছিল। আমার দু'কাকা মেলাই রোজগার করতেন ; কিন্তু, তথাপি পিতাই তাঁদের পরিবার প্রতিপালন করতেন। এঁরা ছাড়াও বহুলোক···আমার পিতৃদেবের রীতিমত সাহায্য পেত। আর একটা বিশেষ গুণ দেখেছি যে, তিনি তাঁর পুত্র-কন্যা এবং অন্যান্য আশ্রিত-প্রতিপালিতের মধ্যে কোন তারতম্যই করতেন না। খাওয়া-দাওয়া কাপড়-জুতো সকলের জন্যই সমান মূল্যের বরাদ্দ ছিল।

আমি ছিলাম পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং সকলের মতে আমিই এই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল। লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে আমিই হব এই বৃহৎ পরিবারের কাণ্ডারী। এমনকি বাড়ীর পুরনো চাকর-বাকররা ভাবত, তারা যখন বুড়ো হয়ে অক্ষম হয়ে পড়বে তখন তাদের ভারও আমিই বহন করব। কিন্তু বিধাতা তাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন নি। আমি যে অল্প বয়সেই দেশের জন্য সর্বত্যাগী হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে অনুশীলন সমিতির হয়ে সর্বহারাদের দলে যোগ দিয়েছি এবং সমস্ত পরিবারকে নিঃস্ব অবস্থার দিকে টেনে নিয়ে আসছি একথা কেউ ভাবতেও পারে নি। আমার চোখে ভারতের অগণিত বুভুক্ষু, নির্যাতিত এবং শোষিত পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিবার এক হয়েছিল। শুধু আমার নিজের কেন, আরও শত-সহস্র পরিবারের ধ্বংস হয়েও যদি ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্ত হয় তাকেও কাম্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। সকলের মুক্তির মধ্যেই যে অংশের মঙ্গল এ যুক্তিই জেনেছিলাম অকাট্য বলে। এত সব কথা আত্মীয়-পরিজনরা বুঝতেন না বা কোনই সান্ত্বনা দিতে পারতেন না।

তা হলেও এইসব আত্মীয়-পরিজন ও আশ্রিতদের কথা মনে হলে বুকটা

ব্যথায় টনটন করে উঠত—এঁদের দৈন্যদশা দেখে। কখনও মনে হয়েছে কর্তব্যের বুঝি ত্রুটি হ'ল। পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের আশা পূর্ণ করার অক্ষমতায় এঁদের কাছে এবং নিজের কাছেও নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেছি। এ হয়ত আমার ভাবরসের কথা। অথবা যে মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক পিতৃ-প্রধান সমাজ আমার অন্তরের অন্তস্থলে অতি গোপনে লুকিয়ে আছে এই ভাবরস তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বিশদ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায়—

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং তাঁর অবর্তমানে আমিই পরিবারের কর্তা। আমিই করব সমগ্র পরিবার এবং গোষ্ঠি প্রতিপালন ও রক্ষা। আমার কথা সকলের ওপরে ; এবং সকলেই কৃতজ্ঞ থাকবে আমার কাছে। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করে আত্মীয়-স্বজন ও পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করে কর্তব্য পালন করব। গ্রামের পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, ভূইমালি, গ্রাম্য-দরিদ্র সকলেই আসবে আমার কাছে প্রার্থী হিসেবে, আর আমি সবাইকে করব মুক্তহস্তে দান। সবাই ধন্য-ধন্য করবে। এই হচ্ছে গিয়ে পিতৃ-প্রধান সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের মূল কথা। এই ভাবাবেগই হয়ত আমার অবচেতন মনে সুপ্ত হয়েছিল এবং আত্মীয়-পরিজনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করত।

দীক্ষিত না হলেও পিতৃদেব মতে ছিলেন ব্রাহ্ম। কিন্তু কুলগুরুর মর্যাদা রক্ষা এবং বার্ষিক প্রণামীদানে কখনও ত্রুটি করেন নি। বহু ঘটক এবং সংস্কৃত টোলের পণ্ডিতও এসে বাৎসরিক বৃত্তি নিয়ে যেতেন। আমি কিন্তু আর কুল-গুরুর খবরও রাখি নি কিংবা ঘটকরাও আর পদার্পণ করেন নি।

যদিও আমার মাতাঠাকুরাণী নিজে আমার সর্বপ্রকারে বিপ্লববাদী কার্যে উৎসাহ দিতেন এবং তিনি নিজে বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তবুও দু'এক সময় আমার কথা উল্লেখ করে দুঃখ করতেন এই বলে যে, আমি এমন একটা জীবনযাপন করছি-যার ফলে বংশের গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার কর্তব্য আমার দ্বারা সম্ভব হ'ল না। আমারও অবচেতন মনে এই পিতৃ-প্রধান সমাজের খেদ লুকিয়ে আছে বলেই মাঝে মাঝে ব্যথিত হই।

আগেই বলেছি যে, আমি জন্মেছি মামাবাড়ীতে। চালিতাতলী গ্রাম চাঁদপুর শহর থেকে বোধহয় পাঁচ কি ছ' মাইল দূরে। আমরা চাঁদপুর শহর থেকে স্টীমারে চেপে তার পরের স্টেশন নরসিংহপুরে নেমে হেঁটে কিংবা নৌকোয় মামাবাড়ী

যেতাম। নরসিংহপুর অবশ্য নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরে স্টেশন হ'ল ইব্রাহিমপুরে। তাও হয়ত আজ পদ্মার স্রোতের ধারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

চাঁদপুর থেকে অবশ্য নৌকোতেও যাওয়া যেত। তবে প্রকাণ্ড নদীতে নৌকো সবসময় নিরাপদ নয় বলে আমরা স্টীমারেই যেতাম। চাঁদপুর ও ইব্রাহিমপুরের মধ্যে পদ্মা-মেঘনার মিলিত স্রোতে সীমারেখাহীন বিস্তীর্ণ জলরাশি ভীষণ কায়া ধারণ করেছে। এই বিশালতা আমার মনকে চিরকাল আনন্দে ভরপুর করে রাখত। সেই ছবি আমি জীবনেও ভুলতে পারব না।

এ পথে অনেকবারই গিয়েছি, কিন্তু শেষ যেবার যাই সেবার একটা ছোট একমাল্লা নৌকোয় চাঁদপুর থেকে ইব্রাহিমপুর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ডিঙ্গি যখন বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে সূর্য তখন পশ্চিমে জলরাশির মধ্যে ডুব দেবার আয়োজন করছেন। তাঁরই অস্তরাগে পারকূলহীন বিরাট নদীর চারদিক রঞ্জিত। নদীর জলে কে যেন খুনখারাপি রং গুলে দিয়েছে। ডিঙ্গিটি ক্ষুদ্র। কাণ্ডারী এক কিশোর। আকাশে সোনালী মেঘ, পারে সুপারির সারি, নৌকোর পাটাতনের এক ইঞ্চি নীচেই অতল জল। সব মিলে এমন একটা রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেদিন সে মুহূর্তে যদি নৌকোর কাঠ কেটে গিয়ে অতল তলে ডুবে যেতাম তবুও বুঝি স্বর্গলাভের আনন্দেই নদীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম।

শুধু সেদিন কেন, চিরকালই পদ্মা-মেঘনার বিস্তৃত কায়া আমার মনকে মোহিত করে। বিরাট ও বিস্তারের রূপ আমাকে চিরকাল অভিভূত করে তোলে। পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক। সেই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে আমি আশৈশব প্রকাণ্ড নদীর স্বপ্ন দেখেছি। আনন্দে বিহ্বল হয়ে ভেসে চলেছি সেই অকূল-অতল তরঙ্গায়িত বানের উপর দিয়ে। আজও রোমাঞ্চ জাগায় পদ্মা-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রূপ! চারদিকে ঝড়-ঝঞ্ঝার তাণ্ডবলীলা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নদীর বুকে। চাঁদপুর-গোয়ালন্দ যাতায়াতে কয়েকবারই এমনি পরিবেশের মধ্যে সীমাহীন আনন্দে সময়টুকু কাটিয়েছি। পথে যদি ঝড়ই না বইত, রাত্রির সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রবল বাতাস ও সুউচ্চ ঢেউ-এর আঘাতে স্টীমার টল্‌মল্ করে না উঠত, তবে যেন নিষ্ফল যাত্রার নৈরাশ্য মনকে সঙ্কুচিত করত।

যে নদী মরে হেজে যাচ্ছে তা দেখলে আমার মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যে নদী ক্ষুরধার স্রোতে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে এগিয়ে চলেছে সে অগ্রগতি

দেখলে মন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়। তাই তো আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বিশীর্ণ ইছামতির উপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে মন বিষাদে ভরে যেত। মনে হ'ত ইছামতি কেন তার দু'পার ভেঙেচুরে নিজের কলেবর বাড়িয়ে তোলে না! আর যখন আমার পিসিমার বাড়ীর কাছে অর্থাৎ রাজবাড়ী-বাহেরকের পাশে পদ্মার ধ্বংসলীলা দেখতাম তখন মন বিভোর হয়ে উঠত।

মামাবাড়ী গেলে প্রায়ই নরসিংহপুর স্টেশনে এসে নদীর ভাঙনকূলে বসে মেঘনার সীমারেখাহীন রূপ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতাম। আমার মনে আছে, নোয়াখালি গেলে মেঘনার চেয়েও বড় নদীর দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম।

ভাঙনকূলে নদী খরস্রোতা। মিনিটে মিনিটে পাড় নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুপ্ত হয়ে যায়। প্রথমে অনেকটা জায়গা জুড়ে চির খেত। আমরা তক্ষুণি সে জায়গা ছেড়ে দূরে গিয়ে বসতাম। একটু পরেই সেই ভূখণ্ডটুকু পাক-খাওয়া জলে ডুব দিত। বিশাল বিশাল বট অশত্থ যখন ভীষণ শব্দ করে পাক খেতে খেতে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেত তখন বিস্ময়ে পুলকে দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।

এমনি মনোভাব ও স্বপ্নাকুল মানুষের মনোবিশ্লেষণ ফ্রয়েডপন্থীরা কি করবেন জানি না। কিন্তু আমি যে আজও এমনি স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ি তা অকপটে স্বীকার করছি।

শৈশবে প্রতিবছরই মামাবাড়ী যেতাম পুজোর ছুটিতে। অবশ্য বড় হয়ে আর প্রতিবছর যেতে পারি নি। তবে জেলের বাইরে থাকলে সময়-সুযোগ হলে ঐ পুজোর সময় মামাবাড়ী না গিয়ে থাকতে পারতাম না। কুলীনদের মামাবাড়ীর প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে সে টানেই বোধ হয় ছুটে যেতাম। এ ব্যাপারে আমি আমার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র। তিনিও যেতেন তাঁর মামাবাড়ী মাদারীপুর অন্তর্গত সেওলাপট্টি গ্রামে এবং এ কারণেই মামাদের একটু বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করছি না।

আমার মামারা গুরুবংশ বলে খ্যাত এবং বহু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর তাঁরা কুলগুরু। কুলীনে কন্যাদান খুব সম্মানের কাজ বলেই তাঁরা স্মরণাতীত কাল থেকে কুলীন জামাই ঘরে আনতেন। ঐ এলাকায় মামারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে

সম্মানিত হতেন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁরা পৃথক ও শ্রেষ্ঠ আসন পেতেন। এ আমার ছোটবেলায় দেখা। কেন তা বলছি: —সর্বানন্দ ঠাকুর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। আমার মামারা তাঁরই বংশোদ্ভব। সর্বানন্দ ঠাকুর মহাবিদ্যা মা কালীর দশরূপ সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে তাঁর বংশ সর্ববিদ্যা বংশ নামে খ্যাত এবং এই কারণেই তাঁরা সমস্ত পূর্ববঙ্গে সম্মানিত।

যতদূর জানা যায়, তেইশ কি চব্বিশ পুরুষ পূর্বে মেহারের জঙ্গলে সর্বানন্দ ঠাকুর তাঁর পরিচারক পূর্ণর মৃতদেহের উপর বসে ঘোর অমাবস্যা রজনীতে শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি নাকি তখন এমন অলৌকিক শক্তির অধিকার লাভ করেছিলেন যে, অমাবস্যা তিথিতেও আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় হয়েছিল। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলাত্মিকা—এই দশ রূপেই নাকি মহাকালী সর্বানন্দ ঠাকুরের নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ সবই তন্ত্রোক্ত দেবতা এবং সকল প্রকাশই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যমণ্ডিত। কারুর গলায় মুণ্ডমালা, রক্তাক্ত তরবারি হস্তে অসুর নিধন করছেন, কেহবা ষড়ৈশ্বর্যশালিনী মূর্তিতে এক হস্তে তরবারি ধারণ করে অপর হস্তে অসুরের জিহ্বা আকর্ষণরতা; আবার ভীষণ-দর্শনা ধূমাবতী কুলার বাতাসে প্রলয় ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করছেন; স্বহস্তে নিজমুণ্ড ধারণ করে ছিন্নমস্তা রুধির পানে রতা। ছেলেবেলায় মাতুলালয়ে এই সব ভীষণ-দর্শন দেবতাদের অসুর ধ্বংসের কাহিনী শুনতে শুনতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। আর সেই সঙ্গে সর্ববিদ্যা বংশের শ্রেষ্ঠত্ব ও অলৌকিক শক্তির গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম।

ছেলেবেলায় একবার মামাবাড়ী থেকে নৌকোযোগে মেহারের কালীবাড়ী গিয়েছিলাম। সেই দেবস্থানে কোন মন্দির দেখি নি কিংবা কোন মূর্তিও ছিল না। কেবল কয়েকটা বহু প্রাচীন বটগাছ আজও দাঁড়িয়ে আছে যেন সর্বানন্দ ঠাকুরের আমলের সাক্ষ্য দান করতে। সেই সব বটগাছের চারদিকে ঘট বসিয়ে লোক পুজো করছে। শুনলাম, দেখলামও বটে, সেখানে অস্পৃশ্যতাও নেই কিংবা কোন কিছু ঘৃণ্যও নয়। স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলেই অবাধ চলাফেরা করছে। অচ্ছুতরা পুজোর ঘট ছুঁলেও কেউ আপত্তি করছে না। এমনকি বটগাছের উপর থেকে অসংখ্য চিল-শকুনির বিষ্ঠা নৈবেদ্যতে পড়লেও কেহ অশুচি কিংবা দোষের মনে করত না।

পাঁঠাবলি হ'ত সেখানে প্রতিদিনই; কিন্তু কালীপুজো কিংবা কোন পর্ব উপলক্ষে বলি হ'ত হাজার হাজার। সর্বানন্দ ঠাকুর যখন সাধনা করেছিলেন তখন জায়গাটা ছিল ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ মহা-শ্মশান। তৎকালে নাকি এখানে নরবলিও হ'ত।

আমি যেদিন সেখানে গিয়েছিলাম সেদিন ছিল অমাবস্যা। দেখলাম সর্ব-বিদ্যা বংশের ব্রাহ্মণরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন—পরিধানে রক্তবস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, কপাল রক্ত-তিলকে রঞ্জিত। কারুর কারুর গলায় নর-অস্থির মাল্য শোভা পাচ্ছে। কারণবারি (সুরা) পানের জন্য দেখলাম মাথার খুলি। বটাচ্ছাদিত অমাবস্যা রজনীর সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে তীর্থযাত্রীরা ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ত। স্তিমিত মাটির প্রদীপগুলি অন্ধকারকে যেন আরও রহস্যাবৃত করে তুলত। সাধারণ তীর্থস্থানের মত সেখানে কোন কলকোলাহল ছিল না। সবাই নীরবে অবস্থান করত। প্রয়োজন হলে মৃদুস্বরে আলাপ করত। কেবল মাঝে মাঝে তান্ত্রিকদের উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ, সুরাপানোন্মত্ত সর্ববিদ্যা-সন্তানদের হুঙ্কার ও অট্টহাস্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করত। দিনের বেলাতেও দেখেছি এমনি পরিবেশের মধ্যে তীর্থযাত্রীদের গা ছম্ ছম্ করত।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন বড়মামা ৺অপর্ণানাথ ঠাকুর। তিনিই আমাদের পুজোর তত্ত্বাবধান করছিলেন। আমি বিপ্লবী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেছিলাম তা তিনি জানতেন। একটু অবসর পেয়ে একান্তে ডেকে তিনি আমায় বলেছিলেন, "এখানেই আমাদের পূর্বপুরুষ, তোরও মাতামহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সর্বানন্দ ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। দশ-মহাবিদ্যার সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন তিনি। জেনে রাখ, এই স্থানই বিশ্বের সমস্ত শক্তির উৎসস্থল। শুম্ভ-নিশুম্ভ, মহিষাসুর প্রভৃতি কত দৈত্যদানব ধ্বংস করেছিলেন এই মহাকালী। তোদের ইংরেজদের যতই গোলাগুলি থাকুক না কেন, তা সবই এ শক্তির নিকট অতি তুচ্ছ তৃণসমান। ম্লেচ্ছ ইংরেজ শক্তির বিনাশ করতে হলে চাই এই মহাশক্তির বর।" বড়মামার কথা শুনতে শুনতে আমার মন বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে গেল। মনে মনে দশ-মহাবিদ্যার নাম জপ করে তন্ময় হয়ে প্রণাম জানালাম—

"ওঁ সর্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে শিবে-সর্বার্থ-সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে"

সেই দিন সেই তিথির রাত্রির রোমাঞ্চকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা

করেছিলাম—"ম্লেচ্ছের কবল থেকে মাতৃভূমি মুক্ত হোক! সেই পুণ্য কর্মে আমায় শক্তি দাও মা মহাকালী!" এই কয়টি কথায় আমাকে চিরদিন মনোবল জোগাতে সহায় হয়েছে। কোন দেবদেবীর মন্দিরে—বিশেষ করে কালীমন্দিরে গেলে দেশের মুক্তি কামনায় নিজের শক্তি-প্রার্থনা এক রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র ভারতবর্ষেই—বিশেষ করে বাংলা দেশে হিন্দুদের উপর তন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী। এরা শক্তির উপাসক। তন্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ীই তারা জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং এদের জীবন তন্ত্রশাসিত বলা চলে।

তান্ত্রিকরা লিঙ্গ-পূজক। লিঙ্গ-পূজা (Phallic Worship) বোধ হয় প্রবর্তিত হয় জীবসৃষ্টি রহস্য মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর থেকেই। তান্ত্রিকরা পুরুষের চেয়ে প্রকৃতিকেই বেশী আমল দেয়। প্রকৃতিই সৃষ্টি, স্থিতি, পালনকর্তা বলে এদের অধিকাংশ দেবতাই স্ত্রীরূপী। তাই তো দেবাদিদেব মহাদেবও মা মহামায়ার পদতলে। তাই তো এরা শুধুমাত্র শিবলিঙ্গের উপাসক নয়, স্ত্রী-চিহ্নও এরা উপাসনা করে এবং স্ত্রী-চিহ্ন পূজার প্রচলনও এই কারণেই।

কিংবদন্তী অনুসারে শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোড়িত করে তুলেছিলেন, তখন বিষ্ণু-চক্র দ্বারা সতীদেহ বাহান্ন খণ্ডে খণ্ডিত করেন এবং যে যে স্থানে এর এক একটি অংশ পতিত হয়েছে সেই সেই স্থানই এক-একটি সিদ্ধপীঠ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই হ'ল বাহান্ন পীঠের উৎপত্তির পৌরাণিক কথা। এর মধ্যে আবার কামাখ্যা শ্রেষ্ঠ, কেননা সতীর স্ত্রী-চিহ্ন এখানেই পতিত হয়েছিল।

স্ত্রী-চিহ্ন পূজাকেই শ্রেষ্ঠ পূজা মনে করে বলেই তান্ত্রিকরা সমস্ত পূজাতেই ত্রিকোণ-চক্র অঙ্কিত করে। এই ত্রিকোণ-চক্রের উপরই দুর্গাপূজার ঘট স্থাপিত হয়। এমন চক্র স্ত্রী-চিহ্নের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। কতকগুলি আবার নর-নারীর মিলন চিহ্নস্বরূপ। তান্ত্রিক মুদ্রাগুলিও প্রায় এইরূপই।

জীবসৃষ্টি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-রহস্য মানুষকে চিরকাল বিস্মিতই করে নি, নানা কল্পনায়ও উদ্বুদ্ধ করেছে। এই যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজ যা অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না, তা কি ভাবে এমন মানুষে পরিণত হয় সে রহস্য আজও মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সমস্ত প্রতিভাকে পরাজিত করে আছে।

তান্ত্রিকরা নিজেদের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেন। আপন আপন সাধন-শক্তিতে এতখানি বিশ্বাসী যে, তাঁরা বিশ্বসৃষ্টির কার্যকারণ সম্বন্ধ ইচ্ছা করলে ওলটপালট করে দিতে পারেন—এমনি তাঁদের ধারণা। এই কারণেই দেখতাম মাতুলবংশের লোকেদের মধ্যে কি একটা শ্রেষ্ঠত্ববোধ বিরাজমান ছিল। তাঁরা যে শুধু ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তাই নয়, তন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে ভগবানের সমতুল্য ক্ষমতাশালী হতে পারেন। তাই তো অমাবস্যা রজনীতেও পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্ভব হয়েছিল। তাই তাঁদের কোন কুলগুরু ছিল না। তবে মন্ত্র যখন গ্রহণ করতে হ'ত তখন তাঁরা পরিবারের মধ্যেরই কারুর কাছ থেকে গ্রহণ করতেন।

তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তির কথা ছোটবেলায় অবাক হয়ে শুনতাম। বিশ্বাস ছিল যে, তাঁরা এই ম্লেচ্ছ-নিপীড়িত ভূমিতে মাত্র সাময়িকভাবে পরাভূত হয়ে আছেন। কিন্তু তবুও তাঁরা সবার চাইতে উঁচুতে—এমনকি ঐ শ্বেতকায়দের চাইতেও। ধর্মবিরোধের ধ্বংস সাধন করে আবার তাঁরা প্রভুত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেন—অবশ্য সাধন-শক্তিতেই। আবার আসবেন সর্বানন্দ ঠাকুর, তাঁদের বংশেই ; এবং তিনিই আবার তাঁদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। জানি না আজও তাঁদের বুকে এমনি ধারণা লুকিয়ে আছে কিনা!

সেকালের স্যার ভেলেনটাইন চিরল (Sir Valentine Chirol) ভারতবর্ষের বিপ্লবান্দোলন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, মহারাষ্ট্রের চিতপাবন ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বলেই ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিরোধী। চিরল সাহেবের মতে ভারতের বিপ্লব শুধু ব্রিটিশ-বিরোধী নয়, সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতারও। উচ্চ শ্রেণীর লোকই আপন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে অপরের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় বিক্ষুব্ধ হয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, বিপ্লবীরা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব। চিরল সাহেব বিপ্লব আন্দোলন তলিয়ে দেখেন নি। তিনি শুধুমাত্র একটি দিকই দেখেছিলেন। তিনি দেখেন নি বা লক্ষ্য করেন নি আন্দোলনের পিছনে একটা জাতির জাগরণ। বিপ্লবীদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই জাতীয় অভ্যুত্থান আত্মপ্রকাশ লাভ করেছিল। শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা মানুষকে পুনরধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে, এটা একটা সমগ্র বিষয়ের অংশ মাত্র। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণরাই নয়, সকল ভারতবাসীর মধ্যে অবশ্যই পূর্ব-গৌরববোধ জাগ্রত হয়েছিল। সক্রিয়ভাবে হয়ত সকলে বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করে না, কিন্তু এমনি সংগ্রামে তারা থাকে সহানুভূতিশীল। যদি

অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অনুকূল হ'ত তবে অনেকেই বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করতেন।

আমাদের চুড়াইন গ্রাম ছিল জনবহুল ঘনবসতি এবং প্রত্যেকটা বাড়ীই ছোট ছোট। কিন্তু মামাদের দেশ হরিণা চালিতাতলী এবং আশেপাশের গ্রামগুলি জনবিরল এবং এক-একটা বাড়ী যেন এক-একটা গ্রাম জুড়ে।

মামাবাড়ীকে লোকে "ঠাকুরবাড়ী" অর্থাৎ গুরুবাড়ী বলত। আমার মামারা ঠাকুর উপাধিতেই বেশী পরিচিত।

মামাবাড়ী ছিল পরিখা-বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাড়ী। সীমানার মধ্যে ছিল খুব বড় একটা দীঘি, বড়-ছোট দুটো পুকুর। পরিখাতে সব সময় জল থাকত। নদীর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জোয়ার-ভাটায় জল কমত বাড়ত। বাড়ীর সীমানার মধ্যেই ছিল ঘন সুপারি বাগান। এ বাড়ীতে দুটো পুরনো ধরনের দোতলা ইটের দেউড়ির অংশ তখনও ছিল এবং তার মধ্য দিয়েই যাতায়াত করতে হ'ত।

দীঘিতে ছিল প্রকাণ্ড ইটের ঘাট—তখন ভগ্নাবস্থায়। পূর্বপারে 'পঞ্চরত্ন' নামে কারুকার্যখচিত অতি সুন্দর একটা দালান ছিল। পরিখার পাশ দিয়ে বাড়ীর চারদিকে ভাঙা প্রাচীর তখনও পুরনো দিনের স্মৃতি বয়ে আনত। প্রাচীরের গায়ে গায়ে প্রকোষ্ঠগুলি স্মরণ করিয়ে দিত সেই যুগের কথা, যখন এতে বসে বাড়ী পাহারা দিতে হ'ত বা বাড়ীর নানা ধরনের কর্মচারীরা বসবাস করতে পারত।

দুর্গামণ্ডপ, ঠাকুরদালান এবং আর একটা তিনতলা দালান তখন ভগ্নাবস্থায় —বট ও নানা বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ। দালানগুলি কড়ি-বরগাহীন এবং পুরনো ধরনের খুব ছোট ছোট ইটে তৈরী। জানালা প্রায় ছিলই না বলা যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দিনের বেলাতেও আলোর প্রয়োজন হ'ত।

আঁধার মাণিক নামে আর একটা কোঠাবাড়ী দেখেছি। তার একতলা ছিল মাটির নীচে। দোতলা উপরে হলেও ছিল অন্ধকার রহস্যপূর্ণ। এ দালানে কেউ প্রবেশ করে না। পূর্বে নাকি এর ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে ধনরত্ন লুকনো থাকত। আলো নিয়ে গুপ্তদ্বার দিয়ে ভূগর্ভে নামতে হ'ত। সুড়ঙ্গপথের চিহ্ন তখনও আমি দেখেছি। দালানটি কেবল বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত নয়, বহু বিষধর সর্পের আবাসভূমিও বটে। এই বাড়ীটা সম্বন্ধে কত আশ্চর্য গল্প শুনতাম ছোট-

বেলায়। অনেক সোনারূপা, মণি-মাণিক্য নাকি তখনও পর্যন্ত যক্ষের পাহারায় মজুত ছিল। মামাদের বংশে কোন পুণ্যবান ব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে নিজের সাধনার শক্তিতে উদ্ধার করবেন।

সমস্ত বাড়ীটাই একটা পুরাতন দুর্গের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। অরাজকতার যুগে ডাকাত ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এমনি করে সুরক্ষিত-ভাবে তৈরি করতে হয়েছিল। এই বাড়ীতেই আক্রমণ ও ডাকাতির কয়েকটা গল্প শুনেছি।

যে সময়ের কথা বলছি তখন মামারা দারিদ্র্য-দশাগ্রস্ত। কিন্তু তখনও বাড়ীটার পুরাতন সমৃদ্ধির স্মৃতি গর্বের সঞ্চার করত। ভবিষ্যতে পুনরায় সর্বানন্দ ঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বংশের পূর্বের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবেন—এই আশাতেই তাঁরা সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতেন।

মাতামহ, আমার মায়ের জ্যেষ্ঠতাত কালিচন্দ ঠাকুর, বড় মামা অপর্ণানাথ ঠাকুর, ছোট মামা উমানাথ ঠাকুর, এবং অন্যান্যদের কাছে কত গল্প শুনেছি, আর বাড়ীর ভাঙা অংশগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে ফিরে গিয়েছি। সেকালের অরাজকতার ছবি মনে ফুটে উঠত। ইংরেজ রাজত্ব চিরকাল ছিল না—তার আগেকার কথাও আছে। তখনকার সমাজ-জীবনের আভাস, সুখ-দুঃখের কথা, আপন শক্তিতে আত্মরক্ষার কত কাহিনী গাছ-পালায় ঢাকা, সাপখোপে ভরা ঐ ভাঙা বাড়ীর কোঠায় কোঠায় লেখা আছে। গল্প শুনে শিউরে উঠতাম। সেকালে ফিরে যাওয়ার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠত।

সে সময় ত্রিপুরা রাজ্যের গল্পও খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। শিশুকালে জানতাম সমগ্র ভারতব্যাপীই ইংরেজ রাজত্ব। ইংরেজের একচ্ছত্র আধিপত্য। এর বিপরীত কোথাও কিছু থাকতে পারে ভাবতেই পারতাম না। অত ছোট বয়সে দেশীয় রাজ্যগুলির কথা ভাল করে বুঝতেও পারতাম না। আমার মামা-বাড়ী ত্রিপুরা জেলার পাশেই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য "ত্রিপুরা" নামক দেশ আছে এ কথাটা আমার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করত। লোকে বলত "স্বাধীন ত্রিপুরা"। সেখানে কারাগার, পুলিশ, বিচারালয় সবই আছে। আছে সেই রাজ্যে সৈন্য আর বন্দুক। ইংরেজ পুলিশের কোন অধিকার নেই, আর রাজা ইংরেজকে খাজনা দেয় না। সে সময়ই শুনেছিলাম "নেপাল" নামে আর একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ্যও হিমালয়ের কোলে আছে। তখন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে গুর্খার আমদানী বেশী হয় নি। গুর্খা পুলিশ ও সৈন্য ব্রিটিশ সরকার প্রথম আনে স্বদেশী

আন্দোলন দমন করতে লাঠি ও বন্দুক দিয়ে। সেকথা এখন থাক। অবাক হয়ে শুনেছিলাম যে, এই ত্রিপুরা রাজ্য কখনও মুসলমান কিংবা ইংরেজ রাজার অধীন হয় নি। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যের কোনও অংশমাত্র বিদেশী রাজার অধিকারে গেছে—এই রাজ্য সমগ্রভাবে বা রাজধানী কখনও বিদেশী আক্রমণকারীর পদস্পর্শে অশুচি হয় নি।

এ সমস্ত কাহিনী আমার শিশুমনকে গর্বিত করে তুলত। এই ভারতভূমিতেই স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব, মুষ্টিমেয় বুয়রদের কাছে অপরাজেয় ব্রিটিশ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়, আর ইংরেজদের মতই শ্বেতাঙ্গ রুশিয়ার আমাদের এশিয়াবাসী ক্ষুদ্র জাপানের হাতে চূড়ান্ত পরাজয়—এই সব কিছু মিলে শিশুমন ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠত।

আমার মাতুল বংশকে যাঁরা চালিভাতলী গ্রামে স্থাপিত করেছিলেন সেই হরিণা চৌধুরীদের বাড়ীও আমার মামাদের বাড়ীর ঢঙে তৈরী ছিল। প্রশস্ত পরিখা সাঁকো দিয়ে পার হতে হ'ত। যদিও এখন আর পূর্বের সমৃদ্ধি নেই, তথাপি অনেকেই আধুনিক লেখাপড়া শিখে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

ছেলেবেলায় দেখেছি কেউ জুতো পরে কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে মামাবাড়ীর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারত না। একে তো ঠাকুরবাড়ীটাই পবিত্র, তাছাড়া ঠাকুরমশাইরা সকলেই মাননীয়, সুতরাং ছাতা এবং জুতো ব্যবহার করে বাড়ীতে প্রবেশ করলে তাঁদেরকে অমর্যাদা করার সামিল ছিল। বাড়ীর সর্বত্রই এত দেবদেবী ছিল যে, ভিতরে আসতে হলে প্রণাম করতে করতে ঢুকতে হ'ত। ঠাকুরবাড়ীর ছোট ছেলেরাও গ্রামের সকলের প্রণাম পেত। গ্রামের বাজারের নামই ছিল 'ঠাকুরহাট'। সেখানে যেদিন হাট বসত সেদিন দেখেছি গ্রামস্থ সবাই ঠাকুরদের পায়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছে।

বাস্তবিকপক্ষে মামাবাড়ীতে যেন একটা ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হতাম। বার মাসই ত্রিসন্ধ্যা, বাড়ীর আবালবৃদ্ধবনিতা পুকুরঘাটে কিংবা ঘরের বারান্দায় বসে সন্ধ্যা-বন্দনায় নিরত আছে। সারাদিনই বাড়ীতে পুজো-অর্চনা চলছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর এবং উলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। যাঁদের জীবনে নেমে এসেছে বৈধব্যের অভিশাপ তাঁরা জপতপ বা শিবপূজায় সময় অতিবাহিত করতেন। দৈনিক পূজা ছাড়াও ছিল বার মাসে তেরো পার্বণ। আশ্রিত পূজারী ব্রাহ্মণরা তারই তদারক করতেন মন্দির মন্দির ঘুরে। ঢাক-

ঢোল বাজিয়ে যাচ্ছে বাদ্যকরেরা। বাড়ীর মেয়েরা কেউ বা সাজিহাতে ফুল তুলতে ব্যস্ত। অপেক্ষাকৃত যারা বয়স্ক তারা বেলপাতা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে রাখছে কিংবা চন্দন ঘষছে। পুরুষদের কারুর কারুর পরিধানে রক্ত-বসন, কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, নগ্নগাত্রে শুভ্র যজ্ঞোপবীত লম্বিত, রক্তবর্ণের ফুলে শিখা বাঁধা আছে। কেউ কেউ রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন, যেমন বৈষ্ণবরা পরিধান করেন তুলসীর মালা। রুদ্রাক্ষের মালা শক্তি-উপাসক তান্ত্রিকদেরই পরিধেয়।

বৈঠকখানায় দেখতাম হিন্দু-মুসলমান প্রজারা কর্তাদের সঙ্গে জমাজমির ব্যাপারে আলোচনা করছে। গৃহস্থরা ঠাকুরদের কাছ থেকে জেনে যাচ্ছে শাস্ত্র-সম্মত বিধি-ব্যবস্থা। বাড়ীতে যদিও একটাও ঘড়ি থাকত না তথাপি তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য-চন্দ্র-তারকার অবস্থিতি দেখে দণ্ড-প্রহর স্থির করতেন। ভুল করা চলবে না। কারণ সমস্ত পূজাই ঠিক ঠিক সময়ে করতে হবে।

এঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অতীব স্বল্প। বাড়ীতে একপ্রকার ধুতি পরিধান করেই কাটিয়ে দিতেন। সার্ট পাঞ্জাবি বা গেঞ্জীর প্রয়োজন হ'ত না। জুতোর ব্যবহার প্রচলন ছিল না। খড়ম পায়ে দিয়েই চলাফেরা করতেন। বাইরে কোথাও যেতে হলে খালিপায়ে যেতেন। গাত্রাবরণ হিসেবে নিতেন নামাবলী বা দেবতার নামাঙ্কিত চাদর। ইদানীং কাউকে কাউকে চটি ব্যবহার করতে দেখেছি।

মেয়েদের বেলাতেও দেখেছি যে, সেমিজ-কামিজের বড় একটা প্রয়োজন তাঁদের হ'ত না। একবস্ত্রেই তাঁরা গাত্র আচ্ছাদন করতেন। বাড়ীর বউ এবং বিবাহিতা মেয়েরা শাঁখা-সিঁদূর ব্যবহার করতেন—যদিও আজকাল এর ব্যবহার কমে আসছে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

১৯৪০ সালে একদিন আমি ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একই মোটরে ঢাকা শহরের শাঁখারীবাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তার দু'পাশে, ছাদের উপর এবং জানালার ধারে হাজার হাজার নরনারী জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে আছে। যেতে যেতেই শুনতে পেলাম সুভাষবাবুর কাছে তাদের আবেদন—"ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা এখন শাঁখা-পরা ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের ব্যবসা ডুবতে বসেছে। আমরা অনাহারে মরছি।" মন ব্যথায় টনটন করে উঠল। যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে অর্থনৈতিক বিবর্তন ও কুটীর-শিল্পের উপর তার প্রভাব তাদেরকে বুঝিয়ে

বলবার স্থান বা কাল তখন ছিল না। পরে অবশ্য ঢাকা কংগ্রেস অফিসে ফিরে গিয়ে সদ্য-বিবাহিতা প্রসিদ্ধ একজন মহিলা রাজনৈতিক কর্মীকে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁরা কি উপলব্ধি করছেন যে, তাঁদের মত মহিলারা শাঁখা ব্যবহার না করায় এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তর দিলেন—"নারীদের শাঁখা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে চান নাকি এবং না করলে তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থাধীনে আসবে!"

যাক্, এই পর্যন্ত। মামাবাড়ীতে দেখতাম বাড়ীর বউরা খুব ভোরে উঠে গোবরজল গুলে সারা বাড়ীতে গোবর-ছড়া দিচ্ছেন। পরে ঘরদোর লেপেপুঁছে বাসন মাজতে ঘাটে চলে যাচ্ছেন। রান্নাবান্না, কুটনো-বাটনা ঘরের যাবতীয় কাজ তাঁরাই করতেন। ঢেঁকি কিংবা হামানদিস্তা (কাহাল-ছিয়া পূর্ববঙ্গের কথা) মেয়েরাই চালাতেন। আবার কাঁথা-সেলাই ছিল তাঁদের অতি প্রয়োজনীয় কাজ। এরই মধ্যে সময় করে মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী ও নানা পুরাণের ব্যাখ্যান শুনতেন। এই পরিবারের বউরা স্ত্রীলোক হয়েও শিষ্য এবং নিজ-পরিবারের অপরকে মন্ত্রদান করার অধিকারী ছিলেন, আজও তাই আছেন।

গৃহ-দেবতার পূজা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে একমাত্র শিশু ছাড়া আর কেউ আহার করত না। আমিষাশী হলেও এঁরা পিঁয়াজ-রসুন খেতেন না। সমস্ত আহার্যদ্রব্যই রান্নার পর দেবতার নিকট নিবেদন করে প্রসাদস্বরূপ আহার করতেন।

অন্নবস্ত্রের অভাববোধ খুবই কম ছিল এঁদের।

সমগ্র ঠাকুরবাড়ী তিন হিস্‌সায় বিভক্ত ছিল। প্রতি হিস্‌সার পরিবার প্রথমে একান্নবর্তীই ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তা ভেঙে গিয়ে একাধিক পৃথগন্নের ব্যবস্থা হয়েছিল।

অভাববোধ কম থাকলেও অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্যই ছিল বলা যায়। গুরুদক্ষিণা, খাজনা, জমির ফসল, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ আর কি চাই! তবুও কিছু নগদ টাকার প্রয়োজন এঁদের মনে উঁকি দিতে সুরু করেছে। তবে সে অভাব-বোধ তেমন তীব্র হয়ে ওঠে নি। কেননা বাজার থেকে কেনবার বড় বিশেষ কিছুর প্রয়োজনই হ'ত না।

ছেলেবেলায় মামাবাড়ীতে দেশলাই ব্যবহার করতে বড় একটা দেখি নি। চক্‌মকি এবং পাটকাঠিতে গন্ধক লাগিয়ে কাজ নির্বাহ করতেন। বাংলা দেশের প্রায় সব গ্রামেই বোধ হয় কম-বেশী এমনি প্রচলন ছিল।

তামাকের প্রচলন খুবই ছিল। তবে সে তামাক বাড়ীতেই তৈরী হ'ত—তামাকপাতা কেটে মাতগুড়ে মেখে। আর ঘরে আগুন থাকত মাটির পাত্রে।

কেরোসিন ও লণ্ঠন ব্যবহার খুব কম দেখেছি। ঘরে জলন্ত মাটির প্রদীপ। বাইরে চলাফেরার জন্য কেউ কেউ সাধারণ একটা লণ্ঠন ব্যবহার করতেন। সাধারণত দূর পথের জন্য ছিল পাটকাঠি কিংবা মশাল।

শীতের সময় মেয়েরা বিশেষ করে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারা মালসায় তুষের আগুন জ্বালিয়ে সঙ্গে রাখতেন শীত নিবারণের জন্য। পুরুষেরা ধুতির খুঁট বড় জোর একটা চাদর গায়ে জড়াতেন। প্রচণ্ড শীতেও এঁদের প্রাতঃস্নান কিংবা সন্ধ্যা-বন্দনা বন্ধ থাকত না।

অতিথিকে এঁরা দেবতাস্বরূপ মনে করতেন। সুতরাং এঁদের সেবা পুণ্য সামিল। অতিথি-অভ্যাগত ছাড়াও এঁদের দেখেছি রাস্তার লোক ডেকে খাওয়াতে। আজ অবশ্য আর সেদিন নেই। এঁদের কারুর কারুর আর দু'বেলা অন্নসংস্থানও হয় না।

বাড়ীর বউরা ঘোমটা দিয়ে চলতেন, কিন্তু বিবাহিতা মেয়েরা পিত্রালয়ে এসে অবগুণ্ঠন দিতেন ফেলে। কোন স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলা সাক্ষাৎ করতেন না। সামনে দিয়ে যেতে হলে মুখ ঢেকে যেত হ'ত। অবশ্য সমস্ত বাঙালী হিন্দু-পরিবারেই কম-বেশী এমনি ব্যবস্থা ছিল। আজকাল অবশ্য অন্য রকম ব্যবস্থা চলতি। গুরুজনের সামনেই স্বামী স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ হয়েছে। স্ত্রীও স্বামীর সঙ্গে অকপটে বা সামান্য অবগুণ্ঠন দিয়ে আলাপ করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

সে সময়ে আমাদের বংশে পুরুষরা সকলেই বাংলা ও সংস্কৃত লেখাপড়া জানতেন। শিষ্যদের মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ ইংরেজী স্কুলে কেবল যাতায়াত সুরু করেছে। বউ বা মেয়েরা সাধারণত কেউ লেখাপড়া জানত না। খবরের কাগজ বাড়ীতে আসত না। কেন না বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর জানবার আগ্রহ ছিল না। সমগ্র গ্রামের মধ্যে এক কি বড় জোর দু'খানা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' কিংবা 'হিতবাদী' আসত।

চাকর-নফর, ধোপা-নাপিত, বাদ্যকর সবাই ঠাকুরদের জমিতেই বাস করে উপস্বত্ব ভোগ করত নিষ্করভাবে। প্রয়োজনমত ঠাকুরবাড়ীতে কাজ করে দিয়ে যেত—কিন্তু পুজো-পার্বণে এদের প্রাপ্তি ছিল। এই সমস্ত পরিবারের লোকের

সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর লোকদের একটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। দাদা, মামা, কাকা ডাক অতি সহজভাবেই গড়ে উঠত।

আমিই ছেলেবেলায় দেখেছি মামারা নতুন লোক এলে নিষ্কর জমি দিয়ে বসতি করাচ্ছেন। পূজা-পার্বণে স্ত্রী-পুরুষ ঠাকুরবাড়ীতে এসে কাজ করে দিত। এরা বেতনভুক্ হ'ত না। এ সবই অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অংশবিশেষ।

গ্রামে তখন নগদ টাকায় লেনদেনের চাইতে জিনিস দিয়ে জিনিস কিনবার প্রচলনই বেশী ছিল।

আমার মাতুল বংশের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমাজপতি হতেন। সাধারণত কয়েকখানা গ্রাম নিয়ে হ'ত একটা সমাজ। কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি নিয়ে একটা কমিটির মত গঠিত হ'ত। আর তার মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকেই সমাজ-পতি বলা হ'ত। বংশমর্যাদায় এবং শাস্ত্রজ্ঞ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই সমাজপতি হতেন। কোন নির্বাচন-প্রথা ছিল না। অধিকাংশই যাঁকে বা যাঁদের মান্য করত তাঁরাই কর্তৃস্থানীয় বলে গণ্য হতেন। শাস্ত্রানুগত সমাজব্যবস্থা বজায় রাখাই ছিল এঁদের কর্তব্য। শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা এবং লঙ্ঘনকারীর দণ্ড বিধান ছিল এঁদের হাতে।

মামারা প্রধান হিসেবে সকলেরই মান্য ছিলেন। একডাকে সকলে এসে হাজির হ'ত। রাস্তায় চলতে গিয়ে দেখেছি যাদের সঙ্গে দেখা হ'ত তাদের অধিকাংশই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে রাস্তার একপাশে সসম্ভ্রমে দাঁড়াত। কারুর বাড়ী গেলে প্রথমেই সকলে প্রণাম করত এবং বসবার যোগ্য আসন দিত। সবাইকে পা-ধোয়ার জল দেওয়ার রীতি ছিল। ঠাকুরমশায়দের পা অবশ্য বাড়ীর কর্তারাই নিজ হাতে ধুয়ে দিতেন। আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলে তার ব্যবস্থা করে দিতেন। শিষ্য কিংবা ব্রাহ্মণেতরের বাড়ীতে ঠাকুররা স্বপাক আহার করতেন।

মামাবাড়ীতে দেখেছি তাঁদের বাড়ী নিমন্ত্রিত অব্রাহ্মণরা নিজেরাই উচ্ছিষ্ট পাতা আহারের পর ফেলে দিতেন। তাঁরা গ্রামের জমিদার, বড়লোক এবং অন্যথা যত সম্মানিতই হোন না কেন, বাড়ীর চাকররাও সে পাতা ফেলত না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে—

তখন বাঙালী সমাজে অব্রাহ্মণদের মধ্যে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তীব্র আন্দোলন চলছিল। একদল শূদ্র ঠাকুরবাড়ীতে আহার করে পাতা না ফেলে উঠে চলে গেল। এরা ছিল হরিণার চৌধুরীদের পূর্বপুরুষ প্রদত্ত নানা রকম

জমাজমি ভোগিদার নফর চাকর শ্রেণীর লোক। এরা নিজেদের শূদ্রত্বের প্রতিবাদে পাতা ফেলল না, কিন্তু চৌধুরীরা নিজেদের হাতে সব পরিষ্কার করে ঠাকুরদের মান রক্ষা করেছিলেন। এ নিয়ে দেশে কম হৈ-চৈ হয় নি।

আমার ছোটমামা উমানাথ ঠাকুরের বিয়েতে যে রোমাঞ্চকর পদ্ধতি দেখেছি তা কতকালের অতীত স্মৃতি কে জানে। বিয়ে যথারীতি মেয়ের বাড়ীতেই হয়েছিল। বরাগমনের দু'একদিন আগে থেকেই দূর দূর জায়গা থেকে অনেক দুর্দান্ত লাঠিয়াল, সড়কি ও বর্শাধারী মামাবাড়ীতে জমায়েত হলো। বরিশাল এবং পদ্মা-মেঘনার চর অঞ্চলের লাঠিয়ালদের সেকালে খুব নাম-ডাক ছিল। তারা এসে ছোট-বড় লাঠির চমক্‌প্রদ খেলা দেখাল। কেউ-বা দাঁতে কেউ-বা বাবরিচুলে ঢেঁকী বেঁধে ঘোরাল। দেখাল আরও কত কসরত।

এই সব জোয়ান সঙ্গে করে বরযাত্রীরা যখন কন্যার বাড়ীর প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হ'ল তখন কন্যাপক্ষেরও এক দল লোক লাঠিসোটা নিয়ে প্রবল বাধা দিল, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল শুধুমাত্র বরকে জোর করে নিয়ে যাওয়া। এদিকে বরপক্ষের লক্ষ্য সবাই মিলে যাওয়া। প্রচণ্ড লড়াই হ'ল। অনেক লোক হতাহত হ'ল। কিঞ্চিৎ রক্তপাতের কথা আজও মনে আছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হ'ল। মামা সদলবলে পাল্কী চড়ে কন্যার বাড়ী প্রবেশ করলেন। বিবাহ সম্পন্ন হ'ল।

এই রীতি বোধ হয় আজকাল আর নেই। এইভাবে বিবাহের ব্যবস্থা কোন্ হিন্দুমতে তার ঠিক হদিস পাই নি—অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস কিংবা পৈশাচ! যতদূর মনে হয় এমনি প্রথা আসুরিক কিংবা রাক্ষস বিয়ের নিয়মানুযায়ী। কোন এক হিন্দু আইন-পুস্তকে দেখেছিলাম—'আত্মীয়স্বজনকে বধ কিংবা পরাভূত করে কন্যাকে জোর করে বিয়ে করাই রাক্ষস বিবাহ।' (Rakshyas or forcible capture of the girl, after her relative have been killed or wounded in battles.) এই বইতেই আরও আছে যে, এ পদ্ধতি বর্বর যুগের এবং চলতি আছে সামাজিক সংস্কারে। কিন্তু ভীষ্ম পিতামহের অম্বাহরণ, শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, অর্জুনের সুভদ্রাহরণ কতকটা এই ধরনের। মহাভারতে বর্ণিত দেবতুল্য উচ্চশ্রেণীর আর্যদের এ পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক যুগের দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সংযুক্তাহরণকে একেবারে বর্বর যুগোপযোগী বলি কি করে!

সে যাই হোক। মামাবাড়ীর প্রসঙ্গে এবং আমার জীবনের ওপর প্রভাবের কথা মনে করে আমার মায়ের জ্যেষ্ঠতাত কালিচন্দ্র ঠাকুরের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁর মত সাধু, সচ্চরিত্র, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় গৃহস্থ আমার চোখে খুবই কম পড়েছে। তাঁদের গুরুবংশে তিনিই বোধ হয় শেষ ব্যক্তি, যিনি ছিলেন সর্বজনমান্য, শ্রদ্ধাভাজন এবং পূজনীয়। তখন তাঁদের পরিবারে দারিদ্র্য প্রবেশ করেছে। সে অবস্থাতেও তিনি অবলীলাক্রমে সর্বস্ব দান করা সাধারণ কর্তব্যের মতই দেখতেন। তিনি ধর্মালোচনা এবং জপতপে সময় কাটাতেন। যদিও নিজে অলৌকিক কিছু করেন নি কিংবা করতে পারেন বলে দাবিও করেন নি, তথাপি তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এবং নির্ভরশীল হয়ে অনেকে আশ্চর্য ফল পেয়েছে। নগ্নগাত্রেই থাকতেন তিনি, কেবল নিদারুণ শীতে দেখেছি নামাবলি ব্যবহার করতে। তিনি অপরের মতে ছিলেন শ্রদ্ধাবান। সুতরাং নিজে গোঁড়া ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্ম এমনকি মুসলমানদের কাছ থেকেও শ্রদ্ধা-ভক্তি পেয়েছেন।

দাদামশায় আমাকে অসীম স্নেহ করতেন। কত শাস্ত্র, দেবদেবীর কথা গল্পের মত শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই। দাদামশায়ের চরিত্র, জীবনযাত্রা, গল্প ও উপদেশ আমার জীবনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে।

এই দাদামশাই আমার জন্ম-সময়ে কয়েকজন জ্যোতিষী বাড়ীতে এনেছিলেন। তাঁরা নাকি বলেছিলেন মাকে, 'তোমার এ ছেলে গৃহবাসী কিংবা সংসারী হবে না।' এ কথা মায়ের কাছে অনেকবার শুনেছি। পরে যখন অনুশীলনের কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম ঘর ছেড়ে, তখন মা মাঝে মাঝে বলতেন, 'তখন ভেবেছিলাম ছেলে আমার সন্ন্যাসী হবে। সন্ন্যাসী হলে তো আর এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না বা জেল-ফাঁসীরও ভয় থাকত না।' কেন জানি না জ্যোতিষীর এই ভবিষ্যৎ-বাণী আমি জীবনে ভুলতে পারি নি।

জীবনের প্রথম ষোল বছর কাটিয়েছি নারায়ণগঞ্জ শহরে। শৈশব ও কৈশোরের মত এমন নিশ্চিন্ত সুখের কাল আর বোধ হয় নেই। যৌবনকাল অবশ্য বে-পরোয়া, বে-হিসেবী হয়ে আনন্দে কাটাবার কাল। কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের সে সৌভাগ্য সেদিনও ছিল না, আজও নেই। তখন যুবক হতে না হতেই বিয়ে করতে হ'ত, তার কয়েক বৎসরের মধ্যে পুত্র-কন্যা পরিবৃত হয়ে চিন্তাভারে নুয়ে পড়ত। মেয়েরা হ'ত কুড়িতেই বুড়ী। ত্রিশ পার হ'লে

পুরুষকে আর যুবক বলা যেত না। যৌবনের চাঞ্চল্য তখন স্তিমিত, প্রৌঢ়ত্বের ধীরস্থির বুদ্ধি-বিবেচনার আভা প্রকাশ পেত।

সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি এবং বাধা-নিষেধের ফলে যুবক-যুবতীর মধ্যে যৌবনোচিত স্বাভাবিক প্রেম-চাঞ্চল্য আসতে পারত না। আসলেও তা চারদিকের চাপে আত্মপ্রকাশের সহজ সুযোগ পেত না। যৌন আকর্ষণের তীব্রতা অদম্য হলে অসংযমী লোক অসামাজিক পথ অবলম্বন করত। পুরুষদের কেউ কেউ বারবণিতালয়েও বা যেত।

এখন অবশ্য অল্প বয়সে বিয়ের প্রথা উঠে গিয়েছে। অর্থ নৈতিক কারণেই গেছে। কিন্তু সে একই কারণে বেকার-সমস্যা এবং দরিদ্রতার চাপে যুবকদের ম্লানমুখে বিষণ্নতা আর ঘুচতে চায় না। মা-বাপ ভাই-বোন এদের দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে বিপ্লবী যুবকেরাও উৎসর্গীকৃত জীবনের আত্মভোলা আনন্দ উপভোগ করতে পারে নি। থেকে থেকে তাদের যৌবনোজ্জ্বল মুখও ম্লান হয়ে উঠতে দেখেছি। যারা একটা সাধারণ চাকরি জুটিয়ে বিয়ে করেছে তারাও জীবিকা নির্বাহের চিন্তায় আকুল। তাই বলছিলাম যে, শৈশব ও কৈশোরের নিশ্চিন্ত নির্ভাবনার দিনই আমার কেটেছে নারায়ণগঞ্জে।

নারায়ণগঞ্জের স্মৃতি আমাকে উৎফুল্ল করে তোলে। পরের জীবনে যখনই যেতাম তখনই সেখানকার আকাশ-বাতাস, রাস্তা-ঘাট, নদীর তীর, গাছপালা এবং মানুষগুলি আমাকে শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। এই বয়সেও দেখেছি দু'একজন মাতৃসমা মহিলা যাঁরা এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে বসলে নিজেকে যেন বালক বলেই অনুভব করি। রাজনৈতিক সম্পর্কশূন্য বাল্য-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে একটা হালকা আনন্দ ও আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে যেন সেই কৈশোরে ফিরে যাই। বিপ্লবা-কর্মীর গম্ভীর প্রকৃতি ও উচ্চচিন্তা-ভারাক্রান্ত মুখোসটা খসে পড়ে নিতান্ত ছেলেমানুষ হয়ে যাই। সমস্ত কৃত্রিমতা দূরে চলে গিয়ে সহজ মানুষটির স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচি। মামাবাড়ী গেলেও আমার এমনি অবস্থা হয়। এ দু'জায়গায় গেলে লোকে যখন আমার সঙ্গে উঁচু বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাইত বা সর্বত্যাগী নিরাসক্ত মহাপুরুষের কাছে উপদেশ আকাঙ্ক্ষা করত, তখন বড়ই ক্লান্ত বোধ করতাম—একেবারে যেন হাঁপিয়ে উঠতাম। সম্বর্ধনা, ফুলের মালা, অভিনন্দনপত্রাদি আমাকে পীড়িত করত। বাধ্য হয়ে নেতৃত্বের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়তাম।

যাঁদের কাছে ছেলেবেলায় পড়েছি, তাঁরাও যখন সশ্রদ্ধ সঙ্কোচের সঙ্গে কথা বলতেন তখন অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে পড়তাম।

ঢাকা থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে নারায়ণগঞ্জ শহর পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর সুন্দর স্থান বলে খ্যাত ছিল। শীতলক্ষ্যার জলের নির্মলতা ও বিশুদ্ধতা ছিল দেশ-বিখ্যাত। নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর ছিল এবং এজন্য ঢাকা শহরের অংশ বলে গণ্য হ'ত। শুধু ঢাকা নয়, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা এবং সিলেটের কতকাংশের কলকাতার সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি ও যাত্রী-যাতায়াতের কেন্দ্র হিসেবে নারায়ণগঞ্জ পূর্ববঙ্গে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সমগ্র বাংলা দেশে একমাত্র কলকাতা ভিন্ন পাটের এত বড় ব্যবসা-কেন্দ্র আর কোথাও ছিল না। নদীতীর সংলগ্ন হয়ে মাইলের পর মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল বড় বড় পাটের গুদাম ও অফিস। কারখানার আকাশচুম্বী চিমনিগুলি দিবারাত্রি ধূম উদ্গিরণ করতে থাকত।

এখানে কোটি কোটি টাকার পাট ক্রয়-বিক্রয় হতে দেখেছি। দূর দূর থেকে নৌকো বোঝাই করে কত ব্যবসায়ী এবং গৃহস্থ পাট নিয়ে আসত তার ইয়ত্তা নেই। কেন্দ্রীয় দপ্তর নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হলেও বিভিন্ন অফিসের শাখাসমূহ সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে থাকত। সে সব জায়গা থেকে পাট জমায়েত হ'ত নারায়ণগঞ্জে। পরে আসত কলকাতায়।

কত বিচিত্র কাজে এখানে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত—পাটের অফিসের কুলি-মজুর, কেরানী, খরিদ্দারবাবু এবং সহকারী, কয়াল, নাচনদার, দারোয়ান, মাঝি-মাল্লা, ছোট-বড় ব্যবসায়ী, আড়তদার, ফড়িয়া, শত শত স্টীমলঞ্চের সারেং, খালাসী। এই তো গেল কেবল পাটের ব্যবসায় প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত মানুষ। এ ছাড়াও আর এক শ্রেণীর মানুষ যারা এদের অন্ন-বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে দু'পয়সা কামাত। সর্বোপরি ছিল পাটের অফিসের কয়েকশত ইউরোপীয় কর্মচারী। এত সাদা-চামড়ার লোক বোধ হয় কোথাও ছিল না।

বহু নদ-নদীর সঙ্গমস্থলে নারায়ণগঞ্জে কেবল স্টীমার-স্টেশনই ছিল না, স্থল-পথের যোগাযোগ রক্ষার জন্য ছিল রেলওয়ে স্টেশন। সুতরাং পাট ভিন্ন আরও অনেক জিনিসের কোটি কোটি টাকার কারবার চলত এখানে। পাট ছাড়া অন্যান্য

ব্যবসা ছিল দেশীয় মহাজনদের হাতে। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

তখনকার দিনে নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক (Bengal Bank) ছাড়া দেশীয় বা বিদেশীয় কোন ব্যাঙ্কই ছিল না। এ সংস্থাটি ছিল সরকার সমর্থিত ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক। সাদা-চামড়াওয়ালা লোকের লক্ষ-কোটি টাকার ব্যবসার জোগান দিত এই ব্যাঙ্ক। দেশীয় লোকের বেলায় এত সব সর্ত আরোপ করা থাকত যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বড় একটা টাকা এই ব্যাঙ্ক থেকে পেত না। এই জন্য দেশীয় কতকগুলি ব্যাঙ্কের মত ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। বড় বড় ধনীরাই ছিলেন এইসব ব্যবসায়ের মালিক। তেজারতি, লগ্নী ও হুণ্ডির সাহায্যে এঁরা দেশীয় ব্যবসায়ীদের টাকা যোগাতেন। এঁরা টাকা গচ্ছিতও রাখতেন খানিকটা সেভিংস ব্যাঙ্কের মত। কলকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় কেন্দ্রে এদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত ছিল। এক কেন্দ্রে টাকা জমা দিয়ে হুণ্ডি বা হাণ্ডনোট নিয়ে অন্য কেন্দ্রে টাকা ওঠানো যেত। প্রয়োজন মত ব্যবসায়ীদের আগাম টাকাও দিত। কখন কখন বিল কিংবা পাওনা টাকার দলিল উপস্থিত করতে পারলে টাকা পেত। অনেক সময় সম্পত্তি বন্ধক রেখেও টাকা দিত।

এ জাতীয় ব্যাঙ্ক বা মহাজনী কারবারের স্বত্বাধিকারী ছিল হিন্দুদের মধ্যে সাহা ও তিলি অর্থাৎ পাল ও কুণ্ড উপাধিধারীরা। এমনকি ছোটখাট ব্যবসা-গুলিরও অধিকাংশ মালিকও তাঁরাই ছিলেন। কেন না তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ব্যবসা করাটা বড় একটা সম্মানজনক ছিল না। আমার কাকা যখন কাপড়ের দোকান দেন তখন সবাই খুব অবাক হয়ে যায়।

সাহা ও তিলিরা ধর্মভীরু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। এঁরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব এবং অনেকে ফোঁটা-তিলক ধারণ করতেন। দেবদ্বিজে এঁদের অসীম ভক্তি। আমাদের নারায়ণগঞ্জ বাড়ীর নিকটস্থ বক্ত লক্ষপতি পালবাড়ীর কর্তা পাত্রে করে জল পাঠিয়ে দিতেন। আমরা তাতে পায়ের আঙুল স্পর্শ করে দিতাম। সেই চরণামৃত পান করে তবে তিনি মধ্যাহ্ন আহার করতেন।

নারায়ণগঞ্জ শহর শীতলক্ষ্যার দুই তীর শোভা করছে। শহরের তিন দিকেই নদী। প্রায় সীমানার মধ্যেই শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পুরনো শাখা একত্রে মিলেছে, কেবল জল আর জল। জলের কল্লোল প্রাণমন উতলা করে তুলত। শহরের দক্ষিণ সীমানায় একেবারে জলের ধারে বসে সঙ্গম-স্থলের স্ফীত জলকায়ার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকতাম। তন্বী

শীতলক্ষ্যার বুকের উপর দিয়ে জলিবোটে (Jollyboat) বাল্যবন্ধুসহ কত সন্ধ্যায় কতদূর চলে যেতাম তার স্মৃতি আজও মনকে অপূর্ব রসে দোলা দেয়।

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। পদ্মা-মেঘনার বিধ্বংসী রূপ আমায় উত্তেজিত করে এগিয়ে চলার আনন্দে, আবার এই তন্বঙ্গী স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী দুই তীরে শ্যামল আঁচল বিছিয়ে মৃদুকলতানে বয়ে যাচ্ছে, তা আমার হৃদয়ে মোহের সঞ্চার করে। একদিকে মহাকালের প্রলয়লীলায় মত্ত রুদ্ররূপের প্রচণ্ড ব্যঞ্জনা, অপরদিকে কৃশাঙ্গী কিশোরী মরালগামীর মোহিনীরূপ। এই দু'রূপই স্বাচ্ছন্দ্য আত্মপ্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ-রসের সৃষ্টি করে। তাই তো পদ্মা-মেঘনার চর-পড়া শুষ্ক তীর মনে দুঃখের সঞ্চার করে। আসল কথা, যার যা স্বাভাবিক বিকাশ তাই মনকে আনন্দ দেয়। জগৎ-বিখ্যাত গামার অস্থিচর্মসার শরীরে স্থূলত্ব থাকবে না বটে, কিন্তু চেহারার এই দৈন্য মনকে পীড়া দেবে। কিন্তু স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পাতলা ছিপ্‌ছিপে চিক্কণ দেহ দেখে কত তৃপ্তি পাই।

নারায়ণগঞ্জ শহরের সমৃদ্ধি ও উন্নতি নাকি আমার পিতৃদেব ৺মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখের ওপর হয়েছে। তিনি যখন নারায়ণগঞ্জ আসেন তখনও সেখানে হাইস্কুল হয় নি। একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত হয়েছে মাত্র। পিতা ছিলেন এই স্কুলের হেডমাস্টার। আস্তে আস্তে একটা সিভিল কোর্ট স্থাপিত হয়। পিতাও স্কুলের কাজ করতে করতেই ওকালতি পাশ করে নারায়ণগঞ্জেই আইনব্যবসা সুরু করেন। তখন নারায়ণগঞ্জে উকিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয়-জন। তার পর মহকুমা এবং শহরের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উকিল, মোক্তার, ডাক্তার এবং দোকান-পসার দ্রুত বাড়তে লাগল।

ছেলেবেলায় নারায়ণগঞ্জে ডাক্তারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তার মধ্যে আবার একজন সরকারী ডাক্তার ছাড়া আর কেউ পাসকরা ডাক্তার নয়। সর্বাপেক্ষা বড় ডাক্তার বলে যিনি খ্যাত ছিলেন, তিনি কম্পাউণ্ডারের কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সেই বলেই ডাক্তারী করতেন। সাহেবরাও তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ করতেন। আর আজ এই নারায়ণগঞ্জেই আধ ডজনের বেশী এম. বি. (M. B.) ডাক্তার ব্যবসা করছেন। আমাদের ছেলেবেলায় যেখানে সন্ধ্যার পর লোকে যেতে ভয় পেত গুণ্ডা-বদমায়েশের অত্যাচারে সে-সব জায়গা এখন জনবহুল।

পিতৃদেব ছিলেন শহরের একজন বড় উকিল। উপায় করতেন সহস্র সহস্র টাকা। মহাজন, ব্যবসায়ী ও ইউরোপীয়দের অনেকেই এবং মফঃস্বলের কৃষক-শ্রেণী ও অনেক ধনীলোকের তিনি উকিল ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর নিজ চরিত্রবলে মৃত্যুকাল পর্যন্ত শহরের সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। অন্ততঃ বিশ বছর তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। হাইস্কুল স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বহু বৎসর সেক্রেটারীর পদ অলংকৃত করেছেন এবং শহরের সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। ঐ যুগেও তিনি ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও যথেষ্ট সম্মান পেতেন। এসব সত্ত্বেও তিনি রাজসম্মানের প্রতি যে শুধু উদাসীন ছিলেন তাই নয়, অপছন্দই করতেন। একবার বাৎসরিক উপাধি বিতরণের পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট পিতৃদেবের মনোভাব জানতে চাইলে তিনি 'রায়বাহাদুর' গ্রহণে অস্বীকৃত হন।

পিতৃদেব জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। সে সময় আমাদের বাড়ীতে বহু দেশীয় বড়লোক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বড় বড় সাহেবরা আসতেন। তা সত্ত্বেও আমাদের বৈঠকখানা ঘরটি অতি সাধারণভাবে রচিত ও সজ্জিত। টিনের চালের ঘর আর বসবার আসন—দু'চারখানা চেয়ার এবং তক্তপোষ। তখনকার দিনে এক-একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও বড় সাহেবরা প্রায় আমীর-বাদশাহের তুল্যই গণ্য হতেন! আমার পিতৃদেবকে কখনই এজন্য লজ্জিত হতে দেখি নি।

যদিও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সাহেবদের গরিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং আমাদের হীন মনোভাব কমতে স্থরু করে, কিন্তু পিতৃদেবকে সেকালেও সাহেবদের অনুকরণে পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে দেখি নি। কোর্টে যেতেন চোগা-চাপকান পরিধান করে। তা ছাড়া সাধারণ বাঙালীর পরিচ্ছদেই তিনি থাকতেন। সেই দিনে মাঝে মাঝে ছোটলাট, বড়লাট এঁরা সব আসতেন ঢাকায়। পথে নারায়ণগঞ্জ, স্থতরাং এতদুপলক্ষে প্রায়ই স্কুল পরিদর্শনে, স্টেশনে অভ্যর্থনা বা অন্যত্র সম্বর্ধনার আয়োজন হ'ত। শহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে নিমন্ত্রিত হয়েও সেখানে ধুতি-চাদরেই যেতেন এবং প্রয়োজন হলে লাটসাহেবের সঙ্গেও দেখা করতেন। ছেলেবেলায় দেখেছি এ নিয়ে শহরে হুলুস্থুল পড়ে যেত। শুনেছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লাটসাহেবের প্রাসাদে চটি-জুতো পায়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপার দেশের লোককে স্তম্ভিত

করেছিল। তার পর আমাদের ছেলেবেলায় এমনি ধরনের দৃষ্টান্তে লোকের হীন মনোভাব (Inferiority complex) দূর করতে সহায়ক হয়েছিল।

সাহেবদের বুটের আঘাতে দেশীয় লোকের পিলে ফাটার কাহিনী ছেলেবেলায় অনেক শুনতাম। ভারতবাসী সে উচ্চ-নীচ যে পর্যায়েরই হোন না কেন, ইউরোপীয়দের কাছে যত্রতত্র লাঞ্ছনার কথা প্রায়ই শুনতে পেতাম। স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্তন হওয়ার পরেও এমনি ঘটনা একেবারে থেমে যায় নি। সেকালে হাইকোর্টের জজ হাসান ইমামের রেলগাড়ীতে লাঞ্ছনার সংবাদ লোকের মনে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ছেলেবেলায় দেখেছি সাহেবদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাটাও একটা বীরত্ববোধক কাজ ছিল। এটা অবশ্য হীন মনোভাব-প্রসূত।

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীর (Class V) ছাত্র। দশ-এগার বছরের বালক মাত্র। আমরা কয়েকজন সমবয়সী নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন লরেন্স নামে এক শ্বেতাঙ্গ সস্ত্রীক তাদের অফিসের লঞ্চে উঠতে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি হ'ল জানি না। দেখলাম, সাহেব একটি অপরিচিত ছেলেকে কিল, চড়, ঘুষি এবং লাথিতে জর্জরিত করছে, ছেলেটির বয়স আমাদের চেয়ে কিছু বেশী। আমরা দু'তিনজন ছুটে গিয়ে বাংলা-ইংরেজীতে প্রতিবাদ করে ওকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম। তার বিশাল দেহের তুলনায় আমাদের হাত অতি দুর্বল। সাহেবকে একটুও নড়াতে পারলাম না। সাহেবের চাপরাসী, আরদালী ও অন্যান্য লোকেরা আমাদের সরিয়ে দিল। অদূরে একটি কলেজের ছেলের কাছে ঘটনা বলায় সে এসে প্রতিবাদ জানাল। সাহেব বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে লঞ্চে আরোহণ করল। আমি এতই উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, রাগে-দুঃখে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। স্টীমার কোম্পানীর বড়বাবু—আমাদের এক আত্মীয়, আমায় অফিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। পরে এক বড় মোক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম লাঞ্ছিত ছেলেটিকে। মোকদ্দমা দায়ের হ'ল। কোর্টে সাক্ষ্য দিলাম। এই প্রথম কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়া। অভিযোগের উত্তরে সাহেব বলেছিল—এই বর্বরটা আমার স্ত্রীর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। আমি ছাড়া অবশ্য আর কেউ সাক্ষ্য দেয় নি। তা হ'লেও সাহেবের পাঁচ টাকা জরিমানা হ'ল। তুচ্ছ হ'লেও সেদিনে এর মূল্য কম ছিল না। ইংরেজেরও শাস্তি হয়! শহরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের উপরই একটা বিরূপ মনোভাব অঙ্কিত হয়ে গেল।

শহরে সাহেবদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসীম। তারা যে রাজার জাত—শাসনদণ্ড তাদেরই হাতে! আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে সাহেব-মেমেরা ঘোড়ায় চড়ে, সাইকেলে চেপে বা গাড়ী হাঁকিয়ে যেত। কারুর কারুর চার বা ছ'ঘোড়ার গাড়ী ছিল। আবার সেই প্রথম এরাই আনল মোটর! সাদা চেহারায় পোশাক-আসাকে ঝলমল এই সব সাহেবদের হাসি-কলরবে ভীত হয়ে দেশীয় লোকেরা এদের সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিত।

আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তার অপর পারে সাহেবদের ক্লাব। একটা গির্জাও ছিল সেখানে, সব শ্বেতাঙ্গরাই সেখানে এসে মিলিত হ'ত। কত বিচিত্র খেলাধূলা করত তারা। বড়দিনে ক্লাব-প্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠত। লাটসাহেবরাও এ ক্লাবে আসত। শুধু কি তাই, নদীর দু'ধারের প্রাসাদতুল্য সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি সবই ছিল সাহেবদের। এদের জাঁকজমক, বিলাস-বহর দেখে মনে কত বিচিত্র ভাবের উদয় হ'ত। এরা যেন ভিন্ন জগতের লোক, পোশাক-পারিচ্ছদ, গায়ের রং কোন কিছুতেই এদের সঙ্গে কোন মিল নেই। এরা এ দেশে এলোই বা কেমন করে, রাজাই বা কেমন করে হ'ল? একদিকে চোখের সামনে দেখতাম এদের ভোগৈশ্বর্যের জীবন-চাঞ্চল্য, আর একদিকে আমাদের পাড়ার ছোট ছোট ভাঙা খড়ের ঘরে ক্ষীণজীবী, ক্ষুধার্ত, নগ্নগাত্র, নিরীহ প্রকৃতির দরিদ্র প্রতিবেশীদের।

সেকালে আমার কাকা ছিলেন একজন প্রভাবশালী পাটের অফিসের বড়বাবু। রাস্তায় বার হলে অসংখ্য উমেদার তার পিছন পিছন যেত চাকরি-প্রার্থী হয়ে। সেই কাকারও উপরওয়ালা কিনা সাহেব! আমার পিতৃদেব কত সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু এই বিদেশীরা তাঁর চাইতেও বেশী সম্মান পায়! যত বড় ধনী জমিদার বা ব্যবসাদার দেশীয় লোক হোন না কেন, তাঁরাও সাহেবদের সসম্ভ্রমে সেলাম করতেন!

সাহেব ও আমরা কত প্রভেদ, কেমন করে হ'ল! সবিস্তারে সব জানবার জন্য সেই বাল্যাবস্থাতেই প্রবল আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম।

খেলাধুলোতে আমার সখ ছিল না ছেলেবেলায়। অনুশীলন সমিতির সভ্য হয়ে লাঠি আর ছোরা খেলা শিখেছিলাম। বেশী বয়সে জেলখানায় স্টেট প্রিজ্‌নার হয়ে টেনিস খেলতাম। বিকেলবেলাটা কাটত আমার রেল কিংবা স্টীমার স্টেশনে বেড়িয়ে—কোনদিন বা জলিবোটে করে নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে। বিচিত্র ধরনের সব যাত্রী আর পরিবেশ আমার মনে যেন কিসের

দোলা দিত। আবার এমন অনেক দিন গেছে যখন সন্ধ্যা পর্যন্ত বই পড়েই ঘরে বসে সময় কাটিয়েছি।

আমাদের বাড়ীতে অনেক দৈনিক এবং নানা জাতীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকা আসত। ইংরেজী দৈনিক আসত বেঙ্গলী (Bengali)। বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, নব্যভারত, প্রবাসী প্রভৃতি সেকালের পত্রিকা আসত। ইংরেজী দৈনিক বাবা নিজে পড়লেও বাংলা কাগজ আমাকেই পড়ে শোনাতে হ'ত তাঁকে। এমনি করেই তিনি আমার জ্ঞানস্পৃহা বাড়িয়েছিলেন এবং পরিচিত করালেন বিশ্বের সঙ্গে। তাই বুঝে না বুঝে পড়ার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেবেলাতেই বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ মজুমদারের নভেল পড়ে ফেলি। এমন কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করি। বুঝতে পারতাম বলতে পারিনে—তবে আনন্দ পেতাম। এই আনন্দবোধের মধ্যে বোধহয় লুকিয়ে ছিল অপরূপ সৌন্দর্য-মধুর কাব্যসুধারস যা বালক বা কিশোরের মনকে উদ্বেলিত করে তোলে একান্ত অজ্ঞাতে। কেন না, পরিণত বয়সে দেখেছি ঐগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য। স্কুলে আমরা কয়েকজন সহপাঠী সকলের অগোচরে পরস্পরকে বই জোগাতাম এবং বই নিয়ে আলোচনা করতাম। ভাল বই যেমন পড়েছি আবার অতি নোংরাও পড়েছি। সব কথা বুঝতে পারতাম না, কিন্তু পড়বার জন্য একটা গোপন আগ্রহ জাগত।

আমি তখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তখনই বাংলা ভাষায় লেখা একখানা বেশ বড় ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে ফেলি। সবটা বুঝতে পারলাম না। তবে এটুকু বুঝতে ভুল হ'ল না যে, ইংরেজ কোন যুদ্ধে হারে নি, তাদের শক্তি অপরাজেয়। এমন কি নেপোলিয়ানের মত লোককেও তারা হারিয়ে দিয়ে বন্দী করেছিল। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তির কাছেই পরাজিত এই কথা ভেবে যেন একটু গৌরববোধ হ'ত। পরিণত বয়সে এ মনোভাবের কথা মনে করে আশ্চর্য হয়ে যেতাম। ছোটবেলা থেকেই ম্যাপ দেখার অভ্যাস হয়েছিল। লাল জায়গাগুলি দেখতে দেখতে বুঝতে পারতাম সত্যই মহারাণীর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না! আবার কেন জানি না, মনকে এই ভেবে পীড়িত করত যে, এত ক্ষুদ্র ইংলণ্ড কি করে আমাদের মত এমন একটা মহাদেশকে পদানত করে রাখতে পারে! তখন মনে পড়ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান—

"ত্রিংশত কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।"

অতি অল্প বয়স থেকেই সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে আরম্ভ হই। কেন না পিতৃদেব সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি নিজে ছিলেন নির্বিরোধী। অপরকেও তাঁর সঙ্গে শত্রুতাচরণ করতে দেখি নি। বহু টাকার লগ্নী কারবার করা সত্ত্বেও তাঁকে সারাজীবনে দুই-একটা ভিন্ন কারুর কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় নি। বহু দরিদ্র মুসলমান গৃহস্থ পিতৃদেবের কাছ থেকে টাকা কর্জ নিয়ে চাষবাস করত। বৈশাখ কিংবা চৈত্রমাসে টাকা নিয়ে আবার আশ্বিন-কার্তিক মাসেই তারা পরিশোধ করে দিত। তখন কোন সমবায় ব্যাঙ্ক বা সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠার ফলে এরা সকলেই পিতৃদেবের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকত। কুসীদজীবীদের নানা অত্যাচার ও ছলচাতুরির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এরা যেন সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর একবার তাদের একান্ত অনুরোধে কৃষকদের গ্রামে গিয়েছিলাম। জমিদারকেও তারা বুঝি অত সম্মান করত না। অনেক অনুরোধ করেছিল যেন আমি পিতৃদেবের কাজটুকু পরিত্যাগ না করি। কিন্তু বিপ্লবী-সমিতির সর্বক্ষণের কর্মী হওয়াতে এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারা নাবালক থাকাতে তত্ত্বাবধায়কের অভাবে লগ্নী কারবার উঠিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

পিতৃদেবকে যে সবাই শ্রদ্ধাভক্তি করত এবং তাঁর অমঙ্গল চাইত না, তার প্রমাণ পেতাম অনেকভাবে। দেশীয় ব্যাঙ্কার মহাজনদের কেউ দেউলে হওয়ার উপক্রম হলে আমার পিতার গচ্ছিত টাকা গোপনে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

বাক্য, চিন্তা এবং জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন অতিনৈতিক। দীক্ষিত না হয়েও মত ও বিশ্বাসে ছিলেন ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদী। সুতরাং প্রতিমা পূজা বিশ্বাসও করতেন না এবং কখনও তাঁকে প্রতিমার নিকট প্রণাম করতে দেখি নি। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত গিয়ে সেখানে নানা আলোচনা করতেন। সঙ্গে অবশ্য আমিও থাকতাম।

জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বাল্যবৈধব্য, সমুদ্র-যাত্রায় বাধা-নিষেধকে কুসংস্কার মনে করতেন। কিন্তু পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও ঘটক বিদায়ের কৌলিক-প্রথা রক্ষা করেছেন এবং কুলগুরুর মর্যাদা দিতে কসুর করেন নি। নিজের মতবাদ তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি দেখেছি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার মিশ্র

জীর কথা। তিনি ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণজীর আখড়ার মোহান্ত উত্তরপ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। মনে পড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ বিশালদেহী মিশ্রজীকে যাঁর অন্তর ছিল স্নেহময় কোমল। তিনি প্রায়ই সন্ধ্যারতি সমাপন করে আমাদের বাড়ী এসে পিতৃদেবের সঙ্গে ধর্ম ও নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমার জন্য তাঁর স্নেহ অপরিসীম। সিপাহী বিদ্রোহের অনেক গল্প তাঁর কাছ থেকে শুনেছি। শ্বেতাঙ্গ ক্লাবের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতেন যে, এই অনাচারী ম্লেচ্ছদের পতন অনিবার্য। স্বাধীন ভারতের কল্পনা-বিলাস তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলত। তিনি বলতেন যে, রাম, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জুন আবার ভারতের বুকে জন্মাবে ভারতের মুক্তি সাধন করতে। তাঁর ধারণা ছিল যে, ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া তোপী, কুনওয়ার সিংহ নাকি প্রায় কৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ম্লেচ্ছ-রাজত্বে অভাবের তাড়নায় রাজসরকারে চাকরি করেও যে হিন্দুস্থানীরা শুদ্ধাচার রক্ষা করে ধর্ম ঠিক রাখতে পারছে, তার ফলেই ভবিষ্যতে সর্বদুঃখ মোচন হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করে পারছি না যে, লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ-নামানুসারেই শহরের নাম নারায়ণগঞ্জ। শহরে প্রায় সাত-আটটা আখড়া ছিল। তবে মিশ্রজীর আখড়াই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মিশ্রজী ছিলেন পঁচিশ বছরের যুবক। তখনকার সব রোমাঞ্চকর কাহিনী বলতে বলতে তাঁর বুক ফুলে উঠতে গর্বে। ঝাঁসির রাণী শিশু-পুত্রকে পিঠে বেঁধে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট ও অন্যান্য জায়গায় ম্লেচ্ছরা কিভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। বিদ্রূপের হাসি হেসে বলতেন, আজ যারা দর্পভরে আমাদের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে চলে যাচ্ছে তারাই তখন প্রাণভয়ে দরিদ্র কৃষকের কুটিরে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল। পরে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, আগেও যা ঘটেছে পরেও তা ঘটতে পারে। লক্ষ্মীনারায়ণজীর কৃপায় দুঃখ বা সুখ কিছুই চিরস্থায়ী নয়। সবই ঘুরে-ফিরে আসে।

আর একটা গল্প তাঁর কাছে শুনতাম। ঢাকা শহরেও নাকি সিপাহীরা বিগড়েছিল। কিন্তু তা অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়। এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া পার্ক সেখানে নাকি বিদ্রোহী সিপাহীদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। এখনও গভীর রাত্রে সিপাহীদের “হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার” ধ্বনি শোনা যায়। এ কথা ছেলেবেলায় অন্য লোকের মুখেও শুনেছি।

এই মোহান্ত ঠাকুর আমাকে আদর করে "জং বাহাদুর" বলে ডাকতেন। হাসিমুখে বলতেন আমি নাকি জাতিধর্ম রক্ষার জন্য বহুৎ লড়াই করব। বহুদিন পর্যন্ত পাড়ায় বৃদ্ধরাও শেষ পর্যন্ত আমাকে ঐ নামেই ডাকতেন। আজও আমার কানে লেগে আছে সেই সদাহাস্যময় বৃদ্ধের স্নেহশীল ডাক "জং বাহাদুর"। উত্তর-জীবনে নির্জন কারাকক্ষে বসে যাঁদের কাছে ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতাম, এই মিশ্রজী ছিলেন সেই সব শ্রদ্ধাবানদের অন্যতম।

যাঁর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে মিশ্রজীর কথায় এলাম সেই পিতৃদেব নিজেও বিলাসী ছিলেন না এবং আমরা পাছে বিলাসী অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন হই এই ভয়ে তিনি তাঁর গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ আমাদের কাছে গোপন রাখতেন। যথোপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে জোগাতে শুধু আপত্তি করতেন না, তা নয়, উৎসাহই দিতেন। আমাদের জলখাবার ঘরে তৈরী হ'ত এবং হাত-খরচ বাবদ কোন পয়সা তিনি দিতেন না। তবে আমার কাকা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী। তিনি অবশ্য গোপনে মাঝে মাঝে কিছু নগদ পয়সা দিতেন।

কাউকেই 'তুই' বলে সম্বোধন করা একেবারে নিষেধ ছিল। চাকর-ঠাকুরকেও তুমি বা আপনি বলতে হ'ত। সে অভ্যাসের বলে আজও কাউকে তুই বলতে সঙ্কুচিত হই। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার তিনি ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন। বলতেন, এমন ভাষা প্রয়োগের চাইতে মারামারিও শ্রেয়।

নারায়ণগঞ্জে যে পাড়ায় আমরা বাস করতাম তা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য-প্রধান। কেবল এক ঘর ছিল সাহা শ্রেণীর। সাহা-রা ছিল জল অনাচরণীয়। ছোঁয়া তো দূরের কথা ঘরে জল থাকলেও সাহা-রা প্রবেশ করলে ফেলে দেওয়ার রীতি ছিল। অথচ তাঁরা বিদ্যা-বুদ্ধি বা চরিত্রগুণে কারুর চাইতেই হীন ছিলেন না। তাঁদের বাড়ীর ছেলেমেয়ে বা গৃহিণীরা কারুর বাড়ীতে গিয়ে ঘরে ঢুকতে সাহস পেতেন না। বারান্দার দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালিয়ে আসতেন। কিন্তু আমাদের বাড়ীর নিয়ম ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পিতৃদেবের কড়া আদেশ এবং মাতৃদেবীর সহনশীলতার গুণে তাঁরা আমাদের ঘরে যথাযোগ্য সমাদর পেতেন। গৃহ-প্রবেশের ফলে আমরা কখনও জল বা অন্য খাদ্য অশুচি মনে করে ফেলে দিই নি।

সাহা-রা পাড়ার অন্যান্যদের কাছ থেকে অনাদর-নির্যাতন পেতেন বটে,

কিন্তু বাবা তাঁদের আদর-অভ্যর্থনা করেই ক্ষান্ত থাকতেন না, তিনি ছিলেন তাঁদের কাছে মুরুব্বী, সহায় ও বন্ধু। ভাবলে আজও অবাক লাগে যে, এই সমস্ত সৎ, নির্বিরোধী এবং পরোপকারী মানুষগুলি কেমন করে সমাজের কাছে ঘৃণা পেত। আজও মনে আছে, প্রথমবার জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ী এলে মা বলেছিলেন, "দেখ, এই সাহাদের সবাই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু মানুষের বিপদ-আপদে এরাই এসে দাঁড়ায় সর্বপ্রথম। ১৯১৯ সালে পূর্ববঙ্গে যে ভয়াবহ ঝড় হয় তাতে নারায়ণগঞ্জে আমাদের পাড়ায় একখানা ঘরও খাড়া ছিল না। এই সাহারাই শুধু নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সকলের প্রাণ রক্ষা করে।"

মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করার এই যে শিক্ষা পেয়েছি তার জন্য আমি আমার পিতামাতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কানে যেন পিতার কথাই সর্বক্ষণ শুনতে পাই, "সকল মানুষই সমান। মুচি, মেথর, মুদ্দফরাশ, সকলকেই দিতে হবে মানুষের সম্মান। এর ব্যতিক্রম করার কোন অধিকারই নেই আমাদের।" আজও আমি বিশ্বাস করি যে-মানুষ বিপ্লবীর ভূমিকায় থেকেও মানুষকে তার যোগ্য সম্মান দেয় না তার বিপ্লববাদ ছলচাতুরী মাত্র। যে বিপ্লবী মানুষের প্রতি দরদহীন পরন্তু বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ, তিনি যতই বিখ্যাত হোন না কেন অন্তরের দিক থেকে তাঁর কাণাকড়িরও মূল্য নেই।

একবার একটা সিঁদেল চোর পাড়ায় ধরা পড়ল। সবার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমিও ওটাকে কম নির্যাতন করি নি। পিতৃদেব শুনতে পেয়ে আমায় তিরস্কার করে বললেন, "চোর ধরে তাকে পুলিসে দিতে পার, কিন্তু নির্যাতন করার অধিকার তোমার নেই।"

মিথ্যাচরণ ও বাক্য তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক মুসলমান বড় গুণ্ডা ছুরিকাহত হয়। কয়েকজন লোক গ্রেপ্তার হ'ল। আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথাও নাকি শোনা গেল। যদিও আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ ছিল না তথাপি ধরে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারত নিশ্চয়। তবে এ ব্যাপারে তখনকার পুলিস ইন্সপেক্টর মনমোহন ঘোষ আমার এবং পিতৃদেবের অজ্ঞাতসারে আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পিতৃদেব আমাকে ডেকে বললেন, "যদি সত্যই এ ব্যাপারে তোমার যোগাযোগ থেকে থাকে তবে তুমি নিজের কথা সত্যি বলে অন্যকে রেহাই দাও। আমি তোমার পক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করব না। মিথ্যা বলে খালাস পাওয়ার চাইতে সত্য স্বীকার করে শাস্তি গ্রহণ শ্রেয়।" মনমোহনবাবু ছিলেন আমাদের পরিবারের

ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরে এই মোকদ্দমায় আমার আসামী পক্ষ হয়ে সাক্ষী দেবার ফলে তাঁকে বিশেষভাবে বিব্রত হতে হয়। আরও পরে অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধাচরণের জন্য শাস্তি পেতেও হয়েছিল।

পিতৃদেবের প্রভাব যে কেবল প্রত্যক্ষ ছিল তা নয়। পরোক্ষভাবেও কত সোপান রচিত হয়েছিল তা আজ সঠিক বলতে পারব না। তার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে উপাসনায় যোগ দিয়ে শুনতে পেতাম কত ভাল ভাল কথা—চরিত্রগঠন, মনুষ্যত্বলাভ, পরসেবা এবং নানাপ্রকার কুসংস্কার-বিরোধী উপদেশ। আজও মনে আছে, শুনতে কত ভাল লাগত। জাতিগঠন, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, সত্যের জয়, পুরুষকার সম্বন্ধে আচার্যগণের উপদেশের প্রভাব বিপ্লবের পথে চলতে গিয়ে পদে পদে অনুভব করেছি। তখন শুনেছিলাম উপনিষদের মন্ত্র।

"আসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাং মৃতর্গময়"

শুনতাম বেদমন্ত্র—

"আনন্দ রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি"
"আনন্দ ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন্"

তার পর উত্তর-জীবনে এসেছে ঝঞ্ঝা, মৃত্যুর তাণ্ডব-নৃত্য, কারাগারের ভীষণতা, কিন্তু কেন জানি না, ঐ সব মন্ত্রের প্রভাব মনে শক্তির দৃঢ়তা দিয়ে যেত। জীবন-মৃত্যুর প্রলয়লীলায় মেতে মনে হ'ত সত্যের সন্ধান পেয়েছি; অন্ধকার নিশীথে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি। মনে পড়ত তাদের প্রিয় ঈশোপনিষদের শ্লোক—

"ঈষাবাশ্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
ত্যাগ ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, মাগৃধ কস্যচিৎ ধনম্।"

কি গভীর শক্তি লুকিয়েছিল এই কথাগুলির মধ্যে। ভগবান সর্বব্যাপী। যা কিছু সবই তিনি আচ্ছন্ন করে আছেন। ত্যাগী হয়ে ভোগ কর—পরধনে লোভ কর না। এই সমস্ত মন্ত্র-শ্লোকে আর কাদের কি হয়েছে জানি না, কিন্তু বিপ্লবী যুবকেরা মনে শক্তির সঞ্চার অনুভব করত; সর্বজীবের মঙ্গলসাধনে

অনুপ্রাণিত হ'ত, ত্যাগের মধ্যেই ভোগের সন্ধান লাভ করে নিস্পৃহ হয়ে কর্মে নিবৃত্ত হ'ত। এ সমস্ত শ্লোকের অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলাতেই তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় রচনাবলী পাঠ করে সবিশেষ আনন্দ পেতাম।

প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রসমাজে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেটা বোধ হয় পরে 'জাতীয় উন্নতির উপাদান' নামে পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছিল। নির্ভীকতা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, কত কথাই তাতে ছিল। বিশেষ করে মনে পড়ে—অন্যায়ে অসহিষ্ণু হও, একতাবদ্ধ হও, জাতির কাহারও উপরে অন্যায় অত্যাচার হলে তীব্র জ্বালা অনুভব কর। অদৃষ্টের উপর দোষ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার কুফল বোঝাতে গিয়ে তিনি একটা গল্প বলেছেন—এক দরিদ্র মুচিকে কেউ তার অবস্থা ফেরাবার চেষ্টার কথা বললে সে বলত—"রামজী যো লিখনা করে, সোত হইবে করে।"

এটাকে শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের জাতীয় চরিত্রের দোষ বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতি সহজে বিদেশীকে বিশ্বাস করে পরনির্ভর হয়ে থাকা যে কতখানি অনিষ্টকারী তা বলতে গিয়ে তিনি উইলিয়াম ষ্টিডের (William Stead) উক্তি উল্লেখ করতেন। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে বলেছিলেন, "তোমরা বিশ্বাস-প্রবণ জাতি" (You are a believing race)। এই ষ্টিড সাহেব ছিলেন বিলাতের 'রিভিউ অফ রিভিউ' পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক। এই মনীষী আরও বলেছিলেন, "বিদেশীরা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই শুধু তোমাদের দেশ শাসন করছে, তোমাদের যাতে ভাল হয় তা সব তারাই করে দেবে—এ সব তোমরা বিশ্বাস করে বসে আছ। তোমাদের উন্নতি হবে কি করে?" তাই তো শাস্ত্রী মহাশয় বলতেন যে, পরনির্ভশীলতার মত দুষ্ট ব্যাধি জাতীয় দেহ থেকে বিদূরিত করতে না পারলে আমাদের নিস্তার নেই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা বা উপদেশ শোনার সৌভাগ্য আমার খুব বেশী হয় নি। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপাসনারত ঋষিতুল্য শাস্ত্রী মহাশয়ের শান্ত-সমাহিত মূর্তি আজও চোখে ভাসছে। সেই ছেলেবেলায় ব্রাহ্মসমাজে যেতাম, তার পর আর বড় যাই নি। কিন্তু কেবল শাস্ত্রী মহাশয় কেন, সমস্ত আচার্যগণের শুভ্র বসন পরিহিত শান্ত-সমাহিত শুদ্ধ মূর্তি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের কণ্ঠে—

সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম
শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি

আজও কানে ধ্বনিত হয়। মহাজ্ঞানী মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানলব্ধ এই সব বেদমন্ত্র শুধু অবাস্তব আধ্যাত্মিক জগতের কথা মনে হতে পারে, কিন্তু এই সব অমোঘ বাণী বৈপ্লবিক জীবনে সমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে চিত্ত প্রসারিত করেছে—যে বিপ্লবী সে নিজেকে সকলের মধ্যে এবং সকলকে নিজের মধ্যে দেখবে। কুসংস্কারবর্জিত যুক্তিবাদী এই ব্রাহ্মধর্ম আমার জীবনে বার বার পথ দেখাতে সহায়ক হয়েছে।

অবশ্য কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবই আমার বাল্য-কৈশোরের সব তা নয়। আমার মাতৃদেবী ছিলেন আচারনিষ্ঠ তান্ত্রিক গুরুবংশের মেয়ে। তাঁর প্রভাবে বাড়ীতে পূজার্চনাও হ'ত। সুতরাং এই দুই ধার্মিক আবহাওয়ার মধ্যে আমি কাটিয়েছি বালক ও কিশোর হিসেবে।

ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে পাঠশালার কথা একটু না বলে পারছি নে। পাঠশালাতেই আমার নিম্ন-প্রাইমারী পরীক্ষা পর্যন্ত কাটে। কারণ আমার পিতৃদেবের ধারণা ছিল যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী স্কুলের চাইতে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিই শ্রেয়।

পারিবারিক জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হিসাব—মাসমাহিনা, জমিজমা, দরকষা, সুদকষার শুভঙ্কর-রীতি পাঠশালায় শেখান হ'ত। এর ফলে পাঠশালার ছেলেদের দেখতাম বাজারে গিয়ে যেসব দুরূহ হিসাব অতি সহজেই মুখে মুখে করে নিত তা সমাধান করতে কলেজে পড়ুয়াদেরও কাগজ-কলম প্রয়োজন হ'ত। পত্রলেখা যা শেখাবার জন্য আজকাল কত উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তা পাঠশালাতেই শেখান হ'ত। দরখাস্ত লেখা, জমি-বন্দোবস্তের দলিল, টাকা ধার করবার তমশুক সবই শিখতে হ'ত পাঠশালার ছাত্রদের।

অধিকাংশ মানুষই ছিল কৃষিজীবী। মুদি, মনোহারী আর কুসিদজীবী এদের নিয়েই সমাজজীবন। ব্যাঙ্কিং বা শিল্পজগতের জটিল হিসাব-নিকাশ তখন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং কালানুযায়ী জীবন-যাপনের মত বিদ্যা পাঠশালাতেই ছেলেরা পেত।

এ ছাড়া সংস্কৃত টোল থাকত। ব্রাহ্মণরাই বহু বৎসর ধরে টোলে পড়ত। সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অধিক যাওয়ার প্রয়োজনবোধ হ'ত না—

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই অবশ্য এমনি বোধের কারণ। আজও ঢাকা এবং অন্যান্য মফঃস্বল শহরে পাঠশালাগুলি বর্তমান আছে। তবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতিও দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

আমি যে পাঠশালায় পড়তাম তা বসত নারায়ণগঞ্জ শহরে রামকানাই-এর আখড়ার চণ্ডীমণ্ডপে। পণ্ডিত ছিলেন চন্দ্রকান্ত মজুমদার। তিনি একাই সবাইকে পড়াতেন। বাংলা, অঙ্ক, হাতের লেখা, নামতা মুখস্ত সবই একই সঙ্গে চলছে এবং সঙ্গে চলছে বেতখানা। প্রতিদিন দু'একখানা নূতন বেত প্রয়োজন হ'ত। ছাত্রদের কাছে পণ্ডিত ছিলেন যমতুল্য। ছেলেরাই সুর করে ছড়া বেঁধেছিল—"চন্দ্রকান্ত বড় শান্ত, চেতলে বড় দুরন্ত।" বাকিটা আমার আর আজ মনে নেই।

গালাগালি, স্কুল পালিয়ে তামাক খাওয়া, বই-শ্লেট-পেন্সিল চুরি, মারামারি, উচ্চৈঃস্বরে নামতার সুর, পণ্ডিতের ধমক সব মিলে একটা হট্টগোল সব সময়ই লেগে থাকত। শাস্তির বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল। দু'পা যতটা সম্ভব ফাঁক করে দাঁড়িয়ে কপালে একটা চাড়া কিংবা নুড়ি দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'ত। পড়ে গেলে তার ওপর নিদারুণ বেত্রাঘাত হ'ত। অনেক সময় অপরাধের গুরুত্ব হিসেবে পূর্ববর্ণিত অবস্থার সঙ্গে দু'হাতে দু'খানা থান ইট নিয়ে দাঁড়াতে হ'ত। কারুর ভাগ্যে জুটত দু'পায়ের নীচ দিয়ে হাত চালিয়ে মাথা নীচু করে দু'কান ধরে থাকা। এক পায়ে দাঁড়ানো, চেয়ার নেই, কিন্তু চেয়ারে বসবার মত ভঙ্গি করা, এমনি আরও কত যে নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তার আজ আর সব মনে নেই। বাড়ীতে পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নালিশ করেও কোন লাভ ছিল না, উপরন্তু অভিভাবকের কাছেও তার জন্য শাস্তি পেতে হ'ত। অবশ্য আমি এবং আর এক মোক্তারের ছেলে আলাদা বসতাম এবং পণ্ডিতের উপর নির্দেশ ছিল, তিনি যেন স্বহস্তে শাস্তি না দিয়ে অভিভাবকদের গোচরে আনেন আমাদের দোষত্রুটি।

আপাততঃ এমনি নিষ্ঠুর মনে হলেও দেখেছি কি গভীর স্নেহধারা তাঁর অন্তরে বইত। শুধু যে ছাত্ররাই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করত তা নয়; পণ্ডিতমহাশয়ের ছিল সমস্ত অভিভাবক এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অনুন্নত শ্রেণীর পিতামাতারা পণ্ডিতমহাশয়কে শুধু শ্রদ্ধা করতেন না, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন শিক্ষাদাতা বলে। স্কুলের বেতন সকলের সব সময় দেওয়ার সাধ্য হ'ত না। তবু সামান্য কিছু দ্রব্য দিলেই পণ্ডিতমহাশয় খুশী থাকতেন।

ছেলেদের অসুখ-বিসুখ করলে তো কথাই নেই, তাদের বাড়ীর কারুর অসুখ কিংবা বিপদ-আপদের সংবাদ পেলে তিনি ছুটে যেতেন সহানুভূতি জানাতে, আধুনিকতা ঘেঁষা মৌখিকতা ছিল না।

আজ কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে গুরু-শিষ্যের স্নেহময় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। খুব বেশী হলে বলতে পারা যায় মিত্রবৎ। অবশ্য মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে অবস্থা একটু ভাল এদিক থেকে। বর্তমানে শিক্ষকরা পড়ায়, ছাত্ররা শোনে। ছেলেরা বেতন দেয়, শিক্ষক বেতন পান। বিদ্যালয়গুলি বিদ্যাপণ্য বেচাকেনার বাজার মাত্র। বাজার ভাঙলে ক্রেতা-বিক্রেতার সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না।

পাঠশালাগুলি ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই একটা অংশ। দেশে রাজা সর্বশক্তিমান। গৃহে পিতামাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আর পাঠশালায় ছিলেন পণ্ডিত সর্বেসর্বা। তাঁর কথাই আইন। তাই তাঁরই ছিল শাসন, রক্ষা ও স্নেহ করার অধিকার। কিন্তু আজকের শিল্পভিত্তিক তথা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে ভূমি অধিকারগত আভিজাত্যের স্থানে টাকার আধিপত্য সর্বত্র। পয়সা-ওলারাই আজ সর্বত্র কর্তৃত্ব করছে। সুতরাং সমাজদেহের সর্বত্র এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও একটা কেনাবেচার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শিক্ষক ও শিক্ষিতের মধ্যে।

শুধু যে পাঠশালাতেই পড়েছি এবং ব্রাহ্মসমাজে গিয়েছি তা নয়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত 'সাণ্ডে স্কুলে'ও (Sunday School) নিয়মিত যেতাম। দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য প্রতি রবিবার সকালে স্কুল বসত। একজন ইংরেজ ধর্মযাজক নানা গল্পচ্ছলে ধর্মোপদেশ দিতেন এবং বাইবেল পড়াতেন। তিনি মানুষ হিসেবে খুবই ভাল ছিলেন। সবার সঙ্গে যেমন তিনি অসঙ্কোচে মিশতেন, তেমনি কোন ধর্মের নিন্দাও তার মুখে কোনদিন শুনি নি। যে সমস্ত খ্রীষ্টান পাদ্রী রাস্তায় ভিড় জমিয়ে বক্তৃতা করত তার সঙ্গে এই স্কুলের পাদ্রী সাহেবের ছিল আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এদের কথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক শুনেছি। কত ঠাট্টা, তামাসা এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হ'ত এদের তার আর অন্ত নেই। কেন জানি না আমার মনের কোণে এদের জন্য একটু মমতার ছোঁয়াচ ছিল যার ফলে এদের বিদ্রূপাংশে ভিড়ের সঙ্গে কখনও যোগ দিতে

পারতাম না। উত্তর-জীবনে দেখেছি এরা পেটের দায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে একান্ত বাধ্য হয়েই অদ্ভুত পোশাক-আশাক পরিধান করে নানান স্বরে গান গাইছে, বক্তৃতা করছে।

সাণ্ডে স্কুলের পাদ্রী ছিলেন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নির্যাতিত জনসাধারণের মনে জাগে একটা স্বাভাবিক বিদ্বেষ। এর তীব্রতা কিন্তু এই সাহেবকে দেখলে একেবারে লোপ পেত। যীশুর নির্মল মানবপ্রেম, আত্মত্যাগ, শাসক-শক্তির অকথ্য অত্যাচারের মধ্যেও অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজেদের চরিত্র গঠন করতে যেসব উপদেশ দিতেন তা শুনতে আমার খুবই ভাল লাগত। আজও মনে পড়ে যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ অমর চিত্র সামনে রেখে যখন তাঁর জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করতেন, তখন আমার চোখ জলে ভরে আসত, শরীরে লাগত রোমাঞ্চ। মহামানবের অপূর্ব চরিত্র মনের পাতায় পাতায় অনপনেয় চিহ্ন রেখে যেত। ভবিষ্যৎ বিপ্লবী জীবনে আত্মত্যাগ করতে ও অত্যাচারীর সম্মুখে সত্যের জয় ঘোষণা করতে মনকে অনুপ্রাণিত করত। শত লাঞ্ছনার মধ্যেও প্রাণে শক্তি-রক্ষায় সাহায্য পেতাম। এই জন্যই বোধ হয় বিদেশী খ্রীষ্টান রাজত্বে বাস করেও তাদের ধর্মগুরুকে মহামানব বলে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা হয় না। এবং তার প্রচারিত ধর্মকে ছোট বলে ভাবতে পারি নি। কেননা অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যেন প্রতীক এ।

সাণ্ডে স্কুলে অধীত বাইবেল পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলাম। দশ আজ্ঞা (Ten Commandments) প্রায়ই মনে পড়ত। বিশেষ করে মনে হ'ত, প্রতিবেশীকে আপনভাবেই ভালবাস (Love Thy Neighbours as Thyself)। বিষয়ী লোকের পক্ষে বাস্তব জীবনে কায়মনোবাক্যে একে গ্রহণ করা কতখানি সম্ভব বলতে পারি নে, কিন্তু বিপ্লবী জীবনে এই উপদেশ পরদুঃখ মোচনে ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করত। ভালবাসা ও ত্যাগ অবিচ্ছেদ্য। মানুষকে ভাল না বাসলে কেউ মানুষের জন্য আত্ম-বিসর্জন করতে পারে না।

আজ কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে জাগছে—যেখানে স্বার্থের সংঘাত, শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ সেখানে ব্যক্তি-শ্রেণীনির্বিশেষে নিঃস্বার্থ ভালবাসা স্বাভাবিক কি না! যে ব্যবস্থায় শ্রমিককে তার ন্যায্য পাওনা দিলে মালিকের লাভের অঙ্কে কমতি পড়ে, চাষী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিতে ফসল ফলিয়ে মালিকানা দাবি করলে জমিদারের গোলা শূন্য থাকে, অর্থাৎ যেখানে পরকে বঞ্চিত করতে না পারলে নিজের তহবিল পূর্ণ হয় না, সে সমাজে Love Thy Neighbours as

Thyself কথার কথাই থেকে যায়। অবশ্য কোন একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরের সেবায় সর্বস্ব দান করতে পারেন, কিন্তু তিনি সমাজে ব্যতিক্রম বলেই পরিগণিত হন। তাঁর ব্যক্তিগত দানে, সেবায় দাক্ষিণ্য আছে, মমত্ববোধও হয়ত আছে, কিন্তু তাতে মানুষ হিসেবে মানুষের দাবির স্বীকৃতি ন্যায্য অধিকার মেনে নেওয়ার মনোবৃত্তি কতখানি আছে তা বলা শক্ত। যাদের শোষণ করে আমি পুঁজিপতি হয়েছি, সাময়িক উত্তেজনার বশে, পরকালে স্বর্গলোকে বা ইহকালে যশের আকাঙ্ক্ষায় অথবা অন্য কোন ক্ষণস্থায়ী উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই শোষিত জনকে সর্বস্ব দান করে ফেলতে পারি। কিন্তু এতে সামগ্রিক ভাবে মানুষের মঙ্গল হয় না। সমাজ-ব্যাধির মূলে যে ব্যবস্থা লুকিয়ে আছে তা অপসারণের দিকে দৃষ্টি নিপতিত না হয়ে ধর্ম বা পুণ্য লাভের ক্ষণিক ধাঁধায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

যদিও ইংরেজ-বিদ্বেষ ভাব স্বদেশী যুগের কিছু আগে থেকেই লোকের মনে স্পষ্ট হতে সুরু হয়, মিশনারীদের উপর বিরূপভাব ছিল বহু বছর আগে থেকেই—বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের সময় থেকেই। তার পর হিন্দুর পুনর্জাগরণ (Hindu Revivalist) আন্দোলনের সময় হতেই এ তীব্ররূপে দেখা দেয়। রুশ-জাপান যুদ্ধে এবং বুয়র যুদ্ধের ফলেও কতকটা শ্বেতাঙ্গদের উপর অবজ্ঞার ভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচনা করব।

নারায়ণগঞ্জে কিন্তু মিশনারী বিদ্বেষ তেমন কিছু ছিল না। এ শহরের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি ছিল পাটের ব্যবসায়ে। শ্বেতাঙ্গরা ছিল তার সর্বময় কর্তা। শহরের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত তাদেরই দ্বারা। তৎকালীন মিশনারী পাদ্রী সাহেব ছিলেন সত্যিকারের মানবপ্রেমিক। তা ছাড়া আমরা গণ্যমান্য লোকের সন্তানেরা সাণ্ডে স্কুলে যেতাম। এসব কারণে মিশনারীদের বড় কেউ একটা বিরুদ্ধাচরণ করত না।

তবে এ অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে নি। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র তখন আমাদের শিক্ষক ক্লাশে মিশনারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন এবং আমাদের সাণ্ডে স্কুলে যেতে নিষেধ করেন। তিনি বলেছিলেন এমনি আচরণ স্বধর্ম-বিরোধী এবং জাতীয়তার পরিপন্থী। সেদিন কথাটা খুব ভাল লাগে নি এবং অতি অনিচ্ছার সঙ্গেই সাণ্ডে স্কুলে যাওয়া ধীরে ধীরে বন্ধ করতে

লাগলাম। পরে অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে পড়ে সেদিনকার শিক্ষক মহাশয়ের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল।

তবে এই মিশনারী-বিদ্বেষ অনেক সময়ই সীমা লঙ্ঘন করত এবং এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে মনে তীব্র ব্যথা অনুভব করেছিলাম। পাদ্রী সাহেবের স্ত্রী হিন্দু পাড়ায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে এলেন তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে। আমার মা তাঁকে যত্ন করে বসালেন এবং শিশুকে কমলালেবু দিলেন। এ কাজ পাড়ার লোকের মনঃপূত হয়নি। কারণ তাদের বাড়ী গেলে তারা এই ইংরেজ মহিলার প্রতি অসৌজন্য ব্যবহার তো করতই, এমনকি বসতেও বলত না। সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে লাগল। কথা চলল আমাদের বয়কট করবার। পাড়ার সঙ্গী-সাথী এবং যুবকরা আমাকে বিদ্রূপ করতে লাগল। যদিও অন্যায়টা পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারি নি কিন্তু মনে আছে লজ্জায় কয়েক দিন বাসা থেকে বার হই নি।

এ অবশ্য প্রথম স্বদেশীভাব-উদ্দামতার উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। পরবর্তীকালেও যে ছেলেমানুষী ইংরেজ-বিদ্বেষ লক্ষ্য করি নি তা নয়। সর্বত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক থেকে সুরু করে যারা কস্মিনকালে কোনরূপ বিপদ্‌জনক কাজে হাত দিত না তাদেরও কারুর কারুর মধ্যে এমনি ভাবের বিকাশ দেখে কৌতুক বোধ করেছি। পুরাতন আইন-সভায় (Legislative Assembly) দেখেছি ইংরেজ সভ্যদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি এবং ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যবাণ। ওরা হ'ল প্রবলপ্রতাপশালী ইংরেজের প্রতিভূ। আর আমরা দুর্বল নিরুপায় দেশীয় সভ্য। এর ফলে কারুর কারুর মনে যে হীনতাভাব বিরাজ করত তারই অক্ষম প্রকাশ এই গায়ের ঝাল মেটানোর মধ্যে। মনে মনে তখন যেমন দুঃখ পেয়েছি, হাসিও পেত কম নয়। বাক্-সর্বস্ব লোকের নিষ্ফল ক্রোধ বড় করুণ।

অসৌজন্য এবং অভদ্র আচরণ দুর্বলতা বলেই বিপ্লবীরা মনে করত। তারা আরও জানত যে, শত্রু-মাত্রই ঘৃণ্য নয় বা অবজ্ঞার পাত্র নয়। তবে আত্মমর্যাদা ও কৃষ্টি প্রভাবহীন বিপ্লবী-নামধারী যে ছিল না তা নয়। তবে তারা ব্যতিক্রম বলেই পরিগণিত।

আজ ভারতের বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত। অবশ্য উগ্র স্বদেশপ্রেমিকরা ভিন্ন-মত পোষণ করেন। সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে এ আদর্শে জাতিবিদ্বেষ থাকতে পারে না। সমাজতন্ত্র

ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে গোটা মনুষ্যসমাজকেই একই বন্ধনে আবদ্ধ করে। অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হয় তা কোন দেশেরই সীমারেখায় এসে থেমে যায় না। পৃথিবীব্যাপী সমস্ত ধনীদের স্বার্থ মূলতঃ একই। শ্রমিক-কৃষকের বেলাতেও একই কথা খাটে। সেজন্যই তাদের শ্লোগান—"Proletarians of all lands unite." ভারতীয় কিংবা ইংরেজ শ্রমিকের মধ্যে প্রকৃত স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষহীন। সুতরাং ভারতীয় বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ, এমনকি ভূতপূর্ব শাসক ইংরেজের উপরও বিদ্বেষ নেই। যারা শোষণ, উৎপীড়ন আর অত্যাচার করে তাদের কবল থেকে মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রক্ষার জন্যই বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিকরা দৃঢ় মাত্র। সুতরাং শুধু যে জাতি হিসেবে তারা ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষহীন তা নয়, তারা ইংরেজ জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একাত্মাভাবাপন্ন। এ আলোচনা এখানেই থাক্।

ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে আমাদের গৃহ-ভৃত্যদের কথা—বিশেষ করে সীতানাথ, দেবেন্দ্র (ওরফে দেবা) ও রাধানাথ, উল্লেখ না করলে আমাদের পরিবার তথা সেকালের সমাজজীবনের একটা চিত্র উহ্য থেকে যাবে। এদের প্রায় সকলের—প্রধানতঃ দেবার কোলে-পিঠেই মানুষ হয়েছি বলতে পারি। আমার এই বুড়ো বয়সেও সীতানাথ ও দেবা আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেছে। অবশ্য কৌতুকভরে লক্ষ্য করেছি যে, ওরা অপরিচিত লোকের সামনে কোন-কিছু সম্বোধন না করেই কার্য সমাধা করত। ছেলেবেলা থেকে আমরণ এরা আমাদের ঘরেই ঘুরেফিরে কার্জ করেছে।

এদের জন্ম দারিদ্র কায়স্থ বংশে কিন্তু এমনি নির্লোভ, সচ্চরিত্র ও দরদী মানুষ উচ্চশ্রেণী শিক্ষিতের মধ্যেও কম চোখে পড়েছে। পরিবারের মধ্যে এদের আলাদা কোন সত্বা ছিল না। আমার পিতৃদেবকেই এরা পিতৃত্বের আসন দিয়ে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছিন্ন করে একই পরিবারের লোকে পরিণত হয়েছিল। সর্বস্ব দিয়েও এদের উপর নির্ভর করতে পারতাম। এই বিশ্বাস শুধু অর্থ বা ধন-সম্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের, ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবুর এবং অন্যান্য স্বজন বন্ধুবান্ধবদের রাজনৈতিক কাজকর্মে এমনকি গুপ্ত সমিতির কাজে সীতা ও দেবা ভ্রাতৃদ্বয়কে অবিশ্বাস করতে পারি নি। এরা অনেক কথাই জানতে পেরেছিল। অনেক পলাতক বিপ্লবী-কর্মীকেও চিনত। কিন্তু কখনও—এমনকি পুলিসের লাঞ্ছনা কিংবা অর্থলোভ, এদের আনুগত্যের

ভিত্তি শিথিল করতে পারে নি। পুলিস, গোয়েন্দা অফিসাররা প্রায়ই এদেরকে থানা বা নিজ বাসগৃহে নিয়ে গিয়ে ভয় এবং প্রলোভন দেখাত। কিন্তু ওরা ছিল বিশ্বাসে অটল, শত প্রলোভনে পড়েও এরা কোনদিন শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আশুতোষ কাহিল্লীর মত পলাতক কর্মীকে ধরিয়ে দেয় নি।

দেবাদের কথা বলতে গিয়ে একটা কাহিনী হয়ত একান্তই বিচ্ছিন্ন, না বলে পারছি না। কেন না এ বৃত্তান্তের মধ্যে যে রহস্যের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম সেই একান্ত শিশু বয়সে, তা বৃদ্ধ বয়সেও সমাধান করতে পারি নি।

আমাদের দেশে অনেক আগে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হ'ত অনেকটা দেশ বা গ্রামের প্রয়োজনে। লেন-দেন বিনিময় প্রথাতেই বেশির ভাগ হতো। তাই লোকের হাতে তেমন কাঁচা পয়সার আমদানী হ'ত না, আর তার ফলে লোকসাধারণ বিলাসী হওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু পাটচাষ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে অবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হ'ল। বিদেশী কোম্পানীগুলি এগিয়ে এলো কাঁচা পাট কিনতে তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য। দেশের লোকের হাতে অকস্মাৎ অনেক টাকা এসে পড়ল। দরিদ্র চাষীর পাট বিক্রী করে জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ সব শোধ করেও হাতে কিছু থেকে যেত। আর যারা মধ্যবিত্ত তারাও পাটের আপিসে চাকরি করে বেশ দু'পয়সা কামাত।

হঠাৎ-পাওয়া চকচকে রূপোর মুদ্রাগুলি শুধু চোখ ধাঁধায় না, মনও মাতায়। সেই স্রোতে নেমে আসে বিলাসিতা। তখনকার দিনে বেশ্যাসক্ত হওয়া বিলাসিতার একটা অঙ্গ ছিল। কাজেই উচ্চতর সমাজের অনুকরণে চাষী এবং মধ্যবিত্তরাও নেশার হাতছানি এড়াতে পারল না। নারায়ণগঞ্জের গণিকালয়-গুলিও বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে লাগল। বর্তমানে যদিও অতি অল্প-সংখ্যক পল্লী আছে, কিন্তু তখন সমস্ত শহর বেশ্যালয়ে আকীর্ণ ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এমনি একটা পল্লীর মধ্য দিয়েই আমাকে প্রতিদিন স্কুলে যাতায়াত করতে হ'ত। আর রাস্তার উপরের এক বাড়ীতে থাকত আমাদের খুল্লতাতের এক রক্ষিতা। তারই বিশেষ অনুরোধে আমাদের দেবা একদিন সকলের অজান্তে আমাকে কোলে করে সেখানে নিয়ে গেল। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক বা বেশ্যা কি তা বোঝবার বয়স আমার নয়। আমি গিয়েছিলাম দুপুর বেলায়। গিয়ে তাকে শায়িত অবস্থায় দেখেছিলাম। আমি যেতেই উঠে বসল।

সে কোন্ যুগের কথা! কিন্তু সবটাই ছবির মত পরিষ্কার মনে আছে। তার আঁচল কোথায় কিভাবে লুটিয়ে পড়েছিল, মাথার লুন্ঠিত চুলের গোছা, উঠে বসার ভঙ্গি সবই চোখের সামনে যেন ভাসছে—আমি কোথায় বসেছিলাম, কি খেয়েছিলাম, কাপড়-জামা, দামী দামী বিলিতি পুতুল।

ব্যাপারটা মায়ের গোচরে আসতেই দেবা ভীষণভাবে তিরস্কৃত হ'ল। পিতৃদেব জানতে পারলে যে কি অনর্থ ঘটবে তাই ভেবে মা বিশেষভাবে শঙ্কিত হলেন। তাঁর কানে যাতে কোন প্রকারেই খবর না যায় সে বিষয়ে দেবা আমাকে এবং আর সকলকে সাবধান করে দিলে। আমার মনের মধ্যে একটা গোল বেধে গেল। জেগে উঠল একটা কৌতূহল।

তার পর, প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার সময় ঐ রক্ষিতার বাড়ীর দিকে চোখ পড়ত। দেখতাম, সে দরজা বা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের তিরস্কারের কথা মনে করে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতাম। কয়েকদিনের মধ্যেই দেবার কাছে শুনতে পেলাম বিকেলবেলায় ফিরতি-পথে আমার শুষ্ক মুখ তাকে চঞ্চল করে তুলত। আমি যেন জলখাবার খেয়ে বাড়ী যাই। মনে মনে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলাম। বাধ্য হয়ে ঘুর-পথে স্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করলাম।

তারপর, যদিও জীবনে কোনদিন আর বেশ্যালয়ে পদার্পণ করার সুযোগ আসে নি, কিন্তু পরিণত বয়স এমনকি আজ পর্যন্তও যখন কলকাতা কিংবা অন্য কোন স্থানে বেশ্যাপল্লীর মধ্য দিয়ে যেতে হ'ত তখনই শৈশবের কথা মনে উদিত হয়ে যেত। এরা যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ। আত্মীয়-বন্ধুহীন সমাজ-পরিত্যক্ত এদের জীবন। এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ কিছুই আজও জানি না। একটা রহস্য আর সংস্কারের বেড়া মনের মধ্যে অজান্তে গড়ে উঠেছে। একটা ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

সেদিন ছিল বাসন্তী পূর্ণিমা। সকালবেলাতেই পশ্চিমে অনেকদিন রাজনৈতিক কাজকর্ম করে কলকাতায় ফিরেছিলাম। সন্ধ্যার পর চন্দ্রালোকে নগরবাসী আবীরের নেশায় মেতে উঠেছে। যদিও ট্রেনের ক্লান্তি সমস্ত দেহকে আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু কেন জানি না একপ্রকার স্বেচ্ছাতেই পরিষ্কার ধব্‌ধবে কাপড়-জামা পরিধান করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। স্নিগ্ধ চাঁদিমা আর মৃদু বাতাসে দেহের সমস্ত ক্লেদ মুছে গেল।

রাস্তায় মাতামাতি। কিন্তু কই, কেউ তো আসছে না আমার দেহে আবীর

ছড়িয়ে দিতে। মন ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। রাজনীতি, নেতৃত্ব, গাম্ভীর্য—সবকিছুর আবরণ খুলে দিয়ে এক হাল্‌কা পরিবেশে মনকে ঢেলে দিতে চাই। কিন্তু কই, আমি কি এদের পর! অবশ্য বেশীদূর যেতে না যেতেই কয়েকটি ছোট ছেলে অনুমতি চাইতেই সানন্দে মাথা পেতে দিয়ে নিজেকে অনেকটা সহজ বোধ করলাম। ক্রমে চীৎপুর রাস্তায় এসে উপস্থিত হলাম। সামনেই বারবণিতালয়-গুলিতে দোলপূর্ণিমার তাণ্ডব চলছে। কেমন একটা নোংরামি ও বীভৎসতার স্পর্শ মনকে কুঞ্চিত করল। ঘুরে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে পড়লাম।

চলতে চলতে একটা রঙ্গালয়ের সামনে এসে মনে হ'ল আমার পুরাতন বন্ধু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। মনোরঞ্জনবাবু প্রথম জীবনে আমার বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন। পরে তিনি অভিনেতার জীবন আরম্ভ করেন। রঙ্গমঞ্চ এবং সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থেকেও তিনি চারিত্রিক সুনাম রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেখানে তিনি মহর্ষি বলেই শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। সে যাই হোক, আমি গিয়ে দেখলাম মনোরঞ্জনবাবু কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে আলাপ-রত। পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রসিদ্ধ জেল-ফেরত, প্রসিদ্ধ বিপ্লবী বলে। তারা আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে কক্ষান্তরে চলে গেল। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ও শ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার এ মনোভাব যুক্তি-বিচারের আওতায় পড়ে না জানি। হয়ত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা বলবেন, এ আমার সংযমে পীড়িত চিত্তের বিকৃত বহিঃপ্রকাশ। বৃহত্তম পর্যায়ে বিচার করে দেখতে পাই যে, এমনি মনোভাব বর্তমান সমাজ-গঠনের জন্যই দায়ী। ধনতান্ত্রিক সমাজে বেশ্যাবৃত্তি যেমন একরকম অপরিহার্য, তেমনি সাম্যবাদী ভিত্তিতে গঠিত সমাজের সকল স্তরে নারী-পুরুষের সমানাধিকার থাকার ফলে সহজেই বেশ্যাবৃত্তি সমাজদেহ থেকে বিদূরিত হয়। এ কেবল নীতিগত কথা নয়, সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু সংস্কারের সহসা মৃত্যু হয় না। তাই গণিকার সশ্রদ্ধ পদস্পর্শও মনকে কুঞ্চিত করে।

সে রাত্রিতে সর্বত্রই রং-এর মাতন। রঙ্গালয়ের সাজঘর আরও রঙীন। মনোরঞ্জনবাবু বললেন, সকলের অনুরোধে একটু বসুন। চেয়ে দেখি একজন নামকরা অভিনেত্রী এগিয়ে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সম্মতির অপেক্ষায়। 'না' করার কথা ভুলে গেলাম। পায়ে আবীর লিপ্ত করে পুনরায় দাঁড়িয়ে রইল। এবার মাথা বাড়িয়ে দিতে হ'ল। সসম্ভ্রমে কপাল রঞ্জিত করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে চলে গেল। বিস্মিত হলাম, মনের সহজভাবও ফিরে পেলাম।

কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতে পারি নি। কোনদিনই তাদের সঙ্গে আমার বাক্যালাপ হয় নি, কিন্তু ঘটনাটাও কোনদিন ভুলতে পারলাম না।

তারপরও বহুদিন থিয়েটারের সাজঘরের অংশে গিয়েছি, প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব এবং চা-পান করেছি। কিন্তু অভিনেত্রীদের মুখে লঘু পরিহাস শুনি নি বা অসঙ্গত ইঙ্গিতও দেখি নি। গায়ে পড়েও এরা কোনদিন আলাপ করতে আসে নি।

স্টীমার ও রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী দেখার প্রবল কৌতূহল ছিল। কত অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যা জেটির সঙ্গে বাঁধা পনটুনগুলির উপরে বসে মুগ্ধ নয়নে কাটিয়ে দিয়েছি তার ঠিক নেই। দেখতাম কত নৌকোর যাতায়াত—নদীর ওপারের মনোরম দৃশ্য। স্টীমার আর লঞ্চ এসে নদীর বুকে ঢেউ তুলে চলে যেত। পনটুনগুলি দুলতে থাকত।

মাঝে মাঝে নদীতে বড় বড় স্লুপ (sloop) আসত। খোলটা জল থেকে অনেক উঁচুতে। ডেকের উপরে নানা কোণে খাটানো পালের হাওয়ায় চলত ওগুলি। দেখতে আগের দিনের পাল-তোলা জাহাজের মত। দূরবর্তী মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীর বুকে ছুটে চলত স্টীমার সন্ধানী-আলো ফেলে। বহুদূরে দিক্‌চক্রবালে রাতের অন্ধকারে মনে হ'ত যেন ধূমকেতুর পুচ্ছ।

কলকাতার যাত্রী আসত গোয়ালন্দ স্টীমারে। বরিশাল, ভৈরব, চাঁদপুর, লক্ষ্যা, সুন্দরবন, কাছাড় এবং আরও কত স্টীমার—যাত্রী বোঝাই হয়ে নারায়ণগঞ্জ আসত এবং এখান থেকে আবার বোঝাই হয়ে চলে যেত। দৈনিক যাত্রীবাহী নৌকোর সংখ্যাও কম ছিল না। আমাদের দেশে ওগুলির নাম ছিল 'গহনার নৌকো'। ভাড়া স্টীমার বা রেলের চাইতে অনেক কম। একজন লোক দাঁড়াত হাল ধরে, আর চার-ছ'জন সামনে থেকে দাঁড় টেনে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। দশ-পনেরো থেকে সত্তর-আশী জন পর্যন্ত যাত্রীবাহী বিভিন্ন সাইজের গহনার নৌকো ছিল। হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নির্বিশেষে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে অনায়াসে এরা রাত কাটিয়ে দিত।

যাত্রী দেখার মোহ যেন আমাকে পেয়ে বসত। অজানা দেশের কত অচেনা লোক এই পথে জোয়ার-ভাঁটার স্রোতের মত যাতায়াত করত তার ঠিক নেই। শত সহস্র লোক যেমন স্টীমার কিংবা নৌকো থেকে রেলে উঠত আবার

তেমনি রেল থেকে ষ্টীমার কিংবা নৌকোয় গিয়ে উঠত। ভীষণ একটা তাড়াহুড়ো আর ছুটোছুটির হিড়িক লেগে থাকত।

কত বিচিত্র ধরনের মানুষ আর পোশাক! কেউ পরিধান করেছে ভাল কোট, শার্ট, জুতো, কারুর পরিধানে বা ছিন্ন-মলিন বস্ত্র। কারুর সঙ্গে কত বিচিত্র রঙের ট্রাঙ্ক বা সুটকেশ, কেউ বা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ময়লা সতরঞ্চি বা কাঁথায় মোড়া বোঝা বেঁধে। দেখতাম কত বরযাত্রীর দল, কত ফুটবল টিমের সদর্প যাতায়াত। কত ঘোমটাটানা কনে-বউ আর ক্ষীণদেহ মানুষেরা ভয়ে ভয়ে যাচ্ছে; কখনও বা জুতো পায়ে, মুখে পাইপ গুঁজে গ্যাটম্যাট করে চলেছে সাহেব। নেটিভরা সভয়ে সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে। স্টেশনে দেখেছি যাত্রীর সঙ্গে কুলির অন্তহীন বচসা। সাহেবদের তো কথাই নেই, বাঙালী ভদ্রলোকের লাথি ঘুষি এদেরকে সহ্য করতে হ'ত। আজকাল অবশ্য দিন পাল্‌টে গেছে।

যাত্রীসাধারণ—বিশেষ করে তৃতীয় শ্রেণীর, স্টেশনের বাবুদের পুলিস-দারোগার মতই ভয় করত। এদের শত প্রকার লাঞ্ছনা এবং উচ্চশ্রেণীর যাত্রীর সদর্প ব্যবহার আজও লুপ্ত হয় নি। টিকিট কাটতে পুলিসের হাতে গলাধাক্কা, রুলের গুঁতা, গেট-কিপারদের ধমক, বাবুদের রূঢ় ব্যবহার, স্বল্পপরিসর নোংরা জায়গা দখলের জন্য মারামারি-ঠেলাঠেলি, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের অভাব—এ ছিল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর নিত্য পাওনা।

তৃতীয় শ্রেণীর প্ল্যাটফরমে বা ষ্টীমারের ডেকের উপর হট্টগোল লেগেই থাকত। নিজেদের কাপড় বা সতরঞ্চিই হ'ত যাত্রীদের বসবার আসন। তামাক খাওয়া, ছেলে-পিলে সামলানো, দখলী জায়গা নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকত। কখনও বা পুলিস ও স্টেশনের কর্মচারীবাবুরা এসে চীৎকার করত—'ইধার সে হটো', 'উধার যাও'। আর অমনি সকলে পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি, বাক্স-বিছানা নিয়ে ছুটছে। সেকালে চা-পানের তেমন রেওয়াজ না থাকায় চিড়ে-মুড়ি বা ফলই ছিল যাত্রীসাধারণের খাদ্য।

একটা ব্যাপার কিন্তু সে বয়সেও লক্ষ্য করেছি। কি নিরীহ, সহিষ্ণু, প্রতিকারবিমুখ মানুষ এরা! দিনগত পাপক্ষয়ই যেন লক্ষ্য। মুখের প্রতিবাদটুকুও শুনতে পেতাম না। স্কুলে মাস্টারমশায়দের কাছে শুনতাম দেশ-বিদেশের কত শৌর্য-বীর্যের কাহিনী। রামায়ণ-মহাভারতের চন্দ্র ও সূর্য বংশের ক্ষত্রিয়দের বীরত্বগাথা। রাজপুত, শিখ আর মারাঠাদের যে চিত্র মনে ফুটে উঠেছিল তার সঙ্গে এই স্টেশনভর্তি লোকগুলির কোন মিল খুঁজে পেতাম না। এদের দেখে

মনে হ'ত বক্তিয়ার খিলাজির সপ্তদশ অশ্বারোহী' নিয়ে বঙ্গ-বিজয় বুঝি অলীক কাহিনী নয়।

মাঝে মাঝে দেখতাম স্টেশন হিন্দীভাষী কুলিতে ভর্তি হয়ে গেছে। পরনে ময়লা কাপড়। বহু নারী-পুরুষ চলেছে চা-বাগানে কুলিগিরি করতে। হাসিমুখে কলরব করতে করতেই যেত। জিজ্ঞেস করলে সগর্বে বলত—'কাছাড় যায়েঙ্গে।' দীনদরিদ্র মানুষগুলি উপার্জনের আশায়, অন্ন-বস্ত্রের ভরসায় পুরুষ-রমণীরা সানন্দে চলে এসেছে বাসভূমি পরিত্যাগ করে। সামান্যই সম্বল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ানো, আর শিশু-সন্তান কোলে-কাঁখে। চা-বাগানে যে ক্রীতদাসের জীবন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তার কিছুই তখন পর্যন্ত জানতে পারত না। উল্টোটাই বরং তাদের বোঝান হ'ত। আসামের চা-বাগানে কুলির উপর অত্যাচারের কাহিনী সেই বয়সেই খবরের কাগজে পড়েছিলাম। নামটা যদিও আজ আর মনে নেই, তথাপি একটা নাটকের কথা আজও মনে আছে। এইসব কুলিদের মধ্যে অনেকে যখন আবার কালাজ্বরে জীর্ণ হয়ে পেটে পিলে নিয়ে পঙ্গু হয়ে ফিরে যেত এই পথ দিয়ে, তখন তাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে ক্ষীণকণ্ঠে টেনে টেনে বলত—'বাবুজি, কাছাড়সে আয়া'।

অবশ্য ইচ্ছে করলেই যে সব কুলি চা-বাগান থেকে ফিরে আসতে পারত তা নয়। যে দলিলে দস্তখত করে ওরা কুলি হয়ে নিযুক্ত হ'ত তাই হ'ত চা-কর সাহেবদের যদৃচ্ছ ব্যবহারের রাজদণ্ড। ইচ্ছে করলেই কেউ চাকরি ছেড়ে আসতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে ওরা ক্রীতদাস হয়ে পড়ত। কেউ পালিয়ে গেলে প্ল্যান্টার (Planter) সাহেবরাই গ্রেপ্তার করে আনতে পারত। তৎকালীন সরকারী আইনই তাদের ঐ ক্ষমতা দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ করতে অস্বীকার করলে কারাদণ্ড বা বন্দী করবার অধিকারও তাদের ছিল। এই আইনসম্মত জবরদস্তির সঙ্গে বেত্রাঘাত প্রভৃতি বহু বে-আইনী অত্যাচার সাহেবরা নির্বিবাদে চালিয়ে যেত। কিন্তু স্বাস্থ্য যেদিন চিরতরে মানুষগুলিকে কাজ-কর্মে অক্ষম করে দিত তখন কিন্তু সাহেবরা ওদের একবস্ত্রে তাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হ'ত না।

ইংরেজ সরকারের উপর এসব সাহেব প্ল্যান্টারদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বলেই দূরদেশে লোকালয়ের বাইরে চা-বাগানের সীমানার মধ্যে এই নিরীহ মানুষগুলিকে সাহেবরা যদৃচ্ছ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হ'ত না।

একবার একটি কুলি-বালক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য

পালিয়ে আসে। একদিন তাকে চাঁদপুরের রাস্তায় দেখা যায় একরকম মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে থাকতে। আমার মাতুল অপর্ণানন্দ ঠাকুর তাকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেন। সে আর কোনদিন দেশে ফিরে যায় নি। আমার মামারা তাকে জায়গা-জমি দিয়ে এক বাঙালী মেয়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়ে দিয়েছিলেন। চিরকালই সে মামাদের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। মামাদের সুখ-দুঃখের সমভাগী হয়ে বাড়ীর একপ্রকার আপনজনের মত দীর্ঘজীবন কাটিয়ে দেয়। নিজের পিতামাতা, বাড়ীঘর এসবের স্মৃতি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

যা হোক্, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। এই সমস্ত কুলি ও যাত্রীসমাগম দেখতাম অবাক বিস্ময়ে। এদের সভয় চাউনি ও অসহায় ভাব দেখে মন ব্যথিত হ'ত। ইংরেজরা না হয় রাজার জাত। তাদের স্পর্ধার কারণ অনুমান করতে পারি। কিন্তু পুরো ছ'ফিট লম্বা, প্রশস্ত বদন, বিচিত্র বস্ত্রবহুল পোশাক সজ্জিত কাবুলিওয়ালা যখন প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে ভিড় ঠেলে চলে যেত তখন তাদের ভয়ে ভীত হয়ে জনতা রাস্তা ছেড়ে যেত! এই কাবুলিওয়ালা-ভীতি আমাদের দেশে অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। এদের অত্যাচারও মানুষরা নীরবে সহ্য করত। দেশের লোকের দুর্বলতা দেখে মনটা ব্যথিত হ'ত। পেলেও, প্রতিকার যে চাই তা বুঝতে অসুবিধে হ'ত না। কোন মানুষেরই উপর অপর কারুর অত্যাচার করবার অধিকার নেই। মানুষকে দুঃখ দেওয়া অন্যায়। সকল মানুষই সমান এবং সকলেই ভগবানের সন্তান—পিতৃদেবের এই শিক্ষা স্মরণ করতাম।

পিতৃদেব দরিদ্র নিঃসহায় মানুষকে ঘৃণা করতে নিষেধ করতেন। তিনি বর্ণনা করতেন তাঁর বাল্যজীবনের দুরবস্থার কথা। আমার ঠাকুর্দা যখন মারা যান তখন বাবার বয়স ষোল কি সতেরো। বাক্স খুলে পাওয়া গেল মাত্র ষোলটি মুদ্রা। থেকে গেল ঠাকুরমা, দুই কাকা, চারজন পিসী এবং আরও দু'একজন আশ্রিত আত্মীয়। সকলের ভার পড়ল পিতার উপর, কেননা তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। অদৃষ্টের পরিহাসে কয়েকদিনের মধ্যেই বসত-বাটীটি পর্যন্ত আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। বাবা শহরে গেলেন লেখাপড়া শিখতে। এক শিক্ষকের আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া করতে লাগলেন। তাঁকে রান্নাও করতে হ'ত। স্কুল থেকে ফিরে রোজ জল-খাওয়া হ'ত না। তখনও পয়সায় আট-নয়টা পেয়ারা পাওয়া যেত। তারই একটা করে দৈনিক খেতেন। ক্রমে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে জলপানি পান। সে টাকা পাঠাতেন বাড়ীতে। পড়া ছেড়ে শিক্ষকের কাজ হাতে নিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন।

এ অবস্থাতেই ওকালতি পাস করে আইন ব্যবসা সুরু করে সহস্র সহস্র অর্থ উপার্জনই করেন নি—কত আত্মীয়-অনাত্মীয়কে প্রতিপালন করে, আমাদের লক্ষ টাকার মালিক করে দেহত্যাগ করেন।

জীবনে তিনি দরিদ্রকে ঘৃণা করতেন না। শ্রমের মর্যাদা ছিল তাঁর নিত্য সাথী। গৃহস্থালীর কোন কাজই তাঁর অজানা ছিল না। নারায়ণগঞ্জের এতবড় উকিল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, স্কুলের সেক্রেটারী, শহরের অতি গণ্যমান্য লোক এবং লক্ষপতি হয়েও বাজার করে মাছের চুপড়ি এবং তরি-তরকারির বোঝা হাতে নিয়ে আসতে কুণ্ঠিত হতেন না। তাঁর দৃষ্টি সর্বদা সতর্ক থাকত যাতে আমরা নিজেদের ধনী বলে না ভাবি এবং দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোককে ছোট এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখি। এ কারণেই তাঁর সঞ্চয় সম্পর্কে কোন আভাসই আমাদের দিতেন না। শুধু যে বিলাসিতাই তিনি ঘৃণা করতেন তা নয়, আপামর সকলের সঙ্গেই ভদ্র ও বিনয় ব্যবহারই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য রাখতেন যাতে আমরা তার ব্যতিক্রম না হই।

যাক্, ষ্টীমার ঘাটের কথায় ফিরে যাই। কত বিচিত্র জলযানই যে দেখেছি তার অন্ত নেই। টিনের গুদামের মত বড় বড় পাট-বোঝাই নৌকো দশ-বারটা একসঙ্গে টেনে নিয়ে ফ্ল্যাট বয়ে নিয়ে যেত বড় বড় ষ্টীমার। আবার প্রত্যেক ফ্ল্যাটের সঙ্গে থাকত ছোট ছোট জালি বোট। নদী-তীরের সঙ্গে যোগাযোগ হ'ত এগুলির সাহায্যেই। এগুলিতে চেপে সান্ধ্য-ভ্রমণ ছিল আমাদের প্রিয়। নিজেরাই বেয়ে নিয়ে যেতাম শীতলক্ষ্যার বুকের উপর দিয়ে। নদীর দু'ধারে পাটের আপিস, গুদাম ও কারখানার চিমনী। প্রত্যেকটা আপিসের জন্য আলাদা আলাদা জেটি দিয়ে মাল ওঠা-নামা করছে। নদীর ধারে ধারে ফুলের বাগান সাহেবদের, তাদেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী আলোতে ঝল্‌মল্ করছে। মনে উদিত হ'ত এই একান্ত অনাত্মীয় বিদেশীরাই কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। এরা আমাদের নেটিভ বলে ঘৃণা করে, লাথির চোটে পেটের পিলে ফাটায় এবং বিচার হলে তারা মুক্তি পায় কিংবা বড়জোর পাঁচ-দশ টাকার জরিমানায় বিচার-প্রহসন শেষ হয়। এদেরই হাতে ভারতীয় বিশিষ্ট লোকেরাও ট্রেনে-ষ্টীমারে লাঞ্ছিত হয়। মনটা ব্যথায় টনটন করে উঠত।

সাহেবরা যে আমাদের দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করে নিয়ে যাচ্ছে এ জ্ঞানটা জন্মায় যখন আমার কাকা একটা স্বদেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। আমার পিসতুত ভাই শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে আমার

কাকা স্বদেশী আন্দোলনের কয়েক বৎসর পূর্বেই বোম্বাই মিলের কাপড় এনে দেশী কাপড়ের দোকান খোলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্যই যে দেশী কাপড় কেনা উচিত এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করেন।

বাল্যকাল থেকেই পিতাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হ'ত। এই সব খবরের কাগজ মারফত সাহেবদের পিলে ফাটানোর সংবাদ এবং বিচার-বৈষম্য মনের মধ্যে আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিতরূপে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে লাগল।

সেকালের নারায়ণগঞ্জ সমৃদ্ধশালী হলেও দালান-কোঠা খুব কম ছিল। অর্থাভাব এর কারণ নয়। কারণ বুঝতে গিয়ে দেখি যে, শহরের প্রায় সমস্ত জায়গাই কয়েকজন জমিদারের সম্পত্তি ছিল। তারা হয় নিজেরাই বাড়ীঘর করে ভাড়া খাটাত, নয়ত যারা জায়গা কিনে বাড়ী করে থাকত তারাও পাকাবাড়ী করবার চিন্তা করত না। তার কারণ ছিল এই যে, জায়গা-জমির উপর দখলিস্বত্ব তাদের জন্মাত না। জমিদার ইচ্ছে করলেই এদেরকে উৎখাত করতে পারত। অবশ্য আমি যখন ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য তখন একটা অস্থায়ী আইন পাশ করিয়ে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হয়। তার পর, তখনকার দিনের মানুষ এতটা শহরমুখী হয়ে ওঠেনি। কেবল একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল মাত্র। সুতরাং শহরে পাকাবাড়ী তৈরী করে স্থায়িভাবে বসবাস করবার বাসনা বর্তমানের ন্যায় এত প্রবল ছিল না।

তখন পর্যন্ত অধিকাংশেরই গ্রামে কিছু কিছু জমি-জমা এবং বাড়ী থাকত। গ্রামের বাড়ীই হ'ত আসল "সাকিন", আর শহরের বাড়ী হ'ত "হাল সাকিন"। শহর বাস্তবিকপক্ষে ছিল প্রবাস বা বিদেশ। গ্রামেই থাকত আমাদের সমাজ। সুতরাং আমার উপনয়ন, বোনের বিয়ে সবই গ্রামে হয়েছিল। গত পঁয়তাল্লিশ বছরের উপর গ্রামে যাই নি। পাকিস্তান হওয়ার ফলে দেশ তো আজ বিদেশ। তবুও কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—বাড়ী কোথায়, তবে এখনও না বলে পারি না—ঢাকা জেলার চুড়াইল গ্রামে।

তবুও যে মানুষ শহরের দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করেছিল তার প্রধান তাগিদ অর্থনৈতিক। কৃষির উপর নির্ভর করে আর সংসার চলে না। চাকরি করতে হলে ইংরেজী লেখাপড়াও যেমন প্রয়োজন তেমন শহর ভিন্ন চাকরি মিলবেই বা

আর কোথায়? কাজেই কিছুকালের মধ্যেই শহর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। গ্রামগুলি হতে লাগল অস্বাস্থ্যকর, সুচিকিৎসার অভাব সেখানে। বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না, গুণ্ডা-বদমায়েস অত্যন্ত প্রবল। সর্বোপরি শহুরে হাওয়ায় জীবন-যাপনের মানের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় গ্রামে মন আর টিকতে চাইল না। অবশ্য পূর্ববঙ্গে পদ্মা-মেঘনার ভাঙনে অনেক মানুষকে শহরমুখী করতে বাধ্য করেছে।

পাকাবাড়ীর অভাবে নারায়ণগঞ্জে প্রতি বৎসরই ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হতো। অগ্নিকাণ্ডের সেই ভয়াবহ দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি। শীতের গভীর রাতেই বেশির ভাগ আগুন লাগত। খুব বেশী দূর না হলে আমরাও ছুটে যেতাম সাহায্যের জন্য। অগ্নিকাণ্ডে সর্বহারা মানুষগুলির হায় হায়, গেল গেল, বিলাপ ; নিজের যা-কিছু রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা ; আর অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘনবসতিপূর্ণ একটা গোটা পল্লী ভস্মীভূত হওয়ার দৃশ্য আজও মনকে কেমন যেন বিষাদগ্রস্ত করে দেয়।

পাটের গুদামগুলিতেও প্রায় প্রতি বছর ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হতো। এর মধ্যে আবার ইচ্ছাকৃত ব্যাপারও ছিল। গুদামগুলি প্রায়ই ইন্‌সিওর করা থাকত। কোম্পানীকে ঠকাবার জন্য অল্প মালসহ গুদাম পুড়িয়ে দিয়ে বহু টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হতো। এমনি একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না।

সেভেজ (Mr. Savage) নামে এক সাহেব পাটের গুদাম খুলে বসে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার ঐশ্বর্যের ঝলমলানিতে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগল। সব সাহেবরাই বাবুগিরি করত, কিন্তু তারা সেভেজ সাহেবের কাছে একেবারে নগণ্য। হঠাৎ একদিন রাত্রিতে তারই গুদামে ভীষণভাবে আগুন লেগে গেল। সবটা পুড়তে বেশ কয়েক দিন লাগল। চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। যথারীতি ইন্‌সিওর কোম্পানীর লোক অনুসন্ধান করতে এল। কয়েকদিন পরেই আশ্চর্য হয়ে শুনতে পেলাম যে, পাটের আপিসের বড়বাবু এবং আর একজন কর্মচারীসহ সেভেজ সাহেব স্বয়ং পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।

সেভেজ সাহেবের পিতা ছিলেন তখন ঢাকা বিভাগের কমিশনার। এতবড় জাঁদরেল ইংরেজ রাজকর্মচারীর ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে হুলস্থূল পড়ে গেল। সাহেব গ্রেপ্তার হয়, বিশেষ করে কমিশনারের পুত্র!

একটা প্রায় অভূতপূর্ব ব্যাপার! সাহেব গরীব কিংবা চুরি করতে পারে এ কথা তখনকার দিনে একরকম অবিশ্বাস্য ছিল। ইংরেজ বলে নয়, যে কোন শ্বেতাঙ্গই আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ! অবশ্য সেভেজ সাহেবের পিতার প্রতিপত্তিতে ইন্‌সিওর কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা হয় এবং সেভেজ সাহেবও ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে বোধহয় অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। যাই হোক, চুরির অপরাধে সেভেজ সাহেবের গ্রেপ্তার ইউরোপীয়দের মর্যাদা অনেকটা নীচে টেনে আনল।

সাহেবদের সম্বন্ধে কেন যে এমনি উচ্চ ধারণা হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে, প্রধানত দু'রকমের সাহেব সেকালে আসত। রাজ-কর্মচারীর মধ্যে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিস সাহেব। কলকাতায় অবশ্য পুলিস সার্জেণ্টও দেখেছি। এ সব ছোট পুলিস সাহেবদেরও কম প্রতাপ ছিল না। আর এক জাত-ব্যবসায়ী—পাটের কিংবা চা-প্ল্যাণ্টার। ব্যবসায়ী সাহেবরা প্রচণ্ড বড়লোক। এদের তো কথাই নেই—রাজকর্মচারীদেরও জীবন-যাত্রার মান ছিল চোখ-ঝলসানো।

পাটের আপিসে নবাগত অনভিজ্ঞ ছোকরা সাহেবও বাঙালী বড়বাবুর উপরওয়ালা হতো। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বড়বাবুকেও ছোকরা সাহেবকে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে বাধ্য করা হতো। সাহেবরাও কর্মচারীদের নিছক নাম ধরে ডাকত, তাও আবার তুমি বলে! বড়বাবুরা নিম্নপদস্থ কর্মচারীর উপর যতই লম্ফঝম্প করুক না কেন, সাহেব উপরওয়ালার সামনে কাঁপতে থাকত। এদের এককথায় চাকরি যেত। তার আর কোন আপীল চলত না।

তাছাড়া সাহেবরা রেলে, স্টীমারে প্রধানতঃ প্রথম শ্রেণীতেই যাতায়াত করত। বড় জোর দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সুতরাং সাহেবেরা গরীব হতে পারে একথা বড় কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না। অবশ্য বৃদ্ধদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমাগত দু'একজন সাহেবের দুরবস্থা দেখেছিলেন, কিন্তু তাদের কথা বড় কেউ বিশ্বাস করত না। ডেভিড কোম্পানী ছিল সেকালে নারায়ণগঞ্জের শ্রেষ্ঠ পাট-কোম্পানী। তার প্রতিষ্ঠাতা এম. ডেভিড সাহেব এত দরিদ্র ছিলেন যে, তিনি এক অতি সাধারণ দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর সানকিতে করে ভাত খেতেন। এক বৃদ্ধ মুসলমানকে আমার বাবার সামনে এ গল্প করতে আমি শুনেছি। কিন্তু পরে ডেভিড কোম্পানীর যে ঐশ্বর্য মানুষের চোখে পড়েছে তাতে এ গল্প কেউ বড় একটা বিশ্বাস করতে চাইত না। সাহেবদের মর্যাদা ছিল এতই অসাধারণ! রাজার জাত কি না!

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড ভিন্ন চলতে পারে না, একথাটা আমাদের দেশের বাদশা-আমীররা বুঝতে পারেন নি। তা নইলে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা বাদশাহের দরবারে কুর্ণিশ করে প্রবেশ করতে পায়, আর আমীর-ওমরাহদের খোসামোদ করে কুঠি করে ব্যবসা শুরু করতে বাধ্য হয়, তাদেরকে কিছুতেই আভ্যন্তরীণ আত্মকলহে অংশগ্রহণ করতে দিতে পারতেন না। ইংরেজরা কিন্তু কথাটা ভাল করেই জানত। সুতরাং তারা নির্ভুলভাবে গুটি চালিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা অপসারণ করে নিজেরা নিষ্কণ্টক হলেন।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দিন দিন শশীকলার মত বাড়তে লাগল। যে সব ইংরেজ এদেশে এসে লুঠের অংশে ভাগ নিতে পারল না তারা কিন্তু ব্যাপারটা সহজে ছেড়ে দিতে চাইল না। সুতরাং আলোচনা ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট নামে যে আইন পাস হলো তার বলে রাজার মন্ত্রিসভা কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাগজপত্র পরীক্ষা করবার ক্ষমতা লাভ করল। তারা কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানবার সুযোগ পেল। আরও ঠিক হলো যে, গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে চারজন পরামর্শদাতা ও কর্মকর্তা থাকবে। এরা কাউন্সিলার নামে অভিহিত হতো। গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে এই পরামর্শদাতাগণের কলহের অন্ত ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস ও ফ্রান্সিস প্রভৃতির সঙ্গে কলহ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পার্লামেন্টেরই নির্দেশে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হলো।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী পিট সাহেব আর একটি আইন পাস করিয়ে কোম্পানীর কাজ পরিচালনার জন্য বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত করলেন। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ছ'জন কমিশনারের দ্বারা গঠিত হলো এই নূতন বোর্ড। সরকার-নিযুক্ত এই নূতন বোর্ড এবং কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এই দুই বোর্ডই ভারত শাসন করতে থাকে এবং এ দ্বৈত শাসন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকারী কোম্পানীর রাজত্ব তুলে দিয়ে নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণ করলেন। 'ভারত সুশাসন আইন' (Act for the better Government of India) পাস হলো। পূর্বোক্ত দ্বৈত শাসন তুলে দিয়ে একজন ভারত সচিব (Secretary of State for India)

নিযুক্ত হলেন ১৫ জন পরামর্শদাতা (Councillor) সহ। আর ভারতবর্ষে এলেন গভর্ণর জেনারেল রাজ-প্রতিনিধি হয়ে।

ভারতের জনসাধারণ কিন্তু জানতে পারল মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হয়েছেন এবং নিজহস্তে ভারত শাসন গ্রহণ করেছেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় শপথ করলেন—ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সমান সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে, কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

শুধু যে সাধারণ লোকই এই ঘোষণায় আস্থা স্থাপন করে আশান্বিত হয়ে উঠল তাই নয়, রাজনীতিকরা পর্যন্ত তারপর পঞ্চাশ বছর এই ঘোষণার দোহাই দিয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন এবং আবেদন-নিবেদন চালিয়ে গেলেন। এই ঘোষণার অসারতা বুঝতে পঞ্চাশ বছর লেগে গেল! প্রকৃত অবস্থা সাধারণ লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সময়। একেই বলা যায় সত্যিকারের নিদ্রাভঙ্গ। অবশ্য একদল লোকের আবেদন-নিবেদনে অচলা ভক্তি-বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। যাই হোক, এই ক্রম-বিবর্তনের কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিজহস্তে শাসনভার গ্রহণ করার পূর্বের ভারতবর্ষের চিত্র অতি অন্ধকারময়। শুধু ঘোরতর অরাজকতা বিরাজ করছিল বললে কিছুই বলা হয় না। অত্যাচার, অবিচার, লুঠতরাজ, বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা—লোকের ধন-প্রাণ এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর্যস্ত। সর্বোপরি দেশীয় রাজাদের মধ্যে অন্তহীন কলহ, ইংরেজ-ফরাসীর ভারতবর্ষের জমিদারী দখলের দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ—সব মিলে জনসাধারণ এমনি আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল যে, সামান্য-মাত্র শান্তির ইঙ্গিতে তারা অনেকটা আশ্বস্ত বোধ করল। তদুপরি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারও তখন পর্যন্ত লোকের স্মৃতিপট মসীলিপ্ত করা। তারা দেশীয় সব ব্যবসা শুধু নিজেদের করতলগত করল না, বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করল। চাষীর স্বাধীনতা রইল না জমি চাষের। কোন্ জমিতে কি চাষ করবে, নীলচাষের জমির পরিমাণ কত হবে তা সবই তাদের নির্দেশে হবে। এমনি পরিবেশের মধ্যে মহারাণীর ঘোষণায় লোক মনে করল সত্যই বুঝি মহারাণী প্রজাসাধারণের মঙ্গল চিন্তায় চিন্তান্বিত।

কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজের প্রচারে সবাই বুঝল মুসলমান রাজা-বাদশারা ছিল ঘোর অত্যাচারী। একমাত্র নবাব সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারের কত গল্প

প্রচলিত ছিল! গল্প শুনতাম যে, নবাব-বাদশাহদের পৈশাচিক সখ প্রবৃত্ত করার জন্য গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট চিড়ে সন্তানের অবস্থান দেখানো হতো যাত্রীসহ নৌকো মাঝ-নদীতে ডুবিয়ে দিয়ে লোকগুলির অসহায় দুরবস্থা নাকি তাদের কাছে আনন্দদায়ক হতো! এজন্য তাঁরা লোকের ঘরবাড়ীতে আগুন দিতেও নাকি দ্বিধা বোধ করতেন না। সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রাখা নাকি একেবারে সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তার ফলেই নাকি পর্দা বা ঘোমটার প্রবর্তন হয়। এমনিতর অকথ্য অত্যাচার নাকি বেশির ভাগ হিন্দুদের উপরই হতো। শুনেছি যে, সর্বজনমান্য নিষ্ঠাবান হিন্দু জমিদারদের ধরে "বৈকুণ্ঠ বাস" অর্থাৎ বিষ্ঠাপূর্ণ গর্তে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রাখা হতো।

মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী যে আদপে মিথ্যা ছিল তা নয়। তবে ইংরেজরা নিজেদেরকে উত্তম প্রতিপন্ন করতে আমীর-নবাবদের অত্যাচারের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রং লাগিয়ে প্রচার করার জন্য অনেক কাল্পনিক গল্প জুড়ে দিত। ইংরেজ আমলে অনেক নারকীয় অত্যাচার নতুন পথে প্রবাহিত হলো। নিজের দেশের শিল্প-বিপ্লব (Industrial Revolution) সফল করবার জন্য শাসনের লৌহচক্রের নীচে এত বড় একটা জাতির সমস্ত রক্ত শোষণ করবার পাকাপাকি ব্যবস্থা হলো।

ইংরেজরা 'মগের মুল্লুকের' অবসান করলো, রদ করলো মগ দস্যু এবং "কাজির বিচার"। সুতরাং জনসাধারণ অনায়াসে ইংরেজের বিচারে আস্থাবান হলো। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বিচার করত মুসলমান কাজিরা। কাজি কথার অর্থই হচ্ছে বিচারক। লোক আশা করতো যে, তাঁরা বিচারের জন্য নির্ভর করবেন ন্যায় ও ধর্মের উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বিচার একটা খামখেয়ালীর প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। একে তো কোন লিপিবদ্ধ আইন ছিল না, তদুপরি গোঁড়া ধর্ম-প্রণেতা মুসলমানই হতো বিচারক। তারা নাকি ঘোরতর হিন্দু-বিদ্বেষী হতো এবং ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারত না। এখনও লোকে খামখেয়ালী বিচারকে "কাজির বিচার" বলে ব্যঙ্গ করে।

তখনকার দিনে আদালতের ভাষা ছিল ফার্সী। হিন্দু ভদ্রলোকেরাও তখন এ ভাষা লিখতে শিক্ষা করতো। ইংরেজ আমল আরম্ভ হওয়ার পরও অনেক দিন পর্যন্ত এই ফার্সী ভাষা আদালতে ব্যবহার হতো। যতদূর মনে পড়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সীর বদলে ইংরেজী ও বাংলা আদালতের ভাষারূপে স্বীকৃত হয়। এখন

পর্যন্তও অনেক ফার্সী শব্দ আদালতে ব্যবহৃত হয় এবং কোর্টের নোটিশ ও দলিল-পত্রাদি ফার্সী শব্দে পূর্ণ থাকে এবং ফার্সী রীতি অনুসারেই লিখিত হয়।

সে যাই হোক, 'কাজির বিচার' থেকে রেহাই পেল এই ধারণা মানুষের মনে স্থান পেল। আইনের চোখে সকলেই নাকি সমান—জমিদার-প্রজা, ধনী-দরিদ্র কোন ভেদ নেই, এই বিশ্বাসই মানুষের মনে ঠাঁই পেল প্রচারের দ্বারা। এই প্রত্যয় ক্রমে এমন দৃঢ় হলো যে, ইংরেজ শাসনের শেষদিন পর্যন্তও অনেকের মন থেকে ইংরেজের সুবিচার এবং ন্যায়-নিষ্ঠার উপর অগাধ আস্থা ছিল। ভাবতে কৌতুক বোধ হয় যে, আদালত ব্যয়-বহুল স্থান এবং দরিদ্র এ ভার বহনে অক্ষম এ জেনেও লোক ইংরেজের আইন-আদালতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বোধ হয় 'কাজির বিচারের' প্রহসন থেকে রক্ষা পেয়েই তাদের এমনি ধারণা জন্মেছিল।

তবে শ্বেতাঙ্গের হাতে ভারতীয়দের লাঞ্ছনার কথা এবং অত্যাচারীর বেকসুর খালাসের কথা যে মাঝে মাঝে প্রচারিত হতো না তা নয়। কিন্তু লেখাপড়া জানত না বলে জনসাধারণ এ সব কথা বেশী হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না। তারা দেখতে পেল এবং জানত যে, ইংরেজ 'মগের মুল্লুকের' অবসান করেছে, স্থাপিত হয়েছে শান্তি, সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রাখতে আজ আর কোন বাধা নেই এবং রাস্তায় চলাফেরার বিপদও কেটে গেছে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বিদূরিত—অস্পৃশ্যও লেখাপড়া শিখলে উচ্চ পদ পেতে তার কোনই বাধা নেই। হাইকোর্টের ন্যায়-বিচারে চিরকালই মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল।

দুর্ভিক্ষ বলতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যা বোঝায় তা পূর্ববঙ্গে বোধহয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর আর হয় নি। সারা বাংলা দেশ সম্বন্ধেই বোধ হয় একথা খাটে। অন্য প্রদেশে যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন তখনও বাংলা দেশে কেউ না খেয়ে মরে নি। পাট চাষ প্রচলনের ফলেই লোকের হাতে কাঁচা টাকা আসায় সচ্ছলতার মুখ দেখতে পেল। কিন্তু আসল সমস্যা সম্পর্কে তারা রইল একেবারেই অজ্ঞ। দেশের শাসন-শোষণ জমিদারী প্রথার সঙ্গে বিশ্ব-বাণিজ্যের দরবারে সবটুকু ঝোল ইংরেজের কোলে টানবার প্রয়াসের ফলে জনসাধারণের অবস্থা যে নিম্নগামী হলো একথা তারা বুঝতে পারল না। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বা অজন্মা হলে তারা অদৃষ্টের দোহাই দিত। মনে করত পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফল। দেশের সরকারেরও যে এ ব্যাপারে কোন কর্তব্য থাকতে পারে এ ধারণা কৃষক বা জনগণের মনে একেবারেই ঠাঁই পায় নি

মধ্যবিত্ত শ্রেণী এদেশে সৃষ্টি করে ইংরেজরাই। ইংরেজী লেখাপড়া শিখে রাজ-সরকারে চাকরি করে, কিংবা কোম্পানীগুলিতে কেরাণীর কলম চালিয়ে অথবা জমিদারী প্রথায় মধ্যস্বত্ব ভোগ করে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী জন্মলাভ করে। বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্বের স্থাপনের সময় থেকে ও পরে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব প্রসারে সহায়তা করে সরকারের আস্থাভাজন হয়। এরাও ইংরেজের Pax Britanica বা শান্তিরাজ্যে বর্ধিত হচ্ছিল। লেখাপড়া শিখলে বেকার বড় কেউ থাকত না। তবে তাতেই যে সকলের দারিদ্র্যদশা ঘুচত তা নয়। কিন্তু অদৃষ্টই হতো এমনি হীন অবস্থার জন্য দায়ী। সরকারের কোন দোষই এরা দেখতে পেত না।

সাধারণভাবে লোক জানতে পারল যে, তারা মহারাণীর রাজত্বে বেশ সুখেই আছে। সুতরাং দীর্ঘকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার পর ভিক্টোরিয়া যখন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করলেন তখন ভারতবাসী সত্যই আন্তরিক দুঃখিত হলো। সভা, শোকযাত্রা করে সকলেই দুঃখ প্রকাশে অংশগ্রহণ করল। সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, ব্রিটিশ শান্তি-রাজ্যে প্রতীক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে ভারতবাসী নিজেদেরকে মাতৃহারা মনে করল। কেননা তখন পর্যন্ত পরাধীনতার বেদনা ও অবমাননা লোকের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে শুরু করে নি।

সুতরাং সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণে ভারতবাসী উল্লসিত হলো। আমার মনে আছে যে আমরা—আমি অবশ্য তখন শিশু মাত্র, শহরের একটা বড় শোভাযাত্রার সঙ্গে যোগ দিয়ে 'এডওয়ার্ডের জয়' গান গেয়ে শহর পরিভ্রমণ করলাম। চাঁদা তুলে বাজি পোড়ান হলো, খেলা-ধূলা উৎসব আরও কত কি! রাজা বিদেশী, আমাদের কেউ নয়, তথাপি সে যে আমাদের পরাধীনতার প্রতীক একথা সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। হয়ত দু-একজন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু জনসাধারণের মনে তার ছোঁয়াচ লাগে নি। সেদিন তাই দেশের অবস্থা বা আবহাওয়া দেখে কেউ ভাবতেও পারে নি যে, চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই এ দেশে বিপ্লব আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে কিংবা বিপ্লবী দল গড়ে উঠবে। অথচ এমনি আন্দোলন বা দল গঠন কখনই আকস্মিক ঘটনা নয় বা হতে পারে না। দেশের আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রমবিবর্তনের মধ্যেই এর বীজ লুকিয়ে থাকে। যথাস্থানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

মহারাণীর মৃত্যুর মাত্র দুবছর আগে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের ভাইসরয় হয়ে আসেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারত শাসন

করেন। এই সময়টা ভারত ইতিহাসে নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে কার্জনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কেউ কেউ তাঁকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। ডালহৌসীর কঠোর শাসনে সারা উত্তর ভারতে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যা: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। আর কার্জনের জবরদস্ত শাসনে ভারতবাসীর নিদ্রাভঙ্গ হয়।

বহুকাল পরাধীন থেকেও কোন কোন জাতির চিত্তে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় না, যতক্ষণ না কেউ তীব্র কশাঘাতে পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়ে দেয়। শাসক তার নির্যাতনে জাতির মনকে শুষ্ক বারুদে পরিণত না করলে দেশ-প্রেমিক নেতার শত জ্বালাময়ী বক্তৃতাও নিষ্ফল হয়ে যায়। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালের বজ্রনির্ঘোষ দেশের লোকের মর্ম স্পর্শ করতে পারত কিনা সন্দেহ, যদি না বড়লাট কার্জন এবং পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেবের দাম্ভিকতা লোককে অপমান ক্ষুব্ধ না করে তুলত।

অবশ্য জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে নানা ঘটনা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে। যে অসন্তোষ বহুকাল ধরে মানুষের মনে জমতে থাকে তাই একদিন অনুকূল পরিবেশে দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে। কিন্তু জাতির জাগরণে যদি কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাত থেকে থাকে তবে তা দেশ-প্রেমিক নেতা ও অত্যাচারী শাসক উভয়েরই প্রাপ্য।

মহারাণী যুগের অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে বাস করে মানুষগুলি যেন নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল। আকাল মহামারীতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু সরকারের প্রতি (মহারাণী) তাদের বিশ্বাস টলে নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ প্রচেষ্টা, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক সবিনয় আবেদন-নিবেদনের আন্দোলন যা করতে সমর্থ হয় নি তা লর্ড কার্জনের ও ফুলার সাহেবের জবরদস্তি অতি অল্পদিনেই সাফল্য দান করল। বিদেশীর আসল রূপ মানুষের কাছে প্রকট হয়ে উঠল। সুতরাং মনে হয় শুভক্ষণে লর্ড কার্জন ভারত-শাসনের অধিকর্তা হয়ে এলেন।

লর্ড কার্জন বিদ্যায় ছিলেন অগাধ পণ্ডিত এবং তাঁর কর্মশক্তির ফোয়ারা ছিল অফুরন্ত। ইংলণ্ডে ছিলেন তিনি প্রথম শ্রেণীর খানদানী এবং নামজাদা রাজনীতিজ্ঞ। এমনি জাঁদরেল সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসীর পর

বোধ হয় আর কেউ আসেন নি! এমন যথেচ্ছাচারী প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু শাসক জারের সিংহাসনে শোভা পেত। বেতনভোগী হওয়া তাঁর পক্ষে অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র। সৈন্য-বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে লর্ড কিচ্‌নারের মত-বিরোধ হয় তখন অনেকেই কানাকানি করেছিল যে, হয়ত কার্জন নিজেকে ভারত-সম্রাট বলেই ঘোষণা করবেন। তার পর যখন বিলেত সরকার লর্ড কিচ্‌নারকেই সমর্থন করল তখন লোকের মনে এই ধারণাই হলো যে, কার্জনের হাতে সৈন্যভার দেওয়া বিপজ্জনক বলেই তাঁকে সমর্থন করে নি।

ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করার কাজে মন দিলেন। এ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নর্থ-ওয়েস্টার্ণ প্রভিন্স নামে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করলেন এবং ব্রিটিশ সৈন্য সীমান্তের শেষ প্রান্ত থেকে সরিয়ে এনে সুরক্ষিত জায়গায় সন্নিবেশিত করলেন। তদুপরি দুর্ধর্ষ উপজাতীয়গুলির মধ্য থেকে লোক নিয়েই এক নতুন রক্ষীদল নিয়োগ করে সীমান্তবাসীর একাংশের আনুগত্যের বীজ বপন করলেন। আফগানিস্তানের আমীর হবিবুল্লার সঙ্গে বন্ধুত্ব দৃঢ় করবার জন্য তাঁকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকার করলেন এবং বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেন।

কার্জনের রুশ-আতঙ্ক ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাই আফগানিস্তানের সঙ্গে সঙ্গে পারস্যের ব্যাপারেও হাত বাড়ালেন। তখন পারস্যের উপর অনেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোলুপদৃষ্টি। রুশরা যদি পারস্য উপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তবে ভারতবর্ষ বিপন্ন হবে। সুতরাং কার্জনের চেষ্টায় পারস্যদেশ, বিশেষ করে তার দক্ষিণাংশ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হলেন।

কেবল কি পারস্য বা আফগানিস্তান, সুদূর তিব্বতের উপরও কার্জন সাহেব দেখতে পেলেন রুশের উদ্যত মুষ্টি। তা ছাড়া তিব্বতে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সেখানকার বাণিজ্য-সম্পদ করতলগত করা যায় না। সুতরাং তিনি তিব্বত অভিযানে মন দিলেন।

এ ব্যাপারে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কেন না বাংলা দেশের উত্তরাঞ্চল দিয়েই অভিযান পরিচালিত হয়। সংবাদপত্র মারফত এ কাহিনী পাঠ করতাম। এ প্রসঙ্গে এক বাঙালী রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের নাম খুব শুনতে পেতাম। তিনি তিব্বত অভিযানের অনেক আগেই পায়ে হেঁটে তিব্বত গিয়েছিলেন। সভ্যজগতের অজ্ঞাত দেশ তিব্বত। দুর্গম-বিপদসঙ্কুল তার পার্বত্যপথ। এহেন দেশে গিয়ে

তিনি বাঙালীর বিশেষ গৌরবের পাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। এই শরৎচন্দ্রই নাকি পরে তিব্বত অভিযানের পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন এবং তিব্বত সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইংরেজকে সরবরাহ করেছিলেন।

অনেকে এ বিষয় নিয়ে গৌরব বোধ করত। কিন্তু রাত্রিতে যখন পিতৃদেবকে খবরের কাগজ পড়ে শুনাতাম তখন তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে যে আলোচনা করতেন তাতে মনে প্রত্যয় জন্মাল যে, শরৎচন্দ্র কাজটা ভাল করেন নি। তিনি নিজে পরাধীন দেশের লোক। আর তিনিই কিনা অপর দেশকে শৃঙ্খল পরাবার কাজেই সহায়তা করতে গেলেন! হাজার বছর আগে এই বাংলা দেশের বিক্রমপুরের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত গিয়েছিলেন সভ্যতার আলোক-বর্তিকা বহন করে। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় গিয়েছিলেন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পবিত্র সঙ্কল্প নিয়ে। আর শরৎচন্দ্র দাস গেলেন কি না পরাধীনতার শৃঙ্খল হাতে করে! কারুর মতে অবশ্য শরৎচন্দ্রের প্রথমবার তিব্বত যাওয়াও ব্রিটিশের গুপ্তচরবৃত্তির জন্যই।

তিব্বতীরা কিন্তু কোনদিনই বিদেশীকে বরদাস্ত করতে অভ্যস্ত নয়। ইংরেজের বাণিজ্য-আকাঙ্ক্ষা তারা পছন্দ করল না। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, প্রবাদ বাক্যের গাধার মতই একদিন এই ইংরেজ তাদের স্বাধীনসত্তা বিলোপ করে দিয়ে রক্ত শোষণের 'পবিত্র দায়িত্ব' গ্রহণ করবে। ইংরেজরা যতবারই বাণিজ্য-মিশন পাঠিয়েছে ততবারই তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এমন কি তিব্বতীরা এ বিষয়ে চীনাদের আদেশও অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করে নি। যদিও তখন তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার বর্তমান ছিল।

লর্ড কার্জনের আমলেই তিব্বতে নতুন আর এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। তিব্বত তখন পর্যন্ত চীনের অধীন একটা প্রদেশ হলেও তিব্বতীরা ছিল ভিন্ন জাতের লোক। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের মনে জেগে উঠল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তারা চীনের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে রুশের সাহায্য চাইল। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যদিও রাজশক্তির অধিকারী ছিলেন দালাই লামা, কিন্তু রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। কাজেই তিব্বতবাসীরা যখন চীনের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে রাশিয়ার সাহায্য-প্রার্থী হলো তখন দালাই লামা সচেষ্ট হলেন অভিজাতদের ক্ষমতা নষ্ট করতে।

এমনি পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কার্জন একটা নগণ্য ছুঁতায় অভিযোগ খাড়া

করে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক মিশন পাঠান। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল অভিযাত্রী। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল। সুতরাং তারা তিব্বত সরকারের বিনা অনুমতিতেই রাজ্যে প্রবেশ করল। তিব্বতীরা তাদের দেশ ত্যাগ করতে অনুরোধ করল এবং একথাও জানিয়ে দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সীমান্ত ত্যাগ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোন কথা বা সাক্ষাৎ হবে না। তারা শুধু অনুরোধ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, সৈন্য-সমাবেশও শুরু করল। ইংরেজ গিয়েছিল ভিন্ন মতলবে। সুতরাং সামান্য যুদ্ধও হলো। কিন্তু তিব্বতীরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো।

ইংরেজরা ছিল তখনকার দিনে লভ্য সমস্ত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত। আর তিব্বতীরা! তিব্বতীরা নাকি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় তীর-ধনুক দিয়েও লড়াই করেছিল। এজন্য এ দেশের বা অপর দেশেরও অনেকে তাদের ব্যঙ্গ করেছিল। আমার পিতৃদেবের বৈঠকখানায়ও শুনেছি প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করার পাগলামীর কথা। কিন্তু পিতৃদেবের একটা কথা আমার মনে চিরতরে গ্রথিত হয়ে রইল। তিনি বলতেন, "তবুও তিব্বতীরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তীর-ধনুকই হোক বা তাদের যা কিছু আছে সব দিয়েই হোক বিদেশীকে বাধা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের মত সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের গল্প সৃষ্টির সুযোগ দেয় নি।"

আক্রমণকারীকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়াই যে পবিত্র দায়িত্ব একথা অধিকাংশ লোক ভুলে যায়। সুতরাং আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডের মোল্লা যখন ব্রিটিশ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হলেন তখন ইংরেজরাই যে তাঁকে "পাগলা মোল্লা" বলত তা নয়, অনেক ভারতবাসীও তাঁকে এ নামে বিদ্রূপ করতে কসুর করে নি।

যাই হোক, অভিযানকারী দল তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করলে দালাই লামা পলায়ন করলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হলো। বাণিজ্যের সুবিধে তো বটেই, তাছাড়া তিব্বতীদের ঘাড়ে ৭৫ লক্ষ টাকার খেসারত চাপানো হলো। উপরন্তু পররাষ্ট্রনীতি নিজেদের করতলগত করে চাম্বি উপত্যকা ব্রিটিশ অধিকারে এসে গেল।

কিন্তু রুশদের চাপে পড়ে সন্ধির ঐসব সর্তগুলি আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কার্যতঃ লর্ড কার্জনের অভিযান ব্যর্থ হলো। ইউরোপের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অবশ্য এজন্য অনেকাংশে দায়ী। জার্মানরা তখন ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী

হয়ে দাঁড়ায়। জার্মানীর ভয়ে রুশের সঙ্গে মিত্রতা তখন ইংরেজের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং রুশের অসম্মতি, তিব্বত সন্ধির ব্যাপারে, ইংরেজরা অস্বীকার করতে পারল না। ইংরেজরা তিব্বতে অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হলো না সত্য, কিন্তু তিব্বতীদের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষভাবে ব্যাহত হলো। চীনারা তিব্বতের উপর অধিকার অধিকতর সুদৃঢ় করার সুযোগ পেল।

লর্ড কার্জনের ক্ষুধা ছিল সর্বগ্রাসী। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির উপরও হস্তক্ষেপ সুরু করে দিলেন। নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করায় সমস্ত দেশীয় রাজারাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। এখানেই এসে তিনি ক্ষান্ত হলেন না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যদল গঠন করে ও তার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করলেন। এইসব সৈন্যদলের নাম দেওয়া হলো ইম্পিরিয়েল সার্ভিস ট্রুপস্। প্রয়োজন বোধে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে এদের নেওয়া চলবে এবং এরা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ কর্তৃত্বাধীনে থাকবে।

এমনিতেই ভারত সাম্রাজ্যের আয়ের প্রায় অর্ধেক ব্যয় হতো সৈন্যদল প্রতিপালনে—অবশ্য বেশী অংশ পড়ত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের ভাগে। তাই কার্জন ভাবলেন যে, সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রাখতে এবং বাড়াবার জন্য যদি অন্যের খরচায় আরও কিছু সৈন্য রাখা যায় তবে ক্ষতি কি! তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এ সৈন্যদল নিয়ে দেশীয় রাজারা কোনমতেই বিদ্রোহ করবার সুযোগ পাবে না। সে অবস্থাই এদের নেই। প্রতি দেশীয় রাজ্যে যে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট থাকত প্রকৃত ক্ষমতা ছিল তারই হাতে। কোন রাজা অবাধ্য হলে তাকে গদিচ্যুত হতে হতো। রাজ্যের সমস্ত আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হতো ব্রিটিশ সরকারের সুপারিশে নিযুক্ত রাজস্ব সচিব দ্বারা। কাজেই কোনমতে ব্রিটিশ স্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ দেশীয় রাজ্য থেকে হওয়া অসম্ভব ছিল।

নিজেদের স্বার্থরক্ষাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃত্বের আসল রূপ। সুতরাং রাজারা প্রজার মঙ্গল করত কিনা তাতে তাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। লোকে আইন মেনে চলছে জানলেই তারা খুশি।

শুধুমাত্র বর্তমান নিয়েই ইংরেজরা খুশি হয় নি। রাজার ছেলেরা অল্প বয়স থেকেই ইংরেজ-শিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত—তা দেশেই হোক বা বিদেশেই থাকুক। এমনি অবস্থায় তারা পাশ্চাত্য আদব-কায়দায় কেতাদুরস্ত হয়ে উঠত। সাজে-পোশাকে, কথাবার্তায়, মেলামেশায় তারা ব্রিটিশের অধীন

হতো। কেবলমাত্র মদ, ব্যভিচার, পরদার আর বিলাসিতায় ছিল রাজা এবং রাজপুত্রদের অবাধ অধিকার। সুতরাং একমাত্র নারী ও সুরা ছাড়া রাজা ও তাদের পুত্ররা ইংরেজের নজরবন্দী হয়ে থাকত।

কার্জন আরও এক চাল চাললেন। রাজার ছেলেদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাবার জন্য গঠন করলেন ইম্পিরিয়েল ক্যাডেট কোর। এরাও প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষারই অপর এক বাহন হলো। বাল্যাবধি ইংরেজের তত্ত্বাবধানে থেকে রাজপুত্ররা এমনিভাবে মানুষ হয়ে উঠত যে, যুদ্ধবিদ্যা শিখেও ব্রিটিশ-বিরোধী কাজে প্রভাবান্বিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

আমাদের দেশে তখনও বুর্জোয়া গণতন্ত্র গড়ে ওঠে নি। আগাগোড়া সমাজ সামন্ততান্ত্রিক। সম্রাট, দেশীয় রাজা, জমিদার, তালুকদার পর্যায়ক্রমে এরাই সমাজের মাথা। ভূম্যধিকারের উপর যে আভিজাত্য গড়ে ওঠে তাকেই ভিত্তি করেছিল তখনকার সমাজের প্রতিষ্ঠা। পারিবারিক ক্ষেত্রেও পিতাই প্রধান সর্বেসর্বা। এ ব্যবস্থা কায়েম রাখাই ছিল ব্রিটিশের স্বার্থ। এ সমাজই যে ভারতবাসীর পক্ষে মর্যাদার এ প্রচারই তারা সযত্নে করে যেত। ভারতবাসী শিল্প-বাণিজ্যের দিকে নজর দিক এটা তাদের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কেননা তার ফলে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্রিটেনের শিল্পপতি এবং পুঁজিবাদীরা। এক কথায় ইংরেজের শিল্প-বিপ্লব হয়ে যাবে নস্যাৎ। এ কারণেই ব্রিটিশ সরকার সদাসর্বদা ভূম্যধিকারীর মর্যাদা প্রতিপত্তি রাখতে সচেষ্ট থাকত এবং শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম রেখেছিল। এমন কি ফ্লাউট কমিশনের রিপোর্টও জমিদারদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে নি।

সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণের উৎসব উপলক্ষ করে লর্ড কার্জন দিল্লীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "দিল্লী দরবারের" আয়োজন করলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাজাদের প্রকাশ্য দরবারে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সম্রাট থাকেন সুদূর বিলেতে। এদেশে আসেন না। আসবার সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং তাঁর প্রতিনিধি ভাইসরয়কে যাতে দেশীয় রাজারা সম্রাটযোগ্য সম্মান দেয় তা শেখাবার জন্যই এ আয়োজন।

যদিও কলকাতাই ছিল তখন পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজধানী, কিন্তু তিনি দরবারের আয়োজন করলেন দিল্লীতে। তার পেছনেও একটা মতলব ছিল। শত শত বছর ধরে দিল্লীই ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইংরেজ আমলেই এর ব্যতিক্রম হলো। ভারতবাসীরা দিল্লীকেই ভারতের রাজধানী এবং দিল্লীশ্বরকেই

ভারত-সম্রাট বলে মানতে অভ্যস্ত। কার্জন জানতেন ভারতবাসীর কাছে দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের রূপান্তর মাত্র—"দিল্লীশ্বরওবা জগদীশ্বরওবা"। সামন্ত রাজারাও দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত। কলিকাতার কোন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নেই যা দিল্লীর আছে। সুতানুটি ও কলিকাতা নামক গ্রামে কুঠি নির্মাণ করে বাণিজ্য করতে করতে একদিন কলকাতা রাজধানী হয়ে উঠল। এমনকি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত বাংলা নামেই পরিচিত হতো। আর বড়লাটের উপাধি ছিল গভর্ণর জেনারেল অফ বেঙ্গল। দিল্লী হলো গিয়ে ইম্পিরিয়েল আর কলকাতা কমার্শিয়াল। সুতরাং কলকাতা দরবার করলে ইংরেজের বণিকত্ব ঘুচবে না। তাই দিল্লীতে হলো দরবার।

খুব জাঁকজমক হলো। সমস্ত দেশীয় রাজারা সেখানে গিয়ে অনেক টাকা খরচ করলেন। লর্ড কার্জন রাজ-প্রতিনিধি হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং দেশীয় রাজারা তাঁর কাছে হাঁটুগেড়ে বসে কুর্ণিশ করে বশ্যতা স্বীকার করলেন। কুর্ণিশ করতে করতে পিছু হঠে আসতে হলো। কিন্তু বরোদার গাইকোয়াড় নাকি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরেছিলেন। বড়লাটের অমর্যাদা হলো বলে নাকি মহা হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। এবং শুনতে পাই এ ত্রুটির জন্য গায়কোয়াড়কে পরে অনেক কিছুই করতে হয়েছিল। দেশের লোকের কাছে কিন্তু তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। জনসাধারণের কাছে এ ত্রুটি স্বাধীনচিত্ততার রূপ নিয়ে দেখা দিল। সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য গায়কোয়াড়ের সুনাম ছিল। এর পর তাঁর মর্যাদা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, কোন কোন স্বপ্ন-বিলাসী দেশ-প্রেমিক স্বাধীন ভারতে গাইকোয়াড়কে প্রথম সম্রাট বলে কল্পনা করতেন।

জাঁকজমকে এই দরবার মোগল-বাদশাহদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে হলো। ইংরেজ ঐশ্বর্য প্রকাশের জন্য রাজস্বের প্রচুর অর্থ খরচ করা হলো। মাত্র দু-তিন বছর আগে আমাদের দেশ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে অনাহারে বহু জনপদ সম্পূর্ণরূপে জনহীন হয়েছিল। যারা মরতে পারল না তারাও কঙ্কালসার দেহে কোনরকমে ধুঁকছিল। দেশের এমনি পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষুধিতের মুখে অন্নের ব্যবস্থা না করে উৎসবের জাঁকজমক ও বিলাসিতায় ব্যয় করাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোকই অসন্তোষ প্রকাশ করল। অবশ্য তখন পর্যন্ত প্রকাশভঙ্গি মৃদুই ছিল। জনচিত্তের তাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল—যদিও ধীরে ধীরে।

বয়স তখন অল্প হলেও পত্রিকা এবং আমাদের বাড়ীতে আলোচনার ফলে

এ দরবারের অনেক কথাই শুনতে পেলাম। দিল্লীর উত্তেজনার ঢেউ সুদূর বাংলা দেশকে উদ্বেলিত করেছিল। ইংরেজ কিন্তু অবিচলিত। বরং এই জাঁকজমকের বহু ছবি তারা দেশ-বিদেশে প্রচার করল।

এ দরবারই তাঁর 'কীর্তির' শেষ নয়। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সাম্রাজ্যবাদী। একথা ভালভাবেই জানতেন যে, একটা জাতির উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে হলে শুধু মাত্র পুলিস ও সৈন্যবল যথেষ্ট নয়। দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতার উপর পুরোপুরি প্রভাব বিস্তার করা প্রয়োজন। তার জন্য সর্বপ্রথমই প্রয়োজন শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আয়ত্তে আনা। অজ্ঞান-অন্ধকারে রাখতে পারলেই যদৃচ্ছ শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়া সহজ হয়। জ্ঞানের আলোকই জাতীয়-জীবনের রবির কর। আত্মসম্বিৎ ফিরে পাওয়ার যাদুকাঠি। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ যে আপন কৃষ্টি ও ঐতিহ্যে গরীয়ান তাকে অবিদ্যার যাদুতে সম্মোহিত করে না রাখতে পারলে কেবলমাত্র অস্ত্রবলে মুষ্টিমেয় বিদেশী ইংরেজ বেশীদিন টিকে থাকতে পারবে না। সুতরাং কার্জন সাহেব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ব্রিটিশ-সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আনবার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করালেন।

এ আইনের বলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক পরিষদ্ নতুনভাবে গঠিত করার ব্যবস্থা হলো। কলেজগুলিকে সরকারীভাবে পরীক্ষা করার অধিকার দেওয়া হলো এবং কলেজগুলির স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির পূর্ণ ক্ষমতা রইল সরকারের হাতে।

এ ব্যবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। চারদিকে উঠল প্রতিবাদ-ধ্বনি। বাঙালীর শিক্ষাগুরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। দেশের সর্বত্র প্রতিবাদ সভা হলো। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক—এককথায় সমগ্র শিক্ষিত সমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল। দাম্ভিক কার্জন জনমত পদদলিত করে আইনের ধারাগুলি কার্যে পরিণত করলেন।

দেশের লোকের চোখ প্রায় খুলে গেল। নিজেদের অসহায় অবস্থার শোচনীয় রূপ দেখতে পেয়ে শিক্ষিত জন-সমাজের অন্তঃকরণ নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলতে লাগল। জাতীয় অপমানবোধ যা এতদিন লুপ্ত হয়েছিল তা যেন আবার ভেসে উঠল। ইতিহাসের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন না লর্ড কার্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চ্যান্সেলারের আসন থেকে তিনি ভারতবাসীকে এবং তাদের পূর্ব-

পুরুষদের মিথ্যাবাদী আখ্যায় ভূষিত করলেন। শুধু সভাস্থ সকলেই ক্ষুণ্ণ হলো না, সমস্ত দেশের জনমন অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হতে লাগল।

১৮৩৩ কিংবা তার নিকটবর্তী কালে লর্ড ম্যাকলে ভারতের আইনসচিব হয়ে আসেন। তিনি এদেশের নিমকে পুষ্ট হয়ে বাঙালীকে মিথ্যাবাদী আখ্যায় ভূষিত করে 'নিমকের' মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। তখন রাজনৈতিক চেতনা এতটা জাগ্রত হয় নি, কিন্তু বাঙালী সেদিনের জাতীয় অপমান ভুলতে পারে নি। সুতরাং দাম্ভিক লর্ড কার্জনের এই অপমানোক্তি বাঙালী নীরবে সহ্য করে নি। ধীরে ধীরে দেশের জনগণের অন্তরে যে আগুন সঞ্চিত হয়ে চলছিল, তাই লর্ড কার্জনের পরবর্তী কার্যের ফলে দেশব্যাপী যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তার প্রস্তুতি বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

সকলকেই তাদের প্রাপ্য দেওয়ার বিধি আছে। হেন অবস্থায় লর্ড কার্জনের দু-একটি ভাল কাজের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দরিদ্র জনসাধারণকে খানিকটা আর্থিক সুবিধে করে দিয়েছিলেন লবণের উপর ট্যাক্স অর্ধেক করে দিয়ে। আয়করের পরিমাণও কিছু কমিয়ে দিয়ে সাধারণ উপার্জনশীল লোকের বোঝা কিছুটা হাল্‌কা করেছিলেন। তখন পাঞ্জাবে ঋণের দায়ে কৃষককে উচ্ছেদ করা যেত। লর্ড কার্জন 'পাঞ্জাব ল্যাণ্ড এলিয়েনেশন এ্যাক্ট' পাস করিয়ে চাষীর জমি হস্তান্তরের সম্ভাবনা কমিয়ে দিলেন। কুশিদজীবীর হাত থেকে চাষীদের মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে লর্ড কার্জনের সর্ববাদিসম্মত প্রধান কীর্তি অবশ্য 'প্রাচীন কীর্তি' সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এতদুদ্দেশ্যে তিনি 'এনসেণ্ট মনুমেণ্ট এ্যাক্ট' পাস করান। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে Archeological Department খুলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন কীর্তির অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করেছিলেন।

এতসব করেও কিন্তু লর্ড কার্জন ভারতবাসীর কাছে জনপ্রিয় হতে পারলেন না। যে চরম অপমানের কশাঘাতে ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন তারই সাহায্যে তারা দেখল, বুঝতে লাগল—তার ভাল কাজ শুধু জোড়াতালি ; গাছের গোড়া কেটে জল ঢেলে তাকে বাঁচাবার অপপ্রয়াস মাত্র। যত অস্পষ্টই হোক না কেন, এ বোধ তখন মানুষের মনকে উদ্বেলিত করতে শুরু করেছে যে, বিদেশীর শাসন-শোষণের অবসান না করতে পারলে কেবলমাত্র সংস্কারের দ্বারা জাতীয় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায় না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা যুগসন্ধিক্ষণ। ভারতবর্ষের পূর্বভালে বাংলা দেশের আকাশে উষার আলো উদিত হলো যুগযুগান্তব্যাপী তিমির রাত্রির পর। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কোলাহলে জাতির নিদ্রাভঙ্গ হলো।

তখন কেবল বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতিই বুঝি বিপ্লব-মুখী হয়েছিল। নির্যাতিত জাতিগুলির অন্তরে জেগে উঠেছিল বিদ্রোহের আকাঙ্ক্ষা। একদিকে যেমন রাশিয়ায় জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবান্দোলন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলছিল, তেমনি অপরদিকে রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়াকে পর্যুদস্ত করে 'অসভ্য' জাপান হলো 'সভ্য'। প্রতীচ্যের সাম্রাজ্যলোভী শক্তি-গুলির হলো ভীতির কারণ। তুর্কী অধিকৃত দেশগুলি একটার পর একটা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে লাগল। দেশের অভ্যন্তরে অভ্যুদয় হলো নব্য বিপ্লবী দলের। সামাজিক কুসংস্কার, সুলতানের কুশাসন সবকিছুর বিরুদ্ধেই এরা বিদ্রোহী হলো। পারস্যে আত্মপ্রকাশ করল গণবিক্ষোভ। চীনদেশে সান-ইয়াত-সেনের নেতৃত্বে স্বাধীনতার বিপ্লব প্রচেষ্টা সফলতার দিকে অগ্রগামী। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী শিবিরেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা যুদ্ধের লক্ষণ আত্মপ্রকাশ করবার মত রূপ পরিগ্রহ করল।

ভারতবর্ষের কথায় ফিরে এসে দেখতে পাই, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ ঘোষণা করলেন। কিন্তু কোন্ প্রয়োজনে এই বঙ্গ-বিভাগ এবং কেনই বা তার বিরুদ্ধে এত বড় আন্দোলন হলো, তার কারণ খোঁজ করতে গিয়ে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বাবস্থা এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত তার ক্রমবিকাশের দিকে স্বতই দৃষ্টি নিপতিত হয়। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক নয় বলেই এ আলোচনা করছি।

মুসলমান রাজশক্তি কখনই সমস্ত ভারতবর্ষকে এক রাজ্যপাশে বাঁধতে পারে নি। যোগাযোগ তথা যানবাহন এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাই ছিল এত বড় একটা দেশব্যাপী সুশৃঙ্খল রাজত্ব গড়ে উঠবার পরিপন্থী। তদুপরি ছিল মোগল-বাদশাহ পরিবারে অন্তর্দাহ। শান্তির পথে মসনদ্ যেমন প্রায় কারুর ভাগ্যে জোটে নি, তেমনি শান্তিতে তা ভোগও কেউ করতে পারে নি।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বেলায়ও দেখি একই ইতিহাস। তাদের আনুগত্য নানা কারণে ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ত। অধিকাংশ বাদশাহজাদাই পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আর তাঁর গদীতে বসেই পিতার আমলের সমস্ত

কর্মচারীদের বরখাস্ত করতেন। কখন কার পক্ষে যোগ দিলে যে তাদের কর্তৃত্ব থাকবে তার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না—যতই রাজভক্ত হোক না তারা। সুতরাং তারাও সুযোগ-সুবিধে পেলে বিদ্রোহ করে নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করত।

এত গেল রাজায় রাজায়। প্রজার সঙ্গে সম্বন্ধের কথায় এসে দেখছি বাদশাহ দেশ শাসন করতেন না। প্রজার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ কোন যোগাযোগ ছিল না। প্রদেশগুলি থেকে নিয়মিত খাজনা পেলেই তিনি খুশী। প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য, এমনকি জমিদারও নিয়মিত খাজনা পাঠিয়ে অন্যান্য সব বিষয়ে প্রায় স্বাধীন থাকতে পারতেন। অবশ্য সকলেরই যার যার উপরওয়ালার খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করাও একটা কর্তব্য ছিল।

দেশের সভ্যতার ভিত্তি ছিল গ্রাম্যজীবন। তখনকার দিনে মানুষের প্রয়োজনের তালিকার প্রায় সবই পাওয়া যেত গ্রামে। সুতরাং গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য-নিরপেক্ষ। তা ছাড়া রাজার সঙ্গে গ্রামের লোকের সম্পর্ক খুব কম থাকায় রাষ্ট্র-নিয়ন্তাদের মধ্যে যে পরিবর্তনই আসুক না কেন, গ্রাম্যজীবন প্রায় অব্যাহত গতিতেই চলত। হবুচন্দ্রের মত রাজা ও গবুচন্দ্রের মত মন্ত্রীও এদেশে রাজত্ব করতে পারত। অবশ্য এরা গল্পের রাজা ও মন্ত্রী। কিন্তু এই গল্পের সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্রেই পাই। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে, একটা বট বৃক্ষকে রাজা করে দিলেও এদেশের রাজত্ব চলত।

কিছু কিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ছাড়া আমাদের সমাজ সেই প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ বণিকের রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত মূলত প্রায় একই ধরনের অচল ও অপরিবর্তিত অবস্থায় ছিল। এমনি অবস্থায় বাস করে মহম্মদ ঘোরী বা সুলতান মামুদের আক্রমণ সারা ভারতব্যাপী কোন বিপদের সঙ্কেত বহন করে আনে নি। পরবর্তীকালে ইংরেজ যখন বাংলা, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের ক্ষুদ্র জায়গায় রাজ্য স্থাপন করতে অগ্রসর হয় তখন অপর অংশের ভারতবাসীরা তা নিজেদের বিপদ বলে ভাবতেও পারে নি। তা ছাড়া এসবের বেশির ভাগ খবরই গ্রামের লোকের কাছে বড় একটা পৌছত না। খবর নেওয়ার প্রয়োজনও তারা বড় একটা বোধ করত না।

ইউরোপের সামন্ত-প্রথা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল বলে জড়ত্ব শুরু হওয়ামাত্র তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। ইউরোপীয় রাজা ছিলেন সবকিছুর মালিক। ভূ-সম্পত্তি, কৃষক, কারিগর সকলের উপরই ছিল তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব। নির্দিষ্ট

কাজ করেই কর্মচারীরা রেহাই পেত না। তারা রাজার দাসের মতই ছিল। ইউরোপে নানা স্তরের স্বত্বাধিকারীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে স্বত্ব নিয়ে, কোন্ স্বত্বাধিকার কোন্ তন্ত্র-প্রথানুযায়ী চলবে তাই নিয়ে। তার ফলে জীবনধারার উপরই আঘাত এসে গেল এবং সামন্ততন্ত্র প্রথার বিরুদ্ধে বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

অবশ্য প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত যে মানুষগুলি মোটা ভাত, মোটা কাপড় নিয়েও নিরঙ্কুশ সুখী জীবনযাপন করছিল, তা নয়। দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, বন্যা বা রাজার কিংবা উচ্চশ্রেণীর অত্যাচারের মধ্যে দেশ বিক্ষুব্ধ হতো। কিন্তু গ্রাম্যসমাজের কাঠামো ভেঙে পড়ত না। নিদ্রার সাময়িক ব্যাঘাতের ফলে একটু নড়ে-চড়ে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়ত।

নগর ও নাগরিক জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানেও প্রাচীর-ঘেরা স্থিতিশীল জীবন। কারিগরি, কারুশিল্প বংশগত। শুধু কি কামার, কুমার, জোলা, তাঁতি, ছুতার আর খোদাইকার, চিত্র নির্মাণে হলো পটুয়ারা আর সঙ্গীতে 'ঘরানা', এরা সকলেই কম-বেশী সূক্ষ্ম কারুকার্য, দক্ষতা ও অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু তার ফলে যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটে নি এবং উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নি।

তার ওপর পাঠান-মোগলরা এল পরধর্ম নিয়ে। মন্দির ধ্বংস, হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে তারা কোনদিনই হিন্দুর আপনজন হতে পারল না। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নি। সুতরাং প্রবল-প্রতাপান্বিত স্বৈরাচারী ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল জীর্ণ গৃহের মত। যতটুকু ন্যায়নীতি, আইন-কানুন, শৃঙ্খলা ছিল সবই দূর হয়ে গেল। চারিদিকে দুর্নীতি, অনাচার, নৈরাশ্য ও দুর্বলতা দেখা দিল। কোথাও কোথাও—যেমন মারাঠা, রাজপুত আর শিখরা নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অভ্যুত্থান ঘটাল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন নতুন রাজবংশ ; সামন্ত রাজা। অনতিবিলম্বেই দেখা দিল আত্মকলহ, হীনস্বার্থের দ্বন্দ্ব। সুতরাং পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অটুটই রয়ে গেল।

ভারতীয় সমাজ যখন এমনি অবস্থায়, তখন ইউরোপে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয়েছে। সুতরাং নব-যৌবনে উদ্দীপ্ত হয়ে ইউরোপীয়রা নতুন জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল কাঁচামাল সংগ্রহ করতে এবং তা কারখানায় তৈরী হলে পর তার

বিক্রয়ের বাজার স্থাপিত করতে। ভারতীয় ধনরত্ন আহ্বান করল পর্তুগীজ, ডাচ্, ফরাসী ও ইংরেজ।

আমাদের দুর্বলতা এবং কূটনৈতিক চালের ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজরাই সাফল্যমণ্ডিত হলো। সাফল্য নিয়ে এল অত্যাচার ও শোষণ। উইলিয়াম বোল্টস্ লিখেছেন, "এই অত্যাচার সর্বক্ষেত্রেই। বেনিয়ান্ ও গোমস্তাদের সহায়তায় ইংরেজরা নিজেদের ইচ্ছামত দামে যে কোনও ব্যবসায়ীকে জিনিস বিক্রয় করতে বাধ্য করত। তাঁতিদের যে সমস্ত শর্তে আবদ্ধ করা হতো তাতে তাঁতিদের সম্মতি লওয়ার কোন প্রয়োজন ইংরেজরা বোধ করত না। শর্ত পালনে অক্ষম হলে মালপত্র দখল করে যে কোনও দরে বিক্রয় করে দাদনের টাকা আদায় করত। অত্যাচার এড়াবার জন্য তাঁতিরা আঙ্গুল কেটে নিজেদের অক্ষম করে ফেলত…।" ওদের অত্যাচার সহ্য করার চাইতে বিকলাঙ্গ হওয়াও শ্রেয় মনে হয়েছিল !!

আর একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, "ইংরেজ কর্মচারীরা দেশের লোকের উপরও অত্যাচার করতই, নবাব কর্মচারীরা বে-আইনী কার্যে বাধা দিতে আসলে তারাও রেহাই পেত না। এরই ফলে মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।" নবাবী পাওয়ার সময় ইংরেজরা প্রত্যেক নবাবকে প্রচুর টাকা দিতে বাধ্য করত। দ্বিতীয়বার নবাব হওয়ার সময় মীরজাফর দেয় ২,৩০,৩৫৬ পাউণ্ড। পরে আট বছরের মধ্যে নানাখাতে আরও ৫৯,৪০,৪৯৮ পাউণ্ড। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক ও কর্মচারীরা মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে অপরিমেয় ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে দেওয়ানী সনন্দ আদায় করবার ফলেও সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে ১৬,৫০,১০০ পাউণ্ড স্টার্লিং মুনাফা করল।

এর পরে তো বাংলা দেশে ইংরেজ অত্যাচারের বন্যা বয়ে গেল। অত্যাচার, শোষণ ও উৎপীড়নে সমস্ত দেশ ছারখার হয়ে যেতে লাগল। ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হলো যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলে কুখ্যাত। 'আনন্দমঠে' সেই ভয়াবহতার বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই মন্বন্তরের মধ্যেও কিন্তু রাজস্ব আদায় পুরোদমে চলেছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বোর্ড অফ ডাইরেক্টরকে লিখেছিলেন—"যদিও এ দেশে এক-তৃতীয়াংশ লোক মরে গেছে এবং তার ফলে চাষের অবনতি ঘটেছে, তথাপি ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে নীট আদায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের চাইতে বেশী। কড়া তাগিদের ফলেই এ সম্ভব হয়েছে।"

ইংরেজ কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষের সামন্ত-তান্ত্রিক শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংস হলো ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা। পুরাতনের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে নতুনের আবির্ভাব হলো না সামগ্রিকভাবে। যা কিছু হলো তারও গতি অতি মন্থর। এক কথায় বলতে গেলে এদেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটল না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়তা করতে গিয়ে ব্রিটিশের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কিছু কিছু কলকারখানা, বিশেষ করে কাপড়ের কলকারখানা স্থাপিত হতে লাগল। ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতীয় বণিকের অর্থনৈতিক বিরোধ বৃদ্ধি পেতে লাগল। এ সংঘাতের মধ্য দিয়েই আমাদের দেশে শিল্প-বিস্তারে নবযুগের আবির্ভাব হলো। দেশের পুরনো আর্থিক কাঠামো ভেঙে গিয়ে নতুন ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। সৃষ্টি হলো বুর্জোয়াশ্রেণীর। ক্রমে গ্রাম্যসমাজ ভেঙে গিয়ে দেশের নেতৃত্ব বুর্জোয়াদের হাতে চলে যেতে লাগল। এ প্রসঙ্গে সেকালের একটা গানের কথা মনে পড়ল, "তাঁতি, কর্মকার করে হাহাকার ; মাকু, খাতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী দুর্ভিক্ষ হয় ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। শুধু উনবিংশ শতাব্দী কেন, ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ কোনও দিনই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রেহাই পায় নি। সেই সময়ে সরকার একটা কমিশন গঠন করে দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয়ে মনোনিবেশ করেছিল। এই প্রসঙ্গেই রমেশ দত্ত তাঁর দুই প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন 'ইকনমিক হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ রুল' ও 'ভিক্টোরিয়ান এজ'। ডিগবি সাহেব লেখেন 'প্রস্পারাস ইণ্ডিয়া'। ব্রিটিশের আর্থিক শোষণের নিষ্ঠুর ইতিহাস আমরা জানতে পারলাম। সবাই জানতে পারল, ভারতবর্ষের কৃষকেরা এক বেলাও পেট ভরে খেতে পায় না। ভারতবর্ষের অর্ধেক লোকের দু'বেলা খাওয়া জোটে না। ভারত-সচিব (Secretary of States), বড়লাট (Viceroy) প্রভৃতি নানা উপলক্ষে স্পষ্টভাষায় মত প্রকাশ করেছেন যে, শাসন শোষণ একসঙ্গেই চলবে। শোষণ বন্ধ করার কথাই ওঠে না। India must be bled. আর যেখানেই রক্ত বেশী, তাই হবে আঘাতের সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান।

সুতরাং বাংলা দেশ হলো তাদের লক্ষ্যস্থল। বাংলার জমি সুজলা সুফলা। ধনদৌলত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম হাণ্টারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "প্রথম থেকেই বাংলা দেশ ভারত-বর্ষের কামধেনু ছিল। বাংলা দেশকেই সকলে শোষণ করত।" ইংরেজ নিজের

স্বার্থেই প্রতিষ্ঠা করেছিল রেলওয়ে, কয়লার খনি আর পাটশিল্প। কিন্তু এর ফলে যে সংঘাতের সৃষ্টি হলো তা বাংলা দেশের সামন্ততান্ত্রিক প্রথার ধ্বংস করে শিল্প-বাণিজ্যের নবযুগের গোড়াপত্তন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ভারতবর্ষে যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বা ভদ্রলোকশ্রেণী গড়ে উঠছিল, তারা দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আগ্রহের সঙ্গে জানতে ও বুঝতে চাইল। এ বিষয়ে বাংলা দেশ হলো সকলের অগ্রণী। কেন না, বাংলা দেশ ইংরেজের সংস্পর্শে প্রথম আসে। রাজত্ব স্থাপনে বাঙালীই হয় প্রধান সহায়। এক-একটা রাজ্যজয়ের সময় বাঙালী কেরাণীবাবু ও অন্যান্য কর্মচারীরা ব্রিটিশের অনুগমন করত। তারা ছিল সাহেবদের পরই ছোট সাহেব। বাংলা দেশের বাইরে বাঙালীর উপনিবেশ এভাবেই গড়ে উঠেছিল। বিদেশী বিজেতার সাহায্য করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করে বাঙালীর চোখ খুলে গেল। নিজেদের মনে করল বিদেশীর সমকক্ষ। বিদেশীর সঙ্গে সমান অধিকারের দাবীর প্রশ্ন মনে উদিত হলো।

ভারতবর্ষের ঘুমন্ত শক্তি জাগ্রত হলো। ইহাই রেনেসাঁস। আর তার প্রধান পুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। চৈতন্যদেবের সময়ও একবার বাংলায় রেনেসাঁস হয়েছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধিতে। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলা দেশে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এত বড় জাগরণ, এতগুলি মনীষীর জন্ম জগতের ইতিহাসেও বোধ হয় অভূতপূর্ব।

রাজা রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করলেন। সর্বপ্রকার সামাজিক ও ধর্মনৈতিক কুসংস্কারকে আঘাত করে তিনি ভূমিসাৎ করলেন। সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন এমনি বর্বর প্রথা যে আমাদের দেশে ছিল, আজ তা বিশ্বাস করাও কঠিন। উপনিষদে একেশ্বরবাদ প্রচার করে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রাহ্মসমাজ। যদিও ব্রাহ্মধর্ম খুব বেশী লোক গ্রহণ করে নি, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নীতিগত, ধর্মগত ও সমাজগত প্রভাব এবং আদর্শ শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

সাহিত্যের দিক দিয়েও তাঁর দান অপরিসীম। তিনিই বাংলা গদ্যের জনক। জনগণের চলিত ভাষা সমৃদ্ধ হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু উচ্চশিক্ষিত জন কয়েকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, এ কথাটা তিনি ভাল করেই বুঝেছিলেন। মানুষের মনের দাসত্ব ঘোচানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম বিপ্লবী।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনাও পরানুকরণ মোহ ত্যাগ করে দেশের ধর্ম ও সভ্যতার দিকে শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তিনি ছিলেন ভারতীয় ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ। নিজের জীবনে সত্য উপলব্ধি করে দেশের শিক্ষিত লোকের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলেছিলেন। মনের দাসত্ব ঘুচিয়ে বিপ্লবের জন্য যাঁরা দেশকে প্রস্তুত করছিলেন পরমহংসদের ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীর আর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এত বড় তেজস্বী নির্ভীক দয়ার্দ্রচিত্ত বিদ্বান ব্যক্তি সমগ্র শতাব্দীতে খুব কম জন্মেছে। বিদেশী শাসকদের কাছে কোন অবস্থাতেই মাথা নত করেন নি। হিন্দুসমাজের মহাপাপ মেয়েদের বৈধব্যদশা ও বহু-বিবাহ প্রথা বর্জনের জন্য ঘোরতর সংগ্রাম করেন। তিনি ছিলেন বাংলা-সাহিত্য স্রষ্টাদের পুরোভাগে। তিনি শুধু নিজের শিরই উন্নত রাখেন নি, নিজের আচরণ দ্বারা দেশকে শির উন্নত করতে শিখিয়েছিলেন। বাল্য-জীবনের কথা বলতে গিয়ে পূর্বেই উল্লেখ করেছি কিভাবে তাঁর আদর্শ সমাজকে বিপ্লবী জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে প্রভাবান্বিত করেছে।

বাংলা দেশের মত এত ব্যাপক না হলেও অন্যান্য প্রদেশেও কিছু কিছু সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। উত্তর ভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ-আন্দোলন ছিল সর্বপ্রধান। বিদেশী শাসনের প্রতি ছিল আর্যসমাজীদের তীব্র ঘৃণা। তার ফলে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে অনেক সহায়ক হয়েছে।

আমার মনে হয় সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীটাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির যুগ, যার পরিণতি ঘটে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। জাতির সর্বাঙ্গ তখন প্রাণপ্রাচুর্যে টলমল। এ সময়কার সাহিত্যের মধ্যেও দেখতে পাই এর প্রতিফলন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দ দাস ও ডি. এল. রায়, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, চণ্ডীচরণ সেন, স্বর্ণকুমারী দেবী, রজনী সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কামিনী রায়, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার সকলেই সামাজিক, ধর্মনৈতিক, রাজনৈতিক—এককথায় সর্বতোমুখী জাতি-গঠনের কাজ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে করেছেন; এদেশের জাগরণের ইতিহাসে, বৈপ্লবিক শক্তির উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দের দানের তুলনা নেই।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পলাশীতে যে যুদ্ধের প্রহসন হয়, তার ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু গোটা ভারতবর্ষ দখল করতে ব্রিটিশের এক শ' বছর লেগে গেল। জয় সম্পূর্ণ হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মে-জুন মাসের সিপাহী যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে। কিন্তু ব্রিটিশের শিল্প-বাণিজ্য এবং রেলওয়ে স্থাপনের মাধ্যমে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের সূত্র গ্রথিত হলো।

সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রধানত বাংলা দেশে রাজনৈতিক সংগঠন-প্রচেষ্টা সুরু হয়। এই যুগেই নীল-চাষীরা বিদ্রোহ করে নীলকর ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বাংলার নীল-চাষীদের সংগ্রাম এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। তারা ইংরেজ নীলকরদের কাছ থেকে দাদন নিতে অস্বীকার করল। ভীষণ অত্যাচারেও তাদের সংকল্প ভেঙে পড়ল না। দেশের সংবাদপত্র ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চাষীদের দাবী ন্যায্য বলে স্বীকার করল। দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" নাটক দেশে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করে।

এই সমস্ত নানা কারণে তখন শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ, স্বাধীন চিন্তাশীলতা, সকল দিক থেকে উন্নত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা তখনও আসে নি বা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন বিশেষ প্রকাশ ছিল না—যা ছিল তারও কোন সংঘবদ্ধ রূপ দেখতে পাই না।

এমনি সময়ে রাজনৈতিক আকাশে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন। তাঁর আবির্ভাব একটা বিস্ময়কর ঘটনা। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন যুগের প্রবর্তন হলো। সারা দেশব্যাপী রাজনৈতিক চেতনা ও তার সংঘবদ্ধ রূপ দিতে তিনিই প্রথমে আনন্দমোহন বসু ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাহায্যে অগ্রসর হলেন।

আই-সি-এস-এর মত তখনকার দিনে উচ্চতম পদাধিকারী হয়েও আদালতে ইংরেজ জজসাহেব হিন্দুর দেবতাকে অপমান করায় সুরেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানান এবং দেশে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এজন্য তিনি চাকুরি থেকে বরখাস্ত তো হলেনই, এমনকি তাঁর কারাদণ্ডও হলো। জেলে যাওয়ার কথা যখন কেউ ভাবতেও পারে নি তখন সেই সুদূর অতীতে দেশের সম্মানরক্ষার জন্য কারাবরণ করলেন।

ভারতবর্ষের পরম লাভ হলো। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পর এই

প্রথম ভারতের জনগণ একজন রাজনৈতিক নেতা পেল। সুরেন্দ্রনাথ বাস্তবিকই রাষ্ট্রগুরু। দেশে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি আনন্দমোহন বসুর সাহচর্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন (ভারত সভা) নামে এক সমিতি গঠন করলেন। অন্যান্য প্রদেশেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো। কোথাও কোথাও আবার সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহেই অন্য নামে সমিতি গঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশেরই শহরে শহরে, যেমন ঢাকায় পিপলস্ এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিতে লাগলেন। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হলো। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নবোদ্ভূত ধনিক ও বণিক শ্রেণীর মধ্যে যে অসন্তোষ এতদিন সঞ্চিত হচ্ছিল তা যেন বহিঃপ্রকাশের একটা পথ খুঁজে পেল।

ব্রিটিশ সরকার ও তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকগণ প্রমাদ গণলেন এবং শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের আঘাত ভুলতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের কার্যকলাপ দেখে তাঁরা চারিদিকে বিভীষিকা দেখতে লাগলেন। একদিকে যেমন মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হলেন, তেমনি অপর কি উপায়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় ভাবতে লাগলেন। তখন এলেন অক্টোভিয়ান হিউম নামে এক আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে কংগ্রেস গঠনের পরামর্শ দিলেন। তিনি ছিলেন খুব দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি জানতেন যে, একটা জাগ্রত জাতির রাজনৈতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশের পথ থাকা দরকার। নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসঙ্গত পথে তাদের অভাব-অভিযোগ আলোচনা ও প্রকাশের ক্ষমতা না দিলে তা ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করবে। একরকম তাঁকেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। সুরেন্দ্রনাথকে তিনি কংগ্রেসে আকর্ষণ করলেন। দেশের সর্বত্র সমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং প্রকৃত শক্তিকেন্দ্র গঠন তার ফলেই হতো। কিন্তু বৎসরে একবার একত্রিত হয়ে দিন-তিনেক খুব বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রস্তাব পাশ করেই কর্তব্য শেষ ও উৎসাহ, উদ্যম অবসানের সুবন্দোবস্ত হলো এই বাৎসরিক কংগ্রেসে। শক্তি সংহত হলেই বিপদ, তাকে বাইরে উবে যেতে দিলেই সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গল, একথাটা ইংরেজ ভাল করেই বুঝল।

তার পর অনেক বছর ধরে কংগ্রেস বছরে একবার শুধু বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাব গ্রহণ ও আবেদন-নিবেদন করেই কর্তব্য সম্পাদন করত। প্রার্থনার মধ্যে ছিল এই কয়টি—সরকারী চাকুরিতে ভারতবাসীর সমান

নিয়োগ, আই. সি. এস. পরীক্ষায় ইংরেজ ও ভারতবাসীর সুযোগলাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমান সুবিধা। বিদেশী বণিকের বিশেষ সুবিধা লোপ। যদিও ক্রমে কংগ্রেসে বেশীসংখ্যক লোক যোগ দিতে থাকে, কিন্তু ক্রমে কংগ্রেসের কোন সংস্থা (organisation) গড়ে ওঠে নি। তবুও ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের উপর অসন্তুষ্ট হলো। রাজ-কর্মচারীদের কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অথচ কংগ্রেসের প্রথম দু-একটা অধিবেশনে বড়লাট উপস্থিত হয়েছিলেন। রাজভক্তিসূচক একটা প্রস্তাব পাশ হওয়া বহুদিন পর্যন্ত রীতি ছিল।

কংগ্রেসে যোগদান করেই সুরেন্দ্রনাথ নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই সেদিন পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর শ্রীচক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী মহাশয় সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি-সভায় বলেছিলেন যে, তাঁদের বাল্যকালে তাঁরা কংগ্রেস বলতে সুরেন্দ্রনাথকেই বুঝতেন।

কংগ্রেস আন্দোলনে বোম্বাই প্রদেশও খুব অগ্রসর হয়ে এল। তাদের উদীয়মান ধনিকশ্রেণী ধনতান্ত্রিক ইংরেজের সর্ববিষয়ে সুবিধাভোগে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। এরাই কংগ্রেসে বেশী করে যোগ দিতে লাগল। বোম্বাইয়ের পার্শীরা বিদ্যায় ধনে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেটা, দিন শা ইদুলচী ওয়াচারের মত লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মহারাষ্ট্র রাজ্যেও তখন নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। সাহিত্য, ইতিহাস-চর্চায় এরা বাঙালীর পরই অগ্রসর হয়ে এসেছিল। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, ভাণ্ডারকর, গোখলে, তিলকের নাম চিরস্মরণীয়।

বালগঙ্গাধর তিলক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নেতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ তিলকের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ভারতবর্ষের সর্বজনমান্য শ্রেষ্ঠ নেতা। এমন সংগ্রামপন্থী, সর্বত্যাগী নির্ভীক নেতা তাঁর আগে দেশে জন্মগ্রহণ করে নি। তিনি ছিলেন চরমপন্থী বিপ্লবী। প্রথম থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষার বস্তু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনিই একাধিকবার রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। মহারাষ্ট্রেই প্রথম বিপ্লবী সমিতি গঠিত হয়। লোকমান্য তিলক ছিলেন বিপ্লবীদের অগ্রজ।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম প্লেগের আবির্ভাব হয়। পুণাতে প্লেগ নিবারণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার ও সৈন্যগণ ভারতীয় নারীদের উপর পর্যন্ত অকথ্য অত্যাচার ও অপমান করে। র‍্যাণ্ড ও এম্‌হার্স্ট ছিল এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অপরাধী। বিপ্লবীরা এদেরকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তার ফলে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হয় এবং নাটু ভ্রাতৃদ্বয় নির্বাসিত হন এবং তিলককেও অনেক নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

তখনকার দিনের অবস্থা পর্যালোচনা করে লর্ড কার্জন দেখলেন যে, বাংলাই ভারতের সর্বাগ্রগণ্য প্রদেশ এবং সর্বভারতের নেতৃত্ব করছে। তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ইংরেজের সর্বাধিক টাকা খাটত পাট, চা, কয়লা ও অন্যান্য খনিজদ্রব্যে। তার মধ্যে বাংলাই সর্বপ্রধান। ক্রয়-ক্ষমতা তখনও বাঙালীরই বেশী; সুতরাং, বিলিতি মাল বিক্রীর বাজারেও বাংলাই প্রথম। কলকাতাই ছিল সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও সামুদ্রিক বন্দর। সুতরাং এই জাগ্রত বাঙালীকে দুর্বল না করতে পারলে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণে বাধা পড়বে। গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরই বিপদ ঘটবে। ধর্মগত বিভেদের উপর প্রদেশ গঠন করে জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করতে পারলে সামন্ততান্ত্রিক প্রাচীনতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব হবে। এই সমস্ত কারণেই লর্ড কার্জন বঙ্গ-বিভাগ শেষ করে ফেললেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাঙালী সমাজকে হীনভাবে গালি দিয়ে সমস্ত বাঙালীকেই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। তার উপর বঙ্গ-বিভাগের আদেশ দিয়ে একটা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি বিস্ফোরণের পথ করে দিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলার জনগণ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তীব্র প্রতিবাদ জানাল। তাঁর সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ বসু—তখন আনন্দমোহন বসুও জীবিত ছিলেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রাজশাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের ঈশান চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও অনেকে যোগ দিলেন।

কলকাতায় বিরাট সভা হতে লাগল। মফঃস্বলেও প্রতিবাদ তীব্র হয়ে উঠল। আমি তখন নারায়ণগঞ্জে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। মনে আছে, ছুটির পর বাড়ী না গিয়ে ক্লাসেই থেকে যেতাম এবং দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাতে যা পড়তাম তাই বক্তৃতা করতাম ও আলোচনা হতো। মাষ্টারমশাইরাও এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহিত করতেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মাষ্টার রুহিণী দাসের কথা কোনোদিনই ভুলতে পারব না। তিনি রমাকান্ত রায়ের জাপানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, জাপানীরা তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—"শুনেছি, তোমাদের দেশে নাকি পুরুষমানুষ নেই? একথা কি সত্যি?" রমাকান্তবাবু তখন জবাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁকে দেখেও কি তাই মনে হয় নাকি? তখন ওরা বলেছিল, তাই যদি হয় তবে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে দু'এক লাখ ইংরেজ কি করে সাত-সমুদ্র পার হয়ে এসে পদানত রাখতে পারে? স্বদেশপ্রেম ছাড়াও নানা সদ্গুণ যাতে আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয় সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিতেন নানা গল্পচ্ছলে। ভবিষ্যৎ জীবনে নির্জন কারাকক্ষে বসে যাঁদের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছি রুহিণীবাবু তাঁদের অন্যতম।

বাংলা দেশের হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও মুসলমানদের মধ্যে একদল নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করল। মুসলমানদের মধ্যে তখনও তেমন কোন রাজনৈতিক চেতনার লক্ষণ দেখা দেয় নি। তাঁদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি জাগ্রত করে বঙ্গ-বিভাগের সমর্থন পাওয়ার জন্য লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফরে এলেন। ঢাকা যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হয়েছিল। আমিও গিয়েছিলাম। বড়লাট ছিলেন তখন ভারতবাসীর কাছে একটা দর্শনযোগ্য অদ্ভুত মানুষ। তিনি এমন একটা সর্বশক্তিমান ভীতিব্যঞ্জক মানুষ ছিলেন যে, পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের ফলে দুই-একজন ভারতবাসী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় তাঁর কাছে যাওয়ারই কল্পনা করতে পারত না। এখনও বেশ মনে আছে, 'লর্ড কার্জন কেমন করে একটা পা ঈষৎ টেনে টেনে স্টীমার থেকে জেটির উপর দিয়ে হেঁটে রেলওয়ে প্ল্যাটফরমে এসেছিলেন। এদিকে বন্দুকধারী পুলিস ও সৈন্যের সঙ্গিন সূর্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করছিল, লাঠিধারী পুলিস জনতাকে হট্ যাও হট্ যাও বলে কারণে-অকারণে ধাক্কা দিচ্ছিল, অপরদিকে দেশের সাধারণ লোক, বিশেষ করে হিন্দুরা ক্ষুব্ধচিত্তে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধ সর্বজনমান্য নেতৃবর্গ দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন—Save us from partition, save us from partition

(আমাদের বঙ্গ-বিভাগ থেকে বাঁচাও)। ট্রেন যখন শহরের উপর লেভেল-ক্রসিং দিয়ে যাচ্ছিল তখনও বহু বৃদ্ধ নেতা একই উক্তি করেছিলেন, আবেদন জানিয়েছিলেন। সহস্র সহস্র জনতার মধ্যে থেকেও সেদিন নিজেকে বড় নিঃসহায় বোধ করেছিলাম। জনতার কাতরোক্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া আর মাননীয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রার্থনা—এই দুটি চিত্র আমাকে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

লর্ড কার্জন ঢাকা গিয়ে নবাব সলিমুল্লা ও পূর্ববঙ্গের অনেক মুসলমান প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করে বঙ্গ-ভঙ্গে মুসলমানের স্বার্থ বুঝিয়ে দিলেন।

নানা জায়গায় সভা করে মুসলমানরা বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নারায়ণগঞ্জ জিমখানা গ্রাউণ্ডে এক বিরাট সভার কথা মনে আছে। ওখানে সাধারণত দেশীয় কোন লোক যেতে পারত না। কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য ইউরোপীয়ানরা সানন্দে সভা হতে সম্মতি দিল। বোধ হয় নওসরালী চৌধুরীও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনে লাউডস্পীকার ছিল না। প্রকাণ্ড গ্রাউণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এক সময়ে বহু বক্তা চেয়ারে দাঁড়িয়ে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করে বক্তৃতা দেয়।

অন্যদিকের চিত্র হচ্ছে এই যে, সারা বাংলা থেকে গণ-আবেদন (mass petition) গেল। কিন্তু কোন ফলই হলো না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগ হয়ে গেল। ঐ বছরই ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে বিরাট সভায় প্রতিবাদ জানিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ রোধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা হলো। স্থির করা হলো স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করতে হবে, বিদেশী পণ্য বর্জন করতে হবে।

নেতারা জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে প্রচারে বেরুলেন, সর্বত্র সভা-শোভাযাত্রা হতে লাগল। আন্দোলনকে কেবলমাত্র ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জন আন্দোলন বলে মনে করলে ভুল হবে। গোটা দেশ স্বদেশপ্রেমের বন্যায় ভেসে গেল। শুধু কি রাজনৈতিক নেতা, দেশের সর্বশ্রেণীর লোক যথাশক্তি জাতির মুক্তিকামনায় এগিয়ে এল। কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী এমনকি যাত্রাওয়ালা, কবিওয়ালা, কথকঠাকুররা পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন।

৩০শে আশ্বিন রাখী-বন্ধন উৎসব হলো। ব্রিটিশ সরকার আমাদের ভাগ করে দিলেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ

হলাম। একে অপরের হাতে রাখী বেঁধে দিলাম। সেই দিনটা ছিল অরন্ধনের দিন। সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হলো। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা লিখলেন। ঠিক ব্রতের কথার ধরনেই সকলের বোধগম্য করে পুস্তকখানা লেখা হয়েছিল, আর তা ঘরে ঘরে সকলে একত্র বসে ভক্তি সহকারে পাঠ করল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনই হলো ভারতীয় জাতীয়তাবোধের প্রথম বিস্ফোরণ।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর নিষ্ঠুর অত্যাচারের ফলে ভীতি-বিহ্বল অবসাদগ্রস্ত জাতির আবেদন-নিবেদনই প্রধান অস্ত্র ছিল—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন—"আবেদন আর নিবেদনের থালা বহি নত শির।" বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনেও এ পন্থা নিষ্ফল হওয়ায় ব্রিটিশ-পণ্যবর্জন আন্দোলন প্রথম সক্রিয় পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হলো। এ বিষয়ে দেশের নেতৃবর্গ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সুরুতে ব্রিটিশপণ্য-বর্জনের নীতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আমেরিকানরা যে ব্রিটিশ-পণ্য বন্দরে নামাতে দেয় নি, জলে নিক্ষেপ করেছে, একথা তাঁরা দেশের লোককে জানাতে লাগলেন। নেপোলিয়ান ইংরেজদের বলতেন বেনের জাত (A nation of shop-keepers)। সুতরাং ইংরেজকে কাবু করতে হলে "উহাদের পকেটে হাত দিতে হইবে" এই কথা নেতৃবর্গ ঘোষণা করলেন।

যদিও সমস্ত বিলিতি-পণ্যবর্জনই সিদ্ধান্ত করা হয়, কিন্তু আন্দোলনের মধ্যমণি হলো বিলিতি কাপড়। বাঙালী তাঁতিদের সর্বনাশ করেই ইংরেজ বিলিতি কাপড়ের বাজার সৃষ্টি করে। বাঙালী সে দুঃখের ইতিহাস ভোলে নি। হাতে-বোনা ঢাকাই মসলিন ছিল জগতের বিস্ময়। বয়কট-আন্দোলনে মৃতপ্রায় তাঁত ও চরকার পুনঃ-প্রচলনে উৎসাহ দেখা দিল।

কংগ্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল বোম্বাই-এর ধনকুবের শিল্পপতিগণ। কংগ্রেসের প্রকৃত নেতৃত্ব বলতে গেলে তাঁদের হাতেই ছিল। এরা বোম্বে, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল! কিন্তু ব্রিটিশ শিল্প-ব্যবসায়ী ও ভারত সরকারের প্রতিকূলতায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না। তুলা এবং মিহি সূতার উপর আবগারী শুল্ক বসল। রেলের ভাড়া এমন হলো যার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাল চলাচলের যা খরচ পড়ত তা বিলেত থেকে আনার খরচের অনেক বেশী। উপকূলের জাহাজী ব্যবসায় ইংরেজের একচেটিয়া থাকায় সেখানেও কোনো সুবিধে পেত না ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

সুতরাং তাদের স্বার্থেও এই বয়কট-আন্দোলন প্রবল হয়েছিল এবং বোম্বের সুতার কল শুধুই বেঁচে রইল না, উন্নতিও করল।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গানের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। রজনী সেন লিখলেন—"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই; দীন-দুঃখিনী মা যে মোদের এর বেশী তার সাধ্য নেই।" রবীন্দ্রনাথের—"পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।" অশ্বিনী দত্তের—"বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত, আপনার পায়ে দাঁড়ারে ভাই।"

এই বয়কট-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালীর আত্মশক্তির উদ্বোধন হলো। দেশের জন্য নির্যাতন সহ্য করার প্রথম পাঠ গ্রহণ করল বাঙালী। তাই তো যখন বরিশাল কনফারেন্স লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দেওয়া হলো তখন বাঙালী গাইল —"আজ বরিশাল, পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায়ে।" সর্ববিষয়ে মানুষ হয়ে ওঠার দৃঢ়সঙ্কল্পও জাগে এ সময় থেকেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর শিক্ষকতায় যে বাঙালী বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী তৈরী হলো তার আরম্ভ স্বদেশী যুগেই। আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ও শিক্ষায় ভারতীয় চারুশিল্পে যে নবজাগণ হয় তাও ওই সময়েই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি যে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জনগণের মনে জাগিয়ে তুললেন ও জাতির সম্মুখে প্রাচীন ইতিহাস তুলে ধরে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করলেন তাও এই স্বদেশী যুগে। রবীন্দ্রনাথ জাতির চিন্তাধারায় নতুন প্রাণসঞ্চার করলেন। তাঁর গানে, কবিতায় ও প্রবন্ধে সমস্ত আন্দোলনকে এক নতুন রূপের সন্ধান দিয়ে সমস্ত আন্দোলনকে উচ্চস্তরে তুলে মহীয়ান করলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং রজনীকান্ত সেন ছাড়াও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার কামিনী ভট্টাচার্য ও মুকুন্দদাস প্রভৃতির গানে দেশ মেতে উঠল।

এই স্বদেশী যুগেই ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবের পূর্ত-বিভাগের খালের জল প্রভৃতি নিয়ে কৃষকদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়। এ আন্দোলন ব্রিটিশের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। জনপ্রিয় পঞ্জাব নেতা লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন রেগুলেশনে বন্দী হন। পঞ্জাব ও ভারতের সর্বত্র এর তীব্র প্রতিবাদ হয়। মাস ছয় পর তাঁরা মুক্তিলাভ করেন। সর্দার অজিত সিং গোপনে দেশত্যাগ করে বিদেশে অবস্থান করতে থাকেন এবং ভারতবর্ষের বিপ্লবান্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য শক্তি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে

৪০ বৎসর পর অতিবৃদ্ধ ভগ্নস্বাস্থ্য সর্দার দেশে ফিরে আসেন। তখন আমার সঙ্গে দিল্লীতে তাঁর দেখা হয়। ভগৎ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের নিয়ে তিনি দিল্লী আসেন। তাঁরাও প্রায় সকলেই রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত হয়েছিলেন। সর্দার অজিত সিং ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ও এসেমব্লি বম্ব-কেসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিখ্যাত ভগৎ সিংয়ের জ্যেষ্ঠতাত। সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা দেশের পরই স্থান ছিল পঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের। এই দুই স্থানে তখন অনেকগুলি রাজদ্রোহের মামলা হয় এবং অনেকে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন। ব্রিটিশ সরকার এই তিন প্রদেশের তিন প্রধানকে সাংঘাতিক (dangerous) বলে ঘোষণা করে। তারা বলত—লাল (লালা লাজপত রায়), বাল (বাল গঙ্গাধর তিলক), পাল (বিপিনচন্দ্র পাল) এই তিনই সাংঘাতিক। ভীত কণ্ঠেই তারা এঁদের নাম উল্লেখ করত।

নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকায় বড় বড় নেতারা এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এল গানের দল। লোকে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জনের মন্ত্র ও শপথ গ্রহণ করতে লাগল। নারায়ণগঞ্জ স্কুলের হেডমাষ্টার ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষকের সহায়তায় আমরা বিলিতি দ্রব্যের দোকানে দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করলাম। লবণ, চিনি ফেলে দিতে লাগলাম ও বিলিতি কাপড় পোড়ান শুরু হলো। এজন্য কোথাও কোথাও কিছু কিছু গণ্ডগোলও হলো।

সরকার নানা সার্কুলার জারি করে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে দিল। কিন্তু কোনো ফল হলো না। কলকাতায় বিনয় সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতী ছাত্ররা যখন বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলাম তৈরীর কারখানা বলে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, তখন দেশব্যাপী ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। বিক্রমপুরের সেরা ছাত্র মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পারিবারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও দেশের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে এদিকের ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে উঠল। অরবিন্দ মস্ত চাকুরি ছেড়ে দিয়ে বরোদা থেকে বাংলা দেশে চলে এলেন এবং দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। এ ঘটনা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করল।

ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারও একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বরিশাল প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স লাঠির ঘায়ে ভেঙে দেওয়া হলো। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ হলো এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করার অপরাধে কোথাও কোথাও ছাত্ররা বেত্রাহত হলো। ক্রমে দেশের লোক বুঝতে পারল এবং বিপিনচন্দ্র পাল

ও অরবিন্দ প্রমুখ নেতারাও ঘোষণা করলেন যে, কেবলমাত্র বিলিতি-পণ্য বর্জনই সব নয়; আমাদের বিলিতি শাসনও বয়কট করতে হবে। আমরা ইংরেজ রাজ্যের অবসান চাই। এঁরাই তখন চরমপন্থী বলে অভিহিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা লোকের মনে উদিত হ'ল যে, কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত আন্দোলনে কোন ফলই হবে না। অন্য পথ আবিষ্কার করতে হবে।

আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের একজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন ক্লাসে স্বদেশপ্রেমের নানা কথা ছেলেদের কাছে বলতেন। একদিন তিনি পাঠ্যপুস্তক না পড়িয়ে পুরো একঘণ্টা পৃথিবীর নানা দেশের গুপ্ত-সমিতির কথা, বিশেষ করে ইতালীর কারবোনারী দল ও রাশিয়ার নিহিলিস্টদের কথা ছাত্রদের কাছে বললেন। আমার মনের মধ্যে নানা আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল। ছুটির পর বাড়ী এসে বেরিয়ে পড়লাম আমার কয়েকজন বিশিষ্ট সহপাঠী বন্ধুর কাছে গুপ্ত-সমিতি সম্বন্ধে পুস্তকাদির খোঁজ করতে। কোনো খোঁজ-খবর পেলাম না। কয়েক দিনের মধ্যেই যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের মাট্‌সিনির জীবন-চরিত হাতে এল। এই বইতে তিনি কারবোনারী গুপ্ত-সমিতির আদর্শ ও কর্মসূচীর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বইখানা বেশ ভাল করে পড়লাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ তখন আমার মনকে এক সর্বত্যাগী বিপ্লবী সন্ন্যাসীর প্রতি আকর্ষণ করছিল। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অন্তরের মধ্যে পরসেবায় আত্মোৎসর্গের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, রাজসিংহ, মৃণালিনী ও অন্যান্য উপন্যাস; কমলাকান্তের দপ্তর ও লোকরহস্য; রমেশচন্দ্র দত্তের মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা এবং স্বদেশী যুগের অসংখ্য গান মনকে নানাভাবে আলোড়িত করছিল।

এমনি সময়ে, বোধ হয় ১৯০৬ সালের শেষের দিকে, একদিন পিতৃদেব আমায় বললেন, "এই তো এখানেও অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয়েছে। আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এলাম, ছেলেরা কেমন লাঠি-ছোরা খেলে এবং ড্রিল করে। তুই ওদের সভ্য হয়ে যা। উচ্চ আদর্শ ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্ব গড়ে উঠবে। বিকেলবেলা ঘরে বসে বসে শুধু বই পড়ার চাইতে ড্রিল, প্যারেড, লাঠি-ছোরা খেলা করলে শরীর মন দুই-ই ভাল থাকবে।"

সমিতির সভ্য হতে প্রথমে আমি রাজী হলাম না। কারণ, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সর্বসময়ের জন্য কাহারও আজ্ঞাধীন হওয়াটা আমার মনঃপূত হ'ল না। এ যেন এক রকম বন্দী-জীবন স্বীকার করে নেওয়ার মত হবে। নিজেকে কার

অধীন করব? সে আমার চাইতে কোন্ বিষয়ে বড়? সত্যিকার এদের উদ্দেশ্য বা আদর্শ কি? কেন এদের আজ্ঞাধীন হব? যদি দেশের মুক্তি-সাধকের দলই গড়ে তুলতে হয় তবে আমি নিজেই বা তা করতে পারব না কেন? বড় হয়ে আমি নিজেই দল গঠন করব।

আরেকটা কথা অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে মনে জাগত। সংস্থা মাত্রই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধাস্বরূপ হয় কি না এবং তাকে পঙ্গু ও পিষ্ট করে দেয় কি না, পরিণত বয়সে এর উত্তর পেয়েছি। সহযোগিতার মাধ্যমেই শক্তির সম্যক্ বিকাশ সম্ভব। সামাজিক মানুষ ছাড়া অন্য মানুষ পশুর পর্যায়ে থেকে যায়। সমাজের পূর্ণ বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আশৈশব যে মানুষ সমাজ ছেড়ে থাকে তার বিকাশ তো দূরের কথা ব্যক্তিত্ব বলে কোন বস্তুর সন্ধানই তার মধ্যে পাওয়া যাবে না।

এই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে মাসখানেক কেটে গেল। পিতৃদেব মাঝে মাঝে তাগিদ দিতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, প্রবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একলা কিছু করা যাবে না—দল না থাকলে।

কয়েকদিন পরেই অত্যন্ত শুদ্ধচিত্তে স্বদেশের উদ্ধার-কামনায় আত্মোৎসর্গের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সমিতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। বললাম, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। পরিচালক জানালেন আমার বয়স কম—নাবালক, সুতরাং অভিভাবকের অনুমতিপত্র চাই। পিতার নিকট বলতেই তিনি সাগ্রহে অনুমতিপত্র লিখে দিলেন।

নারায়ণগঞ্জ সমিতিতে এই অনুমতিপত্র (নাবালকদের জন্য) সাময়িকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। অন্যান্য শাখা-সমিতিতে এ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল কি না বলতে পারি নে। পরে অবশ্য এ নিয়ম উঠে যায়। যতদূর মনে আছে, পুলিনবাবুকে একবার ছেলে-চুরির মোকদ্দমায় ফেলতে চেষ্টা করেছিল। তখনও বিনা বিচারে ধরপাকড় ও দমন নীতিমূলক নানা প্রকার আইন ছিল না। কিন্তু প্রচলিত আইনের দ্বারাই পুলিস সমিতি ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল। কেন্দ্রীয় সমিতির বাড়ী খানাতল্লাশ করে পুলিস একবার কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। তার মধ্যে কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও ছিল। তাদেরই কোনো অভিভাবক দ্বারা ছেলে-চুরির মোকদ্দমা দায়ের করার চেষ্টা হয়েছিল। বোধ হয় এই কারণেই নাবালকের জন্য অভিভাবকের অনুমতিপত্র লওয়ার নিয়ম সাময়িক-ভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল।

আঠার বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সমিতির সভ্য করা যাবে না—এ নিয়ম চলতেই পারে না। এবয়সী ছেলেদের বাদ দিয়ে সেকালেও কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, একালেও তা সম্ভব হয় নি। মহাত্মা গান্ধীও তা পারেন নি। তিনি ছাত্রদের আন্দোলনে আহ্বান করেছিলেন। ছাত্রদের অধিকাংশই আঠার বছরের কম। শ্রমিক কৃষক আন্দোলন ছাড়া বুর্জোয়া যে কোনো আন্দোলনে ছেলেদের বাদ দিয়ে চলে না। কৃষক শ্রমিক আন্দোলনেও যুবশক্তির উচ্চস্থান বর্তমান। সে যাই হউক, আদর্শবাদী হওয়া, বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করার বয়স পনেরো-যোল থেকে একুশ-বাইশ পর্যন্ত। অনুশীলন সমিতির অধিকাংশ সভ্যেরই এ বয়স ছিল এবং সকলেই সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে।

পিতৃদেবের অনুমতিপত্র পরিচালকের হাতে দিলাম। যদিও সমিতির ক্যাপ্টেন বা পরিচালক ছিলেন শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার পাল, কিন্তু তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কার্য পরিচালনা করছিলেন শ্রীযামিনী-মোহন দাস। ঐ সময় শ্রীসীতানাথ দাস ও আরও দু'একজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। প্রাঙ্গণে চলছিল তখন লাঠি ও ছোরা খেলা।

যামিনীবাবু আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। জানালেন সমিতির সভ্য হলে কঠোর নিয়মানুবর্তী হতে হবে। সমিতির আদর্শ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করলেন না। শুধু বললেন যে, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা সংঘবদ্ধ হচ্ছি। কঠোর নিয়মানুবর্তী, ব্রহ্মচর্যধারী ও যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত দেশব্যাপী প্রকাণ্ড এক দল গঠন করে আমরা শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হব ও লক্ষ্যপথে পৌছব। তার পর উপস্থিত নেতৃস্থানীয় দু'একজন সভ্যের মত নিয়ে আমাকে জানালেন—"তোমাকে একসঙ্গেই 'আদ্য' 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা দেব। সাধারণতঃ প্রথমে 'আদ্য' প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। পরে উপযুক্ত মনে হলে 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা দেওয়া হয়। তোমাকে একসঙ্গেই দেব। কিন্তু মনে রেখ 'মন্ত্রগুপ্তি' রক্ষা করতে হবে। সমিতিতে যা কিছু জানবে ও শিখবে তা কাউকেই, বিশেষভাবে সমিতির বহির্ভূত কোন লোককে জানাবেও না, শেখাবেও না। তুমি তা পারবে বলে মনে হচ্ছে।"

তার পর তিনি দু'খানা ছাপান কাগজ—'আদ্য' ও 'অন্ত' প্রতিজ্ঞা হাতে দিয়ে কয়েকটা ধারার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে ব্যাখ্যা করলেন। প্রথমে এই পত্র দু'খানা নিজের মনে পাঠ করে কোন আপত্তি থাকলে বা নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করলে প্রতিজ্ঞাগ্রহণে বিরত থাকতে বললেন। খুব মনোযোগের

সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত করে জানালাম, আমি প্রস্তুত। তখন তিনি উহা স্পষ্ট উচ্চারণ করে পাঠ করতে বললেন। পাঠ সমাপ্ত হলে বললেন, "তোমার প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ সমাপ্ত হ'ল। চাঁদা দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তোমার দ্বারা যা সম্ভব তা সময় মত দিও।" পরে তাঁর আদেশে বোধ হয় সীতানাথবাবু আমাকে তরবারির ও ছোরা খেলার প্রথম পাঠ 'তামেচা, বাহেরা, শীর; শীর, তামেচা, বাহেরা' শিক্ষা দিলেন।

এমন সময় হুইস্‌ল বেজে উঠল। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নতুনদের আলাদা সারি। পরিচালক ঐ সারির মধ্য থেকে একজনকে বললেন— 'তুমি ড্রিল করাও।' যদিও পরিচালক নিজেই অনেক সময় ড্রিল, প্যারেড করাতেন, কিন্তু এমনি আদেশ যাকেই করুন না কেন তাকেই তা বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করতে হ'ত—বয়স বা সভ্য হিসেবে জুনিয়ার বলে কোন কথা উঠত না। অর্থাৎ যদি বয়স ও সভ্যরূপে সর্বকনিষ্ঠকেও এমনি আদেশ দেওয়া হ'ত তবে আর সবাইকে ঐ সময়ের জন্য তার হুকুমমতই ড্রিল করতে হ'ত। এর দ্বারা শুধু যে অনেক সভ্যের পরিচালনা করায় শিক্ষালাভ হ'ত তা নয়, ফলে সভ্যদের মধ্যে ক্যাপ্টেন বা তার দ্বারা নিয়োজিত যে কোনো লোকের হুকুম মেনে চলার শিক্ষাও হ'ত।

দোষ-ত্রুটির জন্যে শাস্তি পেতে হ'ত। প্যারেডের সময় কথা বললে, লাইন ভাঙলে বা অন্য কোনো নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করলে হাতে বা পায়ে লাঠির আঘাত সহ্য করতে হ'ত। লাইনে দাঁড়ান সবাইকে (বিশ থেকে পঞ্চাশ জন) কমাণ্ডার শাস্তি দিতেন একই সঙ্গে—এ আমি নিজেই দেখেছি। আমি নিজেও হাত পেতে শাস্তি গ্রহণ করেছি। একটা জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, এ শাস্তির জন্য কারুর মনে কোনোরূপ বিরূপ ধারণা জন্মাতে দেখি নি বা তার পরদিন থেকে আর এল না—এমন হ'ত না। কি প্রকাশ্য, কি সম্পূর্ণ গুপ্ত, সকল অবস্থাতেই অনুশীলন সমিতিতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও কঠিন শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গুরুতর অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। এসব ঘটনা যথাস্থানে উল্লেখ করব।

রাত্রিতে বাড়ী ফিরে গিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র দু'খানা বার বার মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলাম। চিন্তা করতে লাগলাম তার পূর্ণ তাৎপর্য। অনুশীলন সমিতির ঢাকা-কেন্দ্রের প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেছিলেন পুলিনবাবু এবং তা পি. মিত্র মহাশয় অনুমোদন করেছিলেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের মারফতই বোঝা যায় পুলিনবাবু

কত বড় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। বুঝতে পারা যায়, তিনি মানব-চরিত্র সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি যখন প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন তখন সমিতি প্রকাশ্যভাবেই কাজ করছে। সমিতি যখন সম্পূর্ণ গুপ্ত হ'ল তখনও সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের কোন অদল-বদল আমরা প্রয়োজন মনে করি নি। সংঘ পরিচালনার নিয়ম সময় ও অবস্থা পরিবর্তনে বদলেছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞাপত্রের পরিবর্তন পরিবর্ধন প্রয়োজন হয় নি।

সেদিন প্রতিজ্ঞাপত্র যেভাবে মনে দাগ কেটেছিল তারই সামান্য আভাস দেওয়ার চেষ্টা করছি—

(ক) "এই সমিতি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হইব না।" সুতরাং সমিতির সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালের জন্য স্থাপিত হ'ল। এটা এমন একটা মামুলি সমিতি নয় যে, দু'চার দিনের বা বছরের সভ্য হলাম। বিনা সর্তে স্বীকার করে নিলাম যে, সমিতির উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত আজীবন আমি সমিতির সভ্য।

ব্যক্তিগত জীবনে আমি সমিতি থেকে কোনদিনই বিচ্ছিন্ন হই নি বা হওয়ার কথা ভাবতেও পারি না। কল্পনাতেও এমন কথা মনে উদিত হয় না। হৃদয়ের সমস্ত আকর্ষণ, ভালবাসা ও গর্ব যেন এই অনুশীলন সমিতির মধ্যে ঘনীভূত হয়ে আছে।

(খ) "আমি সর্বদা সমিতির নিয়মাধীন থাকিব।" শুধু সভ্য হলাম তা নয়। সমিতির নিয়মই আমার নিয়ম। কেবলমাত্র সমিতির প্রাঙ্গণে বিকেল-বেলার সময়টুকু নয়, দিবারাত্রি সর্বক্ষণের জন্যই আমি সমিতির নিয়মাধীন হলাম।

(গ) "যখন যেখানে থাকি না কেন, পরিচালকের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র চলিয়া আসিব।" পরিচালকের আদেশ সকলের উপর স্থাপিত হ'ল—পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব সকলের উপর। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পরিচালক সমিতির মঙ্গলকর কার্য ছাড়া অনর্থক কোন আদেশ করেন না। এ সব সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে হ'ত, যার ফলে অনেক সময় বাড়িতে অনুপস্থিতির সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারার জন্য গুরুজনের কাছে অসীম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে।

(ঘ) "আমি সর্বদা সমিতির মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃত থাকিব।" সমিতির উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধিই আমাব কাজ। কেবল অবসর সময়ের জন্য নয়, চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই সমিতির মঙ্গল আমার সর্বপ্রধান কাজ।

(ঙ) "আমি মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করিব। এই সমিতিতে যাহা কিছু জানিব ও শিখিব তাহা বাহিরের লোককে বলিব না বা শিখাইব না।" গুপ্ত-সমিতির যুগে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কথা। এ ভিন্ন কোনো গুপ্ত-সমিতিই রক্ষা পায় না। এমনি ভবিষ্যৎ ভেবেই প্রকাশ্য সমিতির যুগে পুলিনবাবু এই প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অনুশীলন সমিতি ছিল একটা নিয়মানুবর্তী সামরিক সংঘ। প্রস্তুতির জন্য মন্ত্রগুপ্তি ছিল অপরিহার্য।

(চ) "আমি নিষ্প্রয়োজনে এই সমস্ত বিষয় (অর্থাৎ সমিতির ভিতরের কথা) আলোচনা করিব না। তর্ক ও বাচালতা পরিত্যাগ করিব।" অনর্থক আলোচনা প্রায়ই মানুষকে বাচাল করে তোলে এবং তার ফলে মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ায়।

(ছ) "আমি সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিকারে যত্নবান হইব এবং পরিচালককে জানাইব।" বাইরে ষড়যন্ত্র ও ভিতরে বিশ্বাসঘাতকতা—এ তো হবেই, কাজেই সমিতির সভ্যরা যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখে তবে সমিতির বিপদ, বিশেষ করে অন্তর্বিরোধ ও ষড়যন্ত্র সহসা ঘটতে পারে না।

(জ) "পরিচালকের নিকট সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না, কোন কিছু গোপন করিব না।" একমাত্র শত্রু ভিন্ন মিথ্যাচার ভাল নয়। প্রয়োজনবোধে শত্রুর নিকট মিথ্যা বলাই শ্রেয়। কিন্তু পরিচালকেব নিকট গোপনতা বা মিথ্যাচার অসম্ভব। এ না হলে কোনো সমিতিই হতে পারে না।

(ঝ) "আমি চরিত্র নির্মল রাখিব; কোন কিছুতেই লোভ করিব না; বিলাসিতা বর্জন করিব।" চরিত্র নির্মল না থাকলে সমিতির কার্যে একাগ্রতা আসবে না। বিক্ষিপ্ত, অব্যবস্থিত চিত্তকে একমুখী করে কোনো কিছুতেই প্রলুব্ধ না হয়ে একাগ্রচিত্তে সাধনায় ব্যাপৃত থাকব। তবেই তো অপরাজেয় শক্তির অধিকারী হয়ে সাধনায় সিদ্ধি অনিবার্য হবে। যে ব্যক্তি ষড়রিপুর দাস সে দেশের দাসত্ব-বন্ধন দূর করবে কোন্ শক্তিতে?

(ঞ) "আমি দেশের ক্রমে জগতের মঙ্গলসাধন করিব।" শুধু ইংরেজের কবল থেকে উদ্ধার সাধনাই আমাদের কাম্য ছিল না। এ প্রথম ধাপ মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন জাতির মুক্তি এবং পৃথিবী থেকে অন্যায়-অত্যাচার সমূলে উৎপাটন করাই আমাদের ব্রত। আমাদের এই আদর্শ প্রচারিত হয়েছে ভগবদ্গীতায়—

যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে দেবতা আবির্ভূত হন শুদ্ধচিত্ত মানুষের মধ্যে মহাশক্তির সঞ্চার করে। তার ফলে ধর্ম সংস্থাপিত হয়। গো-ব্রাহ্মণের হিত-সাধন হয়।

প্রতিজ্ঞাপত্রের আরও অনেকগুলি ধারা ছিল। আদ্য ও অন্ত প্রতিজ্ঞা ছাড়া আর একটা প্রতিজ্ঞা ছিল "বিশেষ প্রতিজ্ঞা।" নিয়মমত দেবার্চনা ও হোমানল জ্বেলে যজ্ঞ করার পর সভ্যকে তরবারি ধারণ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হ'ত। পিতৃ-পিতামহ, ঈশ্বর, দেবগণ, আকাশ, জল-বায়ু, অগ্নি তথা বিশ্ব-প্রকৃতির সকলকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করতে হ'ত—দেশের মুক্তিকামনায় কোন কাজই আমার অকরণীয় থাকবে না। কোন ত্যাগেই আমি পশ্চাৎপদ হব না। প্রয়োজন হলে অতি প্রিয় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবকে হত্যা করতেও ইতস্ততঃ করব না। মায়ামমতা কিছুই আমার মধ্যে স্থান পাবে না।

এই বিশেষ প্রতিজ্ঞার খুব প্রচলন ছিল না। প্রথম অবস্থায় অল্প কয়েকজন এ গ্রহণ করেছিল। পি. মিত্র মহাশয় পুলিনবাবুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পুলিনবাবু অল্প কয়েকজনকে এভাবে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সর্বপ্রথমে বিশেষ প্রতিজ্ঞাই ছিল। অমৃত হাজরা (পার্টির নাম শশাঙ্ক) বলেছেন যে, তিনি যখন সমিতির সভ্য হন তখনও আদ্য-অন্ত প্রতিজ্ঞা রচিত হয় নি। সমিতি স্থাপন মাত্রই পুলিনবাবু বিশেষ বিশেষ কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও হাতে পরিধান করে, কপালে ত্রিশূল চিহ্ন এঁকে, নিজের ও দীক্ষার্থীর কপালে রক্তচন্দনের তিলক অঙ্কন করে যজ্ঞে বসতেন। যজ্ঞস্থলে তামা, তুলসী, গীতা, গঙ্গাজল ও তরবারি রক্ষিত থাকত। দীক্ষার্থী এই সমস্ত স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করত—"অগ্নি, জল-বায়ু, দেবতাগণ সর্ব লোক সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিব। দেশের বিরুদ্ধে কখনও কিছু করিব না। যদি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি তবে সমস্ত দেশের ও দেশভক্তগণের অভিসম্পাত আমার উপর বর্ষিত হইবে। আমি ধ্বংস হইব। আমি দেশের, ক্রমে জগতের মঙ্গল করিব।" প্রতিজ্ঞা-পাঠের সময় পুলিনবাবু পূর্বোল্লিখিত দ্রব্যগুলি সভ্যের মাথার উপর স্থাপন করে ধরে থাকতেন। প্রথমে পুলিনবাবুর বাড়ীতেই

এভাবে দীক্ষাদান হ'ত। পরে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে এ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হ'ত।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিনবাবু বুঝতে পারলেন যে, সমিতিকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে বিরাট শক্তিতে পরিণত করতে হবে, সভ্যসংখ্যা হাজারে হাজারে বাড়াতে হবে, এভাবে দীক্ষা দিলে চলবে না। প্রতিজ্ঞার ভাষাও বদলাতে হবে। তাই তিনি আদ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞা রচনা করে ব্যাপক প্রস্তুতির জন্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণ পর্বকে সহজ করে ফেললেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি. মিত্র (প্রমথনাম মিত্র) ছিলেন অনুশীলন সমিতির আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁকে আমাদের দেশের বিপ্লবী-সমিতির জনকস্বরূপ বলা যায়। বিপ্লবী-সমিতির গঠনের উৎসাহদাতা ছিলেন বলে বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গেও পি. মিত্র মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

পি. মিত্র নিজে খুব বড় বক্তা ছিলেন না। তিনি সেকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে বার হতেন। বিপিন পালের অনেকগুলি বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর বজ্রকণ্ঠে আবৃত্তি শুনলাম—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে।" পরে সভায় রবীন্দ্রনাথের এ নতুন গানটি গীত হ'ল। আর একবার মুন্সিগঞ্জের এক সভায় বললেন, ষ্টীমারে পদ্মানদী দিয়ে আসবার সময় চতুর্দিকের শ্যাম-শোভার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হ'ল—

"আর বাজাইও না ঐ মোহন বাঁশী,
রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ পরাণে আসি,
রুদ্ধ কর সব ললিত ছন্দ……" ইত্যাদি।

তিনি নিজে কবিতা রচনা কবতে পারতেন। গ্রামে গ্রামে সমিতিগঠন ও বিপ্লবান্দোলনের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করতেন। সমিতির প্রচারকার্যে বিপিনচন্দ্র পালের দান অপরিসীম। ঢাকায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবাবু, আশুদাস, ললিতমোহন রায় প্রভৃতি বহু লোক আসামী হন। মোকদ্দমার রায়ে জজসাহেব উল্লেখ করেন যে, বিপিনচন্দ্র পাল হলেন অনুশীলন সমিতির সহ-ষড়যন্ত্রকারী (Co-Conspirator)।

প্রত্যেক সভার পর উদ্বুদ্ধ জনগণের মধ্য থেকে নিপুণতার সঙ্গে লোক বাছাই করতেন পি. মিত্র। নির্দেশ দিতেন পুলিন দাসের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হও।

পুলিনবাবুর সঙ্গে পি. মিত্রের সাক্ষাৎ ও সহকর্মী হওয়ার ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগে থেকেই পুলিনবাবু ও অপর কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। তখন বিপিন পাল এলেন ঢাকায় বক্তৃতা দিতে। এই সম্পর্কে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি জানালেন যে, পি. মিত্র ময়মনসিং যাবেন মোকদ্দমা উপলক্ষে এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার উপদেশ দিলেন।

ময়মনসিং যাওয়া ও ফেরা উভয় পথেই পি. মিত্র মহাশয় ঢাকায় নেমে কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনি অনুশীলন সমিতি নাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। জানালেন যে, কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং একই নামে ও পরিচালনায় দেশব্যাপী সমিতি গঠন করা উচিত। পূর্ববঙ্গে কাজের ভার কাকে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে পি. মিত্র উপস্থিত সকলের পরামর্শ চাইলেন। প্রায় সকলেই পুলিনবাবুর নাম প্রস্তাব করেছিল। মিত্র মহাশয় প্রথমে পুলিনবাবুর সংঘ-গঠনক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। কিন্তু সকলের সমবেত মতকে অগ্রাহ্য না করে পুলিনবাবুর উপরই পরিচালনার ভার অর্পণ করে যথাযথ উপদেশ দান করে কলিকাতায় ফিরে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, পুলিনবাবু যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পুলিনবাবুর কর্মশক্তি পি. মিত্রকে মুগ্ধ করে। তিনি একবার অতি সামান্য সময়ের মধ্যে দেখতে চাইলেন সমস্ত সভ্য ও অসংখ্য অনুগামীদের সমাবেশ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পুলিনবাবু তা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পি. মিত্রের আদেশে পুলিনবাবু পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে নিজে দল গঠন করতে গেলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমিতির শাখা স্থাপিত করে হাজার হাজার সভ্য সংগ্রহ করলেন এবং এমন সুপরিচালিত ও সুসংগঠিত করে তুললেন যে, কর্তৃপক্ষ ও দেশের জনগণ বিস্মিত হ'ল।

এই সময়ে পূর্ববঙ্গের লাটসাহেব স্যার বম্‌ফিল্ড ফুলার ও বিপিনচন্দ্র পাল একই দিনে ঢাকায় এলেন। লাটসাহেবকে অভিনন্দন ও স্বাগত জানাতে জনকয়েক খোসামুদে ধামাধরা ছাড়া আর কেউ এল না। আর এদিকে বিপিন পালকে স্বাগত জানাতে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে সারা ঢাকা শহরের লোক যেন ভেঙ্গে পড়ল স্টেশনে। সেই বিপুল জনসমাবেশ দেখে কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

কলিকাতায় মাঝে মাঝে মফঃস্বলের কর্মীরা সমবেত হতেন। পুলিনবাবুও উপস্থিত থাকতেন। তখন দেশে বিপ্লবী-কর্মীদের দলাদলি ছিল না। পি. মিত্র, শ্রীঅরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক উপস্থিত থাকতেন। কর্ম পরিচালনা সম্বন্ধে নানা আলোচনার পর যা স্থির হ'ত তা সমিতির সমস্ত শাখা-প্রশাখায় জানিয়ে দেওয়া হ'ত। সমস্ত দেশের জন্য একই কর্মসূচী ও প্রণালী স্থির হ'ত। একবার এমনি এক সভায় শপথ গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করে এই প্রথা প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে শপথপত্র রচনার কথা উঠতেই পুলিনবাবু জানালেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর পরিচালিত সমিতিগুলিতে শপথ গ্রহণ-প্রথা প্রবর্তন করেছেন। তিনি আদ্য ও অন্ত্য প্রতিজ্ঞাপত্র দু'খানা সকলের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আলোচনার পর এই প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণই স্থির হয়।

পূর্ববঙ্গে মফঃস্বলে সভ্যদের শিক্ষার জন্য ঢাকা-কেন্দ্র থেকে লোক পাঠাতেন পুলিনবাবু। মাঝে মাঝে তিনি নিজেও যেতেন এবং সার্কুলার পাঠাতেন। সময় সময় অপেক্ষাকৃত উন্নত শাখা থেকেও লোক পাঠানর নিয়ম ছিল। নারায়ণগঞ্জের পরিচালনাধীনে নিকটস্থ হরিহরপাড়া বন্দর, শহরতলী ও নিকটবর্তী গ্রামে শাখা-সমিতি ছিল। এসব জায়গায় আমাকেও পাঠান হ'ত লাঠি-ছোরা, তলোয়ার খেলা, ড্রিল শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করার জন্য। যদিও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সকল সভ্যকেই পরিচালকের আদেশপালনের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতে হ'ত, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেভাবে সকলকে প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী গঠিত হতে সময় লাগত। কিন্তু এরই মধ্যে কেউ কেউ উৎসাহ, উদ্যম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা দেখিয়ে পরিচালকের নিকট বিশ্বাসী ও বেশী অগ্রসর বলে প্রতিপন্ন হ'ত। নারায়ণগঞ্জ সমিতিতে সীতানাথ দাস, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, গুণেন্দ্র সেন, হেমেন্দ্র ধর, আদিত্য দত্ত, বাণী ব্যানার্জি, আমি ও আরও কয়েকজন এমনি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। এজন্য বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে আমরাই নিযুক্ত হতাম। অবশ্য একটা বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য করত যে, নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক আওয়াজ পাওয়ামাত্র সমিতির সভ্য যে যেখানে যে অবস্থায় থাকত ছুটে এসে একত্র হতে হ'ত। সকলেই লক্ষ্য করল যে, দেশে এমন একদল ছেলে প্রস্তুত হচ্ছে যারা আহ্বানমাত্র সকলে একত্রিত হয় এবং একই আদেশে নিয়মানুবর্তী হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

সমিতির ছেলেদের ছোট-বড় সর্বপ্রকার কাজই অকাতরে করবার জন্য

প্রস্তুত থাকতে হ'ত। সময়ে সময়ে রেল-ষ্টীমার স্টেশনে কুলিগিরি, পুকুরের পানা, রাস্তা ও জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ আমরা করেছি। এসব কাজ করে যা উপার্জন হ'ত তা পরিচালকের হাতে সমর্পণ করতাম সমিতির কার্যে ব্যয় করবার জন্য।

জনগণের সেবা ও বিপন্নের রক্ষা সমিতির সভ্যদের অবশ্যকর্তব্যকার্য ছিল। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সেবা করার লোক পাওয়া কঠিন হ'ত। খবর পাওয়ামাত্র সমিতির ছেলেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেবার ভার গ্রহণ করত।

কলিকাতায় সেবার অর্ধোদয়-যোগ উপলক্ষে মফঃস্বল থেকে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী সমাগত হয়। যাত্রীগণের সেবা ও রক্ষার কাজ স্বেচ্ছাসেবকরা এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে করেছিল যে, সারা বাংলা দেশ তাদের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠল। বিদেশী সরকারের দরদ দেশবাসীর প্রতি না থাকলেও দেশের যুবকগণ আমাদের রক্ষা ও সেবার জন্য প্রস্তুত আছে, এ ভরসা লোকের মনে জাগ্রত হ'ল। অগণিত গ্রাম্য বৃদ্ধারা দু'হাত তুলে স্বেচ্ছাসেবকদলকে আশীর্বাদ করেছে এ আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে কিছুদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত লাঙ্গলবন্দ গ্রাম ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। এখানে বৈশাখ মাসের অষ্টমী তিথিতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করে। তাদের সেবা ও রক্ষার কাজ সমিতির সভ্যদের গ্রহণ করতে হ'ত।

মেলায়, বারোয়ারী উৎসবে, যাত্রা-থিয়েটারে, যেখানেই লোক-সমাগম হ'ত সেসব জায়গায় আমরা শান্তি রক্ষা করতাম। মেয়েদের প্রতি অত্যাচার না হয় সেদিকে নজর থাকত। নারায়ণগঞ্জের থানা কম্পাউণ্ডে দারোগাদেরই উদ্যোগে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী উৎসব হ'ত। যাত্রা-থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতি হ'ত। সে সময় পর্যন্ত থানার কর্তৃপক্ষ শান্তি-রক্ষার জন্য সমিতির নিকট আবেদন করত।

সেবা-সমিতি, পিকেটিং, বিপন্নের রক্ষায় দুর্বৃত্তের উপর বলপ্রয়োগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় আক্রান্ত-রক্ষার কাজ অনুশীলন সমিতির নামে করা হ'ত না। সমিতির সভ্যগণ পরিচালকের অনুমতি নিয়ে এসব কাজে যোগ দিতে পারত। সমিতি এসব কাজে গঠিত সংঘের দায়িত্ব দৃশ্যত গ্রহণ করত না। কারণ, এই সমস্ত কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সরকারের সঙ্গে প্রায়ই বিরোধ বেধে যেত। বিপ্লবের জন্য গোপনে ও যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে প্রস্তুতিই ছিল অনুশীলন সমিতির

উদ্দেশ্য। কাজেই যতদূর সম্ভব ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে বৃহৎক্ষেত্রে প্রস্তুতির পথে বাধা সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করা হ'ত না।

সমিতির ছাত্র-সভ্যরা যাতে লেখাপড়ায় অমনোযোগী না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকত। রীতিমত লেখাপড়া শিখছি কিনা দেখবার জন্য কয়েকবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে পড়াশুনা ছেড়ে গৃহত্যাগ করে আসবে সে যেমন নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে সমিতির কাজ করবে, তেমনি যে ছাত্র তাকেও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া করতে হবে। নির্দিষ্ট কর্মে অবহেলা করলে তা সমিতির কার্যেও এসে বর্তাতে পারে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে।

সমিতির সভ্য হবে সর্ববিষয়ে আদর্শ-চরিত্র। নিজের চরিত্রবলেই তাকে দেশের চিত্ত জয় করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের প্রধান অস্ত্র ও সম্বল হবে চরিত্রবল। তাই সমিতির সভ্যদের চলাফেরা ও সঙ্গী-সাথীর খবর কর্তৃপক্ষ রাখতেন এবং চরিত্রহীনের সঙ্গে না মিশতে পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দিতেন।

পরবর্তীকালে যখন ব্রিটিশের দমননীতি স্বরু হয়, অনুশীলন সমিতি যখন সম্পূর্ণ গুপ্ত-সমিতিতে পরিণত হয়, যখন সমিতির সভ্য হওয়াই বিপজ্জনক ছিল—জেল-ফাঁসি-দ্বীপান্তর সবই হতে পারত—পরিবারকে পরিবারই বিনষ্ট হতে পারত, তখন অনেক অভিভাবক ছেলেকে সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য নানা-প্রকার নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছেন। তখনও আমরা এই সমস্ত পরিবারের সভ্যকে উপদেশ দিতাম তারা যেন অভিভাবকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করে। তারা কোনোমতেই শত্রুর পর্যায়ে পড়তে পারে না। তারা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তারা ও তোমরা দুই কালের মানুষ। মত, আদর্শ ভিন্ন হবেই। ভুল বুঝে বা না বুঝে ছেলের মঙ্গলের জন্যই অতি নিষ্ঠুর নির্যাতন করেন। নিজেরা সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শে অটল থাকলে পিতামাতা একদিন তোমাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। বিপ্লবীদের ভালবাসবেন। বাস্তবক্ষেত্রে এমন অনেক ঘটতে দেখেছি।

সকলকেই নির্ভীক হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বিপদ-আপদের সম্ভাবনা দেখে কর্তব্যচ্যুত হবে না, এই ছিল সমিতির শিক্ষা। অন্ধকার রাত্রিতে একাকী শ্মশানে যাওয়া, ভূত অস্বীকার করা, যে রাস্তা বা গাছের নীচ দিয়ে যেতে লোকে ভয় পায় সেপথে যাওয়া সমিতির সভ্যদের অবশ্যকর্তব্য ছিল। প্রশস্ত

তরঙ্গমুখর খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া বা সাঁতরে পার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ঝড়ের রাতেও ছোট ডিঙ্গি-নৌকোয় পদ্মানদী পার হতে শঙ্কিত হবে না, এই ছিল সমিতির শিক্ষা। লাঙ্গলবন্দের অষ্টমী স্নানপর্বে সেবাকার্য করতে গিয়ে প্রায় প্রতি বছরই পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হ'ত। যে সভ্য অস্ত্রধারী পুলিসকে বাধা দিতে সাহসী হ'ত না, বা লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত হ'ত, সে দুর্বলচিত্ত বলে নিন্দিত হ'ত।

আসল কথা, সমিতির সভ্যকে সর্বকার্যে দক্ষতা লাভের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। নৌকো চালান, সাইকেল-ঘোড়ায় চড়া, রোদ-জল অগ্রাহ্য করে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে অক্লান্তভাবে সারাদিন পায়ে হেঁটে যাওয়ার অভ্যাস করতে হ'ত। কষ্ট-সহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী এবং আহার-নিদ্রা জয় করতে না পারলে আদর্শ সভ্যরূপে গণ্য হ'ত না। সম্পূর্ণ গুপ্ত-সমিতির যুগে এসব গুণের প্রয়োজন হয়েছিল খুবই বেশী।

ড্রিল-প্যারেডের সঙ্গে সঙ্গে বহুসহস্র লোককে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুপরিচালিত করার শিক্ষাও দেওয়া হ'ত। শুধু সমতল মাঠে নয়, ভগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তায়, খাল, বিল, পুকুর, ঝোপঝাড়ে সমাকীর্ণ স্থানেও শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনার শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সামরিক কায়দায় কৃত্রিম যুদ্ধের সময় এ সবের পরীক্ষা হ'ত। এই সামরিক যুদ্ধ অতি চমৎকার আকর্ষণীয় হ'ত। এই যুদ্ধ দেখতে দেশের হাজার হাজার লোক সমবেত হ'ত। এবং প্রয়োজন হ'ত বিরাট আয়োজনের।

সাধারণ যুদ্ধের মতোই দুটো দল হ'ত আক্রমণকারী ও রক্ষী। এক এক পক্ষে সহস্রাধিক যোদ্ধা যোগদান করত। রক্ষীবাহিনীর কর্তব্য হ'ত একটা বাছাইকরা স্থানকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। এই বাছাইকরা স্থানের নাম হ'ত দুর্গ। দুর্গের নিশান উড়ত কোনো সুউচ্চ বৃক্ষের শীর্ষে কিংবা এমন কোনোস্থানে যেখানে আক্রমণকারীদল সহসা যেতে না পারে। জলপূর্ণ দীঘি, পুকুর, খাল দ্বারা বেষ্টিত স্থানই নির্বাচিত করা হ'ত। কতকটা হয়ত দুর্গম জলাকীর্ণ বা উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত এবং প্রবেশপথ সংকীর্ণ আর সংখ্যায় দু'একটার বেশী নয়। আক্রমণ করে কেউ দখল করতে না পারে এজন্য এগুলি আরও সুরক্ষিত করা হ'ত। এই দুর্গের উপর যে নিশান উড়ত তা যদি আক্রমণ-কারীদল নামিয়ে নিজেদের নিশান উড়িয়ে দিতে পারত তবে তাদের যুদ্ধ জয় হ'ল বলে ঘোষণা করা হ'ত।

উভয় পক্ষই এক-একজন সেনাপতির অধীনে থাকত। এই সেনাপতি

আবার তাঁর আজ্ঞাধীনে আরও সহকারী নিয়োগ করতেন সাধারণ সেনা-বিভাগের অনুকরণে।

সহস্রাধিক যোদ্ধা দুর্গ-প্রহরায় নিযুক্ত থাকত এবং প্রবেশপথগুলিতে নানা বাধার সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক লোক পাহারা দিত। বৃক্ষশীর্ষ বা কোনো সুউচ্চ স্থান থেকে দূরবীণ নিয়ে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ত। শুধু তাই নয়, এডভান্স পার্টি ও পেট্রোল পার্টি থাকত। শত্রুর গতিবিধি ও শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করে প্রধান কেন্দ্রে তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দিতে তাদের সাইকেল-আরোহী সৈন্য থাকত। অনেক সময় পথের জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেও শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হ'ত।

যোদ্ধাদের পোশাক হ'ত অতি সাধারণ। মালকোচা করে ধুতি এবং শার্ট কিংবা পাঞ্জাবি। পায়ে জুতো পরার কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মাথায় একটা পাগড়ি পরতে হ'ত। দু'পক্ষের পাগড়ির রং হ'ত আলাদা।

যোদ্ধাদের অস্ত্র হিসেবে থাকত লাঠি। বন্দুকের মাথায় সঙ্গীন চড়ালে যতটা লম্বা হয় লাঠিটার মাপও হ'ত ততটা। এই লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে একটা পুটুলির মত করা হ'ত এবং যার যার রংগোলা বাল্তির মধ্যে ডুবিয়ে নিতে হ'ত। বিপক্ষের শরীরে এই রং লাগলে তাকে মৃত বা আহত মনে করে সরিয়ে ফেলা হ'ত।

সহস্রাধিক আক্রমণকারী নানা জায়গা থেকে মার্চ করে এসে দলে দলে নানা দিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করত। বেয়নেট চার্জের ধরনে আক্রমণ করা হ'ত। যদিও প্রথমে নিয়মমাফিক আক্রমণ হ'ত, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোথাও কোথাও মারামারি হয়ে গেছে এবং অনেক লোক প্রকৃতপক্ষেই আহত হয়েছে। মাথা ফেটে যেত ; হাত-পাও ভাঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ত। ডাক্তার, শুশ্রূষাকারী, ঔষধপত্র, ব্যাণ্ডেজ ও স্ট্রেচার সবই প্রস্তুত থাকত। পানীয় জল সররবাহের ব্যবস্থাও থাকত।

সাধারণত সমিতির বহির্ভূত অথচ সহানুভূতিশীল গণ্যমান্য লোকরাই বিচারক নিযুক্ত হতেন। প্রত্যেক সংগ্রামক্ষেত্রেই এঁরা উপস্থিত থাকতেন এবং নিহত ও আহতদের সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতেন।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর দুই পক্ষের সেনাপতিগণ একত্র মিলিত হয়ে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা নীতি এবং যুদ্ধ-কৌশল আলোচনা করতেন। দোষত্রুটির আলোচনা হ'ত। যে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তেমন লোককে সম্মানিত করা হ'ত।

অনেক সময় পুরস্কারও দেওয়া হ'ত। যুদ্ধের সময়ে নিয়মানুবর্তিতা, নির্ভীকতা, আদেশ পালনে প্রস্তুতি প্রভৃতি সবই লক্ষ্য করা হ'ত। যার মধ্যে এসবের অভাব দেখা যেত তার শাস্তি গ্রহণ করতে হ'ত।

এবম্বিধ যুদ্ধের জন্য সমিতির কোনো খরচ হ'ত না। পোশাক তো যার যার নিজস্ব। যাতায়াতের খরচ নিজেকেই বহন করতে হ'ত। যথাসম্ভব পায়ে হেঁটেই চলার বিধি। নেহাত প্রয়োজনে নৌকো কিংবা গাড়ীতে উঠত। নিজের নিজের খাদ্য নিয়ে আসতে হ'ত কিংবা অন্য কোন উপায়ে নিজেরই ব্যবস্থা করতে হ'ত। যে খাদ্য আসত তা সবাই মিলে আহার করত।

আমি দু'বার এমনি কৃত্রিম যুদ্ধে যোগদান করেছি। একবার ঢাকার স্বামীবাগের কাছে একটা জায়গায়—সেখানে ছিলাম আক্রমণকারীদলে। গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ থেকে মার্চ করে আক্রমণ করতে। আর একবার যোগ দিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জ লক্ষ্মীনারায়ণজীউর আখড়ার সম্মুখস্থ জায়গায়—সেখানে ছিলাম দুর্গরক্ষীদলে সাধারণ সৈন্য হিসেবে একেবারে সম্মুখের সারিতে। সংগ্রামের সময় আঘাতও পেয়েছি, কিন্তু লাইন পরিত্যাগ করা নিয়ম ছিল না। যত বড় বিপদই আসুক না কেন পরিচালকের আদেশ ভিন্ন পিছিয়ে গেলে কিংবা পালিয় গেলে কিংবা নিরাপদ স্থান বেছে নিলে ভীষণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি পেতে হ'ত।

সমিতির কেন্দ্রে ও শাখা-সমিতিতে মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতামূলক তরবারি, লাঠি-ছোরা খেলা এবং ড্রিল-প্যারেডের প্রদর্শনী হ'ত। এমনি প্রদর্শনীতে আমিও অনেকবার যোগ দিয়েছি। সঙ্গে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক ও বীরত্বপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করা হ'ত। নিজেদের লিখিত ছোট ছোট নাটক, কিংবা কোনো নাটকের অংশ-বিশেষও অভিনয় করতাম। এ উপলক্ষে বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন।

সমিতির তরফ থেকে জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে কথকতার ব্যবস্থা করা হ'ত। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা থেকে আগত শ্যামাচরণ পণ্ডিতের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমরা প্রচার করতাম যে, কথকতার বিষয় হবে বৃত্রাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ বা মহাভারতের উপাখ্যান। শ্যামাচরণবাবু কথক ঠাকুরদের মতই ধূপধূনা জালিয়ে উচ্চ স্থানে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করে কপাল রক্তচন্দনে লিপ্ত করতেন। তার পর দু'একটা কথা ঘোষিত বিষয় সম্পর্কে বলেই ব্রিটিশ রাজত্বের

ধ্বংস ও ইংরেজ নিধন-পর্বে এসে পড়তেন। তাঁর গান ও কথকতার গুণে লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনত। তাঁর গানের দু'একটা লাইন এখনও মনে আছে :

সার্ধ শত বর্ষ গত দেশের সন্তান কত
একবার করেছিল পণ

* * *

আবার মিরাট তোল জাগাইয়া
আবার হলদিঘাটে উঠ্‌ করে নাচিয়া
আবার দেবীর পূজা সমাপিয়া
কালিঘাট রক্তে রাঙা কর না।
ঝাঁসি হতে লক্ষ্মীবাই, মালব হতে তাঁতিয়া
চিতোর হতে নানা সাহেব উঠেছিল গর্জিয়া
বিহার হতে কুমারসিংহ ঘোচাতে মার বন্ধন।

ইংরেজের হস্তে ভারতীয় নারীর লাঞ্ছনা, অপমান, শ্বেতাঙ্গের পদাঘাতে কুলিদের প্লীহা ফেটে মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর রচিত গান ছিল।

মুকুন্দদাসের সঙ্গে আমাদের সমিতির সভ্যদের, বিশেষ করে বরিশাল জেলার সভ্যদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, সম্পূর্ণ গুপ্ত-সমিতির যুগেও যখন আমরা পলাতক জীবন যাপন করছি তখনও তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ করতে দ্বিধা করি নি। তাঁর যাত্রাভিনয় ও গান আমাদের সমিতির আদর্শ প্রচারে এবং সামাজিক দুর্গতি দূরীকরণে আর রাজনৈতিক জাগরণে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

দেশের জনগণের উপর সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এক সৈন্যদল প্রস্তুত হচ্ছে, এ বিশ্বাসও লোকের মনে বদ্ধমূল হ'ল। ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হলেন এবং সমিতির কার্যাবলী লক্ষ্য করবার জন্য শল্কল্ড (Salkold) নামক এক আই-সি-এস অফিসার নিযুক্ত হ'ল।

বঙ্গ-বিভাগের ফলে কলিকাতার বাইরে পূর্ববঙ্গেই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করল। ভীষণ অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারপরায়ণ আসাম-পূর্ববঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যার বমফিল্ড ফুলার অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালালেন। এজন্য বহুদিন পর্যন্ত যে কোনো অত্যাচারী শাসনকে 'ফুলারী শাসন' বলত। বরিশাল কনফারেন্স তিনি আঘাতে আঘাতে ভেঙে দিলেন, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু অসংখ্য বাঙালী যুবক নেতৃবর্গসহ রাস্তায় নিষিদ্ধ মিছিল বার করে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করতে লাগল। পুলিসের আঘাতে মাথা ফাটল কিন্তু

বন্দেমাতরমে আকাশ ধ্বনিত হতে লাগল। প্রখ্যাত নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ভীষণভাবে আহত হলেন। তিনি একহাতে পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও অপরহাতে সুহৃদ সমিতির কর্মী ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলীকে ধারণ করে সভায় গর্বের সঙ্গে বক্তৃতা দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জে. চৌধুরী, কাব্যবিশারদ, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত সকলেই নির্ভীকতা দেখিয়ে সমগ্র জাতির প্রাণে সাহসের সঞ্চার করলেন। নেতা হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন এবং তাঁর জরিমানা হ'ল।

আন্দোলন ক্রমশঃ বিপজ্জনক আকার ধারণ করল। ব্রিটিশ রাজনীতি তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রচারে যত্নবান হয়ে শীঘ্রই সফলতা লাভ করল। পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে গেল। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে কলহ ভীষণ আকার ধারণ করল। জামালপুর শহরে হিন্দুবাড়ী লুঠ হ'ল এবং কালী-প্রতিমা ভগ্ন হ'ল। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত বারীনবাবুদের কাগজ 'যুগান্তরে' ভগ্নকালীর ফটো বার হ'ল—নীচে লেখা "দেখ মা যা হইয়াছেন"। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস-সাহেবগণ প্রকাশ্যে হিন্দুর বিরুদ্ধাচরণ ও মুসলমান দাঙ্গাকারীর সাহায্য করতে লাগল। নানা স্থানে হিন্দুনারী লাঞ্ছিত হতে লাগল। তখনকার দিনের সুহৃদ সমিতির একটা বিখ্যাত গানের কয়েক লাইন আজও মনে আছে—

আপনার মান রাখিতে জননী
আপনি কৃপাণ ধরগো,
পরিহরি চারু কনক ভূষণ
গৈরিক বসন পরগো।
আমরা তোদের কুটি কুসন্তান,
গিয়াছি ভুলিয়া আত্ম-অভিমান,
করে মা পিশাচে তোর অপমান
নেহারি নীরবে সহিগো।···

কুমিল্লাতে প্রবল অশান্তির মধ্যে একজন মুসলমান গুলীর আঘাতে নিহত হয়েছিল। এই অপরাধে নিবারণ নামে এক হিন্দুর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। ফাঁসির হুকুমের প্রতিবাদে সারা বাংলায় হুলস্থুল পড়ে যায়। প্রতিবাদ হিসেবে আমরা সকল স্কুলের ছাত্র ক্লাস পরিত্যাগ করে এলাম এবং একদিনের জন্য স্কুল বন্ধ থাকে। নিবারণের পক্ষ সমর্থন করে ঢাকার বিখ্যাত উকিল ও রাজনৈতিক নেতা

আনন্দচন্দ্র রায় অশেষ কীর্তি অর্জন করেন। হাইকোর্টে নিবারণের ফাঁসির হুকুম রদ হয়েছিল।

সরকারের উৎসাহে উৎসাহী হয়ে ঢাকায় গুণ্ডা-প্রকৃতির মুসলমানগণ পুলিনবাবুর বাসা আক্রমণ করেছিল। বাড়ীতে তখন অল্প কয়েকজন সভ্যমাত্র উপস্থিত ছিল। গুণ্ডারাও এই সুযোগই কাজে লাগাবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু এরাই বিস্ময়কর লাঠিচালনায় শত শত মুসলমান গুণ্ডাকে আঘাতে জর্জরিত করে হটিয়ে দিয়েছিল। ঢাকায় বেশ কিছু মুসলমান নেতার কর্মকেন্দ্র হলেও এ আক্রমণ শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় ঢাকা শহর ও জেলায় দাঙ্গা একেবারে থেমে যায়। আর একটা ফল হ'ল এই যে, মুসলমান গুণ্ডারা শহরের রাস্তায় সমিতির সভ্য কাউকে একলা পেলেই পূর্বে মারধর করত, তাও বন্ধ হ'ল। জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষে সমবেত গুণ্ডাদল ভীষণভাবে প্রহৃত এবং একজন গুণ্ডা নিহত হওয়ায় পুলিনবাবুর বাড়ী খানাতল্লাশী হয় এবং পুলিস কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কারুর বিরুদ্ধেই কিছু প্রমাণিত হয় নি।

আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুরা দলে দলে সমিতির সভ্য হতে লাগল। অভিভাবকেরা ব্যক্তিগতভাবে এসে পুত্র ও অন্যান্য ছেলেদের সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাতে লাগলেন এবং নিজেরাই তাঁদের হাতে অস্ত্র দিয়ে পল্লীরক্ষার কার্যে পাঠিয়ে দিতে সুরু করলেন। আমরা দিবারাত্র নানা অস্ত্র হাতে নিয়ে, একরকম আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে হিন্দুপল্লী পাহারা দিয়েছি। অবশ্য সমিতির কর্তৃপক্ষ একটা বিষয়ে সতর্ক থাকতেন, যেন আমরা আমাদের আসল শত্রু ব্রিটিশ বিতাড়নের আয়োজন থেকে বিপথগামী না হই। মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা বা শত্রুতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত আমরা এবং সাম্প্রদায়িকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তবে আক্রমণকারী যেই হোক না কেন, তাকে রোধ করতেই হবে, এটাই আমরা কর্তব্য মনে করতাম। আর একটা বিষয়ে আমরা সতর্ক থাকতাম, যাতে সমস্ত সমিতি এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়ে। কারণ, তাহলে সমিতির সকলকে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ পাবে সরকার। শুধু অনুশীলন সমিতির সভ্যরাই হিন্দুদের রক্ষা করবে, তাই তাদের একমাত্র কাজ নয়। যদিও নিপীড়িতের রক্ষায় অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত, তবুও হিন্দুদের নিজেদেরই সমগ্রভাবে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াতে হবে।

এই দাঙ্গার ফলে শুধু হিন্দুরাই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস অর্জন করল

তা নয়, অনুশীলন সমিতির উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পেল এবং জনবল বৃদ্ধি হ'ল। দুর্গতের সহায়, বিপদের বন্ধু বলে সমিতির সভ্যদের দেশের লোক আপনজন বলে গ্রহণ করল। এককথায় সমিতি দেশের লোকের চিত্ত জয় করে নিল।

কিছুদিন পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেমে যায় বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় মোসলেম লীগ্। তার প্রভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে ভেদ-বুদ্ধি সুদৃঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারতভূমিকে দ্বিধা-বিভক্তই করল না, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ধন-মান-প্রাণ বিসর্জন দিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে চরম দুর্দশায় পতিত হ'ল।

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি. মিত্রের সমিতি পরিচালনা ক্ষেত্রে দু'জন সহকারী ছিলেন। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ পরিচালনার ভার ছিল পুলিন দাসের উপর এবং কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু। সতীশবাবু পরিচালিত সমিতির কেন্দ্র ছিল ৪৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। সেকালে সংগঠক হিসেবে সতীশবাবু কলকাতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন। কলকাতা এবং নানা জেলায় তিনি সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করে সবিশেষ শক্তিশালী করে তোলেন।

অনুশীলন সমিতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বিপ্লবান্দোলনের প্রথম পর্বে বিপ্লবীদের মধ্যে দলাদলি ছিল না। বরং এক রকমের ঐক্যই ছিল। সমস্ত বাংলার প্রধান কর্মীদের নিয়ে কনফারেন্স হ'ত। পি. মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে পুলিনবাবু ও বারীনবাবুও উপস্থিত থাকতেন। একসঙ্গেই পরামর্শ করে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতেন। অনুশীলন ছিল একমাত্র বিপ্লবী সমিতি। সেকালের বিপ্লবীদের সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। বিপ্লবান্দোলনের সংস্থার নাম ছিল অনুশীলন সমিতি আর বিপ্লবান্দোলনের মুখপত্র এবং প্রচার বিভাগের নাম ছিল 'যুগান্তর'। বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন দত্ত, পুলিনবাবু সকলে এই কথাই বলেন। পরবর্তীকালে 'যুগান্তর দল' বলে পরিচিত দলীয় নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও তাই বলেছেন। যুগান্তর পার্টি বলে কোন দল ছিল না। পরবর্তীকালে বাঙলা দেশে যুগান্তর পার্টি বলে যে দল পরিচিত হয়েছিল তাদের সঙ্গে বারীনবাবু, উপেনবাবু পরিচালিত যুগান্তর কাগজের বা তাঁদের দলের কোন সম্পর্ক ছিল না।

বারীনবাবু ও তাঁদের সহকর্মী সকলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

তাঁরা ছিলেন সমিতির সভ্যদের কাছে পূজনীয় আদর্শ বিপ্লবী। মৃতপ্রায় যুবশক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে এঁরাই যুবকদের মরণজয়ী ত্যাগী বীর করে তুলেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে পুলিনবাবু ও সতীশ ঘোষের কার্য-প্রণালীর সূচীক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপণের দিক দিয়ে একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাঁরা বোমা নিক্ষেপ, গুলী প্রভৃতি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। এ সমস্ত চমকপ্রদ কার্যাবলীর একটা পরম সার্থকতাও ছিল। পরাধীনতার জালে জর্জরিত সম্বিতহারা দেশবাসীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনবার জন্য, মরণভীতু মানুষের মৃত্যুভয় দূর করবার জন্য চরম এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগের প্রয়োজন ছিল।

পুলিন দাস পরিচালিত অনুশীলনের কর্মপদ্ধতি ছিল অন্যরূপ। শক্তি সংগ্রহ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে চাই জনবল, অস্ত্রবল ও অর্থবল। এজন্য চাই সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত একটা বেসরকারী প্রকাণ্ড সুসংগঠিত সৈন্যদল এবং অস্ত্র নির্মাণ ও সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সৈন্যদলকে বিপ্লবীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত করা। এ ছাড়াও দেশের লোকের সহানুভূতি আকৃষ্ট করতে হবে সমিতির প্রতি সভ্যদের নিজ নিজ চরিত্রবল, সেবাপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের আদর্শ দ্বারা। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

পুলিন দাস ও সতীশ বসু পরিচালিত অনুশীলন সমিতি আর বারীনবাবু ও তার সহকর্মীদের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল এই যে, বারীনবাবুরা ছিলেন সম্পূর্ণ গুপ্ত। মাণিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কার ও বারীনবাবুদের সকলের গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁদের কোন কথাই দেশবাসী জানতে পারে নি। তাঁদের প্রকাশ্য কার্য কিছুই ছিল না। তাই যেদিন সব প্রকাশিত হয়ে পড়ল সেদিন দেশবাসী চমকিত হ'ল এবং বিপ্লববাদের দিকে আকৃষ্ট হ'ল। দেশবাসী বুঝতে পারল যে, তাদের যুবশক্তি দেশের পরাধীনতার শৃংখল মোচনের জন্য মরণখেলায় মেতে উঠেছে। সেই যে জনচিত্তে আগুনের পরশমণি ছোঁয়া লাগল তা দেখতে দেখতে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল।

অনুশীলনের প্রধান কার্যক্রম ছিল প্রকাশ্য। কেননা সারা দেশের জনসাধারণকে নিয়ে বেসামরিক সৈন্যদল গড়ে তোলার মত কাজ গোপনে হতে পারে না। তখনকার দিনে সংগঠনবিরোধী এত আইন-কানুন ছিল না। তাই পি. মিত্র, পুলিনবাবু এবং সতীশবাবু মনে করলেন যে, দেশে আগেই

অশান্তি সৃষ্টি করে ইংরেজকে হুঁশিয়ার হতে না দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামরিক শক্তি সংগ্রহ করে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এমন কিছু করা সমীচীন হবে না যার ফলে সমিতিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার সুযোগ ইংরেজ পায়। সমিতি যে বলপ্রয়োগের কাজ করে নি এমন নয়, সংগঠনের দিক থেকে যারা প্রতিবন্ধক হয়েছিল তাদের হত্যা করা হ'ত। শুধুমাত্র চমক সৃষ্টির জন্য কোন সন্ত্রাসের কাজ করা হয় নি। দলের লোক ইংরেজের চর হয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে বলে জানতে পারলে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত এবং মৃতদেহ সরিয়ে ফেলা হ'ত। এরূপ একটা হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় উঠে'ছল। সুকুমার নামে এক সভ্যকে পুলিসকে গুপ্ত খবর জানাবার অপরাধে হত্যা করা হয়। ঢাকা শহরের উত্তরে পল্টনের এক নির্জন প্রান্তে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেব সমিতির ভিতরের অনেক কথা সংগ্রহ করেছিলেন এই সমস্ত গুপ্তচরের মারফতে। একই কারণে তাঁকেও গোয়ালন্দ স্টেশনে গুলি করা হয়েছিল।

এই সমস্ত কারণেই আলিপুর বোমার মামলার পর অনুশীলন সমিতির বারীনবাবুদের অংশটা একেবারে ভেঙে যায়—লুপ্ত হয়। আর অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পরেও বহু বড় বড় ষড়যন্ত্র মামলা, সহস্র সহস্র লোকের গ্রেপ্তার প্রভৃতি বড় বড় আঘাত ক্রমাগত, বছরের পর বছর সহ্য করেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদল হিসেবে, অন্তত ইংরেজ রাজত্বের অবসান পর্যন্ত, একটা জীবন্ত সংঘ হিসেবে সতেজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

স্বদেশী যুগে পূর্ববঙ্গে সুহৃদ সমিতি নামে আর একটা সংঘও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অবশ্য অনুশীলনের মতো বিস্তৃত ছিল না। ময়মনসিংহ শহর, চাঁদপুর এবং অন্য কোনো কোনো জায়গায় শাখা ছিল। নেতৃবর্গের মধ্যে কেদার চক্রবর্তী ও ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সমিতি গঠনের প্রেরণা আসে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর কাছ থেকে। কেন্দ্র ছিল ময়মনসিংহ শহরে।

সরলা দেবী সেকালের প্রসিদ্ধ 'বীরাষ্টমী উৎসবে'র প্রচলন করেন। দুর্গা-পূজার অষ্টমী তিথিতে এই উৎসব হ'ত। ঐদিন যুবকগণ লাঠি, ছোরা, তরবারি খেলা এবং নানারকম ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করত। শুনেছি সরলা দেবী নাকি নিজেই তরবারি চালনা করতে পারতেন। তিনি এই উৎসব উপলক্ষে

যুবকদের বীর ও নির্ভীক হতে উপদেশ দিতেন। সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত লাঠি-ছোরা খেলা এবং ড্রিল-প্যারেডের ব্যবস্থা ছিল।

সংগঠন কার্যে অনুশীলন সমিতির মতো কৃতকার্যতা দেখাতে না পারলেও আর একদিকে সে যুগে এদের অবদান ছিল অতুলনীয়। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক চমৎকার গান এঁরা নিজেরাই রচনা বা সংগ্রহ করে ছোট-বড় সভায় শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে চারণদের মতো গেয়ে বেড়াতেন এবং জনগণকে মাতিয়ে তুলতেন। এঁদের পরিধানে থাকত গেরুয়া বস্ত্র, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি এবং গলায় ঝুলত হারমনিয়াম। এঁদের কণ্ঠে আজও যেন শুনতে পাই—কবি হেমচন্দ্রের, "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়·· যোগতপ আর পূজা আরাধনা, এ সকলে এবে কিছুই হবে না, হবে না, হবে না ; খোল তরবার, এ সব দৈত্য নহে রে তেমন" ; এ সমিতিরই সভ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উকিল কামিনী সেনের স্বরচিত গান—"অনবরত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারী", "জাগো ওগো বিষাদিনী জননী", "শাসন সংযত কণ্ঠ জননী, গাহিতে পারি না গান, তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ", "আপনার মান রাখিতে জননী আপনি কৃপাণ ধর গো"। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম", রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ রচিত গান ছাড়াও মনমোহনবাবুর "দিনের দিন সবে দীন" এবং ভাটিয়ালী ও রামপ্রসাদী সুরে গ্রাম্য-কবি রচিত গান গেয়ে জনগণকে মুগ্ধ করতেন—"পেটের ক্ষিধায় জ্বইলা মইলাম, উপায় কি করি" ; "দেশের কি দশা হইল ; সোনার দেশে শয়তান আইয়ারে, দেশে আগুন লাগাইল" ; "জাগ ভারতবাসীরে কত ঘুমে রবে রে, বল সবে হয়ে একমন বন্দেমাতরম ; ভাইরে ভাই—মেড়ারে মারিলে ঢুষ, সেও ফিরে করে রোষ রে ; আমরা এমন জাতি, খাইয়ে ফিরিঙ্গি লাথি, ধূলা ঝারি চলে যাই ভবন—বন্দেমাতরম"। এই সমিতির অনেক গায়কের মধ্যে ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বেআইনী বলে ঘোষণার পর সুহৃদ সমিতি লুপ্ত হয়ে যায়। নেতৃবর্গ গুপ্ত সমিতি গঠন করে আর বিপ্লব আন্দোলনে অগ্রসর হন নি। কেদার চক্রবর্তী সমাজসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সাধনা সমিতি নামে ময়মনসিংহ শহরে আর একটা সংঘ ছিল। স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ হেডমাস্টার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পরিচালক

ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী। এই সমিতির সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ পরবর্তীকালে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি ক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ময়মনসিংহ শহরের বাইরে এই সমিতির শাখা ছিল না।

স্বদেশ-বান্ধব সমিতি স্থাপিত হয় বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ঢাকা-বিক্রমপুরের প্রফেসর সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। জনগণের মধ্যে স্বদেশী ভাব প্রচার ও স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের কাজ খুব সুন্দরভাবে করেন।

বরিশালে আর একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের (সতীশ মুখার্জি) নেতৃত্বে। এই সমিতির শ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন নোয়াখালী-নিবাসী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ চৌধুরী ও বরিশালের মনোরঞ্জন গুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে বাংলা দেশের একজন বিপ্লবী নেতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুলিনবাবুর কাছে শুনেছি প্রজ্ঞানানন্দ এবং নরেন ঘোষ অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন।

আত্মোন্নতি নামে এক প্রভাবশালী সমিতি স্থাপিত হয় মধ্য কলিকাতায় এবং পরে বারীনবাবুদের অংশের সঙ্গে এক হয়ে যায়। সতীশ সেন ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। যুবকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য প্রকাশ্যে সমিতি স্থাপিত হলেও আসলে এটি একটি বিপ্লবীদল ছিল। এই সমিতিরই বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী বাংলা দেশের একজন বিপ্লবী নেতা হিসেবে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বারীনবাবুদের দল আলিপুর বোমার মামলার ফলে ভেঙে গেলে পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বিপ্লবী ভাব ও আদর্শ জীবিত রাখেন, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যাঁরা পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করে তোলেন তার মধ্যে বিপিন গাঙ্গুলী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীমতিলাল রায়, যতীন মুখার্জি, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর যতীশচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবীনায়ক হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

পরবর্তীকালে পূর্ণচন্দ্র দাসের নেতৃত্বে মাদারীপুরে এক শক্তিশালী গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়। বিপ্লবী-নেতা হিসেবে পূর্ণ দাস খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনুশীলনের এক বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে প্রথমে মাদারীপুরের দল গঠিত হয়। যথাস্থানে এর বিশদ আলোচনা করব।

অনুশীলন সমিতি সমগ্র বাংলা দেশে এবং তার বাইরেও কোনো কোনো জায়গায় বিস্তৃত হয় এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হওয়ার খ্যাতি অর্জন করে। এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্র দেশের সঙ্গে যোগাযোগের কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯০৭ সালেই বোধ হয় কলকাতায় ছত্রপতি শিবাজী উৎসব হয়। জনমনে যে স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তা বোধ জাগ্রত হচ্ছিল সেই প্রেরণাই শিবাজী উৎসবের প্রধান কারণ। তাঁর গেরিলা যুদ্ধ-প্রণালী আমাদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং আমরা মনে করতাম যে, তাঁর পথ অনুসরণ করে আমরাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব।

এই শিবাজী উৎসব উপলক্ষে সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ নিমন্ত্রিত হন। মহারাষ্ট্র থেকে আসেন বালগঙ্গাধর তিলক এবং তাঁর সহকর্মিগণ—খাপার্দে ও ডাঃ মুঞ্জে। এ উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রসিদ্ধ 'শিবাজী' কবিতা রচনা করেন এবং সম্ভবত পাঠ করেন। "এক ধর্ম-রাজ্য পাশে বেঁধে দেব আমি" তার প্রতীক হয়ে জনগণের মনে প্রতিষ্ঠিত হ'ল শিবাজীর গৈরিক পতাকা। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ এবং পি. মিত্র প্রমুখ উৎসবে যোগদান করেন—যদিও পি. মিত্র মহাশয় কোনো প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন নি। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বদেশী প্রদর্শনী খোলা হয় এবং তাতে অনুশীলন সমিতির তরফ থেকে লাঠি, ছোরা, তরবারি খেলা এবং সামরিক কুচকাওয়াজ দেখান হয়।

এ সময়ে পুলিনবাবুও কলকাতা এসেছিলেন। তখন সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে বৈপ্লবিক সমিতি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এরূপ সমিতির সংগঠন ও নিয়মাবলী সম্বন্ধে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল দু'খানা স্বতন্ত্র খসড়া রচনা করেন এবং সভায় আলোচিত হয়। বিপিনচন্দ্র পালের খসরাই অনুশীলন সমিতি পছন্দ করে। বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেও শেষ পর্যন্ত কোনো খসরাই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় না। আসলে অনুশীলন সমিতি ও বারীনবাবুর দল নিজেদের প্রয়োজনে কাজের ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা বিচার করে নিজেদের নিয়মাবলী নিজেরাই রচনা করেন।

লোকমান্য তিলকের কলকাতার উপস্থিতি পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করবার জন্য পি. মিত্র মহাশয় তাঁর বাড়ীতে তিলক মহারাজ, ডাঃ মুঞ্জে, খাপার্দে, সখারাম দেউরকর এবং পুলিন দাসের সহিত একত্রিত হন। এই সভা হয় একান্ত গুপ্তভাবে এবং গোপনীয়তা রক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন পুলিনবাবু। তাঁকে পি. মিত্র মহাশয় সকলের কাছে বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দল-সংগঠক বলে পরিচয় করিয়ে দেন। ভারতবর্ষে বিপ্লবী দল গঠন ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান এ সভায়

আলোচিত হয়। ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত করে কি ভাবে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করা যায় এবং কিভাবেই বা বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করা যায় কার্যোদ্ধারের জন্য তাও বিশদভাবে আলোচিত হয়। বাংলা দেশে অনুশীলন সমিতির সংগঠন, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বৈপ্লবিক কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করে সকলেই অনুশীলনকে নিজেদের বিপ্লবী সংগঠন বলে গ্রহণ করেন এবং মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। এর পর থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী সমিতির ঐক্যসূত্র কোনোদিন ছিন্ন হয় নি।

এই সময়ে অরবিন্দ ঘোষের সম্পাদনায় সুবোধ মল্লিক ইংরেজি দৈনিক "বন্দেমাতরম্" প্রকাশ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী এর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন এবং নিয়মিত লিখতেন। এই 'বন্দেমাতরম্' এবং বারীন ঘোষ ও তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা প্রকাশিত বাংলা দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা দু'খানা ব্যবসায় হিসেবে বা কারো অর্থ উপার্জনের জন্য বার করা হয় নি। বিপ্লববাদ প্রচারের জন্যই এদের প্রকাশ। অনুশীলন সমিতি এই কাগজ দু'খানাকে নিজেদের কাগজ মনে করে এবং প্রচার বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' ও বিপ্লববাদও বিপ্লবীদের সমর্থন করে। এ প্রসঙ্গে সেকালের দৈনিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকার সাধারণ আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একমাত্র ইংরেজ মালিকদের সংবাদপত্র ছাড়া সেকালের প্রায় সমস্ত সংবাদ-পত্রই স্বদেশী আন্দোলনের সহায়ক ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেঙ্গলী" বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত "লিডার", লাহোরের "ট্রিবিউন", মাদ্রাজের "হিন্দু" প্রভৃতি ইংরেজী কাগজ নরমপন্থী উদারনীতিক কাগজ বলে পরিচিত ছিল। বিপিনচন্দ্র পালের "নিউ ইণ্ডিয়া", মতিলাল ঘোষের "অমৃতবাজার পত্রিকা", বালগঙ্গাধর তিলকের "কেশরী" চরমপন্থী কাগজ বলে প্রসিদ্ধ ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' ছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' ও 'আত্মশক্তি' বিপ্লববাদী সংবাদপত্র বলে প্রসিদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে আবার যুগান্তরই সর্বপ্রধান ছিল। দু'পয়সা দামের কাগজ দু'টাকা দামেও বিক্রয় হতে দেখেছি। মানিকতলা বোমার কারখানা ও ষড়যন্ত্র যখন

প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনকার এক সংখ্যা যুগান্তরে (বোধ হয় শেষ সংখ্যা) একটা কবিতার কয়েক লাইন আজও মনে আছে।

না হইতে মা বোধন তোমার
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার
আবার পূজিব চরণতট ॥

সাময়িক নৈরাশ্যের মধ্যেও কিন্তু এই কবিতা বিপ্লবীর লেখা বলে লোকের মনে আশার সঞ্চারও করে। সংবাদপত্র সম্পাদকদের মধ্যে যুগান্তর সম্পাদক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তই প্রথম কারাবরণ করেন।

দৈনন্দিন 'সন্ধ্যা' বাংলা সংবাদপত্রে একটা নতুন আদর্শ স্থাপন করেছিল। সহজ বাংলায় এবং প্রচলিত উপমা ও অলঙ্কার দিয়ে বিপ্লবী আদর্শ প্রচার ও ব্রিটিশ-শাসনের তীব্র সমালোচনা বার করত। এজন্য 'সন্ধ্যা'র জনপ্রিয়তাও ছিল খুব। বিপ্লবীদের সঙ্গে উপাধ্যায় মহাশয়ের যোগাযোগ ছিল। তাঁর মতো তেজস্বী, নির্ভীক, স্বদেশপ্রেমিক, সন্ন্যাসী জননেতা খুব কম ছিল। সম্পাদক হিসেবে রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় তিনি গ্রেপ্তার হলেন। খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, ফিরিঙ্গির কারাগারে তাঁকে কেউ আবদ্ধ করতে পারবে না। হ'লও তাই। তিনি বিচারকালেই দেহত্যাগ করেন। ঘৃণাভরে তিনি ইংরেজদের ফিরিঙ্গি বলে 'সন্ধ্যা' কাগজে লিখতেন।

'বন্দেমাতরম্' কাগজকেও কয়েক বার রাজদ্রোহের মোকদ্দমায় পড়তে হয়েছে। একবার এক রাজদ্রোহের প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

সাপ্তা হকগুলির মধ্যে কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাণী', 'বসুমতী' এবং প্রসিদ্ধ জননেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনে প্রভূত কাজ করেছিল এবং দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করেছে। গ্রাম্য জনসাধারণ বেশী পয়সা দিয়ে দৈনিক কাগজ কিনতে পারত না। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত সাপ্তাহিক কাগজের খুব প্রচার ছিল। কোন গ্রামে হয়ত হাটে বা বাজারে একখানা মাত্র সাপ্তাহিক কাগজ যেত, সবাই মিলে সেই কাগজের সংবাদই গ্রহণ করত। 'সঞ্জীবনী'তে স্বদেশী প্রচার ছাড়াও সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হ'ত। সম্পাদক

কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় খুব সাধু প্রকৃতির, চরিত্রবান, নির্ভীক, স্বদেশ-প্রেমিক জননেতা ছিলেন।

মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'প্রবাসী,' 'মডার্ণ রিভিয়ু', 'ভারতী', 'সাহিত্য', নব পর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন', 'নব্যভারত', সুপ্রভাত' প্রভৃতি কাগজগুলি ভাষার সেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীও প্রচার করত। দৈনিক ও সাময়িক অধিকাংশ পত্রিকারই আমি নিয়মিত পাঠক ছিলাম।

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য শাখা বাংলা দেশের সমস্ত জিলায় বিস্তৃত হয়। প্রতি শহর, বন্দর, ব্যবসায়কেন্দ্র এবং অধিকাংশ গ্রামেই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার যুবক সমিতির সভ্য হয়। অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তিও সভ্য-তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

সমিতির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করলেও সাধারণত বড় বড় ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ধনীরা খুব বেশী সমিতির সভ্য হয় নি। তাদের মধ্যেও আবার সরকারী দমননীতি সুরু হওয়ার পর অনেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ে। ব্যতিক্রম যে হয় নি তা নয়। ভাগ্যকুলের রায়বাবুরা সেকালে বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। রাজা জানকীনাথ রায়ের পুত্র রমেন্দ্রনাথ রায় সমিতির কাজে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভাগ্যকুলে সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকা কেন্দ্র থেকে লোক নিয়েছিলেন। পরে রায় পরিবারের প্রায় সমস্ত যুবকগণই সমিতির সভ্য হয়েছিল। রমেন্দ্রবাবু তাঁর একটা বন্দুকও দিয়েছিলেন। বিপদের সম্ভাবনা ঘটার পর তিনি বিলেত চলে যান। মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সিংহও সমিতির উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি ঢাকা থেকে লোক আনিয়ে জিয়াগঞ্জে সমিতির শাখা স্থাপন করান।

শ্রমজীবী শ্রেণীর জনগণ—সাধারণত কুলী, মজুর, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয় নি। দেখেছি, সমিতির প্রতি তাদের কোন বিদ্বেষ মনোভাব ছিল না বরং তারা শ্রদ্ধাই করত। এদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার উপর যদিও কোন নিষেধ ছিল না, কিন্তু এদের মধ্য থেকে সমিতির সভ্য করার কোন চেষ্টাও হয় নি।

যে সমিতি একদিন সহস্র সহস্র থেকে লক্ষ লক্ষ যুবকের সংস্থায় পরিণত হয়, তার প্রতিষ্ঠার দিনটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পি. মিত্র এবং বিপিনচন্দ্র পাল

ঢাকায় গিয়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগদানের জন্য প্রকাশ্য সভায় এবং ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্য দিয়ে যুবকদের কাছে আবেদন করেন। তখন তাঁদের বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে চুয়াত্তর (৭৪) জন যুবক সমিতির সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাম লেখান। কিন্তু পুলিনবাবু যখন সমিতির কাজ আরম্ভ করেন তখন প্রথমদিনে মাত্র একজন উপস্থিত হয়। পরে পুলিনবাবু এদের বাড়ী গিয়ে বোঝালেন, তর্ক করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের যুক্তিকতার কথা বললেন। ফলে চৌত্রিশ (৩৪) জন সমিতিতে উপস্থিত হয়। ক্রমে তারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং ঢাকায় তথা পূর্ববঙ্গে সমিতি স্থাপিত হয়।

ন্যাশানেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পুলিনবাবুর চেষ্টায় বাড়তে থাকে এবং তিনি তাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য করে নেন। বিলিতি মাল পিকেটিং করতে যারা যেত তাদের মধ্য থেকেও বাছাই করে সমিতির সভ্য করা হতে স্থুরু হয়। জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক সমিতির সভ্য হলেন এবং ঐ কলেজ-হোস্টেল থেকেই পুলিনবাবু একশত সভ্য সংগ্রহ করেন। শহরের সর্বত্র, পাড়ায় পাড়ায় এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং ছোট ছোট সভায় বক্তৃতা করে সমিতিতে যোগদানের জন্য সকলকে আহ্বান করতে লাগলেন। কলেজ-হোস্টেল আর মেসগুলিতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে অধিকাংশকেই সভ্য করলেন। যদিও পুরাতন সভ্য কেউ কেউ ভাগতে লাগল, কিন্তু নতুন সভ্যসংখ্যা এত দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল যে, মোটের উপর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে চলল।

স্বদেশী আন্দোলনের স্থুরুতেই যে ছাত্রদলন আরম্ভ হয় তারই প্রতিবাদে ঢাকায় স্কুলে বিশেষ করে সরকারী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট সংগঠনে পুলিনবাবু নেতৃত্ব করেন এবং জাতীয় বিদ্যালয় (National School) স্থাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। নিজে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক হন এবং যাঁরা শুধুমাত্র দেশসেবা হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত বিনা বেতনে, তেমন শিক্ষক নিযুক্ত করে জাতীয় বিদ্যালয় চালাতে থাকেন। ঢাকার নেতৃস্থানীয় উকিল ত্রৈলোক্যনাথ বসু, রসিকলাল চক্রবর্তী, আনন্দ চক্রবর্তী (পাকড়াশী) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ লোকের আন্তরিক সাহায্য লাভ করেন পুলিনবাবু।

তখন পূর্ববঙ্গে স্কুলসমূহের কর্তা স্টেপল্টন সাহেব (Stepleton) খুব কড়া, জবরদস্ত ও অত্যাচারী ছিলেন। স্কুলের বাইরেও যাতে ছেলেরা সর্বদা খেলাধূলা, বিশেষ করে ফুটবল খেলায় মত্ত থাকে সেদিকে নজর দিলেন। কারণ তাহলেই

সারা বিকেলবেলা সমিতির ড্রিল ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত হওয়ার সুযোগ পাবে না। আমরাও এসব কথা ভেবেই আমাদের স্কুলে ফুটবল খেলার প্রচলন করতে দিই নি। ছাত্রদের একমত করে কর্তৃপক্ষকে জানালাম যে, আমরা ফুটবল খেলব না এবং আমরা দেশীয় খেলা খেলতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে নানা খেলার প্রচলন হ'ল। সমিতি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর 'কাণ্ট্রী স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন' নাম দিয়ে একটা সংঘ স্থাপিত করে 'দাড়িয়া বান্ধা' খেলা লীগ প্রথায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলাম।

তা ছাড়া আমাদের স্কুলের ড্রিল মাস্টার ছিলেন অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং স্থানীয় পরিচালকদের অন্যতম। স্কুলের ড্রিল সমিতির ড্রিলে পরিণত হ'ল। আবার ছাত্রদের মধ্যে যারা সমিতির বিশিষ্ট সভ্য হওয়ায় স্কুলেও ড্রিল-প্যারেড করাত তাদের প্রভাবেও ছেলেরা নানাভাবে সমিতির প্রতি প্রভাবান্বিত হতে লাগল।

নারায়ণগঞ্জ সমিতির কেন্দ্র হিসেবে কোন ভাড়া-করা বাড়ী ছিল না। পরিচালকের বাড়ীতেই অফিস হ'ত। আর ড্রিল-প্যারেড ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের অধীনে যে সমস্ত শাখাসমিতি ছিল সেখানে লাঠি-ছোরা খেলা ও ড্রিল শেখাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে লোক প্রেরিত হ'ত। আমিও অনেকবার গিয়েছি এমনি কাজে। এ কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় স্থানীয় নমঃশূদ্র, গোয়াল ব্যবসাদার লাঠিয়ালদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সমিতির মানরক্ষার্থে সাড়া দিতে হয়েছে। লাঠি খেলা জানলেও আমার এ বিষয়ে তেমন কোন সুনাম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের জোরে ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছি।

সমস্ত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সমিতির কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত হয়, উয়াড়ীর পঞ্চাশ নম্বর বাড়ীতে। পরে দক্ষিণ মৈশন্তরীর একটা বড় বাড়ীতে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়, প্রশস্ত আঙ্গিনাসহ এই বাড়ীটা বহুকাল ভূতের বাড়ী বলে কুখ্যাত ছিল। ভয়ে কেউ সে বাড়ীতে যেত না। সমিতির কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর সে বাড়ীতে আর কোনদিন ভূতের উৎপাত হয় নি। এখানে পুলিনবাবু সপরিবারে থাকতেন এবং সর্বক্ষণের গৃহত্যাগী সভ্যরা থাকতেন। এ বাড়ী সর্বক্ষণের জন্য সমিতির সভ্যদের প্রহরাধীন ছিল এবং বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে পারত না।

সমিতির এই কেন্দ্রকে বলা হ'ত বজ্রপুরী আর গৃহত্যাগী সভ্য যাঁরা এখানে থাকতেন তাঁরা হতেন বজ্রী। দধীচির অস্থিতে যে বজ্র তৈরী হয় তার সাহায্যে

দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। দেশের উদ্ধার কামনায় যাঁরা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সর্বক্ষণের কর্মী হয়েছেন তাঁদের পবিত্র অস্থিতেও বজ্রের শক্তি নিহিত আছে, যার বলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে—তাই তাঁরা বজ্রী।

প্রথমদিকে অল্প কয়েকজন গৃহত্যাগী সভ্য হন, যেমন শচীন বাঁড়ুজ্যে, মতি সেন প্রভৃতি। তাঁরা প্রথমে উয়াড়ীর শ্রীউপেন্দ্র নাগের বাইরের দিকে একটা ছোট খড়ের ঘরে আশ্রয় পান। ছোট্ট ঘরের একপাশে তুটো তক্তপোশ আর একদিকে রান্নার জন্য উনুন ইত্যাদি। সভ্যদের নিজেদেরই রান্না করে খেতে হত। পরে যখন সভ্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং বজ্রপুরীতে এঁদের থাকার ব্যবস্থা হয় তখন সেই বড় বাড়ীতেও স্থান সঙ্কুলান হ'ত না।

আশু দাশগুপ্ত, সুরেন নাগ প্রভৃতিকে নিয়ে পুলিনবাবু প্রথমে সমিতি স্থাপন করেন। শশী সরকার, শচীন ব্যানার্জি, মতি সেন, সুরেন ঘোষ, উয়াড়ীর বোচাবাবু, অমলা ঘোষ, প্রভাত দে, হেমেন্দ্র রায় সর্বক্ষণের কর্মী (whole timer) হন।

প্রথমে যাঁরা গৃহত্যাগ করে আসেন তাঁদের বয়স ষোল থেকে বাইশ বছরের মধ্যে ছিল। অনাবশ্যক কাউকেও গৃহত্যাগ করান হ'ত না। যে সমস্ত সভ্যের বাড়ীর সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তারা বাড়ীতে থেকেই গৃহত্যাগী সভ্যের মতো কাজ করতে পারত। ঢাকায় এ রকম প্রথম সভ্য হন শশাঙ্ক হাজরা, শান্তিপদ মুখার্জি, শিশির গুহরায় প্রভৃতি। বীরেন চ্যাটার্জি এবং লালমোহন দে-ও প্রথম যুগেই গৃহত্যাগ করে আসেন। নারায়ণ-গঞ্জের সভ্য সীতানাথ দাশ, আদিত্য দত্ত, বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি ও আরও কয়েকজন গৃহে থেকেই গৃহত্যাগী সভ্যের পর্যায়ভুক্ত ছিলাম।

ঢাকায় সুপ্রসিদ্ধ উকিল আনন্দ পাকড়াশী প্রথম যুগেই সমিতিতে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত ত্রিপুরালিঙ্গের শিষ্য। এঁর সঙ্গে সমিতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গের আশ্রমে প্রথম শিব-লিঙ্গই স্থাপিত ছিল। সমিতির সংস্পর্শে আসবার পর সেখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা উৎসবে সমিতির সভ্যরা উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে, এবং শ্বেত ছাগ বলি দেওয়া হয়—শ্বেতকায় ইংরেজদের মনে করে।

স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গ ঢাকার স্বামীজী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুধু স্বামীজী বললেই সমিতির সভ্যরা স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গকে বুঝতেন।

তাঁর অতীত বা বয়স সম্বন্ধে ঢাকায় কেউ কিছু জানত না। চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা যেত না। বহু বছর যাবৎ যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাও বলতেন যে, একই চেহারা তাঁরা দেখে আসছেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা গুজব ছিল। প্রচলিত ছিল যে, তিনিই নাকি সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক প্রসিদ্ধ নানাসাহেব। তাঁর চেহারা ও বয়সের অনুমান অনেকটা এ গুজবের সমর্থন-সূচক ছিল। নানা সাহেবের শেষ কি হয়েছিল তা কেউ জানে না। ইংরেজরাও তাঁকে বন্দী করতে পারে নি। মানুষের মনে এমনি বিশ্বাস হওয়ার কারণ ছিল, তাঁর স্বদেশপ্রেমের কথায় এবং ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবে।

তাঁর কাছে যে সমস্ত লোক নানা স্থান থেকে আসত তাদের গতিবিধি অত্যন্ত রহস্যজনক বলে মনে হ'ত। তৎকালীন ভারতীয় সৈন্যদলের এবং সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর অনেক সুবেদার, জমাদার স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করত। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন সৈন্য-বিভাগীয় সুবেদার হয়ত জানতে পেরেছে যে, সরকার মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার আশ্রম ও হিন্দুবাড়ী লুট করবার বন্দোবস্ত করেছে। সুবেদার পূর্বেই স্বামীজীকে এ খবর পৌঁছে দিয়েছে এবং রাত্রিতে আশ্রমে প্রহরায় নিযুক্ত থেকেছে। এমনি ঘটনার সঙ্গে সমিতির আদি সভ্য সুরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় জড়িত হয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ সব কাহিনী তাঁর কাছেই শুনেছি।

তিনি ঢাকা এসে প্রথমে আশ্রয় পান ডালপট্টিতে, হিন্দুস্থানী দরিদ্র ডাল বিক্রেতাদের কাছে। ডালপট্টিতে তখন বাস করত কয়েক ঘর দরিদ্রশ্রেণীর হিন্দুস্থানী, যাদের স্ত্রী-পুরুষ মিলে নিজের চাকিতে ডাল ভেঙে তা বিক্রয় করত।

সমিতির প্রধান সভ্য এবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল আনন্দ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য। ক্রমে ঢাকার অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর শিষ্য হন। পুলিনবাবু অনেক সময় স্বামীজীর সঙ্গে সমিতি-বিষয়ে আলোচনা করতেন ও তাঁর পরামর্শ চাইতেন। স্বামীজীর আশ্রম ছিল সমিতির একটা প্রধান আড্ডা এবং তিনি সেখানে সমিতির কাজের নানা সুবিধা করে দিয়েছিলেন। আশ্রম এবং নিকটবর্তী জমিতে কয়েকবার আমাদের কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার যখন সমিতি ধ্বংস করতে উদ্যত এবং ধরপাকড় আরম্ভ করে, তখনও তিনি ভীত হন নি। তাঁর আশ্রম যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত তা আজও স্বামীবাগ নামে পরিচিত।

এদিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিচালনায় অস্ত্র সংগ্রহের কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্স থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী শিখে আসেন এবং বোমা প্রস্তুত আরম্ভ করেন। মাণিকতলায় মুরারীপুকুরের বাগানে বোমা তৈরীর বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়। কলিকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে গুপ্ত কাজকর্ম খুব জোরের সঙ্গে চলে এবং কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে। প্রথমদিকে সরকার এগুলিকে রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে করতে পারে নি। মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে লাট-সাহেবের ট্রেন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা হয় তার জন্য রেল-রাস্তা সারাইয়ের কাজে নিযুক্ত কয়েকজন কুলীর কারাদণ্ড হয়। পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নির্দোষ কুলীরা অপরাধ স্বীকার করে। এমনই আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটে।

এ তো গেল বারীনবাবুদের কথা। অপরদিকে পি. মিত্রের নেতৃত্বে ও সতীশ-বাবু ও পুলিনবাবুর পরিচালনায় ঢাকায়, পূর্ব-উত্তরবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে, যেমন—মুর্শিদাবাদে অনুশীলন সমিতির কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। সমিতির কাজকর্ম সরকারের বিস্ময় ও আশঙ্কা উদ্রেক করল, আর দেশের লোকের মনে জাগিয়ে তুলল শ্রদ্ধা ও আশা। সতীশবাবু ও পুলিনবাবু উভয়েই অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং কাজকর্মের জন্য আদান-প্রদানও করতেন। সভ্যরা ড্রিল, প্যারেড, নৌকা চালনা, মোটর চালনা প্রভৃতির সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতেও শিখতে লাগল। এজন্য কয়েকজন সভ্য নৌকায় কয়েক সপ্তাহের জন্য বেরিয়ে পড়ত। জঙ্গলে গিয়ে হরিণ, পাখী, বন্য-শূকর প্রভৃতি শিকার করত। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সুরেন নাগ ও আরও কয়েকজনকে বিদেশ যেতে নির্দেশ দিলেন পুলিনবাবু। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখবার জন্য কয়েকজন ছাত্র সভ্যকে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করলেন। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে গৃহত্যাগ সুরু করান পুলিনবাবু।

অমৃত হাজরা এবং আর কয়েকজন মিস্ত্রীর কাজ শিখলেন পুলিনবাবুর নির্দেশে। ঢাকা শহরের অন্তর্গত বেচারামের দেউড়ি অঞ্চলে এক হিন্দুস্থানী লোহার মিস্ত্রী থাকত এবং তার একটা দোকানও ছিল ছোটখাটো। সে বন্দুক, রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সারাবার কাজ খুব ভাল করেই জানত। এই ছিল তাঁর এক রকমের ব্যবসা। এই লোকটি সমিতির গুপ্ত বিষয় সমস্তই জানত এবং স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গের কাছে যাতায়াত করত। অমৃত হাজরা এর

দোকানে বসতেন ও কাজ শিখতেন। সমিতির অস্ত্রশস্ত্র সারাই, পরিষ্কার, ব্যবহার করার উপযুক্ত করে দেওয়া সব কাজই এ মিস্ত্রী করত। সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরও আমরা এই হিন্দুস্থানী মিস্ত্রীর কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি নিজেও মেরামতের জন্য এর কাছে গিয়েছি। অমৃত হাজরা ছাড়া মণীন্দ্র রায় (মনা রায় নামে সমিতিতে পরিচিত), দীগেন মুখুটি প্রভৃতি খুব ভালভাবেই আগ্নেয়াস্ত্র মেরামতের কাজ শিখেছিলেন। কিছুকাল পরে অমৃত হাজরা বোমার শেল (shell) নির্মাণে খুব নিপুণতা অর্জন করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির সবদিকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তবিভাগের কাজও খুব দ্রুত বেড়ে গেল। কিন্তু দেখা দিল আর্থিক অনটন। পুলিনবাবুর নিজস্ব কয়েক হাজার টাকা ফুরিয়ে গেল। সরকারী অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সাহায্যকারী ভয় পেল। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থরাই সাহায্য করত। কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে সমিতিকে সাহায্য করতে ভীত হ'ল। গৃহত্যাগী সভ্যদের অন্নবস্ত্র সংগ্রহই কঠিন হ'ল। অনেকে একবেলা খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করল। আশ্রয়ও তথৈবচ। তখন ঠিক হ'ল যে, দেশের লোক, যাদের সাহায্য করবার ক্ষমতা আছে তারা যখন স্বেচ্ছায় টাকা দেবে না তখন বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ না করে আর উপায় কি! তবে ডাকাতি এমনিভাবে করতে হবে, যেন সরকার এগুলিকে স্বদেশী ডাকাতি বলে সাব্যস্ত করতে না পারে। হ'লও তাই। কোন কোন ডাকাতিতে নির্দোষ গ্রাম্য লোকের শাস্তি হয়।

টঙ্গি, শেখের নগর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ডাকাতি হ'ল। নারায়ণগঞ্জ শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় যেখানে ডাকাতি হয় সেখানে একপাটি জুতা পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে মুচি সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ জুতা নারায়ণগঞ্জ স্কুলের ড্রিল-মাস্টারের। অবশ্য এই প্রমাণেই তাঁর কোন সাজা হয় নি, যদিও তিনি নারায়ণগঞ্জ শাখায় নেতৃস্থানীয়ই ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বাড়রা ডাকাতি হওয়ার পর থেকেই সরকার ও দেশের লোক বুঝতে পারে যে, বিপ্লব-সমিতি অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করছে। বাড়রা ঢাকা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ডাকাতি করে ফেরার পথে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। স্বল্প-পরিসর নদীর দুই তীর থেকে তাদের নৌকার উপর আক্রমণ হয়। ধলেশ্বরী নদীর উপর একটা পুলিস ষ্টিমলঞ্চও

অনুসরণ করে নৌকো ধরার চেষ্টা করে। এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষেই গুলি চলে এবং হতাহত হয়। সশস্ত্র পুলিস অপরপক্ষের পাল্টা-আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে দ্রুত পলায়ন করে এবং ষ্টিমলঞ্চ-আরোহী সশস্ত্র পুলিসও পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে ক্ষীরোদ ঘোষের হাতে মণিবন্ধের নীচে গুলি একদিক দিয়ে বিদ্ধ হয়ে অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরও লোক আহত হয়েছিল। গোপাল সেন গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। পুলিস জীবিত, মৃত বা আহত কোন বিপ্লবীকেই ধরতে পারে নি।

এই ডাকাতির পরিকল্পনা ও নির্দেশ পুলিনবাবুর। পরিচালনা করেন আশুতোষ দাশগুপ্ত। তখন সমিতিতে পুলিনবাবুর পরেই ছিল তাঁর স্থান। পরিচালনাকার্যে আশুবাবুর প্রধান সহকারী ছিলেন শিশির রায় ও শান্তিপদ মুখার্জি। এই ডাকাতিতে ত্রৈলোক্যবাবু এবং সতীশ দাশগুপ্তও (স্বামী সত্যানন্দ) যোগদান করেন।

বাড়রা ডাকাতির সংবাদ সমগ্র দেশে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করে। সকলেই বুঝতে পারল যে, এরা সাধারণ ডাকাত নয়। যুবকদের সঙ্গে তিন-চারটার বেশী বন্দুক ছিল না। বহু-সংখ্যক পুলিস। সকলের হাতেই রাইফেল। যুবকগণ ছিল নৌকায়। পুলিস তীরে এবং ষ্টিলমঞ্চে। প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ আজ মুষ্টিমেয় বাঙালী যুবকের কাছে পরাজিত হ'ল। সকলেই গর্ব অনুভব করল। নদীর দুই তীরের গ্রামের অগণিত অধিবাসীরা হতবাক্ বিস্ময়ে যুবকদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছিল।

এই সময়ই পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামের প্রকাণ্ড বাজার আক্রান্ত হয় এবং বহু সহস্র টাকা লুণ্ঠিত হয়। সরকার ও দেশবাসী সকলেই অনুমান করল যে, অনুশীলন সমিতির সভ্যরাই এ কাজ করেছে।

পি. মিত্র মহাশয়ের অনুমোদন ও জ্ঞাতসারে এ সমস্ত কাজ সংঘটিত হয়। ডাকাতি-দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের হিসাবসহ কাগজপত্র এবং সমিতির গুপ্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত চিঠিপত্র তাঁর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির গুপ্ত কার্যাবলীর সঙ্গে মিত্র মহাশয়ের সম্পর্ক প্রমাণিত করবার জন্য যখন পুলিস তাঁর বাড়ী খানাতল্লাশি করে, তখন এই সমস্ত কাগজপত্র ও চিঠি তাঁর বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু অত্যন্ত সুকৌশলে গোপনে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। এ ব্যাপারে আলিপুরের সরকারী উকিল হেমেন্দ্র মিত্রের অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল বলে শুনেছি।

এতেই বোঝা যাবে যে, ব্রিটিশ সরকার সমিতির কার্যাবলীর জন্য বিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হ'ল। হাজার হাজার যুবকের ড্রিল, প্যারেড ও কৃত্রিম যুদ্ধ সবই যে বিপ্লবের আয়োজন, একথা তারা বুঝতে পারল। এরা সুশিক্ষিত এবং সুগঠিত হয়ে অপরাজেয় হওয়ার পূর্বেই এদেরকে অঙ্কুরে বিনাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে সরকার ব্যাপৃত হ'ল। কিন্তু সমিতির সভ্যদের মধ্যে যে-ই বিশ্বাসঘাতক হ'ত তাকেই সরকার আর খুঁজে পেত না। সুকুমার রমনায় এবং বীরেন গাঙ্গুলী পদ্মানদীর চরে এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুকুমারের মৃতদেহ ওদের হস্তগত হওয়ায় বুঝতে পারল এ সমস্ত লোক কোথায় যায়। অনুশীলন সমিতিকে ধ্বংস করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার দেশব্যাপী আয়োজন শুরু করল।

ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. সি. এলেন। অনুশীলন সমিতি ধ্বংসের কার্যে অগ্রণী হলেন। সমিতির কার্যাবলী-সম্বলিত কাগজপত্রসহ উচ্চতম্ কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পাঠালেন যে, অবিলম্বে সমিতি বিনাশ না করলে ভয়ানক অনিষ্ট হবে। অবিলম্বে দমন-নীতি চালাবার অনুমতি চাইলেন। নিজেই কর্তৃপক্ষকে সব বুঝিয়ে বলার জন্য কলকাতা রওনা হলেন। পথে গোয়ালন্দ স্টেশনে বিপ্লবী কর্মীদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন, আক্রমণকারীরা যাত্রীর ভিড়ে মিলিয়ে যায়। এর পর এলেন সাহেবের নাম আর কেউ শুনতে পায় নি। ব্রিটিশ সরকারও এলেন সাহেব জীবিত কি মৃত তা প্রকাশ করে নি।

মেদিনীপুরে বিপ্লবী সমিতির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছিল। পরলোকগত জ্ঞান বসু মহাশয় ছিলেন পরিচালক এবং সত্যেন বসু, হেম দাস প্রভৃতি প্রধান কর্মী। ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন তখন বালক-কর্মী।

১৯০৮ সালেই মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণের ফলে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, দেশের উদ্ধারের জন্য এদেশের যুবকরা বোমা-বন্দুক নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কলকাতার অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে বদলী হয়েছে। সেখানে তাকে হত্যা করবার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী প্রেরিত হন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁরা যে গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন সেখানে কিংসফোর্ডের বদলে জজ কেনেডির পরিবারের দুজন মহিলা ছিলেন। তাঁরা দুজনেই মারা যান। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রফুল্ল চাকী মোকামাঘাট স্টেশনে ইনস্পেক্টর নন্দলাল বাঁড়ুজ্যে কর্তৃক ধৃত

হওয়ার উপক্রম হলে রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিদেশী শাসকের ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝুলে নিজ-হাতেই মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় মনে করেন।

ক্ষুদিরাম বসুও প্রায় চব্বিশ মাইল দূরবর্তী এক রেলওয়ে স্টেশনে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। তিনি ছিলেন মৃত্যুভয়রহিত। হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। শত শত বছরের পরাধীনতাজনিত ভীরুতার অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর নির্ভীক আত্মদানে দেশের যুবকদের মন থেকে ভীরুতা, হীনতা, দুর্বলতা দূর হয়ে গেল।

আমি তখন নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ি। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন আমরা খালিপায়ে শুধু চাদর গায়ে দিয়ে স্কুলে গিয়ে সমস্ত ছাত্রদের একত্র করে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রা করে নীরবে শহর প্রদক্ষিণ করলাম।

মাণিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হ'ল। সুকিয়া স্ট্রীটেও এক বাড়ীতে বোমা আবিষ্কৃত হ'ল। সারা দেশব্যাপী ধরপাকড় ও খানাতল্লাশির বন্যা বয়ে গেল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত, নরেন গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে গ্রেপ্তার হ'ল।

অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। সমিতির সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করল। প্রকাশ্য সমিতি ভেঙে গেল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমিতি সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে আবার জেগে উঠল।

১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পুলিনবাবু ও ভূপেশ নাগ ১৮১৮ সালের তিন-আইনে গ্রেপ্তার হলেন। সারা বাংলায় আরও সাতজন তিন-আইনে গ্রেপ্তার হন—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সতীশ চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ মল্লিক। এঁদের মধ্যে পুলিন দাস, ভূপেশ নাগ ও সুবোধ মল্লিক বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিলেন। বাকি ক'জন কম-বেশী সহানুভূতিশীল ছিলেন।

ঢাকায় সমিতির কেন্দ্র বজ্রপুরী উঠে গেল। সেখানে যে সমস্ত গৃহত্যাগী সভ্য থাকতেন তাঁরা চারদিকে ছড়িয়ে গেলেন। এঁদের অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল।

সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করার পর অমৃত হাজরা এবং আর ক'জন ময়মনসিং গোলোকপুরের জমিদার কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে আশ্রয়

পান। তিনি ছিলেন সমিতির গৃহী সভ্য। সমিতির পূর্ণ সমর্থক দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ উকিল সতীশ রায় মহাশয় অনেককে আশ্রয় দেন। কয়েক বছর পর আমি তখন পলাতক। আমার নামে যুদ্ধোদ্যম-ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। তখনও দিনাজপুর গিয়ে সমিতি পুনর্গঠনের কাজে সতীশবাবুর পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছি।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার প্রসিদ্ধ মোক্তার রজনী বসাক মহাশয় ছিলেন সমিতির সভ্য। তিনি তাঁর উপার্জিত অর্থ সৎকার্যে দান করতেন। নিজ গৃহে বহু ছেলেকে রেখে তিনি থাকা-খাওয়া এবং লেখাপড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। এও আমাদের একটা প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। মাণিকগঞ্জে আমাদের খুব সুবিধে ছিল এই যে, ওখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার রজনীবাবু, স্টিমার স্টেশনের মাস্টার, পোস্ট-মাস্টার; অনেক গণ্যমান্য উকিল-মোক্তার এবং ব্যবসায়ী, সমিতির সভ্য ছিলেন। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তিল্লির প্রভাবশালী ব্যক্তি যোগেন্দ্র রায় মহাশয়ও সমিতির ছত্রভঙ্গ সভ্যদের আশ্রয়স্থল ছিলেন। এ ছাড়াও আর যাঁরা সমিতির সভ্য এবং আশ্রয়দাতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে—মাদারীপুরের অন্তর্গত বাজিতপুরের জমিদার মণীন্দ্র মজুমদার, গৌরীপুরের (ময়মনসিং) চারি আনার জমিদার-ম্যানেজার অন্নদাবাবু, নোয়াখালীর অন্তর্গত দেবপাড়ার প্রসিদ্ধ ধনী, সম্মানী ঠাকুর-বংশের বড় কর্তা সারদা ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যারা কলকাতা এসে পড়ল তাদের আশ্রয়ের জন্য পি. মিত্র মহাশয় সতীশ বসুকে নির্দেশ দিলেন। তিনি ৪৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সমিতির কেন্দ্রে পলাতকদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুদিন অবশ্য আশুতোষ দাশগুপ্ত ও বীরেন চ্যাটার্জী শ্যামবাজারে ঘর ভাড়া করে থাকতেন। পরে সকলেই সমিতির কেন্দ্রে গিয়ে ওঠেন। আশুবাবুই পলাতক সকলকে খোঁজ খবর করে একত্রিত করেন। পি. মিত্র মহাশয় সমিতির সভ্যদের মনোবল বৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খল করার জন্য এই সময় প্রাণায়াম, যোগ-সাধনা এবং চতুর্মাস্য করাতেন। মিত্র মহাশয়ের এ-সবে বিশ্বাস ছিল এবং নিজেও ভালভাবেই জানতেন।

১৯১০ সালে কানাই ধর লেনে যখন একটা বাসা করে সমিতির গৃহত্যাগী সভ্যরা বাস করছিলেন, তখন আর্থিক দুরবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, সভ্যরা মাঝে মাঝে অনাহারে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছেন। আশু দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে আহার্য সংগ্রহ করে সবাই মিলে

আহার করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফরিদপুর শহরের কাছে একটা ডাকাতিতে কিছু অর্থলাভ হয়।

বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় আমাদের নারায়ণগঞ্জ শাখা-সমিতিও বিচ্ছিন্ন হয়। আমরা এর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। কালীরবাজার আমলাপাড়ার প্রধান রাস্তায় কয়েকখানা ঘরের পেছনে একটা বড় ঘর ভাড়া করলাম। প্রকাশ্য সমিতিতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের মধ্যে থেকে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসযোগ্য সভ্যগণকে বাছাই করতে আরম্ভ করলাম। এঁদের মধ্যে ছিলেন—রজনীকান্ত রায়, সীতানাথ দাস, গুণেন্দ্র সেন, আদিত্য দত্ত, বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্দ্র ধর, নগেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। এই ভাড়া-করা ঘরে আমরা বিশ্বাসী সভ্যদের নিয়ে ব্যায়াম, ছোরাখেলা, যুযুৎসু, বক্সিং চালিয়ে যেতে লাগলাম। তরবারি ও বড় লাঠিখেলা এখানে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া সমিতির আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা, স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক পুস্তক, নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিম-চন্দ্র প্রমুখের পুস্তকাবলী গোপনে পড়ানো ও আলোচনার ব্যবস্থা হ'ল। এই গুপ্ত আড্ডায় সমিতির বিশিষ্ট সাহসী কর্মী শান্তিপদ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন এসে বাস করেন।

নারায়ণগঞ্জে আমরা কিছু অস্ত্রও সংগ্রহ করলাম। এম. ডেভিড কোং-এর ম্যানেজার মরগ্যান সাহেবের বাংলো থেকে তাঁর সমস্ত অস্ত্র আমাদের হাতে এসে পড়ল। আরও কয়েক জায়গা থেকেও রিভলবার সংগৃহীত হয়। জার্মানী থেকে রিভলবার আনার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার সহপাঠী ব্রজবল্লভ দাস কারাদণ্ড লাভ করে। কয়েকটা রিভলবার ডাকে আসে। পুলিস টের পেয়ে ডাক-পিওনকে দিয়ে বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবল্লভকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছরের বেশী নয়।

তখন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাটির-পাড়া গ্রামে হাইস্কুলের ছাত্র। তিনি, যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিনোদ কিছু অস্ত্রসহ নারায়ণগঞ্জ নদীতে একটা নৌকায় গ্রেপ্তার হন। পরে পুলিস তাঁদের নামে নৌকা চুরির মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং দণ্ডিত করে। পুলিসের সহায়ক মুসলমান গুণ্ডার সঙ্গে মারামারিতে একজন নামকরা গুণ্ডা আহত হয়। তার ফলে মামলায় আদিত্য দত্ত প্রভৃতির সাজা হয়।

১৯০৯ সালে রাজেন্দ্রপুরে ট্রেন-ডাকাতি হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে কিছু টাকা ময়মনসিং যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেন রাজেন্দ্রপুর স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই টাকা নিয়ে আক্রমণকারীরা গাড়ী থামিয়ে রেল-লাইনের দু'পাশের শালবনের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যায়। এটাই আমাদের দেশে প্রথম ট্রেন-ডাকাতি। দেশে খুবই উত্তেজনা হয়। এ প্রসঙ্গে স্থরেশ সেনের নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। নারায়ণগঞ্জে রজনীকান্ত রায়, সীতানাথ দাস এবং সম্ভবত গুণেন্দ্র সেন গ্রেপ্তার হন। যদিও এঁরা ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করে। পরে পূর্ববঙ্গ সরকার সীতানাথ দাসকে ঢাকা কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেন। এর পরেই নারায়ণগঞ্জের নিকট গোপচরে ধলেশ্বরী নদীর উপর ডাকাতি হয়। এবারও রজনীকান্ত রায় এবং গুণেন্দ্র সেন প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন।

এই সময়েই সমিতির পুনর্গঠন হয়। মাখনলাল সেন সমিতির প্রধান নেতা হন। তিনি ছিলেন তাঁর নিজগ্রামে বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এই বিদ্যালয় ও স্কুল-বোর্ডিং হয় সমিতির প্রধান কেন্দ্র। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক পলাতক বিচ্ছিন্ন সভ্য ফিরে এলেন সোনারং কেন্দ্রে। স্কুলের সব শিক্ষকই সমিতির বিশ্বাসযোগ্য গৃহত্যাগী সভ্য ছিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে। ঢাকা কেন্দ্রের বজ্রপুরীর মতই আবার সোনারং কেন্দ্র গড়ে উঠল।

তখন নেতৃত্ব-স্থলে মাখনবাবুর পরেই স্থান ছিল নরেন্দ্রমোহন সেনের। তাঁর দক্ষতা, উৎসাহ এবং দৃঢ়সঙ্কল্পের ফলে সমিতি পুনরায় নব-জীবন লাভ করে। নরেনবাবুর নেতৃত্বেই রাজনগর, মোহনপুর বাজার, ঘড়িসার এবং আরও কয়েকটা ডাকাতি সাফল্যলাভ করায় সমিতি কিছু অর্থলাভ করে। সোনারং-এ সমিতির কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় নারায়ণগঞ্জের শাখা তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সোনারং-এর নেতৃত্বাধীনে চলতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে পুলিনবাবু মুক্তিলাভ করে ঢাকায় এসে সমিতির সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সমিতির নানা জেলার সভ্যগণকে সোনারং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করতে নির্দেশ দেন।

নারায়ণগঞ্জে পুলিসের উৎপাত ভীষণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কয়েকজন সভ্য বিশেষ করে, সীতানাথ দাস ও আদিত্য দত্তের অবস্থা এমন হ'ল যে, ওঁদের

কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাধ্য হয়ে সোনারং কেন্দ্রকে খবর দিলাম, যদি গৃহত্যাগী সভ্যের প্রয়োজন থাকে তবে ওঁদের অবিলম্বে পাঠাতে পারি। যদিও আমরা কয়েকজন সভ্যই গৃহত্যাগ করার জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলাম, তথাপি আমি এবং আরও জনকয়েক তখনও পুলিসের তেমন সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়াই নি। সুতরাং আরও কিছুদিন আমাদের এখানে থেকেই কাজকর্ম চালান সম্ভব ছিল। এমনি অবস্থায় একদিন নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় সন্ধ্যার সময় আমাকে সংবাদ দেন সীতানাথ দাসকে গৃহত্যাগ করিয়ে অবিলম্বে সোনারং পাঠাবার জন্য। সীতানাথ দাসকে ডেকে কেন্দ্রের নির্দেশ জানালাম। তিনি সানন্দে সেদিন শেষরাত্রির অন্ধকারে পিতামাতা, ভাইবোন, শয্যায়শায়িতা যুবতী স্ত্রী সব পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের অতি কঠিন জীবন-যাপনের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সংসারের ভরসাস্থল। ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন মেধাবী। সোনারং কেন্দ্রে কিছুদিন থেকে তিনি গেলেন ফেণী মহকুমা শহরের স্কুলের শিক্ষকতা কার্য নিয়ে সমিতির কাজ করবার জন্য। সেখানে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর ঢাকা কলেজের সহপাঠী সুরেন্দ্রকিশোর দাসের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দুজনেই পাস করেছিলেন। সুতরাং সেখানে অনুসন্ধান করলে হঠাৎ প্রকাশিত হওয়ার ভয় ছিল না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সীতানাথ দাসের পক্ষে পলায়ন করাও খুব সহজ কাজ ছিল না। পুলিস যে শুধু তাঁকে সারাদিন অনুসরণ করত তা নয়, রাত্রিতেও মাঝে মাঝে এসে জাগিয়ে দেখে যেত, ঠিক বাড়ীতে আছে কিনা।

কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় খবর পেয়ে আদিত্য দত্তকে সোনারং কেন্দ্রে পাঠাই সীতানাথ দাসের মত। ক্রমে রমেশ আচার্য, রবীন্দ্র সেন, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতি গৃহত্যাগ করে সোনারং গমন করেন।

সোনারং বোর্ডিং-এ ঠাকুর-চাকর রাখবার নিয়ম ছিল না। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদেরই সব কাজ করতে হ'ত। গৃহত্যাগ করে সোনারং বোর্ডিং-এ গিয়ে অনেক সভ্যকেই প্রথমে পাচক ও ভৃত্যের কাজ করতে হ'ত। আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা থাকতে পারত না। গৃহত্যাগী সভ্যদের সোনারং কেন্দ্রে কিছুদিন থাকবার পর মফঃস্বলে সমিতির কাজে পাঠান হ'ত।

১৯১০ সালের এপ্রিল মাসে আমার পিতৃদেব পরলোকগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। যদিও আমার বয়স তখন

মাত্র বোন, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে আমার উপরই সব দায়িত্ব এসে গেল। যদিও মাতৃদেবী সংসার চালাবার মত বুদ্ধি ও ক্ষমতা রাখতেন, কিন্তু একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়কের একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় কখনও জানতে পারি নি কি আছে আর নেই।

সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে এবং যাদের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক ছিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলাম যে, বুদ্ধি করে চলে পিতৃদত্ত অর্থ ঠিকভাবে খাটাতে পারলে শুধু পরিবার প্রতিপালনই সম্ভব হবে তা নয়, প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে সুখে দিনযাপন করতে পারব। আর একটা কথা বুঝতে পারলাম এই যে, কেবল শোচনীয় দারিদ্র্যই বিপ্লবী-জীবনের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক নয়, প্রচুর ধন-সম্পত্তিও সমভাবে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পিতৃদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। শুয়ে শুয়ে সংসারের ভবিষ্যৎ, নিজের কর্তব্য ভেবে স্থির করলাম, কোন প্রলোভনেই বিপ্লবী-জীবনের যে ব্রত গ্রহণ করেছি তা থেকে বিচ্যুত হব না। এ বিষয়ে আমার মাতৃদেবীর কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। তিনি বললেন, "তুমি তোমার কর্তব্য করতে থাক। কোন কিছুর জন্যই তোমাকে ব্রত পরিত্যাগ করতে হবে না। আমাদের দিন একরকমে চলে যাবে।" এমনি করেই তিনি আমায় চিরকাল সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি সমস্ত বিপ্লবী যুবকদেরই নিজের সন্তানের মত দেখতেন। সেকালের বিপ্লবীরাও তাঁকে মায়ের শ্রদ্ধা দান করেছেন। পরবর্তী জীবনে যখন আমি বছরের পর বছর কারাগারে দিন কাটিয়েছি তখনও আমার অনুপস্থিতিতে তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয়, আহার ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কোনদিনই তাঁকে আমি ভীতা হতে দেখি নি। পুলিসের অত্যাচার তিনি উন্নতশিরে বহন করেছেন। তাঁর চারপুত্রের মধ্যে যখন তিন পুত্রই কারাগারে তখনও তিনি দিশেহারা হন নি। কয়েক বার এমন হয়েছে যে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কাজে ট্রেনে-স্টিমারে যাতে বিপদ না ঘটে সেজন্য মা রিভলবার, পিস্তল ইত্যাদি আমাদের কাছ থেকে নিজের কাছে রাখতেন—"মেয়েদের তো সন্দেহ করবে না, আমার হাতে দে।"

শুধু মা ও ভাইয়েরা নয়, আমার ভগ্নিপতি ঢাকার উকীল মনোরঞ্জনবাবু অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর বাসা সমিতির একটা আশ্রয়-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার আপন

পিসতুত ভাই। ছেলেবেলা থেকেই দেশপ্রেমের মধ্য দিয়ে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় একজন বোবা থাকত। সে কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় থেকে কিছু কথা বলতে শিখেছিল। সে অনেককেই চিনত, কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিস যখন তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখাত, সে কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। আমাদের বাড়ির ভৃত্যদের বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করেছি। একবার কেবল আমাদের এক ভৃত্যের গতিবিধিতে মা সন্দিহান হয়ে একটি ঘরে আবদ্ধ করে বললেন—"সমস্ত সত্যি করে বল্, নইলে এখনই তোকে মেরে ফেলা হবে। আমি হুকুম দিয়ে তোকে হত্যা করাব।" ভয়ে সমস্ত স্বীকারোক্তি করে বলে যে, সে পুলিসের ডেপুটি-সুপার মনোমোহন চক্রবর্তীর নিযুক্ত লোক। অনেক চেষ্টা করে সে এ বাড়িতে নিযুক্ত হয়েছে। সে গোয়েন্দা-পুলিসের নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা পায়। আর বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত আছে বলে কিছু অতিরিক্ত টাকা পায়। পরে আমার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলে—"আমায় রক্ষা করুন, প্রাণে মারবেন না। জীবনে আমি আর এমন কাজ করব না। সব ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাব।" বাড়ির সকলকে সতর্ক করে দিয়ে মা তাকে তার প্রাপ্য বেতন দিলেন ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন।

ঢাকায় আমাদের পাড়ায় আশেপাশের সকলের সঙ্গে আমরা সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলতাম। মা ও বোনেরাও এ সমস্ত বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে রাখতেন যাতে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ির সামনে যাতে অবাঞ্ছনীয় ভাড়াটে না আসতে পারে, তার ব্যবস্থা দেখতেন মনোরঞ্জন-বাবু। পাড়ায় কয়েক ঘর মুসলমান গাড়োয়ান বাস করত। এদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা অত্যন্ত অশ্লীল ও বিরক্তিকর ছিল। পাড়া তো নোংরা করে রাখতই, সুবিধে পেলে ছোটখাট জিনিসও চুরি করত। আমাদের বাড়ি থেকেও দু'একবার করেছে। পাড়ার লোক এদের তুলে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবুর চেষ্টায় এ সমস্ত দরিদ্র মুসলমান বাস্তুহারা হয় নি। পুলিস এদের হাত করে আমাদের বাড়ীর তথ্য জানবার চেষ্টা করেছে। বাড়ী এবং আস্তাবলে বসে গোয়েন্দারা আমাদের বাড়ীর উপর নজর দিতে সচেষ্ট হয়েছে, কিন্তু কোনদিনই এরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। যদিও এরা সাধারণত অপরাধপ্রবণ লোক ছিল, চুরির দায়ে প্রায়ই থানায় যেতে হ'ত এবং পুলিসের কুনজরে পড়লে কঞ্জি-

রোজগার বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু কোনদিনই আমাদের গতিবিধির খবর পুলিসকে দেয় নি। বরং তাদের খবরই আমাদের কাছে অনেক সময় পৌঁছে দিয়েছে। সেকালে এত মোটর ছিল না। বড় রকমের খানাতল্লাশিতে বহু পুলিসের যাতায়াতের জন্য অনেক ঘোড়ার গাড়ীর প্রয়োজন হ'ত। এজন্য ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ানরা পুলিসের গতিবিধি কিছু কিছু টের পেত। অনেকবার অনেক খবরই তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। মনোরঞ্জনবাবুর গ্রেপ্তারের আয়োজনের খবর এক গাড়োয়ানই এসে প্রথম দিয়ে যায়। কাদির, লালু মিঞার কথা আজও ভুলতে পারি নি।

বহু বছর পরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় যখন এই সমস্ত মুসলমানের বাসস্থান, গাড়ি প্রভৃতি ভস্মীভূত হওয়ার খবর কারাগারে বসে পাই তখন বাস্তবিক পক্ষে মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। ১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পর ঢাকা ও কলকাতায় যে কুখ্যাত গ্রেট্ কিলিংয়ে হাজার হাজার লোক নিহত হয় সেই আগস্ট মাসে উক্ত লালু মিঞা—সে তখন বৃদ্ধ—তার নাতিকে কোলে নিয়ে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার মুক্তি-সংবাদ পেয়ে। সেদিন আমি আমার মনের আবেগ রুদ্ধ করতে পারি নি। লালু মিঞাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর পরিতৃপ্ত হলাম। কিন্তু হিন্দুপাড়া থেকে সে আজ আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না ভেবে ব্যাকুল হলাম। শেষে নিজেই তাদের মুসলমান পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে দিলাম।

আমাদের বাসা নারায়ণগঞ্জ থেকে উঠে এসে ঢাকায় আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবুর পাশাপাশি হয়। খাওয়া-দাওয়া বহুদিন পর্যন্ত একসঙ্গেই হ'ত। দলের অনেক সভ্য প্রতিদিন আমাদের বাড়ী আহার করতেন। একটা নিয়মই ছিল যে, প্রতিদিন অতিরিক্ত চারজন লোকের আহার্য প্রস্তুত থাকত। সমিতির লোকের জন্যই এ ব্যবস্থা হয়। যদি চারজনের বেশী আসত এবং মেয়েদের পূর্বে আসত, তবে অতিথির আহার শেষ হওয়ার পর পুনরায় রান্না হ'ত। আমরা জেলে যাওয়ার পরও মা ও বোন এ নিয়ম রেখেছিলেন। দলের অনেক বিশিষ্ট সভ্য ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরী, আশু কাহিলী প্রভৃতি আরও অনেকে ঢাকায় এলে সরাসরি আমাদের বাসায় এসে উঠতেন—আমরা বাড়ী থাকি না থাকি তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

পুলিনবাবু কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সমিতির পুনর্গঠনে মনোযোগ দিতে না দিতেই একদিন নানা জেলায় ব্যাপকভাবে খানাতল্লাশি শুরু হয়। ঢাকায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের এক ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন হয়। পুলিনবাবু, আশু দাশগুপ্ত, শান্তিপদ মুখোপাধ্যায়, গোপীবল্লভ বসাক, অক্ষয় দত্ত (পরে যিনি গোরক্ষনাথের আসনে অধিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শান্তিনাথ নামে পরিচিত হন), নলিনীকিশোর গুহ, রজনী সরকার, সুশীল সেন, উকিল ললিতমোহন রায়, দীনেশ মুস্তফী, মাণিক্য মুস্তফী, টাঙ্গাইলের মোক্তার অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, শশী সরকার, বঙ্কিম সেন প্রভৃতি অনেকে গ্রেপ্তার হন। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ঐ মোকদ্দমার একজন পলাতক আসামী।

এই মোকদ্দমা বহুদিন চলে। সরকার পক্ষ সমর্থন করতে কলকাতা থেকে আসেন ব্যারিস্টার গার্থ (Garth), পি. এল. রায়, এন. গুপ্ত প্রভৃতি। আসামী পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ এবং শ্রী শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় সহ ঢাকার অনেক উকিল।

অধিকাংশ খরচ সমিতিকেই বহন করতে হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করতে কয়েকটা ডাকাতি সংঘটিত হয়।

প্রচারের দিক থেকে এই মোকদ্দমায় সমিতির লাভই হ'ল। দেশবাসী সমিতির উদ্দেশ্য জানতে সুযোগ পেল। যদিও কেউ কেউ ভীত হয়ে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, কিন্তু মামলার প্রচারের ফলে সমিতির সভ্য ও সমর্থকের সংখ্যা মোটের উপর বৃদ্ধিই পেল।

পুলিনবাবু, আশুবাবু প্রভৃতি অনেকেই দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অনেকে মুক্তিলাভও করেন।

এই সময়েই মাখনবাবুর সঙ্গে সমিতির অধিকাংশ সভ্যের মতদ্বৈত হয়। ১৯১০ সালে তিনি কলকাতা গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নরেন্দ্রমোহন সেনের উপর ন্যস্ত হয়। মাখনবাবুর মত ছিল সমিতি নতুন আকারে গড়ে তুলতে হবে। বলপ্রয়োগ, ডাকাতি প্রভৃতি বর্জন করতে হবে, যারা গৃহত্যাগ করে এসেছে তাদের গৃহে ফিরে গিয়ে ধর্ম, শিক্ষা, সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে মিশে গিয়ে কিংবা তাদের অনুরূপ কাজ করে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা সমিতির

যন্ত্রপুরীতে এবং সোনারং বোর্ডিংয়ে দশাবতার স্তোত্র পাঠের নিয়ম ছিল। তার মধ্যে আমার প্রিয় শ্লোক ছিল—

"ম্লেচ্ছঃ নিবহঃ নিধনে, কলয়সি করবালম।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম ॥
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥"

কারণ, আমরা মনে করতাম যে, পৃথিবী থেকে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ যারা শক্তির দম্ভে জনগণের উপর অত্যাচার করত, তাদের ধ্বংসের জন্য ভগবান দেহ ধারণ করবেন। আমাদেরই মধ্যে যারা শুদ্ধাচারী, নিষ্ঠাবান, পরহিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ—আমাদের দ্বারাই ভগবান তাঁর অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করবেন।

সোনারং বোর্ডিংয়ে একটি ঠাকুরঘর ছিল। সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূজা হ'ত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে আমাদের আত্মগঠন করতে হবে। মাখনবাবুর নির্দেশ এবং প্রভাবেই আমাদের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা দিল। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী পঠন-পাঠন এবং প্রচারের ব্যবস্থা করলাম।

কিন্তু মতদ্বৈত এল উপদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে। মাখনবাবু ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দ বললেন যে, আগে ধর্ম, ব্রহ্মোপলব্ধি, তার পর সব। আগে ঈশ্বর দর্শন করে চাপরাস লাভ কর, তার পর জীবহিতে লেগে যাও। আমাদের মত হ'ল যে, ব্রহ্মোপলব্ধি যদি মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয় এবং তা যদি আগেই লাভ করি, তবে অন্য কাজ করার কোন অর্থ ই থাকে না। আমাদের মতে আগে কর্ম। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলেই তবে ব্রহ্মোপলব্ধি হবে। ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্মই হ'ল শ্রেষ্ঠ কর্ম। এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং কোটি কোটি জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অবসানই ঈশ্বরাভিপ্রেত। সুতরাং আমাদের আশু কর্তব্য বিপ্লবায়োজন করে ব্রিটিশ-নিধন এবং এ জন্যই সমিতি গঠন। বল-প্রয়োগের পথ আমরা পরিত্যাগ করব না, কারণ তা ছাড়া অত্যাচারীর ধ্বংস সাধন হবে না। গীতা-নির্দিষ্ট পথই আমাদের পথ।

মাখনবাবু একবার পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন জেলায় নিজের মত সভ্যদের কাছে প্রচারের জন্য ভ্রমণে বার হলেন—অবশ্য অত্যন্ত গুপ্তভাবেই। আমাদের সঙ্গে অনেক তর্ক হ'ল। কিন্তু তিনি স্বমতে অটল রইলেন এবং দলাদলি ও দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষতিকর কার্য থেকে দূরে থাকবার জন্য কলকাতায় গিয়ে স্থায়িভাবে বাস করতে লগেলেন। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই

যে, মাখনবাবু বা তাঁর মতাবলম্বীদের কারুর সঙ্গেই কোন মনোমালিন্য, দলাদলি, বিদ্বেষ কিছুই হয় নি।

তখন যে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলেছিল তাতে নরেনবাবু ইচ্ছে করেই পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল পাছে লোকে মনে করে যে, তিনি নেতৃত্বের লোভেই এ সমস্ত করছেন। আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, চিঠি লেখালেখি আমি ও ত্রৈলোক্যবাবু করতে লাগলাম; ত্রৈলোক্য-বাবু চিঠির একটা ধারাবাহিক অনুলিপি লিখে ফেললেন। ঐ চিঠিগুলি থাকলে এই সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী-চিন্তাধারার একটা সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যেত। মাখনবাবু দায়িত্বভার পরিত্যাগের প্রাক্কালে নরেনবাবু তাঁকে বারে বারে তাগিদ দেন, যেন তিনি নিজ-হাতেই সমিতির সমস্ত কার্যভার রাখেন ও পরিচালনা করেন।

উপরে উল্লেখ করেছি যে, নরেনবাবু তর্ক-বিতর্কে যোগ দেন নি। ও কাজ বেশির ভাগ আমিই করেছি। তার কারণ এই যে, তার কিছু পূর্ব থেকেই নরেনবাবু আমার সঙ্গে খুব মিশতে থাকেন এবং সমিতি সম্পর্কে সমস্ত কাজের সঙ্গে আমাকে ওয়াকিবহাল করাতে লাগলেন। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং নারায়ণগঞ্জ-ঢাকার দৈনিক যাত্রী। তিনি কলেজে আসতেন প্রতিদিন দুপুরবেলা। যে সময় ক্লাশ থাকত না তখন দলের সভ্য, যাদের সভ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সহানুভূতিশীল, চরিত্রবান ও পরোপকারী যুবকদের নিয়ে কলেজ-প্রাঙ্গণের কোন গাছের তলায় বসে নানা আলোচনায় কাটাতাম।

সে যাই হোক, মাখনবাবুর কলকাতা যাওয়ার পর সমিতির সব কিছুই যখন নরেনবাবুর উপর এসে পড়ল এবং আমি তাঁর সহকারীরূপে পরিচিত হয়ে গেলাম তখন নরেনবাবু আমায় বললেন, "মাখনবাবু তো গেলেন। এখন সমিতি বাস্তবিক আমাদের চায় কি না তার একটা পরীক্ষা করা দরকার। কায়দা করে আমরা দলপতি হয়ে পড়লাম এমন একটা কথা কেউ মনে না করতে পারে।" আমরা দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, কিছুদিন আমরা কতকটা গা-ঢাকা দেওয়ার মত থাকব। লোকের যদি বিশ্বাস থাকে তবে আমাদের ডেকে নেবে। অবশ্য এতে সমিতির ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মধ্যে জনপ্রিয় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তখন ত্রিপুরা স্টেটের উদয়পুরে। এ সম্বন্ধে পরে বলছি।

উপরি-উক্ত পরামর্শক্রমে সমিতির অস্ত্র-শস্ত্র ও সম্পদ নিরাপদ স্থানে রেখে আমি গেলাম আমাদের গ্রামের চুড়াইনের বাড়ী এবং নরেনবাবু গেলেন তাঁদের গ্রামের বাড়ী নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত সোনারগাঁর আমিনপুরে।

তখন সমিতির মধ্যে একটু দিশেহারা ভাব আসে। লোকে চিঠি লিখলে জবাব পায় না, দেখা করতে এসে ফিরে যায়। সমিতির অনুরাগী সভ্যগণ নরেনবাবু ও আমার খোঁজ করতে থাকেন। সে সময় উদয়পুর থেকে ত্রৈলোক্য-বাবুর লেখা একটা কৌতুকপূর্ণ চিঠির কথা মনে আছে। তিনি লিখলেন, "আমি এখানে গাঁজার চাষ আরম্ভ করেছি। আপনি ও নরেনবাবু যেভাবে সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে বসে আছেন তাতে আপনাদের এখন এই জিনিসটারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাড়ী ছেড়ে শীঘ্র চলে আসুন।" অনুরূপ চিঠি তিনি নরেনবাবুকে লেখেন। তখন আমি ও নরেনবাবু পত্রালাপ করে দু'জনেই ঢাকায় ফিরে এসে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করলাম।

এখানে উদয়পুরের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। উদয়পুর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত একটি মহকুমা। তখনকার দিনে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা না থাকায় উদয়পুর অতি দুর্গম স্থান বলে পরিচিত ছিল। আগরতলা কিংবা কুমিল্লা শহর থেকে ত্রিশ মাইল পাহাড় অঞ্চলের পথ হেঁটে যেতে হ'ত। সেখানের জমি ছিল সস্তা। আমাদেরই এক গৃহী-সভ্য দ্বারিক রায়ের নামে বহু জমি সংগ্রহ করে-ছিলাম সমিতির টাকায়। তিনি ছিলেন আমাদের বিশ্বাসী গৃহী-সভ্য।

সেখানে আমাদের কাজের একটা পরিকল্পনা ছিল এবং দলের কয়েকজন পলাতক ও গৃহত্যাগী কর্মী থাকতেন। চাষের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যরা বন্দুক চালনা শিক্ষা করবে। অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী ও রক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ত্রিপুরা দেশীয় রাজ্য হওয়ায় সেখানে ব্রিটিশ পুলিসের ততটা যাতায়াত ছিল না। এ স্থানে একটা ঘাঁটি স্থাপন করে নিকটবর্তী পাহাড়ীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পাব। ঘাঁটি সুদৃঢ় করতে পারলে উদয়পুরকেই কেন্দ্র করে আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কার্য পরিচালনার সুযোগ পাব। যদি সমতল ক্ষেত্র থেকে হটেও যেতে হয়, তথাপি বহুদিন পর্যন্ত পাহাড় অঞ্চলে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব।

সভ্যরাই সেখানে চাষীদের মত চাষের কাজ করতেন। ত্রৈলোক্যবাবু মাঝে মাঝে গিয়ে কাজকর্ম দেখে আসতেন। ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী সেখানে অনেক

দিন স্থায়িভাবে বাস করেছিলেন। তাঁর ডাকনাম বসন্ত ও দলীয় নাম শর্বরীকান্ত। তিনি ছিলেন বিক্রমপুর নিবাসী এবং সমিতির খুব বিশ্বাসভাজন ও নিষ্ঠাবান কর্মী।

তখন নানা কাজের মাধ্যমে আমি ও নরেনবাবু এমনভাবে মিশে গিয়েছিলাম যে, ঢাকায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আহার করতেন। আমিও তাঁদের বাড়ীতে আহার করেছি। নরেনবাবুর বাড়ীর সকলেই, মায় ভৃত্যগণ সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতি-শীল ছিলেন। ঐ সময়েই সমিতির কেন্দ্র সোনারং থেকে ঢাকায় এসেছে। নরেনবাবুরও আমাদের বাড়ী ছিল প্রধান আড্ডা।

চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাশ ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কেশব দাশ সমিতির সভ্য ছিলেন। এঁদের ঢাকার বাড়ী আমাদের একটা গুপ্ত আড্ডা ছিল। পলাতক সভ্যগণ প্রায়ই এই বাড়ীতেই আহারাদি এবং শয়ন করতেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তাঁরা কখনও পুলিসকে ভয় করেন নি।

নরেনবাবুর সঙ্গে আমার মেলামেশার মধ্যে একটা সমিতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল। কেন না, যে সমস্ত সভ্যের মধ্যে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা সমিতির কর্তৃপক্ষ দেখতে পেতেন, গোড়া থেকেই তাঁরা এই সমস্ত সভ্যকে সমস্ত কার্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেন। সমিতির কাজের জন্য ছোট-বড় কাজের কোন তারতম্য ছিল না। সমিতির মঙ্গলার্থে সবই বড় বলে গণ্য হ'ত। সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ আর ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলা সমান দায়িত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'ত। কারণ সামান্য কাজেও ত্রুটি থাকলে বৃহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা থেকে যেত। সর্ববিধ কাজই নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে করতে হ'ত। সমিতি সংক্রান্ত সমস্ত কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে না পারলে ভবিষ্যতে নেতৃস্থানীয় হতে পারত না।

প্রসঙ্গত, অনুশীলন সমিতির নেতা নির্বাচনের আসল মর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমিতির নেতা, বিশেষত গুপ্ত সমিতির যুগে, নির্বাচিত বা মনোনীত (nominated) হ'ত না। নানাবিধ কাজ, কুশলতা ত্যাগ, বুদ্ধিমত্তা ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব যেন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকত। নেতা নির্বাচনের কোন রীতি-অনুষ্ঠান সম্পন্ন না করে সকলেই পূর্ব হতেই যেন সভ্যরা নিজের মনে স্বীকার করে রাখত। মাখনবাবুর পর নরেনবাবুর নেতৃত্ব লাভ

কোন রীতিগত অনুষ্ঠান বা ভোটের মাধ্যমে হয় নি। সকলে অন্তরের দিক থেকেই সহজে তাঁকে নেতারূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

নরেনবাবু ভবিষ্যতের জন্য আমাকে গড়ে তুলতে শুরু করলেন। সর্বকার্যে আমাকে তাঁর সহকারী করে অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে লাগলেন। সমিতির বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে আগত সমস্ত চিঠিপত্র আমাকে দিয়ে পড়াতেন। পরামর্শ করে কি উত্তর দিতে হবে তা বলে দিতেন। চিঠি লিখে আমিই 'সেন' দস্তখত করতাম। কিছুদিন পর নরেনবাবুর নির্দেশে আমি একাই পত্রাদি পড়ে উত্তর দিতাম। যদিও দস্তখত 'সেন' বলেই থাকত। নরেনবাবু যখন পুলিসের বিশেষ সন্দেহভাজন হয়ে পড়লেন এবং নানা জায়গায় পুলিস গোপনে পত্রাদি পড়ে দেখতে শুরু করল এবং আটক করে দিতে লাগল, তখন নরেনবাবুর নির্দেশেই আর 'সেন' দস্তখত করতাম না। আমার নিজস্ব দস্তখতই করতাম। নরেনবাবু বলেছিলেন, "আমি আর বেশীদিন বাইরে থাকতে পারব না। কাজেই, বুঝে আপনি নিজেই সমস্ত কাজকর্ম চালাতে থাকুন।" পত্রদ্বারা তিনি সব জায়গায় জানিয়ে দিলেন যে, চিঠিপত্রে প্রতুলবাবুই দস্তখত করবেন এবং লেখা থাকবে 'গাঙ্গুলী'। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী প্রিয়নাথ আচার্য তার সাক্ষ্যে এই কথাই বলেছিল।

আমাদের সমিতির আর একটা বিশেষ নিয়ম ছিল যে, যার ওপর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার থাকবে তার একজন সহকারীও রাখতে হবে, যাতে একজন গ্রেপ্তার হ'লে কাজকর্মের ক্ষতি না হয়। একই কারণে প্রধান ও তার সহকারী—দুজনেরই কোন বিপজ্জনক কাজে একসঙ্গে যাওয়ার নিয়ম ছিল না।

এই সমস্ত কারণেই নরেনবাবু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই আমাকে সমিতি পরিচালনায় প্রস্তুত করে রাখলেন। এমন কি তিনি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমাকে কার্য পরিচালনা করতে হ'ত এবং নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হ'ত। মফঃস্বল থেকে কোন লোক এলে অনেক সময় আমিই আলাপ করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতাম। অবশ্য আগে কিংবা পরে যখনই হোক নরেনবাবুকে সমস্ত জানিয়ে রাখতাম।

১৯১০ সালে একদিন সন্ধ্যেবেলা নরেনবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঢাকার মাহুতটুলীতে মণীন্দ্র রায়ের বাড়ীর বাইরে বসবার ঘরের সিঁড়ির উপর বসে আলাপ হয়েছিল। বিষয়বস্তু একটু বিশেষ ধরনের ছিল বলে আজও সব মনে আছে। নরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন—"দেখুন, সমিতির সবরকম কাজের

দায়িত্বভার ক্রমশঃ আপনাকেই নিতে হবে। কে কখন আমরা ধরা পড়ি, মারা যাই, তার ঠিক নেই। নতুন লোক অগ্রসর হয়ে না এলে সমিতি টিকবে না। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। সবরকম কাজে যোগ-দান করলেই সমিতি পরিচালনায় যোগ্যতা বাড়বে।"

আমি বললাম—"সমিতির কাজের জন্য আমি সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। উপযুক্ত মনে করে যদি কোন দায়িত্বভার দেন তবে তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব।"

নরেনবাবু—"সশস্ত্র অভিযানে যেতে হবে। পরিচালকরূপে অন্যকে এ কাজে পাঠাতে হবে। সুতরাং প্রয়োজনমত আপনার নিজেকেও যেতে হবে। তবেই শিক্ষা দিতে পারবেন—শুধু পরিচালক নয়, সভ্য সকলকেই রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকা বিতরণ থেকে শুরু করে খুন-ডাকাতি পর্যন্ত সমস্ত কাজের জন্য তৈরী থাকতে হবে। কোন কাজেই ভীত হবেন না। ধীর, স্থির ও কর্তব্যে অটল থাকতে হবে। সফলতায় বিফলতায়, জয়ে পরাজয়ে, কিছুতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য বা বুদ্ধিভ্রংশ হতে পারবেন না।"

আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতি পেয়ে নরেনবাবু আমাকে একটা ডাকাতিতে যাওয়ার কথা জানালে আমি আমার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিলাম।

এই ডাকাতি সংঘটিত হয় ১৯১১ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী। আমি, বিমলা গাঙ্গুলী (পরে তিনি কিছুকাল কলেজে প্রফেসরি করে ১৯২০ সালে কংগ্রেসের কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন), বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে তিনি রাজশাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েছিলেন), আমরা এই ক'জন রাত এগারটার পর নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে গোয়ালন্দ মিক্সড স্টিমারে (Mixed steamer) তৃতীয় শ্রেণীর ডেকে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। ঢাকা থেকে আরও কয়েকজন এসেছিল। রাজবাড়ি স্টেশন থেকে উঠলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্র সেন, অমৃত সরকার ও কলকাতা থেকে অমৃত হাজরা প্রভৃতি আরও ক'জন।

পরে আমরা তারপাশা স্টেশন থেকে স্টিমার বদল করে চাঁদপুরগামী স্টিমারে উঠে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সুরেশ্বর স্টেশনে নামলাম। তখন বেলা পড়ে আসছে। আমরা হেঁটে ঘড়িসার হয়ে ঘুরে-ফিরে এক মাঠের ভিতরের রাস্তায় পৌঁছলাম। চলতে চলতে ত্রৈলোক্যবাবু গান ধরলেন—"নিশি অবসান প্রায়, আর কত দেরী, প্রাণ যে সহে না।" সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে নিকটবর্তী জঙ্গল

থেকে এক ব্যক্তি একটা শব্দ করে এসে আমাদের সকলকে এক জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার স্থানে বসাল। আরও লোক সেখানে আগে থেকেই জমায়েত ছিল।

যথাসময়ে আমরা অভিযানে চললাম। অপরপক্ষের প্রবল বাধা এবং অন্যান্য নানা বিপদের মধ্যেও নির্দিষ্ট কর্ম সমাধা করে আমরা যে-যার গন্তব্যস্থানে ফিরে গেলাম। বাড়ি ফিরে গিয়ে খবরের কাগজে দেখলাম, যে গ্রামে ডাকাতি হয়েছে তার নাম পণ্ডিতসার।

এই কার্যের পরিচালনার ভার ছিল ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর উপর। ত্রৈলোক্য-বাবুর নিজের দায়িত্ব ও পরিচালনায় এটাই প্রথম সশস্ত্র অভিযান। এই কার্যের পরই সকলের মনে প্রত্যয় জন্মে যে, ত্রৈলোক্যবাবুর নেতৃত্বে এমনি অভিযানে সাফল্য অর্জন করা যায়। নরেনবাবু উপস্থিত না থাকলেও চলে। তাঁকে ছাড়াও কাজ চলতে পারে এমনি পরীক্ষা করবার জন্যও নরেনবাবু ইচ্ছাপূর্বক এ কাজে অনুপস্থিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। নরেনবাবু সমিতির নেতৃত্ব এমনি-ভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন যার ফলে সমিতির গঠন-সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়, আর সশস্ত্র কার্যের দায়িত্ব অর্পিত হয় ত্রৈলোক্য-বাবুর উপর। কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ধৈর্যে ত্রৈলোক্যবাবুর উপর সশস্ত্র কার্যে আস্থা স্বতঃই সকলের মনে স্থান পেয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তার মধ্যে আদর্শ বিপ্লবী চরিত্রের সমস্ত গুণরাশি এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি অনুশীলন সমিতির এক অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হলেন।

পরবর্তী যুগে অনেক সশস্ত্র কার্য দেশে সংঘটিত হয়েছে। অনেক চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তখনকার দেশের জনসাধারণের অবস্থা এবং কর্মীসাধারণের মনোবিকাশ বিবেচনা করলে বোঝা যাবে, সে সময় এসমস্ত সশস্ত্র কার্যে সফলতা অর্জনের দ্বারা কর্মিগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মানো কত কঠিন কাজ ছিল। ত্রৈলোক্যবাবুর নেতৃত্বে ডাকাতি এবং প্রাণদণ্ড দেওয়ার কাজ ক্রমাগত সাফল্যমণ্ডিত হতে লাগল।

পণ্ডিতসার ডাকাতির কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাওদিয়া গ্রামে ডাকাতি সংঘটিত হয়। পরিচালক ছিলেন ত্রৈলোক্যবাবু। অংশ-গ্রহণকারীর মধ্যে ছিলাম আমি এবং আরও অনেকে, যাঁদের মধ্যে আছেন --সতীশ দাশগুপ্ত, রমেন আচার্য, বীরেন চ্যাটার্জি, দীগেন মুখুটি, শশধর দত্ত,

অমৃত হাজরা, নগেন সরকার, বিমলা গাঙ্গুলী, নলিনী মুখার্জি (পরে ইনি বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছিলেন। সমিতির কাজেই তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন), এবং উৎপল সরকার (ইনি পরে সরকারী কৃষি-বিভাগের অফিসার হন)।

স্টিমার থেকে তারপাশা স্টেশনে নেমে নৌকোয় ধানকুনির খাল দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে বাকী পথ পদব্রজে যাই। খালের মুখে জল-পুলিস আমাদের নৌকো থামিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু বীরেন চ্যাটার্জির সহজ ও স্বাভাবিক হাস্যরসপূর্ণ কথায় পুলিস কোন সন্দেহ করতে পারে নি—যদিও আমাদের সঙ্গে কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি ছিল।

আমরা যখন গ্রামের কাছে এসে নামলাম তখন রাত হয়ে গিয়েছে। নিকটেই এক বিশাল মাঠের মাঝখানে দণ্ডায়মান এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে এসে মিলিত হলাম আরও অনেকের সঙ্গে, যারা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী কে কোন্ কাজ করবে, কে কোথায় দাঁড়াবে তা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার পর তদনুযায়ী লাইনবদ্ধ হয়ে আমরা কার্যে অগ্রসর হলাম।

এই ডাকাতিতে একটা ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যে ঘরে লোহার সিন্দুক ছিল রিভলবারহস্তে সে ঘরের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম আমি। সেই ঘরে ছিল এক বৃদ্ধ এবং এক যুবতী স্ত্রীলোক—বোধ হয় বাড়ির মালিক এবং পুত্রবধূ। বলামাত্র মহিলাটি তাঁর দেহের প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার একে একে খুলে দিলেন। থেকে গেল কানের দুটি গহনা। আমাদের মধ্যে একজন তা হাত দিয়ে দেখিয়ে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন বয়স্ক সভ্য তাকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলেন এবং আমরা সকলেই তাকে ধমক দিলাম। কারণ মহিলাদের অঙ্গ স্পর্শ করা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। গায়ে হাত দিয়ে জোর করে নেওয়া অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। বাড়ির লোক বা মহিলা কারুর উপরই অত্যাচার নিষেধ ছিল। শুধু অনুরোধ এবং ভয় দেখিয়ে যতটা সম্ভব হ'ত।

ঘরে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছিল। একটা হ্যারিকেন আলো দেখিয়ে ওটা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম বৃদ্ধকে। সে তো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কিছুতেই আর জ্বালিয়ে উঠতে পারছে না। তখন মহিলাটি আমাদের দিকে ভালভাবে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—"বাবা, দিন আমি আলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আপনি কিছু ভয় করবেন না।

এরা সে ডাকাত নয়। আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই।" যুবতীর সেই দৃপ্ত ভঙ্গি আজও চোখে ভাসে। আমাদের সকলের মুখেই মুখোস ছিল।

কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা হেঁটে সোনারং ন্যাশন্যাল স্কুল বোর্ডিংয়ে এলাম। রমেশ আচার্য তখন স্কুলের পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক। তিনিও যে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এর পরের ডাকাতি সংঘটিত হয় নোয়াখালির চৌপল্লী গ্রামে। দত্তপাড়ার দেওয়ানজীর বাড়ীতে ডাকাতির কথা ছিল। বাড়ী খুব বড় এবং প্রহরীর সংখ্যাও অধিক। স্থতরাং প্রবল বাধার আশঙ্কা করে আমাকেও যেতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল—যদিও পূর্বে আমার যাওয়ার কথা ছিল না। একে তো আমার কলেজের পরীক্ষা অতি সন্নিকটে। যার জন্য সঙ্গে পাঠ্য-পুস্তকও নিয়েছিলাম। তদুপরি প্রয়োজন ছিল এমন একজন সাহসী বুদ্ধিমান সভ্য, যে বন্দুক চালনায় সমর্থ। আমি তৎপূর্বে কখনও বন্দুক চালাই নি, কার্তুজ খোলা, ভরা, কিছুই করি নি। সবাই বলল, একবার দেখে নিলেই চলবে। শেষ পর্যন্ত ঢাকাতে মনোরঞ্জনবাবুর বাসার দোতলায় গুলি ভরা, খোলা, চালনা ইত্যাদি কিছুক্ষণ শিখে নিলাম। আর এই বিদ্যা নিয়েই চললাম সেই দায়িত্বপূর্ণ কাজে।

নোয়াখালির অন্তর্গত দেবপাড়ার ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে পৌছলাম রাত্রিতে। সেখানে পরের দিবাভাগ কাটিয়ে সন্ধ্যার পর ডাকাতির জন্য বার হতে হবে। ঠাকুরবাড়ীর বড়ঠাকুর সারদা চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন সমিতির সভ্য। ঠাকুর-বাড়ী আবার আমার মাতুল-বংশেরও আত্মীয়। মুস্কিল হ'ল যে, আমার এক দূর-সম্পর্কিত মামার ভাই তখন ঠাকুরবাড়ীর টোলে পড়ত। আমার অবস্থান সম্পূর্ণ গোপন রাখবার জন্য সারাদিন এক ঘরে আবদ্ধ থাকলাম। সন্ধ্যার পর শুনতে পেলাম যে, দত্তপাড়ার দেওয়ানজী বাড়ীর পুরোহিত-বংশের যে ছেলেটি আমাদের পথপ্রদর্শক ও সংবাদদাতা হয়েছিল সে গা-ঢাকা দিয়েছে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আর কি করা যায়! একেবারে ফিরে না গিয়ে চৌপল্লী গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করলাম।

১৯১০ সালেই সোনারং কেন্দ্রের উপর গোয়েন্দা পুলিসের বিশেষ নজর পড়ে। স্কুল বোর্ডিংয়ের উপর নজর রাখবার জন্য অনেক গোয়েন্দা নিযুক্ত হ'ল। সোনারং এবং তার আশ-পাশের গ্রামে ইংরেজ-ভক্ত পরিবারের সাহায্য চাইল সরকারপক্ষ। এদের মধ্যে ছিল, যারা সরকারী চাকরি করে বা সরকারী

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে গ্রামে বসবাস করছে। স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য না পেলেও কিছু কিছু লোকের ব্যক্তিগত সাহায্য সরকার পেয়েছিল। জনসেবা ও জনহিতকর কার্যের মাধ্যমে সমিতির সভ্যরা জনপ্রিয় ছিল। সুতরাং জনসাধারণের সোনারং স্কুল বোর্ডিংয়ের উপর খুব ভাল ধারণা ছিল। তাই স্কুলটাকেই ধ্বংস করবার জন্য সরকারী কর্মচারীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল।

গ্রামের দফাদার, ডাক-পিওন প্রভৃতির সাহায্যে নানা অজুহাতে স্কুল বোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন হ'ল যে, ডাক-পিওন স্কুল বোর্ডিংয়ে ঢুকেই অভদ্র আচরণ ও কুৎসিত গালাগালি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা মাটিতে ফেলে দিয়ে এমনভাবে চিৎকার করতে লাগল যেন, তাকে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে মারধোর করছে এবং ব্যাগটা লুটে নিয়েছে। পূর্ব থেকেই পুলিস ওৎ পেতে ছিল। ছুটে এসে বোর্ডিংয়ে প্রবেশ করে সবাইকে গ্রেপ্তার করতে সুরু করল। রবীন্দ্রমোহন সেন এবং আরও কয়েকজন পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে গেলেন। বাকী সবাই গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—নরেন্দ্রমোহন সেন, দীগেন মুখুটি, রমেশ আচার্য, প্রিয়নাথ আচার্য প্রভৃতি।

মোকদ্দমা চলতে লাগল। নরেনবাবু ও আরও কয়েকজনের জামীন মঞ্জুর হয়েছিল। পরিণামে রমেশ আচার্য, দীগেন মুখুটি প্রভৃতি কয়েকজনের সাজা হয়। নরেনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন মুক্তিলাভ করে।

জামীন পেয়ে বাইরে এসেই নরেনবাবু আমাকে বললেন, "এবার সমিতির সংগঠন ঠিক রাখা এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার। আমি আর বাইরে থাকতে পারব না। বাইরে থাকলেও নিজ হাতে ভার রাখব না। আপনিই চালিয়ে যেতে থাকুন। আমি যথাশক্তি কাজ করতে থাকব এবং সর্বসময়ে সুপরামর্শ দেব।"

আমাদের সোনারং কেন্দ্র ভেঙে গেল। সমিতির কেন্দ্র পুনরায় ঢাকা সহরেই স্থাপিত হ'ল। নরেনবাবুদের বাড়ীর উপর গোয়েন্দা পুলিসের কড়া নজর পড়ল। তবে বাড়ীতে প্রবেশপথ একাধিক থাকার ফলে আমাদের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল না। আমি তখন রাজার দেউড়ী অঞ্চলে আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় থাকি। সেইটাই কেন্দ্ররূপে পরিণত হ'ল।

ঢাকা দক্ষিণ মৈশন্ডির ভূতের বাড়ী যে অর্থে সমিতির কেন্দ্র ছিল, তার পর

সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর যেভাবে সোনারং ন্যাশনাল স্কুল বোর্ডিং প্রায় অর্ধ গোপন কেন্দ্র হয়েছিল, সোনারং বোর্ডিং ভেঙে যাওয়ার পর সে রকম কেন্দ্র আর গঠন করি নি। সমিতির গৃহত্যাগী বা পলাতক সভ্যদের জন্য মাঝে মাঝে বাড়ী ভাড়া করা হ'ত। কিন্তু তা এত গোপন রাখা হ'ত যে, সেগুলি ঠিক কেন্দ্ররূপে গণ্য হতে পারে নি। যত দূর সম্ভব গুপ্ত আড্ডা পরিহার করে সমিতির যে সমস্ত সর্বক্ষণের কর্মী যারা ঢাকাতে যাতায়াত করত এবং কিছুদিন থাকতে বাধ্য হ'ত, তাদের নানা বাড়িতে ছড়িয়ে রাখা হ'ত। যেমন—আমাদের, নরেনবাবুদের, ডাক্তার মোহিনী দাশের এবং মনোরঞ্জন-বাবুদের বাড়ী।

এ ছাড়াও ঢাকায় মাহুতটুলীর মণীন্দ্র রায়ের বাড়ী আমাদের সমিতির একটা বিশেষ আড্ডাস্থল ছিল। পলাতক গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা প্রাপ্ত, গৃহত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মী এবং বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এ বাড়ীতে আসতেন। তাঁর পিতৃদেব বোধ হয় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সে বাড়ীর ছেলেমেয়ে প্রায় সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কাজেই এটাও সমিতির একটা কেন্দ্রমত ছিল। মণীন্দ্র রায় নিজে সে সময় সমিতির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন। সমিতির জন্য অস্ত্র সংগ্রহ, কার্যোপযোগী করে সংগোপনে রাখা এবং সারাই করা প্রভৃতি অতি দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য। তিনি ছিলেন সেই জাতীয় সভ্য-শ্রেণীভুক্ত, যাঁদের পরিচয় সাধারণ সভ্যরা জানতে পারত না। কেন না যাঁরা অস্ত্রশস্ত্র নিজের বাড়ীতে বা তত্ত্বাবধানে রাখতেন, যাঁদের বাড়ী ছিল গুপ্ত আশ্রয়স্থল এবং যাঁদের নামে চিঠিপত্র আসত —সে সমস্ত সভ্যের নাম ও পরিচয় সাধারণ সভ্যদের কাছে গোপন থাকত।

কবিরাজ মহাশয় আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের তত্ত্বাবধান ও গোপনে রাখবার ব্যবস্থা করতেন। অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রাখা হয় তা সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদেরও জানাতেন না। এমন কি আমিও বহুদিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করি নি অস্ত্রশস্ত্র কোথায় থাকে। শুধু প্রয়োজনমত বলতাম অতটা বন্দুক, রিভলবার, কার্তুজ দিতে হবে। কবিরাজ মহাশয় সেগুলি যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতেন। এইরূপ অস্ত্র-হস্তান্তর সাধারণত কোন বাড়ীতে করতাম না। রাত্রির অন্ধকারে সহরেরই কোন নির্জন রাস্তায়, বড় গাছের নীচে বা খালের নির্জন ঘাটে অস্ত্র-হস্তান্তর করা হ'ত। কেউ এমন কি খুব বিশিষ্ট বিশ্বাসী নেতৃবর্গও জানতে

চাইত না এসব কোথায় থাকে। প্রথমে শুধু নরেনবাবু, প্রফুল্ল কবিরাজ ও মণীন্দ্র রায় জানতেন। নরেনবাবু পরে আমায় জানিয়ে রাখলেন।

আমাদের সমিতির একটা বিশেষ নিয়ম ছিল যে, অস্ত্রশস্ত্র যাঁর নিকট বা তত্ত্বাবধানে থাকবে তিনি বা আর কেউ ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। অস্ত্র-স্থানান্তর করা ও ব্যবহারের অনুমতি দানের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল একমাত্র প্রধান পরিচালকের উপর। তাঁর অনুমতি ছাড়া একটা কার্তুজও কেউ ব্যবহার করতে পারত না।

ঢাকা ছাড়া নোয়াখালি জেলাতেও সমিতির অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখবার একটা কেন্দ্র ছিল। নোয়াখালিতে আমাদের কয়েকজন খুব বিশ্বাসভাজন গৃহী-সভ্য ছিলেন। তাঁরা অনেকেই চাকরি করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাপন করতেন। অথচ সমিতির কাজের জন্য সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতেন। এঁরা অত্যন্ত নিরীহ ভদ্র ও শান্ত গৃহস্থ মানুষ হলেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা-প্রাপ্ত সভ্যকে আশ্রয় দেওয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র নিজের কাছে রাখবার মত বিপজ্জনক কাজ করতে ভীত হতেন না। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ কাহিলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে গৃহী হলেও বহু গৃহত্যাগী সভ্য তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হ'ত। সমস্ত জেলার ভারই তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

সোনারং কেন্দ্র ভাঙার কথায় ফিরে এসে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। কেননা তার সঙ্গে সঙ্গেই একই রাত্রিতে তিন বাড়ী আক্রমণ করে তিন গোয়েন্দাকে হত্যা করা হয় সোনারং ও রাউৎভোগ গ্রামে। এর মধ্যে রাউৎভোগের মনোমোহন দে ছিল সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। সমিতি সংক্রান্ত অনেক বিষয় সে জানত এবং অনেককে চিনত। সুতরাং তাকে হত্যা করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর উপরই এই ভার ন্যস্ত হয়।

সোনারং কেন্দ্র ভেঙে যাওয়ার পর ঢাকায় কেন্দ্র স্থাপিত হলে আমরা তৎকালোপযোগী করে সমিতিকে পুনর্গঠন করতে মনোনিবেশ করলাম। প্রকৃত-পক্ষে নানা বাধা-বিপত্তির দরুন পূর্বের ন্যায় সমিতি সুশৃঙ্খলভাবে গঠিত হতে পারে নি। সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিনবাবু গ্রেপ্তার হলেন। প্রকাশ্য সমিতির সভ্যদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। বিশৃঙ্খল হয়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। নিদারুণ অর্থাভাবে গৃহত্যাগী সভ্যগণ

অনাহারে-অর্ধাহারে দিন-যাপন করতে বাধ্য হ'ল। প্রকাশ্য সমিতিতে যারা সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে এসেছিল তাদের অনেকে বিপদের সঙ্কেত পেয়ে পিছিয়ে পড়ল। এই সমস্ত কারণে কিছুদিন আর সমিতি সুশৃঙ্খলভাবে পুনর্গঠিত হতে পারে নি। তবে যতই ক্ষীণ হোক না কেন প্রত্যেক জেলার সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক অবশ্যই ছিল।

পুনর্গঠনের কাজে মনোনিবেশ করে কর্মনীতি স্থির করতে গিয়ে তৎকালীন অবস্থা বিচার অবশ্যম্ভাবী। সমিতির কাজ প্রকাশ্যভাবে করা চলবে না, অথচ সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে কাজ চালিয়ে গেলে দেশের জনগণের সঙ্গে সমিতির সংযোগ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গুপ্ত-সমিতির নিরাপত্তাও রক্ষিত হয়, অথচ আগামী বিপ্লবের জন্য সমগ্র দেশের জনগণের প্রস্তুতিও দ্রুত অগ্রসর হয়। সুতরাং প্রকাশ্য এবং গুপ্ত এই দুই ভাবেই আমাদের কাজ করতে হবে। তবে প্রকাশ্য কার্যের পশ্চাতে যে গুপ্ত-সমিতির পরিচালনা আছে তা যেন পুলিস টের না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু দেশের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যে, পাড়ায় একটা বই পড়ার জন্য লাইব্রেরী খুললেও পুলিসের দৃষ্টি পড়ত। পুলিস সন্ধান করত সেই সমস্ত ছেলেদের যারা স্কুলে, কলেজে, পার্কে, ব্রহ্মচর্য-সৎচরিত্র রাখা, পরোপকার এবং ধর্মের কথা আলোচনা করে। পুলিস ধরে নিত এই সব ছেলে বিপ্লবী সমিতির সভ্য না হলেও শীঘ্রই হয়ে যাবে।

সুতরাং কাজ কঠিন হলেও স্থির করলাম যে, আসল রূপ গোপন রেখে আমরা এমনভাবে চলব যাতে দেশের লোকের চিত্ত জয় এবং তাদের সহানুভূতি লাভ করতে পারি। কেউ গ্রেপ্তার হলে যেন স্থানীয় লোক অনুভব করে যে, একজন সৎ, হিতৈষী ও নিঃস্বার্থ লোক জেলে গেল। কোন ঘৃণিত অপরাধ এদের দ্বারা সম্ভব নয়, এরা যা করে পরের ভালর জন্যই করে। পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যখন সরকার-বিরোধী কাজ করে গ্রেপ্তার হয় তখন তার প্রচারের (propaganda) একটা দিক্ আছে। সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। যখন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ন্যায় (Conspiracy to wage war against the King Emperor, and to deprive his Majesty of the Sovereignty of British India—Penal Code) গালভরা নামের অভিযোগে নানা জেলায় বহু লোক গ্রেপ্তার হ'ত এবং বহু বাড়ী খানাতল্লাশি হ'ত তখন দেশব্যাপী আমাদের কথাও ছড়িয়ে পড়ত। দেশের

লোকের মনে আশা জাগত যে, যুবকরা এমন শক্তিধর হচ্ছে যার ফলে বিদেশী রাজশক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ্যে সমিতির কাজ, প্রচার ও প্রসার বন্ধ হওয়ার পর আমরা ভাবলাম কর্মের মাধ্যমে প্রচার (propaganda by deeds)-এরও একটা পথ আছে। যে সব পথ এজন্য নির্দিষ্ট হ'ল তা সংক্ষেপে বলতে গেলে এমনি দাঁড়ায়—

মাঝে মাঝে এমন সশস্ত্র কাজ করতে হবে যাতে আমাদের অস্তিত্ব দেশের লোকের কাছে জাজ্বল্যমান থাকে এবং তাদের প্রাণে আশারও সঞ্চার হয়। আমাদের জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর এবং দণ্ডভোগের দ্বারাও দেশের জনগণের মধ্যে অনেক কাজ হবে বলে আমরা স্থির করলাম।

আমাদের কর্মীরা যে যেখানে থাকবে সেখানকার স্থানীয় যুবকদের দ্বারা ধর্ম, সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। এ সব করে আমরা দেশের সমস্যা সমাধান করতে পারব তা মনে করতাম না। কিন্তু এ-দ্বারা স্থানীয় যুবকদের মনে মহৎ কাজ এবং পরহিতে আত্মোৎসর্গ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হ'ত। আমাদের কর্মীরাও জনপ্রিয় হয়ে উঠত। আর একটা কথা, এ সমস্ত কাজ করে চিত্ত নির্মল না হলে বিপ্লব-মন্ত্র গ্রহণ করবার যোগ্যতা লাভ করবে না।

স্থানীয় ধর্মমূলক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উৎসবগুলির মধ্যে আমাদের কর্মীরা যোগ দেবে। এভাবে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনচিত্তের অগ্রগতির প্রেরণামূলক কাজগুলির উপর জোর দিতে পারবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কথকতা এবং যে সমস্ত পূজায় দুষ্কৃতকারীর ধ্বংস ও ধর্মের জয় হয়, যেমন—দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের চিত্ত উদ্বোধিত করবার চেষ্টা আমাদের কর্মীরা করবে।

জনসেবামূলক সমস্ত কাজই আমাদের কর্মীরা আন্তরিকভাবে করবে। বিশেষ যোগ উপলক্ষ্যে, স্নানযাত্রায় স্থানীয় যুবকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে রোগী-পরিচর্যা করবে। গ্রাম্য রাস্তাঘাট, জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কারকার্যে সাহায্য করবে এবং জনস্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি বিধান, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কাজে আমাদের কর্মীরা শুধু অগ্রসরই হয়ে আসবে না, সবই নিঃস্বার্থভাবে করবে। কিন্তু স্থানীয় কোন দলাদলির মধ্যে জড়িত হতে পারবে না।

স্থানীয় লোকেরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনহিতকর কাজ করতে পারে এবং

বিপদে-আপদে আত্মরক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে, সেদিকে আমাদের কর্মীরা দৃষ্টি রাখবে।

আমাদের কর্মীদের এই ক'টি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল— কৃষিকার্য, গোপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) এবং সাধারণ মিস্ত্রীর কাজ। কর্মীদের যত বিভিন্ন প্রকারের কাজ জানা থাকবে ততই তারা বিভিন্ন জীবিকা নির্বাহে নিযুক্ত স্থানীয় লোকের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত হতে পারবে।

স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মীর এই ক'টি কাজ বিশেষ করে করতে হবে—(১) স্থানীয় যুবকগণকে সমিতির সভ্য করে একটি সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তী দল গঠন ও (২) নানাভাবে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা।

সমিতিকে সুগঠিত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনার জন্য জেলা সংগঠন পরিকল্পনা (District Organisation Scheme) তৈরী করে নিয়মাবলী স্থির করি। সেকালে এগুলি যেভাবে তৈরী হয়েছিল এতদিন পরে পুরোপুরি ঠিক সেভাবে লিখতে না পারলেও মোটামুটিভাবেই লিখছি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তথাকার সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী সমিতির কর্মসূচী তৈরী করতে হবে।

প্রত্যেক প্রদেশ জেলা অনুযায়ী এবং প্রতি জেলা আবার মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম হিসাবে বিভক্ত করে নিতে হবে। অর্থাৎ সমিতির শাখাগুলিও সরকারী প্রশাসনিক রীতিতে বিভক্ত হবে। তবে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে কোথাও কোথাও নিয়ম বদল করতে হবে।

প্রধানতঃ জেলাই একক (unit) হিসেবে গণ্য হ'ত। জেলার কর্মকর্তার প্রশাসনিক নাম হ'ত জেলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠক (Organiser-in-charge of the District)। তাকে নিযুক্ত, বদলী বা কর্মচ্যুত করার অধিকার কেবলমাত্র প্রধান কেন্দ্রের।

জেলা-সংগঠক সম্পূর্ণরূপে প্রধান কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করবেন এবং সমস্ত কাজের জন্য প্রধান কেন্দ্রের নিকট দায়ী থাকবেন।

জেলার সমিতি সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা জেলা-সংগঠকের আদেশে চলবে এবং জেলার ভিতরে সবাইকে তাঁর নির্দেশ মেনে নিতে হবে।

প্রধান কেন্দ্র থেকে কেউ কোন বিশেষ কাজের ভার নিয়ে জেলায় গেলে তিনি সেখানে নির্দিষ্ট কাজ স্বাধীনভাবেই করতে পারবেন এবং জেলা-সংগঠক

তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। কিন্তু আগন্তুকের জেলার মধ্যে চলাফেরা, কার সঙ্গে মিশবেন, কাকে বিশ্বাস করবেন প্রভৃতি ব্যাপারে, অর্থাৎ কেন্দ্র-নির্দিষ্ট কার্যটি ছাড়া তিনি জেলা-সংগঠকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবেন।

জেলা-সংগঠকের একজন সহকারী থাকবেন। এঁরা দুজনে একত্রে কোন বিপজ্জনক কাজে যেতে পারবেন না। কারণ দুজন একসঙ্গে বিপন্ন হলে সমিতির বিশেষ ক্ষতি হবে।

জেলা-সংগঠক নিজ জেলায় হত্যা, ডাকাতি, অস্ত্র সংগ্রহ বা ব্যবহার প্রভৃতি কোন বলপ্রয়োগের কাজ করতে বা করাতে পারবেন না। সর্বপ্রকার বল-প্রয়োগের কাজ একমাত্র প্রধান কেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী সংঘটিত হবে।

এক জেলা অপর কোন জেলার সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক, চিঠিপত্র লেখা, যাতায়াত করতে পারবে না। একমাত্র প্রধান পরিচালকই জেলাগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এক জেলা থেকে অপর কোন জেলায় চিঠিপত্র লিখতে হলে জেলা-সংগঠক সে চিঠি প্রধান কেন্দ্রে পাঠাবেন। প্রধান কেন্দ্র থেকে তা নির্দিষ্ট জেলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠকের কাছে যাবে। অবশ্য বিশেষ কোন জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে এ সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারবে। জেলার ভিতরকার উপশাখা-গুলির চিঠিপত্রও জেলা-সংগঠক এই নিয়মে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

কোন কর্মী যদি কোন জেলার বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে যান তবে তাঁর নতুন জায়গার জন্য পরিচয়পত্র প্রধান কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং সময়মত তা যথাস্থানে চলে যাবে।

নবাগত ব্যক্তির পরিচয়-পর্ব শেষ করার পর সমিতিভুক্ত হয়ে গেলে সে আর তার পূর্বের জেলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে বা চিঠিপত্র লিখতে পারবে না। কোন বিশেষ কারণে কারুর কাছে চিঠি লিখতে হলে তা স্থানীয় গ্রুপ বা ব্যাচ্-নেতার হাতে দিতে হবে। পরে সে চিঠি প্রধান কেন্দ্রের মারফৎ যথাস্থানে যাবে।

জেলা-সংগঠকের তত্ত্বাবধানে যদি কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকে তবে তা তিনি প্রধান কেন্দ্রের আদেশ ভিন্ন ব্যবহার কিংবা নতুন অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারবেন না।

যাঁর নামে চিঠিপত্র আসবে তিনি যেন কোনপ্রকারে পুলিসের সন্দেহভাজন না হন। তিনি রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশবেন না বা তিনি

এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও যোগ দেবেন না যেখানে তাঁর লোকের কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্ত নিয়ম তাঁদের বেলাতেও প্রযোজ্য যাঁদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বা সমিতি সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকবে। এ ছাড়াও এ সমস্ত ব্যক্তি কোনপ্রকার বলপ্রয়োগের কাজে বা বিপজ্জনক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করবেন না। এঁদের সাধারণত সমিতির অন্য কোন কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। এঁরা হবেন বিনীত নম্র স্বভাবের এবং সর্বদা হাঙ্গামা এড়িয়ে চলবেন। তাছাড়া সমিতির সাধারণ সভ্যদের কাছেও এঁরা অপরিচিত থাকবেন।

যাঁর নামে চিঠিপত্র আসবে তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র বা সমিতি-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র থাকবে না, কিংবা গৃহত্যাগী ও গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা প্রাপ্ত পলাতক কেহ বাস করবে না। এসব বাধানিষেধ তাঁদের বেলাতেও প্রযোজ্য হবে, যাঁদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বা সমিতি-সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকবে। তবে এঁদের নামে কোন চিঠিপত্র আসতে পারবে না। মোটকথা এই যে, চিঠি, কাগজপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন লোকের কাছে থাকবে।

যাঁর নামে চিঠি আসবে তিনি তাঁর নিজের নামের কোন চিঠিই খুলে পড়বেন না। তিনি সমস্তই পরিচালকের হাতে দেবেন।

প্রধান বা জেলা পরিচালক নিজের লেখা চিঠিপত্র হয় নিজেই ডাকবাক্সে ফেলবেন, নয়ত কোন একজন বিশেষ লোক দ্বারা ফেলাবেন। কারণ পত্রের উপরে লেখা ঠিকানা অনাবশ্যক অপর কাউকে জানান হবে না।

পত্র পড়া হলে তা অবিলম্বে পুড়িয়ে বা অন্য কোনভাবে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে হবে। চিঠিপত্র বা সমিতির প্ররোচনামূলক কাগজপত্র পোড়ালেই নিরাপদ হয় না। পোড়া কাগজ গুঁড়ো করে কিংবা জলে ভিজিয়ে নষ্ট করতে হবে। কারণ পোড়া কাগজও আস্ত থাকলে তা পড়া যায়।

সাধারণতঃ ব্লটিং কাগজ বা প্যাড ব্যবহার করা চলবে না। এমনি কাগজের কোন অংশ দ্বারা ব্লট করা হলে সে অংশ পুড়িয়ে বা অন্য কোনপ্রকারে নষ্ট করে ফেলতে হবে। কেননা, এরকম কাগজ পড়ে পুলিস অনেক ব্যাপার জানতে পেরেছিল এবং অনেককে গ্রেপ্তারও করেছিল।

কেন্দ্রের প্রধান পবিচালক বা পরিচালকদের মধ্যে কেউ জেলার কার্য পরিদর্শনের জন্য এলে জেলা-সংগঠক তাঁর থাকবার এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং জেলা সম্বন্ধে তাঁকে সমস্ত বিষয় জানাবেন। সমিতির উপযুক্ত

সভ্যদের ক্রমান্বয়ে প্রধান পরিচালকের নিকট উপস্থিত করে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এ ছাড়াও কেন্দ্রের পরিচালক যদি অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন তবে জেলা-সংগঠক তাঁকে কেন্দ্র পরিচালকের নিকট উপস্থিত করবেন। বিনা প্রয়োজনে বা বিনা অনুমতিতে আলাপের সময় অপর কোন লোক উপস্থিত থাকতে পারবে না।

জেলা-সংগঠক এক জেলা থেকে অপর জেলায় বদলী বা অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত হলে পূর্ব জেলার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না বা কোন চিঠিপত্র লিখতে পারবেন না। প্রয়োজন বোধে চিঠিপত্র প্রধান কেন্দ্রের মারফত লিখবেন।

সমিতির সভ্যগণ পরস্পরের নিকট ব্যক্তিগত বা বন্ধুভাবে কোন চিঠি লিখতে পারবেন না। কারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গেছে যে, এমন চিঠিপত্রের সূত্র ধরে এক জেলার গ্রেপ্তারের ঢেউ অপর অনেক জেলাতেও পৌঁছেছে।

শ্রেণীগত বিভাগে ব্যাচ্ (batch)-ই হবে সর্বনিম্ন। একক কোন ব্যাচেই পাঁচজনের বেশী সভ্য থাকবে না। পাঁচজনের বেশী হলে আর একটি ব্যাচ্ তৈরী করতে হবে। প্রত্যেক ব্যাচের সভ্যগণ ব্যাচ্-পরিচালকের নির্দেশানুযায়ী চলবেন।

প্রত্যেক ব্যাচ্-নেতা তাঁর অধীনস্থ সভ্যদের সমস্ত খবর রাখবেন। সমিতির কাজ ছাড়াও বাকী সময় তাঁদের কিভাবে অতিবাহিত হয় তা নেতার নিকট অজ্ঞাত থাকলে চলবে না। নেতার নিকট সভ্যদের কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকবে না।

সমিতির কাজ, গৃহের কাজ বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়া যদি কোন সভ্যের অসঙ্গতিসূচক অভ্যাস লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ যখন-তখন বাড়ীর বাইরে চলে যায়, বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয় এবং স্কুলে অনুপস্থিত হতে শুরু করে তবে ব্যাচ-নেতা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন। সভ্যগণ কোন অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে মেশেন কিনা সেদিকেও নেতার দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রথমে একজন সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হলেই কাজ শুরু হ'ল। এই সভ্য আর একজন সভ্য সংগ্রহ করবে। পরে এই দুজন মিলে আরও সভ্য সংগ্রহ করবে। এই সভ্যদের মধ্যে কারুর সভ্য সংগ্রহ ক্ষমতা প্রতিপন্ন হলে তাকে প্রথম ব্যাচ্ থেকে আলাদা করে আর একটা ব্যাচ্ তৈরী করার অধিকার দিতে হবে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ব্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সংগঠনই বর্ধিত আকার ধারণ করবে।

সমিতির কাজে পদোন্নতি কেবল ধাপে ধাপেই হবে এমন কোন কথা নেই। প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণ থাকলে যে কোন সভ্যকে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা যাবে।

জেলা-সংগঠক প্রতি তিনমাস অন্তর জেলার কাজকর্ম, জেলা সম্বন্ধে নানা তথ্য এবং নতুন কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিপিবদ্ধ করে ত্রৈমাসিক বিবরণী হিসাবে প্রধান কেন্দ্রে পাঠাবেন। এই বিবরণীগুলি এত সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ হ'ত যে, কেবলমাত্র এগুলির উপর নির্ভর করেই প্রধান কেন্দ্র থেকে কার্য পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ জেলায় জেলায় পাঠান সম্ভব হ'ত।

আমার হাতে যখন সমিতির সাংগঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব আসে তখনও আমি অধিকাংশ জেলায় পদার্পণই করি নি, নিজে গিয়ে জেলার কার্য পরিদর্শন করি নি। বহু লোকের সঙ্গে পরিচিতও হই নি। তথাপি এই সমস্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী পাঠ করেই সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ করতে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সমর্থ হয়েছি।

এই সমস্ত ত্রৈমাসিক বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ থাকত :

জেলা-সংগঠকের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মানচিত্র ও তার ভূ-সংস্থান। জলপথ—ষ্টিমার লাইনসহ, স্থলপথ—রেল-লাইন সহ, টেলিগ্রাফ লাইন, বন-অরণ্য, জলাভূমি, পুল এবং সাঁকো।

ডাকঘর, ষ্টিমার ও রেল-স্টেশন, থানা ও অন্যান্য পুলিস ফাঁড়ি।

সাইকেল, মোটর, নৌকা, মোটর বোট, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর মোট সংখ্যা।

জনগণের মনোভাব। সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিরুদ্ধবাদীদের মোটামুটি হিসাব।

গুপ্তচর ও সরকার পক্ষভুক্ত লোকের নাম ও পরিচয়।

বে-সরকারী জনগণের নিকট লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে তাদের সংখ্যা এবং মালিকদের নাম ও ঠিকানা।

সরকারী অস্ত্রাগার বা অস্ত্রশালা থাকলে তার বর্ণনা এবং অস্ত্রের সংখ্যা।

বে-সরকারী কারুর কাছে লাইসেন্সবিহীন অস্ত্রশস্ত্র থাকলে তার খোঁজ-খবর।

রাজকোষ সম্বন্ধীয় খবরাখবর।

ধনীর সংখ্যা ও তাদের অর্থের আনুমানিক পরিমাণ।

ধর্মমন্দির থাকলে তার সংখ্যা ও নাম।

পতিত বাড়ী থাকলে তার অবস্থান।

খেয়াঘাটের সংখ্যা ও অবস্থান বর্ণনা।

জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় ও আর্থিক অবস্থা।

প্রধান উৎপন্ন ফসল কি এবং তার পরিমাণ।

লোহার কারখানার সংখ্যা ও অবস্থান।

কোন প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকলে তার বর্ণনা।

জেলাবোর্ড নিয়ন্ত্রিত রাস্তা। জনসাধারণের পায়ে-চলা রাস্তার প্রধান কোন্‌গুলি। এবং এইসব জল ও স্থলপথের বিশেষ বিশেষ ল্যাণ্ডমার্কগুলির বর্ণনা। ব্যবসায় কেন্দ্র, বন্দর ও জেলার প্রচলিত ব্যবসাগুলি কি কি।

সমিতির সভ্যসংখ্যা। কতজন এবং কে কে নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী বলে স্বীকৃত। যে যে সভ্য গৃহত্যাগ করতে প্রস্তুত সে সে সভ্যের নাম।

দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত সভ্যদের নাম।

সমিতির বিরোধীদের নাম ও বর্ণনা।

সমিতির সভ্যদের মধ্যে কার কার অভিভাবক বা আত্মীয় সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। এবং অভিভাবকদের মধ্যে পুলিস অফিসার থাকলে তার নাম।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও বর্ণনা। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ গুপ্তচর থাকলে তাদের নাম।

সেবাসমিতি বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান থাকলে তার বর্ণনা। জনসাধারণের পাঠাগার বা হাসপাতাল থাকলে তাদের সংখ্যা ও বর্ণনা।

জেলার স্বাস্থ্য, কোন্ কোন্ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী এবং তার প্রতিকারের জন্য সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে কিনা।

এই তো গেল ত্রৈমাসিক বিবরণীর মোটামুটি বিষয়বস্তু। জেলা-সংগঠকের এ ছাড়াও দৃষ্টি রাখতে হ'ত সমিতির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র চলছে কিনা বা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা। টের পাওয়া মাত্র জানিয়ে দিয়ে তাদের নির্দেশমত জেলা-সংগঠক প্রতিকারে যত্নবান হবেন।

এই জেলা সংগঠন পরিকল্পনা এবং ত্রৈমাসিক বিবরণীর বিষয় নির্বাচন ইত্যাদির রচনায় যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে নরেনবাবু প্রধান নেতা হিসেবে তো ছিলেনই সহকারী হিসেবে সংঘ পরিচালনার দায়িত্ব থাকায় আমাকেও অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন রমেশ আচার্য, রমেশ চৌধুরী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও অনেকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে সমিতির কিছু কিছু সভ্যের মধ্যে কাজকর্মে শৈথিল্য, আগ্রহহীনতা, চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে স্থির করলাম যে, পুরানো নতুন সকল সভ্যকেই পুনরায় 'প্রতিজ্ঞা' গ্রহণ করতে হবে। আরও স্থির হ'ল যে, পুরানো সভ্যদের গোপনে সুযোগ দেওয়া হবে এই যে, ইচ্ছা করলে তাঁরা সমিতি ছেড়ে দিতে পারেন। এতে তাঁদের সমিতির লোকের কাছে কোন প্রকার মর্যাদা হানি হবে না। তাঁরা সমিতি থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়তে পারেন। যে কয়জন পুরানো লোককে মনে করলাম যে, তাঁরা আর বৈপ্লবিক জীবনযাপন করতে পারবেন না, অন্তর থেকে তাঁরা দূরে সরে পড়ছেন, ভিতরে দুর্বলতা এসে পড়ছে, চক্ষুলজ্জায় সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারছেন না, নিজেদের সংসারের শোচনীয় অবস্থা দেখে বা সাংসারিক জীবনযাপনের ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে—এমনি সভ্যদের বিশেষ করে বললাম। লোক মারফত না বলিয়ে আমরাই তাঁদের সব বললাম। পুরানো সভ্যদের মধ্যে যাঁদের মনে কোন প্রকার দুর্বলতা আসেনি তাঁরা সানন্দে আমাদের প্রস্তাব শুনলেন। কোন প্রকার মনঃক্ষুণ্ণ হননি বা দোষ গ্রহণ করেননি।

অবশ্য কেউ কেউ খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং আমাদের এ প্রস্তাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। প্রিয়নাথ আচার্যের কথা বিশেষ করে মনে আছে। ইনিই পরে বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন। ইনিই বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। যদিও প্রথম আমরা তাঁর মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করেই তাঁর নিকটে প্রস্তাব করেছিলাম, তবে তিনি যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবেন, তা ভাবতে পারিনি।

এই জেলা সংগঠন পরিকল্পনা রূপায়ণ করবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে বা বিবরণী পাঠ করে এবং নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করতে লাগলাম কাকে কোন্ জেলার ভারপ্রাপ্ত করা যায়।

সে সময় রমেশ আচার্য কেবল সোনারং মোকদ্দমায় দণ্ডভোগান্তে মুক্তিলাভ করে বাইরে এসেছেন। তাকেই বরিশাল জেলার ভার দিয়ে পাঠান হ'ল। তখন সেখানকার আভ্যন্তরীণ জটিলতার দরুন, বিশেষত তখন সেখানে কেউ কেউ পুরানো সভ্য কাজ করছিলেন, একজন প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বরিশাল জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচা্লকরূপে পাঠান প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং রমেশ আচার্যের মত উপযুক্ত লোক প্রেরিত হলেন। বিশেষ ভাবে মনে আছে সে সময় যতীন রায় (ফেগু রায়)-এর মত পুরানো কর্মী সেখানে কাজ করছিলেন। তিনি সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত জেলায় পরিচিত হয়ে গেলেন। বরিশাল জেলায় তাঁর মত প্রসিদ্ধি আর কেউ লাভ করতে পারেননি। বাস্তবিকপক্ষে তিনি একটা রূপকথার মানুষ (legendary figure) হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে যেমন জেলার লোক তাঁর নামে গর্ব বোধ করত, অপরপক্ষে দুষ্কৃতকারীদের তেমনি হৃৎকম্পও হ'ত।

রমণীমোহন দাস ময়মনসিংহ জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হলেন। তিনি ছিলেন সমিতির একজন পুরানো বিশ্বাসী দায়িত্বশীল সভ্য। বাইরে থেকে তিনি ছিলেন সাধারণ সংসারী লোক। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদারী সরকারে সামান্য চাকুরি করতেন। কাজেই আর্থিক সচ্ছলতা একেবারেই ছিল না। ইংরেজী লেখাপড়াও খুব ভাল জানতেন না। কিন্তু তাঁর দক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠার জন্য তাঁকে এত বড় একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক করা হয়েছিল এবং এজন্য সমিতির বহু সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিদ্বান, বড় চাকুরে এবং অবস্থাপন্ন লোকও রমণীবাবুকে মান্য করতেন।

আমি ময়মনসিংহ সমিতির কার্য পরিদর্শন করতে গিয়ে গৌরীপুরেও যাই। অবস্থা পরিদৃষ্টে বুঝতে পারলাম যে, রমণীবাবুর মনোনয়ন যথোপযুক্তই হয়েছে। তাঁর প্রধান সহকারী হয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

এ প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে রাখা দরকার। তখন তার বয়স খুব কম। দাড়ি-গোঁফের রেখাও দেখা দেয়নি। খুব নীচু ক্লাস থেকেই লেখাপড়া শেষ হয়েছিল। অবশ্য এমনিতে লেখাপড়া খুব জানত। কিন্তু তার প্রতিভা, দক্ষতা, ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা এমনি পর্যায়ের ছিল যে, অপেক্ষাকৃত বয়সে, বিদ্যায়, অবস্থায় বড় সভ্য পূর্ণ চক্রবর্তীর আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করত। বিশেষ করে সমিতির সভ্য সংগ্রহের ও সভ্যগণকে সমিতির শৃঙ্খলার মধ্যে টেনে আনবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। পরে তার দক্ষতার

জন্য মালদহ জেলার ভার দিয়ে পাঠান হয়। সেখানে তার সাফল্যের জন্য কুমিল্লার মত জেলায় পাঠাই। পরে সে ঢাকারও ভার পেয়েছিল।

প্রথম অবস্থায় কুমিল্লায় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন সারদা চক্রবর্তী। তার পরেই পূর্ণ চক্রবর্তী ভার গ্রহণ করে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ কাহিলীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি জমিদারী সরকারে চাকুরি করতেন এবং সংসারী লোক ছিলেন। তাঁর উপরই ছিল নোয়াখালী জেলার পরিচালনার ভার। তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল সভ্য ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বহু গৃহত্যাগী সভ্য তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকত, এবং তিনি অস্ত্রশস্ত্রের দেখাশুনা করতেন।

চট্টগ্রাম জেলায় প্রথম বিপ্লবী চন্দ্রশেখর দে-ই ছিলেন ঐ জেলার প্রথম পরিচালক। সোনারং কেন্দ্র ভেঙে যাওয়ার পরই তাঁর নিয়োগ। তারপর প্রিয়নাথ আচার্য এ জেলার পরিচালক হন কিছুদিনের জন্য।

চন্দ্রশেখর দে-র পরে চট্টগ্রামের ভার গ্রহণ করেন সিলেটের নগেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত মনে করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকা কেন্দ্রে এনে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে উত্তর ভারতে পাঠান হয়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় উত্তর ভারতে যে বিপ্লবায়োজন হয় তাতে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। পরে বারাণসী ষড়যন্ত্র মামলায় (Benaras Conspiracy Case) শচীন সান্যাল প্রভৃতির সঙ্গে গ্রেপ্তার হন এবং কারাদণ্ড হয়। বন্দী অবস্থায় আগ্রা জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। নগেনবাবু আমাদের মধ্যে একটু বেশী বয়স্ক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিবাহিত। আমাদের গ্রেপ্তারের পর নিজের দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কারী। অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ, অল্প শিক্ষিত সভ্যের নেতৃত্ব মেনে চলতে তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। তিনি প্রথমদিকে ছিলেন সিলেট জেলার ভারপ্রাপ্ত। তার পর সে জেলার ভার পান রমেশচন্দ্র চৌধুরী।

রমেশবাবু ময়মনসিংহ জেলার এক শিক্ষিত সম্মানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করেন। পরে গৃহত্যাগ করে সমিতির কাজে সোনারং আসেন। রবীন্দ্রমোহন সেনও একই তারিখে গৃহত্যাগ করে সোনারং আসেন। তাঁদের দলীয় নাম রাখা হয় যথাক্রমে পরিতোষ ও ভবতোষ। সিলেট জেলা ছাড়াও সুর্মা উপত্যকা এবং আসামের অন্যান্য জায়গায় সমিতি বিস্তারের অধিকার রমেশবাবুকে দেওয়া হয়েছিল।

রমেশবাবু খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান কর্মী ছিলেন। নেতৃত্বের গুণ ছিল অনেক। এবং সমিতির উচ্চতম নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন তিনি।

সিলেট থেকে তাঁকে আনা হয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহের জন্য। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লালমোহন দে। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হওয়ার পর রমেশবাবুর উপর সমস্ত পূর্ববঙ্গের ভার অর্পণ করে আমি কলকাতায় চলে আসি। প্রত্যক্ষভাবে পূর্ববঙ্গের ভার থাকলেও তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একজন দায়িত্বশীল নেতারূপে পরিচিত হয়েছিলেন।

নোয়াখালী জেলায় ফেনী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হয়ে সীতানাথ দাস স্থানীয় স্কুল-শিক্ষক হিসেবে অবস্থান করেন, মানুষ এবং কর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। সমিতির কাজে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রবল ছিল।

নারায়ণগঞ্জ সমিতিতে তিনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, অনেক বেশী বিদ্বান ও সভ্য হিসেবে ছিলেন আমার সিনিয়র। সমিতিরও তিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় নেতা। কিন্তু যখন ঘটনাচক্রে সমিতি পরিচালনার ভার আমার হাতে আসে তখন আমার নির্দেশে কাজ করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেননি। তিনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন, তাঁকে আমি করতাম 'আপনি' বলে। তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেই নির্দেশ দিতাম।

এ প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা কথা না বলে পারছি না। আমি যখন সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব পাই তখন আমি অনেকের চাইতে বয়সে ছোট। সুতরাং পরিচালনা ক্ষেত্রে একটা নীতি অনুসরণ করতাম। কাউকে কোন আদেশ দিতে হলে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারই মুখ থেকে কথাটা বার করতাম যাতে সে বুঝতে পারে যে, কাজটা সে নিজের বিবেচনা মতই করছে, কারুর আদেশ পালন হিসেবে নয়। আমার আদেশ কারুর পক্ষে পীড়াদায়ক এবং মর্যাদা-হানিকর না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতাম। আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্রসভ্যদের পরিচালক ছিলাম তখন আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সমস্ত ছাত্র-সভ্য এমন কি এম-এ, এম-এস-সি শ্রেণীর ছাত্ররা আমার নির্দেশে কাজ করতে দ্বিধা করেনি। এ রকম দৃষ্টান্ত সমিতির অনেক শাখাতেই দেখা গিয়েছিল।

উত্তরবঙ্গে সমিতির অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল ছিল। এক রকম অস্তিত্বই লোপ পাওয়ার উপক্রম হ'ল। সুতরাং আমরা যখন একজন উপযুক্ত লোককে সেখানে

পাঠাবার কথা ভাবছি তখন এমন একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে ত্রৈলোক্যবাবুর পূর্ববঙ্গে অবস্থিতি নিরাপদ রইল না। ফলে তাঁকেই উত্তরবঙ্গের ভার দিয়ে পাঠান হ'ল। ঘটনাটা এই—

সমিতির কাজ যখন পূর্ণোদ্যমে চলতে আরম্ভ করেছে, সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকা শহরে সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছে, তখন আমরা অনুভব করলাম যে, সরকার অনুশীলন-সমিতির পুনর্জাগরণের কথা বুঝতে পেরেছে এবং আমাদের সমস্ত খবরাখবর জানবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। ঢাকার নদীর ধারে করোনেশন পার্কে সমিতির একটা বড় সভ্য সংগ্রহের স্থান ছিল। সময় সময় এমন হ'ত যে, করোনেশন পার্ক ও নদীর ধারের ভ্রমণের রাস্তা বাক্-ল্যাণ্ড বাঁধে অধিকাংশ লোকই সমিতির সভ্য হয়ে পড়ত। পার্কে নজর রাখবার জন্য তখনকার বড় গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টর উমেশ চন্দ নিজে আসতে লাগল। প্রতিকারের জন্য আমরা প্রথমে স্থির করলাম যে, চন্দকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই হবে সমিতির মঙ্গল। কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে বুঝলাম যে, গোয়েন্দা কর্মচারী বড় অফিসার হলেই যে আমাদের পক্ষে বেশী অনিষ্টকর হয় তা নয়, আমাদের খবর যে বেশী সংগ্রহ করেছে এবং করতে পারে, আমাদের অনেককে যে চিনে রেখেছে, সমিতির নিরাপত্তার জন্য সকলের আগে তাকেই সরান কর্তব্য। তখন স্থির হ'ল যে, গোয়েন্দা রতিলাল রায়কেই প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। সে সমিতির পেছনে লেগেছিল, বহু লোককে চিনত—নাম না জানলেও মুখ চিনত।

এ কাজের জন্য ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বীরেন চ্যাটার্জি এবং আমি নিযুক্ত হলাম। নেতা হিসেবে ত্রৈলোক্যবাবু প্রথমে গুলী করবেন, তার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমিও গুলী করব। বীরেন চ্যাটার্জি আমাদের প্রহরায় থাকবেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় রতিলাল যখন উমেশ চন্দের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে চন্দের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন আমরা আক্রমণ করলাম। কথা ছিল কেদারেশ্বর সেন আমাদের জন্য এক জায়গায় অপেক্ষা করবে। কার্য-সমাধা করে সে স্থানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে সমর্পণ করে নিজেদের জায়গায় চলে যাব। আমি তখন ঢাকা কলেজের মিনার্ভা হোস্টেলে থাকি। রতিলাল নিহত হয় ১৯১১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর।

কার্য সমাধা হওয়ার পর এত হৈ-চৈ পড়ে গেল এবং আমাদের ধরবার জন্য অনুসরণকারীর দল এত প্রবল হয়ে উঠল যে, আমরা পূর্ব-নির্দিষ্ট দিকে যেতে

পারলাম না। অন্য পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটা অন্ধ গলির মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে ফিরে অন্যদিকে গেলাম। পরে এমন অবস্থা হ'ল যে, আমরা আর কোনদিকে অগ্রসর হওয়ার উপায় দেখলাম না। তখন সুবিধে মনে করে আমরা ঢুকে পড়লাম আমার খুল্লতাত আদিত্য গাঙ্গুলীর বাসা পানী-টোলায়। বাড়ীর ভিতর ঢুকে পিছনের দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনি সময় আমার কাকীমা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী 'কে', 'কে' আওয়াজ করে একেবারে আমাদের নিকটে এসে গেলেন। তিনি খুব সাহসী ছিলেন, কেননা অমনি অবস্থায় স্ত্রীলোক তো দূরের কথা, পুরুষও অন্ধকারে লোক দেখলে ভয় পেত। কাকীমা আমাদের একেবারে সামনে এসে পুনরায় বললেন—কে তোমরা। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বললাম—কাকীমা, আমি। ব্যাপার তো বাইরের গোলমাল শুনেই বুঝতে পারছেন। আমরা এখানে একটু সময় অপেক্ষা করে চলে যাব। আপনি এই রিভলবার ও কার্তুজগুলি সাবধানে রেখে দিন। আজ যদি পারি ভালই, নইলে কাল এসে নিয়ে যাব। কাকীমা একটুও দ্বিধা না করে বললেন—দে, সবগুলি আমার হাতে দে। কোন ভয় নেই। আমি সব ঠিকভাবে রাখব। এখন আর কোথায় যাবি, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে থেকে যা। আমরা থাকতে রাজী না হয়ে চলে গেলাম। আমার আবার হোস্টেলে হাজিরা ঠিক রাখতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা ত্রৈলোক্যবাবু রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন আগের দিনের হত্যাকাণ্ডের অনুসরণকারী দলের জেলা পুলিস-সুপার, বহু পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। উমেশ চন্দ ত্রৈলোক্যবাবুকে দেখিয়ে পুলিস-সুপারকে ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে সুপার সুলিভান সাহেব ত্রৈলোক্যবাবুকে গ্রেপ্তার করল। এই উপলক্ষে ঢাকার উকিল মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিস-সুপার ডেকে নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও ভয় দেখান।

ত্রৈলোক্যবাবুর নামে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পরোয়ানা ছিল। কিন্তু তখন এই মোকদ্দমা শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে মোকদ্দমা চালান সরকার পছন্দ করল না। তিনি ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু অন্য মোকদ্দমায় পলাতক ফেরারী বিধায় ১০৯ ধারায় মোকদ্দমা চলে না। সুতরাং ত্রৈলোক্য-বাবু জেল থেকে খালাস পেলেন। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরবঙ্গে চলে গেলেন। এই হ'ল ত্রৈলোক্যবাবুকে উত্তরবঙ্গে পাঠানোর সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

ত্রৈলোক্যবাবু সমস্ত উত্তরবঙ্গ একবার পরিদর্শন করে নাটোরের উকিল শ্রীশ চক্রবর্তীর বাসায় থাকা স্থির করলেন। নাটোরকে কেন্দ্র করেই তিনি কাজ সুরু করলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করবার জন্য আরও সংগঠক পাঠান স্থির হয়।

মালদহ জেলায় পাঠান হয় পূর্ণ চক্রবর্তীকে। সেখানকার পুরানো সভ্যরা কেউ কেউ সহানুভূতি দেখালেন। নিয়ম ছিল যেখানেই যাকে পাঠান হোক না কেন তাকে লোক দেখানো একটা জীবিকা-নির্বাহের কাজে নিযুক্ত হতে হবে। লোকচক্ষে সন্দেহ এড়াবার জন্যই এ ব্যবস্থা। পূর্ণ চক্রবর্তী এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তার ছেলের গৃহশিক্ষকরূপে থাকবার স্থান পেল। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, ছাত্রটির বিদ্যা পূর্ণ চক্রবর্তীর চাইতে বেশী। তদুপরি পড়াবার সময় অভিভাবকটি কাছেই বসে বিশ্রাম করতেন। বেগতিক দেখে পূর্ণ চক্রবর্তী ছাত্রটিকেই সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে নিল। তার পর যেদিন যা পড়ান হবে তা পূর্ব থেকেই স্থির হয়ে থাকত—শিক্ষক-ছাত্র উভয়ের পরামর্শক্রমে। পাঠ্য বিষয়টা পূর্ণ চক্রবর্তী আগেই একটু দেখে রাখত। পূর্ণবাবু নিজে স্কুল-কলেজে না পড়লেও নিজগুণে তাঁর চেয়ে বিদ্বান ছাত্রকে বহুদিন অভিভাবকের সামনে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়িয়ে গেল।

সমিতির কার্যে মালদহে পূর্ণ চক্রবর্তীর কৃতিত্বের জন্য পরে তাঁকে কুমিল্লায় জেলা-সংগঠক করে পাঠানো হয়। মালদহে পূর্ণ চক্রবর্তীর স্থলাভিষিক্ত হন সতীশ পাকড়াশী।

পাবনা জেলায় সমিতির কাজ করবার জন্য কুমিল্লার পুলিন গুপ্তকে পাঠান হয়।

রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে কাজ চালাবার জন্য পাঠান হয় ফরিদপুরের নিবারণ পালকে।

দিনাজপুর জেলা-সংগঠক করা হয় সেখানকার অশ্বিনী মাস্টার মহাশয়কে। তাঁর কৌলিক উপাধি ভুলে গিয়েছি।

ফরিদপুর জেলায় অনুশীলন সমিতির কাজ প্রথম থেকেই ভাল চলছিল। পুলিনবাবুর বাড়ীই ছিল দক্ষিণ-বিক্রমপুরের (মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত) লোনসিং গ্রামে। পালং অঞ্চল ছিল সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। সমিতির প্রথম যুগের বিশিষ্ট সভ্য বীরেন সেনগুপ্তের পরিশ্রমে ও নিষ্ঠার ফলে ঐ অঞ্চলে সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমিতির বহু বিশিষ্ট কর্মীর

বাড়ী ছিল ঐ অঞ্চলে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন মাদারীপুর মহকুমার পালং অঞ্চলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন আশুতোষ কাহিলী, জীবন ঠাকুরতা। কেদারেশ্বর সেনের বাড়ী ঐ অঞ্চলে হলেও বাল্যাবধি তিনি ঢাকা শহরে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সমিতির নেতৃবর্গের অন্যতম হয়েছিলেন। আশুতোষ কাহিলীকে গৃহত্যাগ করিয়ে কুমিল্লা জিলার ভিতরে কাজ করবার জন্য পাঠান হয়। পরে তিনি ময়মনসিং জেলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠক হয়ে যান।

ফরিদপুর শহর, সদর মহকুমা ও রাজবাড়ী মহকুমার সঙ্গে মাদারীপুর মহকুমার যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সমস্ত ফরিদপুর জেলাকে একক জেলা-সংগঠক-এর নেতৃত্বে পরিচালনায় অসুবিধা ছিল। ফরিদপুর শহরের দিকে প্রধান কর্মী ছিলেন রমেশ দাশগুপ্ত ও নিবারণচন্দ্র পাল। পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছিল রমেশ দাশগুপ্তর উপর। ফরিদপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যদুনাথ পাল মহাশয় সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সভ্য ছিলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনকার প্রথমদিকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় চাঁদপুর ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক হয়ে সেখানকার কাজের ভার নিয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর দেশের বাড়ী, বিক্রমপুরের অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম (কামারখাড়া , আমাদের সমিতির একটা বিশেষ আশ্রয়স্থল ছিল। সমিতির গৃহত্যাগী এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত পলাতক অনেক কর্মী গিয়ে সে বাড়ীতে বাস করত।

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে ১৯১১-১২ সালে মণীন্দ্র রায় এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। বেশ কিছু সংগ্রহও হয়েছিল। বিশেষ কয়েক শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার, এমনকি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ পর্যন্ত বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করতে পারতেন। এই সমস্ত অফিসারদের নাম সংগ্রহ করে, তাঁদের নামে অস্ত্র আনা সম্ভব কিনা তার খোঁজ-খবর নিয়ে কর্তব্য স্থির করতাম। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছুটিতে বাইরে আছেন কিনা এ খবরটা আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন হ'ত। পরে তাঁর নাম সই করে কলকাতার কোন আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতার দোকানে অর্ডার দিতাম। ঢাকা থেকেই সাধারণতঃ এ কাজ করা হ'ত। ঠিকানা দিতাম ঢাকার কোন হোস্টেলের, যেখানে হোস্টেলবাসীদের

মধ্যে আমাদের সভ্য ছিল। ডাক-পিয়নের দিকে তারা সবিশেষ দৃষ্টি রাখত। নির্দিষ্ট নামে অর্ডারী দোকান থেকে চিঠি এলেই তারা অন্যের হাতে পড়বার আগেই চিঠি হস্তগত করত। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা।

অস্ত্র-পার্শেল আসার খবর দিয়ে চিঠি এলে সমস্যা দাঁড়াত তা পোস্ট-অফিস থেকে যথাস্থানে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। পূর্বেই কোন খবর পেয়ে পুলিস আমাদের ধরবার জন্য ফাঁদ পেতে আছে কিনা, সাদা পোশাকে পুলিস পোস্ট-অফিসের মধ্যে লুকিয়ে আছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হ'ত।

আর একটা সমস্যা ছিল। একজন প্রৌঢ় বা বয়স্ক অফিসারের মত যোগ্য চেহারাওয়ালা লোকের প্রয়োজন হ'ত—বড় অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে মাল খালাস করবার জন্য। আমরা অনেকেই বয়সে—অন্তত চেহারায় এত ছেলেমানুষ ছিলাম যে, আমাদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হ'ত না।

মণীন্দ্র রায়ের এই প্ল্যান আমাকেই অনেকবার কার্যে পরিণত করতে হয়েছে। এভাবে আমরা সেকালের নাম করা অস্ত্র মশা পিস্তল (Mauser Pistol) কয়েকটা সংগ্রহ করেছি। উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করে আমাকেই অনেকবার এ কাজ করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সভ্য শ্রীযুত হেমেন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ছে। তিনি বোধ হয় তখন এম. এস-সি'র ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কিংবা পাস করে গবেষণা কার্যে লিপ্ত আছেন। আমি তখন মাত্র আই-এ পড়ি। হেমেন্দ্রবাবুকে গিয়ে যখন বললাম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেজে জেনারেল পোস্ট-অফিসে যেতে হবে, তিনি যেতে স্বীকৃত হলেন না। আমি অপর একজন লোক ঠিক করে পোস্ট-অফিসে উপস্থিত হয়ে আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলাম হেমেন্দ্রবাবু যথা-সময়ে পোস্ট-অফিসে উপস্থিত হয়েছেন।

হেমেন্দ্রবাবু পরে বরিশাল কলেজে রসায়নের সিনিয়র অধ্যাপক হয়েছিলেন। এ ঘটনা উল্লেখ করলাম বিশেষ করে এই কারণে যে, উচ্চশিক্ষিত লোক, শত আপত্তি থাকলেও বিপদজনক কাজে অগ্রসর হতেন একজন বয়োকনিষ্ঠ নিচু শ্রেণীর ছাত্রের নির্দেশে। সমিতির নিয়মানুবর্তিতা এমনই ছিল।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার খবর পেয়ে দেশের কংগ্রেস রাজনৈতিক মহলে আনন্দ কোলাহল উঠল। তখন কংগ্রেস থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, খাপার্দে, মুঞ্জে, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি বিতাড়িত হয়েছেন। কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে নরমপন্থীদের কুক্ষিগত। ফিরোজশা মেটা, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ

কংগ্রেস পরিচালনা করেন। এঁদের চেষ্টার ফলে চরমপন্থীদল কংগ্রেসের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙে যাওয়ার পরই এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

নরমপন্থী নেতারা সর্বদাই ইংরেজের সঙ্গে আপোষের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতার (British Justice) উপর ছিল এঁদের গভীর বিশ্বাস। এঁদেরকে এদেশে যুক্তিতর্ক দ্বারা বোঝাতে পারলে এবং প্রয়োজন মত ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরেজকে ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করালে নিশ্চয়ই তাদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে এবং আমাদের উপর সুবিচার করবে। এই ছিল তাঁদের আন্তরিক বিশ্বাস।

এমনি মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হ'ল, ভারত সচিব লর্ড মরলির সেটেলড্‌ ফ্যাক্ট (settled fact) আনসেটেলড (unsettled) হ'ল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ "পাকা ব্যবস্থা রদ করব (We shall unsettle the settled fact)" জয়যুক্ত হ'ল, তখন দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ার মত একটা অবস্থা হ'ল। ইংরেজের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হ'ল। আমার মনে আছে যখন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা এলেন তখন সমস্ত শহরে প্ল্যাকার্ড পড়েছিল—'লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলার মুক্তিদাতা' (Lord Hardinge—Saviour of Bengal)। আমরা যা চেয়েছিলাম তা যেন পেলাম এমনি একটা তুষ্টির ভা॰ এল।

চারিদিকের অবস্থা পরিদৃষ্টে নরেনবাবু, ত্রৈলোক্যবাবু, আমি ও আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয়রা আমাদের কর্তব্য স্থির করবার জন্য আলোচনা আরম্ভ করলাম। এ আলোচনা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে হয়নি। অতি গোপনে পার্কে বা কারুর বাড়ীতে বসে হয়েছে। আমরা ভাবলাম—দেশের মধ্যে একটা আত্মতুষ্টি এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাহত হবে, অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। আমরা চাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস, পূর্ণ স্বাধীনতা। মন থেকে অসন্তোষ বিদূরিত হলে মূল আদর্শের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের খুব অনিষ্ট হবে। পৃথিবীর লোক মনে করবে—ভারতবর্ষে কোন অসন্তোষ নেই, ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনই চায়—উচ্ছেদ কামনা করে না। জার্মানীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে শক্তি গড়ে উঠছিল তার বিশেষ ক্ষতি হবে। প্রমাণিত হবে যে, ভারতবাসী ব্রিটিশকেই চায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে

ভারতবর্ষ, মিশর, আয়ারল্যাণ্ড ও অন্যান্য জায়গায় যে অসন্তোষবহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল তাই ব্রিটিশ শক্তির একটা দুর্বলতা। এটাই ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে শক্তিগোষ্ঠীর একটা ভরসা। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা স্থির করলাম যে, এ সময় কতকগুলি হত্যাকাণ্ড করতে হবে নানা জায়গায় যাতে ইংরেজ সরকারও ধরপাকড় ও অত্যাচার এমনভাবে করবে যার ফলে অন্তত পৃথিবীর কাছে এ কথাটা প্রমাণিত হবে যে, ভারতবাসী সুখী হয়নি, তারা ইংরেজকে স্বীকার করতে চায় না।

অবশ্য সাধারণত আমরা একটা নীতি অনুসরণ করতাম। কেবলমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্যই আমরা বলপ্রয়োগ করতাম না। শুধু ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্রিটিশ-শক্তি বিতাড়িত করতে পারব এ কথা আমরা বিশ্বাস করতাম না। ব্রিটিশ রাজত্ব যদি কায়েম থাকে তবে একজন শাসনকর্তা নিহত হলে তারা শত শত শাসক পাঠাতে পারবে। আমরা বলপ্রয়োগ করতাম সমিতির শক্তি বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য। সমিতির কার্যে অর্থ-সংগ্রহের জন্যও অনেক সময় বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি। সমিতির অগ্রগতির পথের কণ্টক—যেমন, বিশ্বাসঘাতক, গোয়েন্দাদের মধ্যে যারা সমিতির অনেক সংবাদ জেনে ফেলেছে, অনেক লোককে চিনেছে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কতব্য মনে করতাম। বঙ্গভঙ্গ রদের পর যে দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল তা বিদূরিত করবার জন্য সমিতির অনিষ্টকারীদের সরিয়ে দেওয়া এবং স্বদেশে ও বিদেশে যাতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফলপ্রসূ হয়, এই দুই কারণেই আমরা বলপ্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করলাম।

তখন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছে। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা হয়। বোমা নিক্ষেপ করেন বসন্ত বিশ্বাস। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন খুব জনপ্রিয় বড়লাট। তাঁর উপর আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। তাঁর জনপ্রিয়তার উপর আঘাত করে পৃথিবীর কাছে এ কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, আমরা ব্রিটিশ-শাসন চাই না। এ কারণেই দিল্লীতে তাঁর রাজকীয় প্রবেশানুষ্ঠানের (State Entry) শোভা-যাত্রার উপর লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা দ্বারা আঘাত করা হয়। এ বোমার ব্যবহৃত বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করে দেন শ্রীসুরেশ দত্ত এবং তাঁর সহকারীরূপে ছিলেন শ্রীমণীন্দ্র নায়েক। বোমার খোলটি (Shell) তৈরী করেন অনুশীলন সমিতির

অমৃত হাজরা। তিনি শশাঙ্ক নামে সমিতির লোকের কাছে পরিচিত ছিলেন। রাসবিহারীবাবুকে নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত করেন শ্রীমতিলাল রায়।

পূর্ববঙ্গের নামজাদা পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর মনোমোহন ঘোষ বরিশাল শহরে কাজ করতেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় এক ব্যক্তির সহায়তায় মনোমোহন ঘোষকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এ সমস্ত কার্যে যিনি নেতা হবেন তাঁকেই প্রথম আঘাত করতে হবে। কেননা, প্রথম আঘাত কার্যকরী না হলে সমস্তই পণ্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ধীর, স্থির, অচঞ্চল এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নেতাই প্রথম আঘাত হানবেন এই ছিল রীতি।

এই কার্যের কিছুদিনের মধ্যেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুমিল্লার গোয়েন্দা দেবেন্দ্র ঘোষ নিহত হয়।

সেকালে তীর্থক্ষেত্রগুলি অনাচার-অত্যাচারের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। চরমে উঠেছিল তীর্থের মোহান্তদের অত্যাচার। সব রকম অন্যায়ই এরা করত লোকের ধর্ম-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে। ধর্মভীরু গৃহস্থ স্ত্রীলোকও এদের কবলে পড়লে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করতে পারত না।

চন্দ্রনাথ তীর্থের প্রধান পাণ্ডা অধিকারী মহাশয় ছিলেন অনুশীলন-সমিতির একজন প্রধান সমর্থক এবং গৃহী-সভ্য। সমিতির গৃহত্যাগী সভ্যরা অনেক সময় তাঁর কাছে গিয়ে থাকত। চট্টগ্রামের 'জ্যোতি' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কালীশঙ্করবাবুও সমিতির একজন প্রধান গৃহী-সভ্য ছিলেন। তিনিও এই তীর্থ-পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তখন আমাদের একটা পরিকল্পনা হয় চন্দ্রনাথ-সীতাকুণ্ডের তীর্থের সমস্ত কর্তৃত্বভার সমিতির হাতে আনার জন্য। তাতে একদিকে যেমন তীর্থের অনাচার-অত্যাচার বন্ধ হবে, অপরদিকে অত বড় তীর্থস্থান এবং তার বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার করায়ত্ত হলে নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য দ্বারা দেশের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের উপরও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক থেকেও লাভ হবে এই যে, একটা পাহাড়-অঞ্চলের উপর আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। এজন্য কোন যুবক-সভ্যকে মোহান্তর প্রধান চেলা বা শিষ্য করা যায় কিনা সে চেষ্টা করতে লাগলাম। কেননা, মোহান্তর মৃত্যুর

পর তার নির্দিষ্ট চেলাই সাধারণত মোহান্ত পদে বৃত হয়। মোহান্তরা থাকত অকৃতদার, সুতরাং বংশগত উত্তরাধিকার স্থির হত না।

সে সময় চন্দ্রনাথ-তীর্থের মোহান্ত ছিল যতীন্দ্র বল। তার অত্যাচার ক্রমে চরমে উঠল। ধর্মপরায়ণ জনগণ একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন তাকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করাই স্থির হ'ল। কালীশঙ্করবাবুই একথা বিশেষ করে বললেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দে সীতাকুণ্ডে গিয়ে যতীন্দ্র বলকে গুলী করে হত্যা করেন।

ঢাকার অত্যাচারী পুলিস অফিসার বঙ্কিম চৌধুরীকে ঢাকাতেই হত্যা করা স্থির হয়। কিন্তু সে হঠাৎ ময়মনসিং বদলি হয়ে যায়। সেখানে গিয়েও সমিতি ধ্বংসের কার্যে পূর্ণোদ্যমে লেগে যায়। তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা হয়। কলকাতা থেকে ঢাকায় কয়েকটা বোমা আনা হয়েছে। এগুলির বিস্ফোরক দ্রব্যও তৈরী করেন সুরেশ দত্ত এবং তাঁর সহকারী মণীন্দ্র নায়েক, আর খোলটা করেন অমৃত হাজরা। এগুলি নিরাপদে রাখবার জন্য প্রফুল্ল ঘোষের বাসস্থানে গচ্ছিত হ'ল। ইনিই হলেন পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কংগ্রেস নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ছিলেন সমিতির সভ্য। তিনি তখন থাকতেন সেকালের প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা অফিসার শরৎশশী দত্তর বাড়ীতে, তাঁর ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে। বোমা রাখা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের বাড়ীতেই সব চাইতে নিরাপদ মনে করলাম। এরই একটি বোমা নিয়ে ত্রৈলোক্যবাবু, অমৃতলাল সরকার এবং স্থানীয় একজন বঙ্কিম চৌধুরীর গৃহে গিয়ে তাকে হত্যা করে। বোমা নিক্ষেপ করেন ত্রৈলোক্যবাবু।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নগেন্দ্র রায় ও হেমেন্দ্র রায় দু'ভাই প্রথমে অনুশীলন-সমিতির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্য হয়েছিল। পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ পুলিসের সঙ্গে যোগ দেয়। সরকার এ দু'ভাইকে অগণিত পুলিস দিয়ে ঘেরাও করে রাখত। সমিতির তরফ থেকেও তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়ার কয়েকবার চেষ্টা করা হয়। একবারের চেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কাজের নেতৃত্ব ত্রৈলোক্যবাবুকে দেওয়া যাবে না। কারণ ত্রৈলোক্যবাবু এই দু'ভাইয়ের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। গুলী করার পূর্বে দেখে ফেললে বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা স্থির করি যে, ওদের সশস্ত্র পুলিস প্রহরীসমেতই হত্যা করতে হবে। তখন তারা থাকত তাদের গ্রামের বাড়ীতে। এদিকে গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য সতীশ পাকড়াশীও দু'একজন সহকারী

সহ নিযুক্ত হয়। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও পাঠান হয়েছিল। আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হলে সতীশ পাকড়াশী আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে স্থির হয়।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের দল নারায়ণগঞ্জের মোক্তার অশ্বিনী ঘোষালের বাসায় সমবেত হ'ল। তিনি ছিলেন আমাদের দলের বিশিষ্ট সভ্য এবং নারায়ণগঞ্জের সমিতি-পরিচালক। শশধরবাবু (আসল নাম রাজেন্দ্র দত্ত, তাঁর নামে বাররা ডাকাতির জন্য ওয়ারেণ্ট ছিল। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়), ললিত বাররী, বীরেন চ্যাটার্জি, সতীশ দাশগুপ্ত (পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যানন্দ), মণীন্দ্র রায়, অমৃত সরকার, রমেশ চৌধুরী, নগেন সরকার, আমি এবং আরও কয়েকজন দিগেন মুখোটির নেতৃত্বে আমরা নারায়ণগঞ্জ থেকে লাখাপুর ষ্টিমারে রওনা হব স্থির হ'ল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সতীশ পাকড়াশী ও আর একজন রিভলবার সহ ধরা পড়েছে। সেখানে এমন গোলমাল হয়েছে যে, পুলিস বিপদ আশঙ্কা করে খুব সতর্ক হয়েছে। সুতরাং এ প্রচেষ্টা শেষ মুহূর্তে পরিত্যক্ত হয়।

সে সময় বিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে গুপ্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়েকজন প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত দেশ-দ্রোহাত্মক দুষ্কার্যে রত হয়েছিল। আমরা দু'একজন শিক্ষককে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। জামালপুরের হেড মাস্টারকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার চেষ্টা হয়। একবার আমি, মণীন্দ্র রায় ও প্রিয়নাথ রায় চেষ্টা করি। প্রিয়নাথ রায় হেড মাস্টারকে অনুসরণ করে ঢাকায় আসে ও আমরা কার্যে লিপ্ত হই। কিন্তু তখন সফলকাম হতে পারি নি। হেড মাস্টার পরে মালদহ বদলি হয়ে যান। সেখানেই তখনকার জেলা পরিচালক সতীশ পাকড়াশীর ব্যবস্থায় সমিতির নির্দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

জামালপুরের অন্তর্গত পিঙ্গলাতে একটা ডাকাতি করা স্থির হয়। এজন্য সরজমিনে খোঁজখবর নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য রবীন্দ্র সেন, যোগেন্দ্র চক্রবর্তী ও আর একজন সেখানে যান। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সন্দেহবশত তাঁরা গ্রেপ্তার হন। অন্য কোন মকদ্দমা চালান যায় না দেখে সরকার তাঁদেরকে ১০৯ ধারায় চালান করে এবং এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তখন পর্যন্ত ডিফেন্স এ্যাক্ট (Defence Act), সিকিউরিটি এ্যাক্ট (Security Act) প্রভৃতি বিনা বিচারে লোককে জেলে প্রেরণের ব্যবস্থা হয়নি। ১০৯, ১১০ ধারায় লোককে এমনি অবস্থায় জেলে পাঠাত। এগুলিও প্রায় বিনা বিচারের সামিল ছিল। সাক্ষী-প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন হ'ত না।

কারাবাসান্তে রবীন্দ্র সেন কলকাতায় গিয়ে লোক-দেখানভাবে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমিতির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবেই কাজ করতে থাকেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কুলিয়ারচর বাজার একটা বড় বন্দর। দিগেন মুখোটির নেতৃত্বে এ বন্দর লুট করা হয়। আরও যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন— সতীশ দাশগুপ্ত, নগেন সরকার (পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সহজানন্দ), ললিত বারুরী, বীরেন চ্যাটার্জি, অমৃত সরকার প্রভৃতি আরও অনেকে। নারায়ণগঞ্জের মোক্তার অশ্বিনী ঘোষালের বাড়ীতে একত্রিত হয়েই এ অভিযানে রওনা হয়েছিলেন কর্মীরা। এ অভিযানে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—

প্রত্যেক ডাকাতির পরিকল্পনায় আক্রমণ, ফিরে আসা সব কিছুরই সময় নির্ধারিত করা হ'ত। কেননা ঘড়ি ধরে কাজ না করলে বিপদের আশঙ্কা থাকে। কুলিয়ারচর বন্দরের অভিযানে যখন সবেমাত্র সমস্ত লোহার সিন্দুক ভাঙা শেষ হয়েছে, প্রচুর অর্থ যখন প্রায় হস্তগত, এমনি সময়ে নায়ক দিগেন মুখোটি পশ্চাৎ-অপসরণের জন্য একত্রিত হওয়ার সঙ্কেতসূচক বিউগল ধ্বনি করলেন। যদিও পরিকল্পনা অনুযায়ীই এমনি নির্দেশ, কিন্তু আর সকলে আরও কয়েক মিনিট সময় দাবী করলেন এই যুক্তিতে যে, এত অর্থ একসঙ্গে আর কোথাও পাওয়া যায়নি এবং একটু সময় পেলেই তা হস্তগত হবে। অনেকে সিন্দুক পরিত্যাগ করে ফল্ ইন্ করতে ইতস্তত: করছিলেন। তখন দিগেন মুখোটি তাঁর নির্দেশ পুনরায় ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন যে, আদেশ লঙ্ঘনকারীকে গুলী করে হত্যা করা হবে। এই হুকুম দিয়ে তিনি একজন বন্দুকধারীর নিকট থেকে নিজের হাতে বন্দুক নিয়ে তাক করে সকলকে সতর্ক করে দিলেন। এর পরে সকলেই বিনা দ্বিধায় পশ্চাৎ-অপসরণের জন্য এসে লাইন-বদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন।

ফিরে এসে পরে দিগেন মুখোটির নামে কেন্দ্রে অভিযোগ করা হ'ল এই বলে যে, তাঁর অন্যায় বিবেচনার ফলে এতগুলি টাকা হাতে এসেও ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অভিযোগ পেয়ে নরেনবাবু আমার এবং অপর কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে অনুসন্ধান সুরু করলেন। আমরা উভয়পক্ষের সাক্ষী-প্রমাণ এবং বক্তব্য শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, দিগেন মুখোটির আদেশ পালন করতে ইতস্তত: করে সকলে ঘোরতর অন্যায় করেছে। এজন্য তাঁদের সতর্ক করে দেওয়া হ'ল। দিগেন মুখোটিকেও জানান হ'ল যে, আরও কিছু সময় দিলে যখন কোন ক্ষতি হ'ত না সেমতাবস্থায় তিনি খুবই অবিবেচনার

কাজ করেছেন। এও স্থির করা হ'ল যে, ভবিষ্যতে তাঁকে আর এমনি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠান হবে না।

পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়মাফিক কাজ করতে গিয়ে আমাদের ফিরে আসার আর একটি কাহিনী উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটা এমনি—মানিকগঞ্জ মহকুমায় একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তখনও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করে উত্তরবঙ্গে চলে যাননি। দিগেন মুখোটি কারাদণ্ড ভোগ করে সদ্য সদ্য ঢাকা জেল থেকে বাইরে এসেছেন। স্থির হয়েছিল যে, সবাই যার যার নির্দিষ্ট স্থান থেকে নানা পথে অগ্রসর হয়ে মানিকগঞ্জ এসে মিলিত হবে এবং সেখান থেকে আক্রমণের জন্য রওনা হতে হবে। দিগেন মুখোটির উপরই ছিল নেতৃত্ব।

এ কাজের জন্য একটি বড় ঘাসি নৌকো (সরু লম্বা নৌকো, এগুলি খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়), এবং দুটি ছোট নৌকোর ব্যবস্থা হয়। ডাকাতি করা হবে ঘাসি নৌকোয় গিয়ে। ফিরবার পথে নিরাপদ স্থানে রক্ষিত ঐ ছোট নৌকোয় অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত মালপত্র তুলে দিয়ে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে। ঘাসি নৌকোয় কিছুই রাখা হবে না—একটা কার্তুজও নয়, যাতে খানাতল্লাসি হলে সন্দেহ উদ্রেক না করে।

আমি আর দিগেন মুখোটি ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ ষ্টিমারে রওনা হয়ে সন্ধ্যা-বেলা দাহসারা ষ্টেশনে নামলাম। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, ললিত বাররী প্রভৃতি মাঝির পোশাকে আমাদের নিকটে এসে মালপত্র ধরে টানাটানি স্থরু করে দিল। "আস্থন বাবু, আমার নৌকোয় আস্থন; কতদূর যাবেন; কত ভাড়া দেবেন!" এমনি কিছুক্ষণ ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটির পর গিয়ে নৌকোয় উঠলাম।

নদী তখন বর্ষার। একেবারে ভরপুর। কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই বীরেন চ্যাটার্জি গান ধরল "ভেদা মাছে কাদা খায়, পুঁটি মাছে পানসী বায়, পোটকা শালা পেট ফুলাইয়া…মরি হায় হায় রে" ইত্যাদি। নদীর ভেতরে কিছুদূর থেকে এমনি সাংকেতিক গান হ'ল। কিছুদূর এগিয়ে আমরা একটা বড় নৌকোয় উঠলাম। তাতে আগেই অনেকে বসা ছিল। দিগেনবাবু সব জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখে নিলেন। যাদের আসবার কথা ছিল তারা সবাই এল কিনা তাও মেলা-লেন। তারপর নৌকো অপর পারে গিয়ে একটা খালের মধ্যে প্রবেশ করল।

খালের জলে তখন প্রবল ভাঁটা। কাজেই আমাদের নৌকো সেই উজান ঠেলে যখন নির্দিষ্ট বাড়ীর কাছে এল তখন ঘড়ি খুলে দেখা গেল যে, আমাদের

পৌছতে আধঘণ্টারও বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে। কার্য সমাধা করে ফিরতে ফিরতে আবার খালে জোয়ার এসে যাবে, এবং আমাদের সেই উজান বেয়েই নদীতে আসতে হবে। তাড়াতাড়ি তা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং সময়ের হিসেব করে দিগেনবাবু ফেরার হুকুম দিলেন। এত খরচ এবং হাঙ্গামা করে এতদূর এসে কোন কিছু না করেই প্রত্যাগমনের আদেশে অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। কিন্তু বুঝিয়ে বলায় সবাই অবশ্য ফেরার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিল।

নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত পালাম গ্রাম বহু লক্ষপতি ধনীর বাসস্থান হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ। অধিকাংশই ব্যবসায়ী, কিছু জমিদারও ছিল। নামেই গ্রাম, আসলে শহরের মতই পাকাবাড়ি, প্রাসাদ ও ঘনবসতি। গ্রামের ভিতর দিয়ে একটাই প্রবেশপথ। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই বন্দুক ছিল। গ্রাম্য ডাকঘরের সঙ্গে তারঘরও যুক্ত ছিল। বৈদ্যেরবাজার থানা খুব কাছে এবং নারায়ণগঞ্জ শহরও খুব দূরে নয়। সাইকেলে কিংবা পায়ে হেঁটে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা যায়। কেবল এক জায়গায় ব্রহ্মপুত্র নদ (যেখানে খুব সরু) খেয়া নৌকোয় পার হতে হয়।

সুতরাং এ গ্রামে অভিযান খুবই বিপজ্জনক। সামান্য ভুল-ত্রুটিতে ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। সমস্ত ভালভাবে দেখেশুনে আসবার জন্য নরেন্দ্রমোহন সেন ও আমি পালাম গিয়ে ঘুরে-ফিরে সমস্ত দেখে এলাম। ফিরে এসে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা স্থির করা হ'ল এবং ত্রৈলোক্যবাবুই এর পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত হলেন।

ঠিক হয়েছিল যে, নৌকাপথে গিয়ে ডাকাতি সমাধা করে কিছু লোক পায়ে হেঁটে আসবে, আর বাকী সবাই নৌকোয় নারায়ণগঞ্জ আসবে। কাইখার টেক নামক স্থানে (যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ খেয়ায় পার হতে হয়) দু'জন লোক রিভলবার নিয়ে পাহারায় থাকবে, যাতে ডাকাতির খবর নিয়ে কেউ আমাদের আগে নারায়ণগঞ্জ না আসতে পারে। ডাকাতির খবর টেলিগ্রাম করে না জানাতে পারে এজন্য নির্দিষ্ট স্থানে টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গ্রাম থেকে সংবাদ নিয়ে যাতে কেউ বেরুতে না পারে সেজন্য গ্রাম থেকে বাইরে যাবার রাস্তায় রিভলবার হাতে লোক রাখা স্থির হয়।

১৯১২ সালের ১০ই জুলাই তারিখে এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সমাধা করা হয়। ডাকাতির সময় গ্রামবাসীদের তরফ থেকে প্রবল প্রতিরোধ হয়। উভয় পক্ষই বন্দুক চালিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধকারীরা গুলির আঘাতে আহত হয়ে

নিরস্ত হয়। পরে সব কাজই নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন ত্রৈলোক্যবাবু, আমি, বীরেন চ্যাটার্জি, কৃষ্ট সাহা, ভুবন বসু, ময়মনসিংহ ধানহাটার জমিদার প্রিয়নাথ রায়, অমৃত সরকার, ললিত বাররী, ক্ষীরোদ ঘোষ এবং আরও অনেকে।

এ ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাকাতির পরদিন কৃষ্ট সাহা ও ভুবন বসু নারায়ণগঞ্জ শহরের অন্তর্গত একটা খালের মধ্যে নৌকা ফেলে এসে নারায়ণগঞ্জে আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করে। এভাবে নৌকা ফেলে আসা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। কেননা, খালি নৌকা লোকের, ক্রমে পুলিসের সন্দেহের কারণ হয়ে আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। বিনা অনুমতিতে এবং বিশেষ জরুরী কারণ ছাড়া নৌকা ফেলে আসায় এরা দু'জনই পদচ্যুত হয় এবং সমিতির সক্রিয় কার্যক্রম থেকে সরিয়ে এদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখনকার দিনে সমিতিতে এমনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ছিল।

কৃষ্ট সাহা বলপ্রয়োগ-সংক্রান্ত কার্যে খুবই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। সুতরাং পরে তাকে আবার সক্রিয় কার্যে গ্রহণ করা হয়। পরে কৃষ্ট সাহা অনেক বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে বিশেষ সুনাম অর্জন করে। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর পুলিসের কাছে সমস্ত স্বীকারোক্তি করে বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে পড়েছিল।

পালাম ডাকাতি উপলক্ষে আর একটি ব্যাপারও উল্লেখ না করে পারছি না। তাড়াতাড়িতে বাধ্য হয়ে নারায়ণগঞ্জের এক বাসায় একজন বিশিষ্ট সক্রিয় অংশগ্রহণকারী কর্মীর গৃহে কিছু লুণ্ঠিত মালপত্র রাখা হয়েছিল। খবর পাওয়া গেল যে, সে ব্যক্তি ব্যাগ খুলে মালপত্র দেখেছিল। এ অপরাধে তাকেও পদচ্যুত করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই শ্বেতাঙ্গ প্রভুর পদাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গ কুলীর পিলে ফেটে মৃত্যুর ঘটনা কমে আসছিল। কিন্তু রেলওয়ের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর দ্বারা ভারতীয় নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল। কিভাবে এর প্রতিকার করা যায় তা ভাবতে লাগলাম। কেননা, ভারতীয় নারীর অসম্মান সমস্ত ভারতবর্ষের অপমান বলে আমরা মনে করলাম। কোর্টে

নালিশ হলে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর ন্যায়বিচার হ'ত না। তারা হয় মুক্তিলাভ করে, না হয় সামান্য দণ্ড পায়। তাই আমরা স্থির করলাম যে, দু'চারজন অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিলেই সমস্ত শ্বেতাঙ্গ-প্রভুরা সতর্ক হবে। পুনরায় এমনি অপরাধ করতে সাহসী হবে না।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়েতে গোমেস (Gomez) নামে এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী একজন ভারতীয় রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করল। যথারীতি অভিযোগ হ'ল, কিন্তু সুবিচার হ'ল না। এই গোমেসকে চরম দণ্ড দেব ব'লে স্থির করলাম। খবর পেলাম গোমেস চাঁদপুর স্টেশনে বদলি হয়ে এসেছে। নরেন্দ্রমোহন সেন ও একজন পুরাতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাবেন এই কার্য সমাধা করতে। সঙ্গে থাকবে একজন স্থানীয় যুবক, যাতে পশ্চাৎ-অপসরণের সময় নিরাপদ পথ বেছে নেওয়া যায়।

তাঁরা চাঁদপুর গেলেন বটে, কিন্তু ঠিক আক্রমণের সময়ই কার্য সম্পন্ন না করে ফিরে এলেন। ফিরে এসে নরেনবাবু আমার নিকট সমস্ত খুলে বললেন। ব্যর্থতা হয়েছিল দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য। তার সম্বন্ধে নরেনবাবু যা বললেন তা খুবই বিচিত্র। প্রথম দু'দিন আক্রমণ করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হ'ল না। কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নরেনবাবুর মনে হ'ল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে দুর্বলতা এসেছে। তবে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি তৃতীয় দিন ঠিক আক্রমণের মুখে নরেনবাবু যখন রিভলবার খুলে ছুটে গিয়ে গুলি করবেন, ঠিক সেইক্ষণে দ্বিতীয় ব্যক্তি নরেনবাবুর হাত চেপে ধরে বললো, নরেন থাম থাম, আগে আমার কথা শোন।

পরে তিনি নিজ দুর্বলতার কথা স্বীকার করে বললেন, আমি আর সে মানুষ নেই। আমার মনে পরিবর্তন এসেছে। আমি দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েছি। আমি আর তোমাদের সঙ্গে চলতে পারব না। এতদিন নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখেছি। আজ আর না বলে পারলাম না। হঠাৎ যেদিন বৃদ্ধ পিতাকে দেখলাম ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ঠক্ ঠক্ করে শীতে কাঁপছেন, সেদিন থেকেই আমার মনে দুর্বলতা প্রবেশ করেছে। আমাকে সংসারী হতে হবে, অর্থোপার্জন করতে হবে।

নরেনবাবু তাঁকে বললেন, তুমি যে অকপটে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করলে, তার জন্য খুবই সন্তুষ্ট হলাম। কোন হৈ-চৈ না করে, কাউকে কিছু না বলে সক্রিয় কর্মপন্থা পরিত্যাগ করে চলে যাও। তোমার আর কোন সম্পর্ক রাখার

প্রয়োজন নেই। কাউকেই কিছু বলব না বা তোমার নিন্দে রটবে না। তবে বুঝতেই পার দু'একজনকে একটু জানিয়ে রাখতে হবে।

ফিরে এসে নরেনবাবু আমাকে সব কথা বললেন। ইচ্ছে করেই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম প্রকাশ করলাম না। তিনি ছিলেন সমিতির নেতৃস্থানীয় একজন পুরাতন বিপ্লবী এবং আমার সিনিয়র। অনেক বছর ধরে তিনি পলাতক জীবন যাপন করছিলেন এবং তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। মানুষের চরিত্র যে কি রকম দুর্জ্ঞেয়, কি অবস্থায় কখন হঠাৎ মনের আমূল পরিবর্তন এসে যায় তা দেখাবার জন্মই বিষয়টা উল্লেখ করলাম।

প্রথম যুগে সমিতির গৃহত্যাগী-সভ্যরা আর বাড়ী ফিরে যেতে পারত না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিল। উপরে যে ঘটনার উল্লেখ করলাম তার পরে আরও দু'একটা এমনি ঘটনা হওয়ায় স্থির করলাম যে, বিশেষ কোন অসুবিধে না থাকলে—যেমন ধরা পড়বার সম্ভাবনা না থাকলে, গৃহত্যাগী সকলকেই অস্থায়ি-ভাবে বাড়ী যেতে দেব। প্রয়োজন বোধে বাড়ী ঘুরে আসতে বরং উৎসাহিতই করব। যেহেতু গৃহত্যাগ করেছি, সুতরাং ওমুখো আর হব না, আত্মীয়, প্রিয়-পরিজনের মুখ আর দেখব না, এমনি কঠোরতার মধ্যে এক রকমের দুর্বলতা লুকান থাকে। এমনি বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যেই গৃহের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ একান্ত অজ্ঞাতেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সেজন্মই হঠাৎ কোন সামান্ম ঘটনায় মনের মধ্যে বিপর্যয় ঘটে যায়। আত্মপ্রকাশ সহসা হলেও, আসলে কিন্তু কঠোরতার আবরণের মধ্যে গৃহের প্রতি আকর্ষণের অঙ্কুর উদ্‌গম হয়। কিন্তু যাতায়াত ও মেলা-মেশার দ্বারা ঘর ও বাহিরকে এক করে ফেলতে পারলে সম্পর্কটা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কমে যায়।

অবশ্য বাড়ী যেতে দিয়েছি এবং সে আর ফিরে আসে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে। গৃহত্যাগী কর্মীটির নাম ছিল সম্ভবতঃ দেবেন্দ্র দাস। এই কাহিনীতে এ নামেই অভিহিত ছিল। বাড়ী ছিল নারায়ণগঞ্জ মহকুমার বারদী কিংবা বৈদ্যেরবাজার অঞ্চলে। যে সময়ের কথা বলছি তখন সে নৌকায় থাকত। কেননা, সমিতির যে কয়েকখানা নৌকা ছিল সেগুলি ডাকাতি কিংবা তদনুরূপ কোন কার্যের সময় ভিন্ন খালি ফেলে রাখলে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে। তাছাড়া নৌকাগুলি সর্বদা চালু রাখলে অনেকেই নৌকা চালনা শিখতে পারে, দেশের জলপথগুলি ভাল করে চিনতে পারে। ফলে আমাদের সমিতির সভ্যরা নৌকা চালনায় এমন নৈপুণ্য অর্জন করেছিল যে, ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তারা

পদ্মা-মেঘনা নদীতে পাড়ি জমাতে পারত। এমন কি নোয়াখালি ও বরিশালের দিকে নদীর মোহনা সমুদ্রের পার পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করতে পারত। বিনা কারণে নৌকা চলাচলে জল-পুলিসের সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে এজন্য নৌকায় মাল চালানের ব্যবস্থা স্থির করলাম। নারকেল, সুপারি, ধান বোঝাই করে, সভ্যরাই মাঝি-মাল্লা সেজে বড় বড় শহর-বন্দরে নিজেরাই সুবিধেমত দরে বিক্রয় করত। অনেক সময় শহরের রাস্তায় এবং বাজারে বসেও মাল বিক্রী করতে হ'ত। ফলে ঘাট এবং রাস্তার পুলিসের হাতেও কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। কারণ কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করা চলবে না।

দেবেন্দ্র দাসের কাহিনী এমনি একটা ব্যাপারের যোগসূত্র ধরেই সুরু হয়। দেবেন্দ্র নোয়াখালি থেকে চালান নারকেল ঢাকায় এনে রায়সাহেবের বাজারের সামনে খাল থেকে মাল নামিয়ে রাস্তায় বসে খুচরো বিক্রী করছিল। এমন সময় সেখানে ওর কাকা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে দেখেই চিনতে পারলেন। গৃহত্যাগের পর থেকে অনেকদিন যাবতই তাঁরা ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে চিনতে ভুল করলেন না। কথা সুরু করতেই দেবেন্দ্র কিন্তু নিজের পরিচয় বেমালুম অস্বীকার করল। কিন্তু ওর কাকা নাছোড়বান্দা। সে হাঁকডাক সুরু করতেই অন্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের আশঙ্কা ও বিপদ বুঝে ইশারায় অপর সঙ্গীর উপর দোকানের ভার অর্পণ করে সে স্থান পরিত্যাগ করল। খুড়া মহাশয় তার পিছু নিল। নিরুপায় দেখে আমার বাসস্থান মিনার্ভা হোটেলের কাছাকাছি এক জায়গায় কাকাকে দাঁড় করিয়ে অনেক আশ্বাস দিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল।

সমস্ত শুনে আমি দেবেন্দ্রকে একবার বাড়ী ঘুরে আসবার জন্য উপদেশ দিলাম। সে কিন্তু কিছুতেই যাবে না, বলল—দেশের কাজে গৃহত্যাগ করেছি, আবার গৃহে ফিরে যাব? তা হয় না। আমি বাড়ী যাব না। অনেক বুঝিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ী যেতে রাজী করালাম। বাড়ী থেকে ফিরে আসবার জন্য খরচা বাবদ টাকাও দিলাম। বলে গেল সে শীগগিরই ফিরে আসবে। সেই দেবেন্দ্র আর ফিরে আসে নি। পুরোপুরি সংসারী হয়ে গৃহীর জীবন যাপন করতে লাগল।

১৯১২ সালের ১লা নভেম্বর কুমিল্লা শহরের এক বাড়ীতে সমিতির কয়েকজন সভ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং লোহার সিন্দুক ভাঙার যন্ত্রপাতিসহ গ্রেপ্তার হন—আদিত্য দত্ত, রমেশ ব্যানার্জি, রমেশ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

ডাকাতির ষড়যন্ত্র ও চেষ্টার অভিযোগ পুলিস আনয়ন করে। মকদ্দমায় আদিত্য দত্ত এবং আর কয়েকজন মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু বাকী সকলের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

আদিত্য দত্ত বরিশাল জেলায় সমিতির কাজে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিল এবং সেখানে সে নিশিকান্ত নামে পরিচিত ছিল। 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়' এই নাম বিশেষভাবে উল্লেখ হয়। পুলিস যখন নিশিকান্তকে গ্রেপ্তার করবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল তখন যে সে তার আসল নাম আদিত্য দত্ত রূপে কুমিল্লা জেলে, একথা কর্তৃপক্ষ অনেক দিন জানতে পারে নি।

আদিত্য দত্ত কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হলেও পরে তাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলি করা হয় এবং সেখান থেকেই সে মুক্তিলাভ করে। কুমিল্লায় গ্রেপ্তারের সময় তার জামাকাপড় আলিপুর যাওয়ার সময় আর পুলিস তার সঙ্গে দেয় নি। ফলে মুক্তির সময় পুলিস এক হাত চওড়া ছোট এক টুকরো কাপড় পরতে দিল। সেও তাই কোমরে জড়িয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কলকাতা ঘুরে বেড়াল দলের লোকের সন্ধানে। দৈবক্রমে সন্ধ্যাবেলায় কলেজ স্কোয়ারে একজন পরিচিত সভ্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা একবারও ভাবে নি। সব কিছুর ঊর্ধ্বে সমিতির কাজ। সমিতির প্রয়োজনে গৃহে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়।

আদিত্য দত্ত সমিতির একজন বিশ্বাসী, সাহসী, কঠোর পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী সভ্যরূপে পরিচিত ছিল। বলপ্রয়োগের কাজে সে খুব উপযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রথমে তাকে পাঠান হ'ল ময়মনসিংহ জেলায় একটা নগণ্য গ্রামে পাঠশালায় শিক্ষকের কাজ করতে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন থেকে সেখানকার দূরত্ব ছিল ২৬ মাইল এবং এ পথে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে হ'ত। আদিত্য দত্তও খুশী মনেই এ কাজে গেল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছিল। সে যেমন বহু বলপ্রয়োগের কার্যে অংশগ্রহণ করেছে আবার তেমনি একটানা একঘেয়ে কাজে যেতেও অস্বীকার করে নি।

সাধারণত মনে হতে পারে যে, বিপ্লবীরা কত রোমাঞ্চকর ধারণা নিয়েই না গৃহত্যাগ করে সমিতির কার্যে লিপ্ত হয়। পিস্তল-বন্দুক নিয়ে কত হত্যা, ডাকাতি, গুলি ছোঁড়া এবং আরও কতরকমের উত্তেজনামূলক কাজই না সে করতে পারবে। কিন্তু আমাদের নীতি ছিল, যে কর্মীর মধ্যে কেবল উত্তেজনার প্রতি আকর্ষণ থাকত, যে কেবল হৈ-চৈ চাইত, যার মতি অস্থির হ'ত, তাকে

আমরা গৃহত্যাগ করাতাম না এবং খুন বা ডাকাতির মত কোন চাঞ্চল্যকর কাজেও পাঠাতাম না। যে সব কর্মীর মধ্যে এসব কার্যে অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা পরিদৃষ্ট হ'ত, তাদের আমরা এমনি কার্যের উপযুক্ত মনে করতাম না। আমরা চাইতাম সে সব কর্মী দ্বারা এ সব কাজ করাতে, যারা এ কাজ কর্তব্য-জ্ঞানে নিষ্কামভাবে করতে পারবে এবং এর প্রতি কোন স্পৃহা থাকবে না।

আদিত্য দত্ত যখন আলিপুর জেল থেকে মুক্তিলাভ করে, আমিও তখন কলকাতায় এক পলাতকের আশ্রয়ে একসঙ্গে দুজনে বাস করি। আমার নামে তখন 'বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার' ওয়ারেণ্ট।

অনুশীলন-সমিতির আরম্ভের যুগ থেকেই পুলিনবাবু ভারতবর্ষের বাইরে—ইউরোপ, আমেরিকায় কিছু কিছু লোক পাঠাতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর নির্দেশ মতই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার নাগ এবং আরও কয়েকজন বিশেষ করে সমিতির কাজেই বিদেশে গিয়েছিলেন। পুলিনবাবুর উৎসাহে কয়েকজন ছাত্র-সভ্যও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিদেশ থেকে কি কি সাহায্য আমরা পেতে পারি, অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং তা নিয়ে আসা যায় কি না। তিনি অবশ্য জোর দিতেন অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ শিক্ষার দিকে। আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আমরাই তৈরী করব, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর চিরকালই প্রবল ছিল। আন্দামানে দ্বীপান্তর বাসের পর ফিরে এসে, এবং ১৯২০ সালেও তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন। সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর গুহও এই উদ্দেশ্যেই বিদেশে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য সৈয়দ বন্দর কিংবা ইটালী পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন (১৯১০)।

তারপর, আমরা যখন (১৯১০-১২) সম্পূর্ণ গুপ্ত সমিতির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করলাম, তখন আমাদের 'বৈদেশিক নীতি ছিল—বিদেশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাহায্যের জন্য কিছু করা যায় কি না, পৃথিবীতে ইংরেজের প্রকৃত শত্রু কারা, কারাই বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস নিজেদের স্বার্থেই কামনা করে। ব্রিটিশের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে পৃথিবীতে যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে, তাতে ইংরেজের বিপক্ষে কোন কোন্ শক্তি থাকবে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কি ব্যবস্থা করা যায়, এক কথায় বিদেশী শক্তিচয়ের মধ্যে পরস্পর

দ্বন্দ্ব বাধলে আমরা তার কি সুযোগ গ্রহণ করতে পারি—এ সমস্ত কথা আমরা চিন্তা করতে লাগলাম। কেননা, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজের বিপদ আমাদের সুযোগ এনে দেবে।

তখন ব্রিটিশই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তি। তারা চেয়েছিল সারাটা দুনিয়াই তাদের পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতে। সেজন্য তারা পৃথিবীর শক্তিসাম্য এমনভাবে রাখতে উদ্‌গ্রীব থাকত, তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সংঘবদ্ধ না হতে পারে। সে সময় ব্রিটিশের নৌ-শক্তির মান ছিল পৃথিবীর যে কোন দু'টি শক্তির মিলিত নৌবল (Two power standard) হতে অধিকতর শক্তিশালী। পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যে আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে এ তারা চাইত না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই নবজাগ্রত জার্মানী ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। জার্মানীও সাম্রাজ্য বিস্তারের সংকল্প নিয়ে নৌশক্তি বৃদ্ধির আয়োজন করল। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা ভোগের ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ানতে জার্মানী ইংরেজের প্রধান শত্রুরূপে পরিগণিত হ'ল।' দু'পক্ষই মিত্র সংগ্রহ করে আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল; এবং এদের রেষারেষির ফলে বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায় পৃথিবী আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এই আসন্ন যুদ্ধের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সুতরাং বিদেশে পাঠাবার লোক খুঁজতে লাগলাম। কেদারেশ্বর গুহকেই বিদেশে পাঠান স্থির হয়। তিনি নিজেও যাওয়ার জন্য আগ্রহশীল ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত তাঁর আগেকার পাশপোর্টের মেয়াদও শেষ হয়ে যায় নি। তাছাড়া তিনি ছিলেন সমিতির একজন পুরাতন বিশ্বাসী সভ্য। স্থির হ'ল কেদারবাবুর বিদেশে যাওয়া, থাকা এবং চলাফেরার যাবতীয় খরচ সমিতিই বহন করবে।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেদারবাবু ১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানী চলে গেলেন। নরেনবাবুর নির্দেশমত আমি কেদারবাবুর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখা ও যোগাযোগ রক্ষা করতে লাগলাম। পত্রালাপের জন্য সংকেত (cypher) ঠিক করে রাখলাম। টাকা পাঠাতাম সাধারণতঃ ডাচ্ ব্যাঙ্কের মারফত। তাঁরই অনুরোধে আমরা তাঁকে আমেরিকা যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। কেদারবাবুর কাজকর্ম এবং বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম) আরম্ভ হওয়ার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানীর সাহায্য-প্রাপ্তির ব্যবস্থা কি কি হয়েছিল তা যথাক্রমে উল্লেখ করব।

কেদারবাবুর জার্মানী যাওয়ার পূর্বে তিনি এবং আমি ময়মনসিংহ জেলার

কিশোরগঞ্জ মহকুমা শহরে গিয়েছিলাম। ইতোপূর্বেই ঐদিকে একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। মনোমোহন বর্মণ হয়েছিলেন এদের নেতা। পশ্চিমবঙ্গে কার্তিক দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল এবং এক দলের মতই চলতেন।

পশ্চিমবঙ্গে বিঘাটি ও নেত্রা ডাকাতি সম্পর্কে কার্তিক দত্তের নাম খুব ছড়িয়ে পড়ে। সেকালে ঢাকার বররা ডাকাতিতে যেমন শশী সরকারের নাম, রাজেন্দ্রপুর ট্রেন ডাকাতিতে যেমন সুশীল সেনের নাম, তেমনি বিঘাটি ডাকাতি সম্পর্কে কার্তিক দত্তের নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ. করে। গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের ফলে দলটি ভেঙে যায়। তখন কিশোরগঞ্জ বাজিতপুর অঞ্চলের এই দলটি নিজেরাই অনুসন্ধান করে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন।

বিঘাটি ডাকাতির সমসাময়িক কিশোরগঞ্জ বাজিতপুরেও একটি চমকপ্রদ ডাকাতি হয়।

এ দলটিকে যখন অনুশীলনের সঙ্গে মিলিত করে নেওয়া স্থির হয় তখন এও স্থির হয় যে, অনুশীলনের 'প্রতিজ্ঞা'ও এদের গ্রহণ করতে হবে। এবং দলীয় বিশিষ্ট সভ্যদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের উপযুক্ত মনে করলে সমিতির আদ্য ও অন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়ে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করব। এ উপলক্ষেই আমি ও কেদার-বাবু কিশোরগঞ্জ গিয়েছিলাম।

কেদারেশ্বর গুহর পিতা তখন কিশোরগঞ্জ শহরে সরকারী কর্মচারী। বিদেশ যাত্রার পূর্বে পিতামাতার সঙ্গে দেখা করতে তিনি সেখানে গেলেন, এবং আমার পক্ষেও যাতায়াত ও সেখানে দু'দিন থাকার একটা সুযোগ হ'ল। সেকালে কিশোরগঞ্জে রেল-লাইন বসে নি। ঢাকা-ময়মনসিংহ লাইনের গফরগাঁও স্টেশনে নেমে সতের মাইল পথ হেঁটে এবং মাঝপথে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে কিশোরগঞ্জ যেতে হ'ত।

মনোমোহন বর্মণ ও তাঁর দলীয় বিশিষ্ট সভ্যদের আদ্য ও অন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়ে আনলাম। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ শরীর কেটে রক্ত বার করে তাই দিয়ে নাম দস্তখত করেছিল।

এই দলের সঙ্গে যে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেয় তার নাম হচ্ছে ঢাকার বসন্ত ভট্টাচার্য। সে এই দলেরই লোক এবং কার্তিক দত্তের সহকর্মী ছিল। সে নিজে সমিতির সভ্য হয় এবং এই দলটিকে পরামর্শ দেয় সমিতির সভ্য হওয়ার জন্য।

এই বসন্ত ভট্টাচার্যই পরে পুলিসের গুপ্তচর হয়ে আমাদের সব খবর গোয়েন্দা পুলিসে যোগাতে থাকে। ফলে তাকে গুলী করে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। ঘটনাটা যদিও পরেই ঘটেছিল তবু এখানেই তা উল্লেখ করছি।

একদিন ফরিদপুরের জগদ্গুরু জগদ্বন্ধুর প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তী মাণিকগঞ্জ ষ্টিমারে দুপুর রাতে ঢাকা ষ্টিমার স্টেশনে নামেন। পরদিন আমাকে খবর দিলেন যে, তিনি বসন্ত ভট্টাচার্যকে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছেন এবং তাকে যেন আর বিশ্বাস না করা হয়।

সে সময় ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তী বিদ্বান, চরিত্রবান এবং সাধু-প্রকৃতির লোক হিসেবে বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনুশীলন-সমিতির সভ্য ও অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতাম। ব্রহ্মচর্য-বিষয়ক পুস্তকাদি তিনি লিখেছিলেন। এবং নিজেও নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী ছিলেন।

তাঁর কথা শুনে বসন্ত ভট্টাচার্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতেই তার চরিত্র সম্বন্ধে নানাকথা শুনতে পেলাম। তাকে সারা দিনরাত্রি চোখে চোখে রেখে, সে কোথায় যায় কি করে, সমস্ত সংবাদ সংগ্রহার্থে সমিতির খুব বিশ্বাসভাজন ও দায়িত্বশীল সভ্য খগেন্দ্র চৌধুরীকে নিযুক্ত করলাম। খগেনবাবু তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে একেবারে বেশ্যালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পরে অন্য লোকের নিকট শুনলাম বসন্ত মদ্যপানও সুরু করেছে।

মদ্যপান, বেশ্যালয়ে গমন এবং বিলাসিতার জন্য টাকা বসন্ত পায় কোথা থেকে ? তার বাড়ীর অবস্থা ছিল অতি শোচনীয় এবং নিজেও সে এক পয়সা উপায় করত না। নিজের পারিবারিক দারিদ্র্যের বর্ণনা করে আমার কাছে অর্থ সাহায্য চাইত। যত টাকা চাইত তত দিতাম না বটে, তবে কিছু কম দিতাম যাতে সে হাতছাড়া না হয়ে যায়, এবং তাকে কিছুতেই বুঝতে দিতাম না যে, তাকে সন্দেহ করি। তখন পর্যন্তও তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ হয় নি।

যখন গোয়েন্দা পুলিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ করার যুক্তিযুক্ত কারণ পেলাম, তখন তাকে আরও খাতির করতে লাগলাম যাতে তার বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া মাত্র তাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলা যায়। গুপ্তচরবৃত্তির খবর পাকাপাকি পেয়ে তাকে এমনভাবে সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে তাকে হত্যা করার কোন যোগসূত্রই না পাওয়া যায়। এ কাজের ভার দেওয়া হ'ল একজন

বিশিষ্ট পুরাতন কর্মীর উপর। স্থির হয়েছিল যে, সে বসন্তকে বারদি কি বৈদ্যেরবাজারের কাছে মেঘনা নদীর ধারে কোন কাজের ছুতোয় নিয়ে গিয়ে শেষ করবে। কিন্তু লোকটির দীর্ঘসূত্রতায় এবং দক্ষতার অভাবের জন্য খুব দেরি হতে লাগল।

এদিকে রমেশ চৌধুরী এবং আরও দু'তিনজন গ্রেপ্তার হ'ল ঢাকার বাবুরবাজারের এক বাড়ীতে। এদের সকলেই সমিতির গৃহত্যাগী সভ্য। এদের নামে ১০৯ ধারায় মকদ্দমা দায়ের হয় এবং রমেশ চৌধুরী জামীনে মুক্তিলাভ করে।

সে সময় কুমিল্লার ডাকাতি ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিসের হাতে একটা কাগজ পড়েছিল যাতে ডাকাতিতে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের কার হাতে কি অস্ত্র থাকবে তা লিখিত ছিল। তার মধ্যে ছিল পরিতোষ - automatic (অটোমেটিক), অর্থাৎ পরিতোষের হাতে অটোমেটিক পিস্তল থাকবে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, রমেশ চৌধুরীর দলীয় নাম ছিল পরিতোষ। কিন্তু পুলিস তা জানতো না। এ বিষয় বলতে গিয়ে যে সময়ের কথা লিখছি তখন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। আমার নামেও ওয়ারেণ্ট বার হয়েছে। যাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—a man named Paritosh (পরিতোষ নামীয় একজন লোক)। কিন্তু পুলিসের জানা না থাকায় রমেশ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে জেলে রেখে এবং পরে তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েও পরিতোষের সন্ধান পেল না।

বসন্ত-ভট্টাচার্যের কথায় ফিরে আসা যাক্। রমেশ চৌধুরী একদিন তাঁদের মকদ্দমার শুনানীর শেষে আদালত থেকে বার হয়েই অনেক কষ্টে গুপ্তচরদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে একেবারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন—আজ আদালতে গোয়েন্দাদের সঙ্গে বসন্তকে দেখলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করে অঙ্গুলি নির্দেশে কি বলেই মুখ লুকিয়ে সরে গেল। আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম।

রমেশবাবু ছিলেন প্রধান নেতৃত্বের অন্যতম। সুতরাং তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, অবিলম্বে বসন্তকে শেষ করতে হবে। একজনের শৈথিল্য এবং দক্ষতার অভাবে যখন কাজটা গোপনে করা গেল না, তখন প্রকাশ্যেই কার্য সমাধা করা যাক। এই নির্দেশ দিয়ে আমি বিশেষ কাজে কলকাতায় চলে গেলাম। তিন-চারদিনের মধ্যেই ঢাকা বাঙ্গলাবাজারে সন্ধ্যাবেলা রিভলবারের গুলীতে বসন্ত ভট্টাচার্য নিহত হয়।

বরিশাল সম্পূরক ষড়যন্ত্র মামলার (Supplementary Conspiracy case) সময় তখনকার গোয়েন্দা পুলিসের বড় কর্মচারী Colson (কলসন) সাক্ষীতে বলেছিল যে, বসন্ত ভট্টাচার্য পুলিসের সংবাদদাতা ছিল এবং তার পূর্ণ স্বীকৃতি (Full confession) লিখিত হওয়ার তিনদিনের মধ্যেই বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করে।

সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে শেষ পর্যন্ত সমিতির বহু সভ্যকেই হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই এত অনুসন্ধান করে নিঃসন্দেহ হতে হয়েছে যে, পাছে কোন নির্দোষকে শাস্তি দেওয়া হয়—অনেক সময় সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি সাধিত হয়ে যাওয়ার পর শাস্তি বিধান করা হয়েছে। গোড়াতেই কাজ শেষ করতে পারলে এত ক্ষতি হ'ত না।

পূর্ব কথায় ফিরে আসছি। কিশোরগঞ্জে মনোমোহনবাবুদের সঙ্গে কার্য সমাধা করে ময়মনসিংহ শহরে গেলাম। তথায় পূর্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করলাম। তখন তার বয়স খুব কম। বয়স অনুপাতে তাকে আরও ছোট দেখাত। বিদ্যা যাই থাক না কেন, তার বুদ্ধি, উদ্যমশীলতা, নিষ্ঠা দেখে মনে হ'ল উপযুক্ত লোকই কাজে হাত দিয়েছে। বিপ্লবীর সমস্ত গুণই তার মধ্যে আছে। পূর্ণই নেতৃত্বের উপযুক্ত।

সেখান থেকে গৌরীপুর গিয়ে রমণী দাস মহাশয়ের সঙ্গে জেলার কার্য সম্বন্ধে আলোচনা করে বুঝতে পারলাম যে, এমন ধীর, স্থির, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নিষ্ঠাবান লোকই জেলা পরিচালনায় উপযুক্ত। সেখান থেকে গিয়েছিলাম জামালপুর ও ধানহাটায়। রবীন্দ্রমোহন সেন বাল্যকাল কাটিয়েছেন জামালপুরে। সেখানে বিপ্লবান্দোলনের বীজ তিনিই বপন করেছিলেন, এবং সমিতির ভিত্তি এমন পাকা করে রেখেছিলেন যে, জামালপুর সর্বদাই কার্যে পুরোভাগে থাকত।

ধানহাটার প্রিয়নাথ রায় ছিলেন জমিদার। তিনি ছিলেন সমিতির স্তম্ভ-স্বরূপ। তিনি যে কেবল সর্বপ্রকার কার্যে সাহায্য করতেন, তা নয়, নিজেও খুন-ডাকাতি প্রভৃতিতে যোগদান করতেন।

সেকালে ধর্মের প্রতি বিপ্লবীদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। স্বদেশ-সেবা, দেশের উদ্ধারকার্যে আত্ম-বিসর্জন, জনসেবা, পরহিতে আত্মদান সমস্তই ধর্ম-সাধনার অঙ্গ বলে বিপ্লবীরা মনে করত। ব্রহ্মচর্য পালন সমিতির সভ্যদের অবশ্যপালনীয় ছিল। সমিতিতে ছেলেদের আকর্ষণ করবার প্রথম সোপান হিসেবে এবং প্রাথমিক সভ্যদের সঙ্গে আলোচনার প্রধান বিষয়ই হ'ত ধর্ম ও

ব্রহ্মচর্য। তা ছাড়া পৌরাণিক কাল থেকে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যাঁরা জনহিতে কিংবা অন্য কোন মহৎ কার্যে আত্মদান করেছিলেন তাঁদের উপাখ্যানই হ'ত সকলের প্রধান পাঠ্য ও আলোচ্য বিষয়।

সমিতি ধর্ম-সঙ্ঘ নয়, কিন্তু ধর্মই ছিল প্রাণ-স্বরূপ। নরসেবাই ছিল নারায়ণ সেবা। কাজেই সাধু-সন্ন্যাসীর উপর বিপ্লবীদের একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লব-সাধনার ভিত্তিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ভগবদ্গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। শুধু যে প্রেরণাই এসেছে এই তিন উৎস থেকে তা নয়, বিপ্লবের সাধনা কি এবং আদর্শই বা কি তাও বিপ্লবীরা জানতে পেরেছে এবং গ্রহণ করেছে।

পূর্বেই বলেছি স্বয়ং পি. মিত্র মহাশয় একজন যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে যোগ-সাধনা করতেন এবং সমিতির সভ্যদেরও তা করতে বলতেন। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মহাযোগী। অন্যান্য সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরাই দেবসেবা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি জানাতেন সমিতির সভ্যরা তাঁদের প্রতিই আকৃষ্ট হ'ত। আমাদের সমিতি থেকে বহু সভ্য সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং যে ব্যক্তি যে আশ্রমেই যোগদান করেছেন সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী সত্যানন্দ (সতীশ দাশগুপ্ত), স্বামী নির্বাণানন্দ (সূর্য সেন), স্বামী সহজানন্দ (নগেন সরকার), স্বামী আত্ম-প্রকাশানন্দ (প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত), স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ (সতীশ চক্রবর্তী), স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (ধীরেন দাশগুপ্ত), নরেন মহারাজ (নরেন্দ্র সেন) এবং আরও অনেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। স্বামী গম্ভীরানাথের প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন স্বামী শান্তিনাথ (ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অক্ষয় দত্ত)। স্বামী সত্যানন্দ পুরি (প্রফুল্ল সেন) ছিলেন পরবর্তী কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কথা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব।

লোকালয়ে বিচরণকারী ধর্ম-প্রচাররত স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলেও কোন সমিতির সভ্য তাদের শিষ্য হয় তা আমাদের কাম্য ছিল না। কারণ তাতে মন্ত্রগুপ্তি নষ্ট হ'ত। সমিতির কাজে যে আত্মোৎসর্গ করেছে, সমিতির নিয়মানুবর্তিতা, সমিতির প্রতি আনুগত্য এবং সমিতির মন্ত্রগুপ্তি রক্ষা করে চলবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, সে আর একজনকে গুরু বরণ করে তেমনভাবে তার অনুগত হবে এ আমরা চাইতাম না। দ্বিধা-বিভক্ত আনুগত্য জীবনে

চলতে পারে না। কেউ কোন সাধুর তেমন শিষ্য হলে তাকে সমিতির কাজ পরিত্যাগ করতে বলতাম।

শুনেছি যতীন মুখার্জি মহাশয় নাকি স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক বিপ্লবী কর্মী নাকি শিষ্য হয়েছিলেন। বাংলার বিপ্লব যুগের আদি পুরুষদের অন্যতম শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাস অবলম্বন করে নিরালম্ব স্বামী নাম গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী যেমন দেখতে তেমনি চমৎকার আলাপী পুরুষ ছিলেন। তিনি সাহস, ত্যাগ, দেশসেবা প্রভৃতি সম্বন্ধে বলতেন এবং দেশ-কর্মীদের ও বিপ্লবীকর্মীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এসব কারণেই তাঁর কাছে সময় সময় যেতাম।

আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠের প্রতি। কলকাতায় গেলে এ দু'স্থান ছিল আমাদের অবশ্য গন্তব্যস্থল। সে সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানাপ্রাপ্ত হয়ে পলাতক অবস্থায়ও সারাদিন বেলুড় মঠে কাটিয়ে এসেছি। সোনারং আমাদের সমিতির কেন্দ্রে যে ঠাকুরঘর ছিল সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি ছিল এবং তারই পূজার্চনা হ'ত। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়েও আমরা বিপ্লব আদর্শের প্রেরণা পেতাম। বেলুড় মঠের ভক্তগণ অন্যরূপ ব্যাখ্যা করতেন। এ কারণেই আমরা রামকৃষ্ণভক্ত হওয়া সত্ত্বেও আদর্শের দিক দিয়ে একটা ভিন্ন মত পোষণ করতাম।

ফরিদপুরের জগদ্‌গুরু জগৎবন্ধু মৌনী হলেও তাঁর প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী রমেশ চক্রবর্তী বলতেন যে, জগৎবন্ধু বিপ্লবী আদর্শ সমর্থন করতেন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের ধ্বংস কামনা করতেন।

তখন সিলেট জেলায় স্বামী দয়ানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর আশ্রম ছিল অরুণাচল। শিষ্যবর্গসহ তিনি জেলায় জেলায় ভ্রমণ করতেন এবং খোল-করতাল ও নৃত্যসহ অহোরাত্র কীর্তন করাই ছিল এঁদের প্রধান কাজ। এঁরা কতকটা উগ্রপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। যেখানেই যখন যেতেন সেস্থান সরগরম হয়ে উঠত। কারুর বাধাই এঁরা মানতেন না। পুলিস এঁদের পেছনে লেগেই ছিল। কিন্তু এঁরা পুলিস বা সরকারী বাধা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করতেন। মাঝে মাঝে পুলিস এঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরত। রমেশ চৌধুরী একবার ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে স্বামী দয়ানন্দ ও তাঁর প্রধান শিষ্য মহেন্দ্রনাথ দে এবং

আরও দু'এক জনের সঙ্গে একই কক্ষে কিছুদিন বাস করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ দে খুব বিদ্বান ও চিন্তাশীল ছিলেন। রমেশ চৌধুরী এঁদের মধ্যে স্বদেশীভাব বা বিপ্লবীদের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখতে পান নি।

যদিও আমাদের দু'একজন সভ্য এঁদের সঙ্গে মিশে দয়ানন্দের শিষ্য হয়েছিল, কিন্তু আমরা এঁদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতাম না। তবে ব্রিটিশ-বিরোধী বলে সন্দেহ করে পুলিস এঁদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত এবং এঁদের উপর নির্যাতন করত—এ কারণেই এঁদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মাত।

সিলেট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার জৎসা গ্রামে দয়ানন্দের শিষ্য-শিষ্যাগণ সরকারী হুকুম অমান্য করে হরিসংকীর্তন করতে থাকেন। তখন মৌলভীবাজারের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গর্ডন, আই. সি. এস., সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়ে কীর্তনরত দলকে আক্রমণ করে গুলীবর্ষণ করে। গুলীর আঘাতে মহেন্দ্রবাবুর মৃত্যু হয় এবং বহুলোক আহত হয়। সর্বোপরি, কীর্তনরত মহিলাদের উলঙ্গ করে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। এ ঘটনায় সমস্ত দেশ শিউরে উঠল। ধর্মকার্যে বাধাদান ও এমনি নৃশংস অত্যাচারে দেশের লোক অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ হয়েছিল যে, সরকারী এই নৃশংস কার্যের তীব্র প্রতিবাদও হ'ল না। সুতরাং এ কার্যের জন্য অত্যাচারীকে চরম দণ্ডদান করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করলাম। অনুশীলন-সমিতিই অপরাধীকে দণ্ডদান করবে।

আমরা স্থির করলাম যে, এ কার্যের জন্য দায়ী গর্ডন সাহেবকেই প্রাণদণ্ড দিতে হবে। বোমার আঘাতে নিহত করা হবে বলে ঠিক করা গেল। সিলেট জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লালমোহন দে-কে ঢাকায় ডেকে এনে সমস্ত কথা বললাম এবং তিনি সিলেট প্রত্যাবর্তন করলেন সমস্ত বন্দোবস্ত করার জন্য।

আমি তখন ঢাকা কলেজের মিনার্ভা হোস্টেলে থাকতাম। যোগীন্দ্র চক্রবর্তী সদ্য কারাদণ্ড ভোগ করে জেলের বাইরে এসে এই হোস্টেলেই আমাদের এক সভ্যের অতিথি হিসেবে থাকতেন। জেল-ফেরত আর গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে সমিতির কার্যে আত্মনিয়োগ করবার জন্যই তিনি থেকে গেলেন। তিনি খুব সাহসী কর্মী ছিলেন। তাঁকে আমি গর্ডনের কথা বলা মাত্রই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। স্থির করলাম যোগীন্দ্র চক্রবর্তীই এ কার্যের নেতৃত্ব করবেন। বোমা ছোঁড়বার জন্য কিভাবে প্রস্তুত হতে হয় এবং কি কি সাবধানতা অবলম্বন

করতে হয় তা তাঁকে শিখিয়ে দেওয়া হ'ল। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতা গিয়ে বোমা নিয়ে এলেন।

স্থির হ'ল যোগীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারাপ্রসন্ন বল এ কার্যের জন্য যাবেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এ কার্যে পাঠাবার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁকে অন্যত্র নিযুক্ত করার কথা ছিল।

আমি গেলাম ঢাকা রেলস্টেশনে ওঁদের গাড়ীতে তুলে দিতে। বিপদ ঘটলে, অর্থাৎ জানাজানি হয়ে গেলে তার প্রতিকারের জন্য আরও দু'তিনজন গিয়েছিল।

তখনই স্টেশনে ময়মনসিংহ থেকে আর একখানা ট্রেন এল, এবং তাতে এলেন অমৃত সরকার। তৎক্ষণাৎ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে অমৃত সরকারকে যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম।

নিরাপদে তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। কার্যোপলক্ষে কয়েক দিন কলকাতা থাকার পর যেদিন নরেন্দ্রমোহন সেন ফিরে এলেন, সেদিন স্টেশন থেকেই একখানা খবরের কাগজ হাতে করে এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার, কাকে কাকে পাঠিয়েছিলেন? এই দেখুন সংবাদ! খবর বেরিয়েছে Bomb outrage at Maulavi Bazar, Assassin killed (1917, March) (মৌলভী বাজারে বোমার আক্রমণ, আততায়ী নিহত—মার্চ, ১৯১৭)। নরেন-বাবুকে বিস্তারিত বললাম। তিনি কলকাতা যাওয়ার পূর্বেই এ কাজ অনুমোদন করে গিয়েছিলেন, কেবল কে কে যাবে তার নামের তালিকা তখনও ঠিক হয় নি।

যাই হোক, বিস্তারিত খবর জানবার জন্য ব্যস্ত হলাম। আর যারা গিয়েছিল তাদেরই বা কি হ'ল? কেউ গ্রেপ্তার হয় নি বলে আমাদের অনুমান হ'ল; তবে আহত হয়ত নিশ্চয় হয়েছে। এই সমস্ত ভেবে, খবর পাওয়ার জন্য ও আহতদের সেবার জন্য ঔষধ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি সহ নলিনী ঘোষ ও আর এক-জনকে সিলেটে পাঠান হ'ল। তারা গিয়ে কোন সন্ধান করতে না পেরে ফিরে এল।

কয়েকদিন চলে যাওয়ার পরও কোন সংবাদ পেলাম না। নানান দুশ্চিন্তায় যখন দিন কাটাচ্ছি সে অবস্থায় একদিন বিকেলবেলা শ্রীশ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় বসে আমরা কয়েকজন এ বিষয়েই আলোচনা করছি। এমনি সময় লালমোহন দে শুষ্কমুখে ক্লান্ত দেহে ঘরে ঢুকে সংবাদ দিলেন যে, অমৃত

সরকার ও তারাপ্রসন্ন দে খুব সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন এবং যোগীন্দ্র চক্রবর্তী নিহত হয়েছেন। তাঁরা সবাই নৌকায় আছেন। মৌলভীবাজার থেকে ঢাকা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ নৌকাতেই এসেছেন। কেবল সতর্কতা অবলম্বনের জন্য দু'বার নৌকা বদল করেছেন। আর বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ না করে তাঁকে স্নান করতে বললাম। শ্রীশবাবু আমার পিসতুত ভাই, তাঁর স্ত্রীকে (আমার বৌদি) জিজ্ঞেস করলাম ভাত আছে কিনা। তিনি বললেন —আছে। আহারাদির পর লালমোহন দে-কে সঙ্গে নিয়ে নদীর ঘাটে গেলাম।

সমস্যা হ'ল পুলিস ও জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে এমনি সাংঘাতিক আহতদের নৌকা থেকে নামিয়ে কিভাবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। স্থির করলাম সহরে কোন বাসায় না নিয়ে গিয়ে নদীর ঘাটেই পান্সী (বজরা) ভাড়া করে আহতদের রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। কিন্তু কথা হ'ল এই যে, আমরা যুবক, কোন গোয়েন্দা আমাদের চিনে ফেলতেও পারে। সুতরাং একজন বয়স্ক লোকের প্রয়োজন। এই কারণে ঢাকায় ইম্পিরিয়েল সেমিনারী স্কুলের শিক্ষক এবং আমাদের সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন ঘোষকে ডেকে আনলাম।

ঘাটে বাঁধা একটা পান্সীতে আহতদের তুলে নিলাম। আহত হওয়ার পর থেকে এক সপ্তাহেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে, এর মধ্যে ক্ষতস্থান ধোওয়া বা ঔষধ কিছুই দেওয়া হয় নি। আহতস্থান পচে দুর্গন্ধময় হয়েছে। নিকটে যাওয়া কঠিন। অমৃত সরকারের উরুতে ভয়ানক আঘাত লেগেছিল এবং সেখানে প্রকাণ্ড ক্ষত হয়েছিল। তারাপ্রসন্ন বলের সর্বশরীরে আঘাত লেগে ঘা হয়েছিল—সর্বাঙ্গে পিন আর লোহার টুকরো ফুটেছিল। এঁদের দু'জনেরই সমস্ত শরীরে চাপ চাপ হয়ে রক্ত জমা হয়েছিল। কিভাবে যে এঁরা এদ্দিন জীবিত ছিলেন তাই আশ্চর্য মনে হ'ল। এঁদের নিরাপদে রেখে কি করে বাঁচান যায় তাই আমাদের চিন্তা হ'ল। কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে এঁদের চিকিৎসা ও সেবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

চিকিৎসার জন্য আনলাম সমিতির বিশ্বাসভাজন সভ্য ও অকৃত্রিম সমর্থক চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস মহাশয়কে। তাঁর সুচিকিৎসায় অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বল ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কয়েক মাস পরেও তারাপ্রসন্নের শরীর থেকে পিন্ ও লোহার টুকরো অস্ত্রোপচার করে বার করা

হয়েছে। শুনেছি লর্ড হার্ডিঞ্জের শরীর থেকে তিন মাস পরেও পিন্ বার করতে হয়েছিল।

পান্‌সীতে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হলেন কয়েকজন বিশ্বাসী সভ্য—তার মধ্যে পুরাতন গৃহত্যাগী সভ্যও ছিল।

একসঙ্গে অনেক দিন থেকেও শুশ্রূষাকারীরাও কি ব্যাপার জানবার জন্য উৎসুক হয় নি বা আহতরাও কোন গল্প করে নি। নিষ্প্রয়োজনে কেউ কিছু জানতে পারল না।

দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর নিক্ষিপ্ত বোমা, ময়মনসিংহে ব্যবহৃত বোমা, এবং মৌলভীবাজারের বোমা, এ সমস্তেরই বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করেন সুরেশ দত্ত ও মণীন্দ্র নায়েক, আর আবরণ তৈরী করেন অমৃতলাল হাজরা।

মৌলভীবাজারে যা ঘটেছিল তা এবার বলছি। যোগীন্দ্র চক্রবর্তী নিলেন বোমা, অমৃত সরকার ও তারাপ্রসন্ন বলের হাতে রিভলবারসহ লালমোহন দে এদের ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। স্থির ছিল পথে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রফুল্ল রায় নামে একটি যুবক—মৌলভীবাজারেরই ছেলে অপেক্ষা করবে। কার্যনির্বাহের পর যোগীন্দ্রবাবুরা প্রফুল্লর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং সে যোগীন্দ্রবাবুদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।

খবর পাওয়া গেল ম্যাজিস্ট্রেট বাড়ী নেই—কোথাও গেছেন। তখন যোগীন্দ্রবাবুরা বাংলোর ঘেরাওর মধ্যে ঢুকে প্রবেশপথের একধারে ফুলগাছের আড়ালে বসতে যাবেন, এমন সময় হঠাৎ বোমাটি যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর হাত থেকে ফস্‌কে মাটিতে পড়ে যায়। প্রচণ্ড শব্দে বোমা ফেটে গেল। বিস্ফোরণের ফলে তিনজনই আঘাতের চোটে অনেক দূরে ছিটকে পড়ে। যোগীন্দ্র চক্রবর্তী তৎক্ষণাৎ মারা যায় এবং তাকে এ অবস্থায় দেখে অপর দু'জন ঐরূপ আহত অবস্থাতেই হামাগুড়ি দিয়ে বার হয়ে আসে। পরে লালমোহন দে এদের নৌকা করে খাল, বড় নদী মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা নদী প্রভৃতি কয়েক শত মাইল অতিক্রম করে ঢাকা শহরের সদরঘাটে এসে উপস্থিত হয়। পথে কোন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি! এমন অবস্থাও গেছে যখন মনে হয়েছে যে, আহতদের মৃত্যু বুঝি আসন্ন। সর্বোপরি পথে কয়েক জায়গায় জল-পুলিসের নৌকা ও ষ্টিমলঞ্চ এদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কোন সন্দেহের উদ্রেক না করায় অবশ্য ছেড়ে দিয়েছে।

সরকার যোগীন্দ্র চক্রবর্তীর মৃতদেহের ফটো তুলে খবরের কাগজ মারফত

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল—যে কেউ এই মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারবে—শুধুমাত্র নাম বললেই চলবে, তাকে পনের হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে এবং পুরস্কার প্রাপকের নাম গোপন রাখা হবে। কয়েক বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ-গোয়েন্দা এই মৃতদেহ কার তা জানতে পারে নি।

গর্ডন সাহেবকে গোপনে পাঞ্জাবে বদলী করা হ'ল। সেখানে (লাহোরে) আমাদের তরফ থেকে তার উপর পুনরায় বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু সেখানেও সে দৈবক্রমে বেঁচে যায়।

আমাদের দু'খানা পুস্তিকা (pamphlet) নিয়মিতরূপে প্রচারিত হ'ত—বাংলা ভাষায় 'স্বাধীন ভারত' নামে এবং ইংরেজীতে Liberty (লিবার্টি) নামে এবং সারা ভারতবর্ষে প্রচার সবই গোপনে হ'ত।

কলকাতার বর্তমান আমহার্স্ট রো'তে সুরেন্দ্র বসু নামে একজন অবস্থাপন্ন সম্মানিত ব্যক্তি আমাদের সমিতির বিশ্বাসভাজন গৃহী-সভ্য বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে অনেক সময় আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। তাঁর বাড়ীতে একটি ছাপাখানা ছিল। কালীপদ রায় নামে (প্রকৃত নাম উপেন্দ্র রায় চৌধুরী) একজন গৃহত্যাগী সভ্যকে এখানে নিযুক্ত করা হয়। তিনিই ছাপাখানার তত্ত্বাবধান করতেন। আমাদের সমস্ত গোপন পুস্তিকাদিই এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হ'ত। কালীপদবাবু রাজাবাজার বোমার মামলায় ধৃত হন। মোকদ্দমায় খালাস পান বটে, কিন্তু তাঁকে কারাগারেই পুনরায় অন্তরীণ করা হয়। মুক্তিলাভের পর তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে বহু বছর সমিতির কাজ করেছিলেন।

'স্বাধীন ভারত' সমস্ত বাংলা দেশে এবং 'লিবার্টি' সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতে একই তারিখে এবং একই সময়ে একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বিতরণ করা হ'ত। এতে সমিতির শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার পরীক্ষা হ'ত। সারা ভারতে একই দিনে 'লিবার্টি' প্রচারিত হওয়ায় সমিতির ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত এবং লোকের মনে সমিতির প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পেত। ফলে সমিতির সভ্যদের মনেও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হ'ত।

অনুশীলন-সমিতির মুখপত্র এই দু'খানা কাগজে সমিতির আদর্শ প্রচারিত হ'ত এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হ'ত।

'স্বাধীন ভারতে' নিয়মিত প্রধান লেখক ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ও মাঝে মাঝে লিখতেন। 'লিবার্টি' কাগজে মাঝে মাঝে লিখতেন রাসবিহারী বসু। এই কাগজেই তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিপূর্বে সমস্ত বিশ্বের রাজনীতি ও বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৈদেশিক ও সমর-নীতির পর্যালোচনা করেন এবং সকলকে আগতপ্রায় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেছিলেন, জার্মানী ও তার মিত্রবর্গের যুদ্ধ যে অনতিবিলম্বে ঘটবে তা অবশ্যম্ভাবী। পরাধীন জাতিগুলিকে এখন থেকে আগতপ্রায় যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এই দুটি সমিতির মুখপত্র ছাড়াও বিভিন্ন জেলায় সমিতির হাতে-লেখা কাগজ ছিল। সমিতির সভ্যরাই তাতে লিখতেন এবং সকলেই তা সমবেত বা পৃথক পৃথক ভাবে পাঠ করতেন।

কলকাতা থেকে বার হ'ত 'সাধক'। অনেক সভ্য ছাড়াও এ কাগজেও নলিনীকিশোর গুহই নিয়মিত লিখতেন এবং কাগজের তত্ত্বাবধান করতেন। এ কাগজের প্রচ্ছদপট আঁকতেন শ্রীযুক্ত অতুল বসু। তিনি তখন আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং অনুশীলন-সমিতির সভ্য। গুপ্ত-সমিতির কেন্দ্রে তিনি নিয়মিত আসতেন। বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি অন্যতম এবং বোধ হয় সমিতি গঠন ব্যাপারে বাড়ীর লোকের কার্যকলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটিয়েছে তার কথাই এখন বলব।

লাঙ্গলবন্দ গ্রামে এক ধনী গৃহে ডাকাতি হয়—অংশগ্রহণ করেন বীরেন চ্যাটার্জি, অমৃত সরকার, ললিত বাররী, তারাপ্রসন্ন দে, নলিনী ঘোষ প্রভৃতি। এ গ্রাম নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী হওয়ায় সাবধানতার জন্য দু'জন লোককে এক রাস্তার মোড়ে রিভলবার নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত রাখা হয়। তারা লোক যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল।

এই ডাকাতিতে প্রাপ্ত মাল—বিশেষ করে স্বর্ণালঙ্কার এবং বরিশাল বীরাঙ্গল গ্রামে ডাকাতিলব্ধ মাল ও হিসাবপত্র ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযামিনীমোহন দাশের উয়াড়ীস্থ বাসভবনে রাখা হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য জেলা থেকে প্রেরিত ত্রৈমাসিক বিবরণী এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্রও এ বাড়ীতে ছিল।

এই যামিনীমোহন দাশের বড় ছেলে সত্যেন্দ্রমোহন দাশ ও মেজ ছেলে গিরীন্দ্রমোহন দাশ সমিতির সভ্য ছিল। সত্যেন্দ্র অনেকদিন থেকেই সমিতির সভ্য, তা ছাড়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী। সুতরাং নিরাপদ মনে করে তার নামে

সমিতির গুপ্ত চিঠিপত্র আসত। গোয়েন্দাদের সন্দেহ না জন্মে এজন্য সত্যেন্দ্র সমিতির সভ্যদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করত না এবং নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে ধূমপান করত এবং খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ছেলেদের সঙ্গে মিশত। এটা আমরা ভালই মনে করতাম। এ প্রসঙ্গে ঢাকার প্রসিদ্ধ বিপ্লবী খগেন্দ্র চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। তিনিও ধূমপান করতেন এবং সমিতির ছেলেদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করতেন না, কেননা তাঁর নামে চিঠিপত্র আসত এবং তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকত। তিনি সমিতির বলপ্রয়োগের কাজেও পরে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ সব যথাস্থানে লিখব।

যদিও সত্যেন ও গিরীন দু' ভাইই সমিতির সভ্য, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির ফলে এক ভাই অপর ভাইয়ের সমিতির সভ্য হওয়ার খবর রাখত না। সে যাই হোক, যামিনী দাশ বদলী হয়ে ময়মনসিংহ সহরে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর পরিবার ঢাকাতেই থেকে গেল। একে মস্ত বড় বাড়ী তায় যামিনী দাশ অনুপস্থিত, আমাদের কিছুটা সুবিধে হ'ল। এ উপলক্ষ্যে কয়েকটা নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হয়। প্রথমত অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র একই বাড়ীতে রাখা হ'ল, দ্বিতীয়ত নিরাপদ বলে অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত স্থানে নামজাদা বিপ্লবীদের যাতায়াত চলল। অবশ্য সত্যেনের নামে চিঠিপত্র আসা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

একদিন দুপুরবেলা যামিনী দাশের বাড়ীর একটা ঘর বন্ধ করে রমেশ আচার্য ও আর একজন কিছু রিভলবার, পিস্তল মেরামত করছিলেন। যামিনী দাশের স্ত্রীর মনে কি কারণে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং গিরীন্দ্রের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে তার বাক্সে কি থাকে ইত্যাদি ব্যাপারের খোঁজ-খবরের জন্য স্বামীকে মিথ্যা তার করলেন সত্যেনের নাম দিয়ে—মা গুরুতর অসুস্থ শীঘ্র বাড়ী চলে এস (Mother seriously ill—come immediately)। বিচারালয়ে বসেই যামিনী দাশ এ তার পেয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে অবিলম্বে ঢাকা চলে এসে দেখেন তাঁর স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ। একান্তে ডেকে স্ত্রী যামিনী দাশকে তাঁর সন্দেহের কথা বললেন। যামিনী দাশ গিরীনকে তলব করে তাকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকে বললেন—"তোর বাক্স খোল তো, দেখব কি আছে?"

গিরীন চাবি খোঁজবার ছল করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে সোজা খগেন চৌধুরীর বাসায় এসে উপস্থিত হয়—চাবি অবশ্য তার সঙ্গেই ছিল। খবর পেয়ে আমি গেলাম। রমেশ চৌধুরী, মদন ভৌমিক, খগেন চৌধুরী প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথম মনে হ'ল গিরীনকে আর বাড়ী না পাঠিয়ে গৃহত্যাগ করিয়ে

গোপনে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু গিরীনের বাক্সে অনেক ডাকাতি-লব্ধ অলঙ্কার, সমিতির কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র আছে; এগুলি নিরাপদে সরিয়ে ফেলাই প্রথম কর্তব্য। ভাবলাম এগুলি ধরা পড়লে গিরীন কিংবা তার পিতার কারাদণ্ড অনিবার্য—যামিনী দাশের চাকুরি তো নিশ্চয়ই থাকবে না। যামিনী দাশ অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, সুতরাং সমস্ত ফলাফল তাঁর ভালভাবেই জানা আছে। সুতরাং তিনি এগুলি হয় আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হবেন, নয়ত নিজেই গোপনে নষ্ট করে ফেলবার ব্যবস্থা করবেন। চিন্তা হ'ল এই যে, কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লে বহু লোক গ্রেপ্তার হবে, ব্যাপক খানাতল্লাশি হবে, এবং সম্ভবত একটা যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাই হয়ত দায়ের করে ফেলবে। ভাবলাম যামিনীবাবু তাঁর বিশিষ্ট আত্মীয় এবং ঢাকার শ্রেষ্ঠ উকিল মহেন্দ্র রায়কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। তিনি একজন দেশপ্রেমিক, সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি ধরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেবেন না—তাছাড়া অন্যথা এই পরিবারেরই ঘোর বিপদ হতে পারে।

এই সমস্ত ভেবে গিরীনকে বলা হ'ল বাড়ী গিয়ে পিতাকে সব অবস্থা বুঝিয়ে বলে জিনিসগুলি ফিরিয়ে দিতে। জিনিসগুলি আনবার জন্য মদন ভৌমিক, রমেশ আচার্য আরও দু'একজন গিরীনের সঙ্গে গেল। আমিও সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের পশ্চাতে গেলাম।

যামিনী দাশ বা তাঁর স্ত্রী অটল। স্থানীয় কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শক্রমে যামিনী দাশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে খবর দিলেন। সদলবলে বড় বড় অফিসাররা এসে পড়ল। খানাতল্লাশি করে পুলিস সব মালপত্র নিয়ে গেল। সঙ্গে গিরীন ও মদন ভৌমিক গ্রেপ্তার হ'ল। পরে মোকদ্দমায় গিরীনের ছয় বছর কারাদণ্ড হয়েছিল, কিন্তু মদনবাবু মুক্তিলাভ করেন।

কাগজপত্র দেখে পুলিস ঢাকা ও বরিশাল জেলায় লোকের খোঁজ-খবর করতে লাগল। ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য গিরীন্দ্র দাশকে পীড়াপীড়ি করে অল্পে অল্পে ছয় মাসে পূর্ণ স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেয়।

ওদিকে বরিশালে সমিতির সভ্য রজনী দাশ তার ভগ্নিপতি জানকী দত্তের বাড়ীতে যায়। রজনীর পকেটে ছিল সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্র। এটি জানকী দত্তের চোখে পড়ে এবং তিনি তা গোপনে তুলে নিয়ে বরিশালের উকিল শ্যামাচরণ দত্তের হাতে দেন। তিনি জানকী দত্তকে বিষয়টা গোপন রাখতে

বলে রজনীকে নিয়ে ঢাকায় এসে একসঙ্গে এক হোস্টেলে থাকতে লাগলেন। প্রতিদিন কিছু কিছু করে রজনীর কাছ থেকে সংবাদ ও স্বীকারোক্তি আদায় করতে লাগলেন। কাজ সম্পূর্ণ হলে শ্যামাচরণ সোজা কলকাতা এসে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মচারী হাচিন্‌সন (Hatchinson) সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন—সরকার বলে যে, দেশের লোক বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কোন খবর সরকারকে দেয় না বা সাহায্য করে না। কিন্তু এই দেখ আমি কত সংবাদ নিয়ে এসেছি। শ্যামাচরণ তার পুরস্কার সম্বন্ধেও কথাবার্তা বলল।

অনুসন্ধানের জন্য সরকার গোয়েন্দা-ইন্‌স্পেক্টর কেদারেশ্বর চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করল। গিরীন দাশের বাড়িতে পাওয়া মাল এবং রজনী দাশের স্বীকারোক্তির মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য পাওয়া গেল।

বরিশালে আমরা চিঠি লিখতাম শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র ঘোষের নামে। কেননা তখন পর্যন্ত তিনি পুলিসের তেমন সন্দেহভাজন ছিলেন না। কিন্তু গোয়েন্দা তাঁর নামের চিঠিও গোপনে খুলে পড়তে আরম্ভ করল। পরে এগুলি আবার পিওনকে বিলি করার জন্য দিত। একবার এক প্যাকেট 'স্বাধীন ভারত' পুস্তিকা বিতরণের জন্য পাঠাই। পুলিস একখানা রেখে বাকীটা বিলির জন্য দেয়। একখানা যে কম—তা আমরা ভাবলাম যে হয়ত পাঠাবার সময়ই ভুল হয়ে থাকবে। নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিতরণের সময় পুলিস হাতে হাতে গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নি।

বরিশাল সহরে সমিতির একটা বোর্ডিং-হাউস ছিল। অবশ্য এটা যে সমিতির বোর্ডিং-হাউস তা খুব গোপন ছিল। এখানে শুধু সমিতির সভ্য ও সহানুভূতিশীল লোকেরাই থাকতে পারত।

এই বোর্ডিং-এ একজন জ্যোতিষীর আবির্ভাব হয়। ঢাকায় আমাদের কাছে সংবাদ এলে, একে জায়গা দেওয়ার কারণ খোঁজ করলে শুনতে পেলাম যে, ইনি নির্দোষ এবং একান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ায় একে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধরপাকড় হওয়ার পর জানতে পারলাম এ গোয়েন্দা কর্মচারী নিশিকান্ত চক্রবর্তী। কেদারেশ্বর চক্রবর্তীই একে তার সহকারীরূপে এখানে বসিয়েছে। নিশি চক্রবর্তী রাশি-চক্রের আকারে ঠিকুজি তৈরি করে তাতেই তার রিপোর্ট দিয়ে পুলিসের বড়কর্তার কাছে পেশ করত। নিশির সাহস ও কৃতিত্বের তারিফ না করে পারি নি। কেননা সামান্যতম সন্দেহ হলেও বিপ্লবীরা তাকে হত্যা করত।

যাই হোক, ঢাকা কেন্দ্রে বসেই আমরা সন্দেহ করতে লাগলাম যে, বরিশালেই দলের কেউ বিশ্বাসঘাতক হয়েছে। সমিতির জেলা-কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে প্রধান কেন্দ্রে নির্দেশের জন্য লিখলেন। নরেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে সন্দেহ না হয় এমন ভাষায় লিখে দিলাম যেন বিশ্বাসঘাতককে অবিলম্বে গুম-খুন করে ফেলা হয়। যথারীতি এই চিঠি দেবেন ঘোষের ঠিকানায় লেখা হয়। পুলিস ঐ পত্র পড়ে বিলির জন্য না দিয়ে সোজা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করল যে, অবিলম্বে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে। রজনীর প্রাণরক্ষার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। অবিলম্বে পুলিস ষ্টিমলঞ্চে একজন প্রহরীসহ রজনীর গ্রামে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে এনে বরিশাল জেলে একেবারে আলাদা করে রেখে দিল।

আমরা বুঝতে পারলাম যে, একটা ষড়যন্ত্র-মামলা দায়েরের আয়োজনই পূর্ণ হয়ে এল। যে কোন সময়েই এখন দেশব্যাপী গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাশি হয়ত সুরু হবে।

আমার মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শিখতে বিলেত যাই। প্রায়ই তিনি আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। মাত্র অল্পদিন পূর্বে আমার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়, ভাইয়েরা তখন বালক মাত্র—তা সত্ত্বেও তা ছাড়া তখনকার দিনে সমুদ্র-যাত্রা ছিল শাস্ত্রনিষিদ্ধ। যে যেত তাকে একঘরে হতে হ'ত। আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত-আমেরিকায় গিয়ে মূক-বধিরের শিক্ষাপ্রণালী শিখে এসে আমাদের দেশের পরম হিতকর কাজ করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁকে একঘরে হতে হয়েছিল। এমন কি তাঁর কলকাতা চলে আসার পরও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপরাধে মনোরঞ্জনবাবুকেও একঘরে হয়ে থাকতে হয়। আমার বোনের বিয়ের সময় মনোরঞ্জনবাবুর আত্মীয়রা জানিয়ে দিল যে, যামিনীবাবু এলে তারা এ কাজে যোগদান করবে না। সেই দিনেও মা'র প্রস্তাব শুনে অনেকে আশ্চর্য হয়েছিল। আমার মা গোঁড়া গুরুবংশীয়া কন্যা হলেও মামারা বিলেত-ফেরতদের বর্জন করার বিরোধী ছিলেন এবং এজন্য তাঁরাও বহুদিন সমাজবদ্ধ হয়েছিল।

যাই হোক, আমি প্রথমে রাজী হই নি, কেননা তখন ভাবলাম যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রায় সুরু হয়ে গিয়েছে। এমনি সময় আমার বিলেত গিয়ে বসে থাকা চলবে না। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম যে, বিদেশে গিয়েও

কিছু করা সম্ভব হবে, তখন যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে এবং পোশাক-আশাক তৈরীর জন্য ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা রওনা হলাম। কলকাতা এসে উঠলাম আমার আত্মীয় মূক-বধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। কেননা তিনিই আমার বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন।

প্রসঙ্গত বলছি যে, অন্যান্য বার কলকাতা এসে উঠতাম ১০নং বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেনের একটা ছাত্রাবাসে। এটা প্রধানত সমিতির লোক দ্বারাই পূর্ণ থাকত বলে কয়েক বছর এই ছাত্রাবাসটি সমিতির একটি প্রধান আড্ডায় পরিণত হয়েছিল।

কলকাতা এসেই সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অমৃত হাজরা (তাঁর নাম তখন শশাঙ্কবাবু) ও অন্যান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি তখন থাকতেন বাদুড়বাগান রো'র এক বস্তি-সংলগ্ন মাটির ঘরে।

এভাবে যখন তৈরী হচ্ছি তখন একদিন খুব সকালবেলা আমার এক আত্মীয় ঢাকা মেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে, ঢাকায় অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অনেকের বাড়ী খানাতল্লাশি হয়েছে। সরকার যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছে। আমার এবং আরও অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আমাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে আমাদের বাড়ী তল্লাশি করেছে, মনোরঞ্জনবাবু, খুল্লতাত আদিত্য গাঙ্গুলী তাঁদের বাড়ীও বাদ যায় নি। মা আমার খরচের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছে আমি যেন এই আত্মীয়ের সঙ্গে গিয়ে তাদের গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিন নিরাপদে থাকি। পরে নিরাপদ বোধে অন্যত্র গমন করি।

এর মধ্যে দৈনিক খবরের কাগজও এসে গেল। তাতে দেখলাম সব খবর। আমার নামের সংবাদ বেশ বড় বড় হরফে ছাপান, যাতে সহসা আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সতর্ক হতে পারি।

অবিলম্বে শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব বলে জানালাম সেদিন সন্ধ্যাতেই ওর সঙ্গে থাকতে আসব। যামিনীবাবুর বাড়ী ফিরে বললাম, সন্ধ্যার পরই আমার আত্মীয়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে ফিরে যাব।

বেশীক্ষণ তাঁর বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে সারাদিন বাইরে বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর কিছু আহারাদি করে আমার আত্মীয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কিছুদূর এসে যখন আমার আত্মীয় জ্ঞান চক্রবর্তীকে বললাম যে,

তিনি ফিরে যান, আমি যাব না; তখন তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। কোন অনুনয়েই কাজ হ'ল না দেখে তাঁর চোখে জল এসে গেল। বললেন, তোমাকে ঠাঁই দিতে গিয়ে যদি পুলিসের কাছে লাঞ্ছনা ভোগও করতে হয় তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। এভাবে তোমায় ফেলে গিয়ে তোমার মায়ের সামনে কি করে মুখ দেখাব! আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, তাঁর কোন ভয় নেই। মা সবই জানেন। শুধু তিনি যেন টাকা চেয়ে পাঠালে তা নির্দিষ্ট লোকের হাত মারফৎ পাঠিয়ে দেন এবং ভয় না পান। জ্ঞানবাবু চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্টেশনের দিকে গেলেন আর আমি বাদুড়বাগানের বস্তির দিকে পা বাড়ালাম।

আমাদের এই বস্তির ঘরখানা একটি বড় বাড়ীর মাঝ-অংশের একটি ছোট ঘর। রাস্তার সামনে দরজা এবং খুব ছোট্ট একটি জানালার মত। আমাদের ডান পাশের ঘরে থাকত বাড়ীউলীর ছেলে, গুলিখোর এবং ঐ ঘরটা একটা গুলির আড্ডাই ছিল। বাঁ দিকের ঘরে থাকত বাড়ীউলীর এক যুবতী মেয়ে। স্বামীর ঘরে যেত না। যাকে বলে হাফ্ গেরস্তের মত থাকত। আর ছিল ঐ গুলিখোরের বালিকা বধূ। চারদিকের পরিবেশ ছিল নোংরা। সমস্ত বস্তি-বাসীর জন্য মাত্র একটি কল ও চৌবাচ্চা। পায়খানার বন্দোবস্তও তথৈবচ। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, যেখানে ময়মনসিংহের সুষুঙ্গের মহারাজা বাস করতেন। বর্তমানে এ বাড়ীতে প্রবাসী অফিস।

আমাদের পক্ষে এ বাড়ী মন্দ ছিল না। সুকিয়া স্ট্রীটের থানা খুব কাছে থাকায় গুলিখোরের আড্ডায় হানা দিতে পুলিস মাঝে মাঝে আসত। কখনও কখনও আমাদের ঘরেও ঢুকে পড়ত। আর একটা মুস্কিল হ'ত ঐ মেয়েটির কাছে যারা আসত তারা রাত্রিতে ভুল ক'রে আমাদের ঘরের দরজায় টোকা দিত। ভয় হ'ত আমাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিস না কি!

শশাঙ্কবাবু এক সামান্য লোহার দোকানে হাতুড়ি পেটানর কাজ করতেন। ওখানে তিনি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। প্রথমে বস্তির লোকেরা আমাদের আসল রূপ জানত না। পরে যখন ধরপাকড় সুরু হয় এবং আমাদের ঘর খানাতল্লাশি করে এবং আমাদের সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের জন্য পুলিসের আনাগোনা হতে থাকে, তখন এরা আমাদের স্বরূপ চিনতে পেরেও পুলিসকে কোন সংবাদ দেয় নি। আমাদের সনাক্ত করার জন্য এবং বোমার মামলায় সরকার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অনেক লোভ ও ভয়

দেখিয়েও এই মূর্খ, দরিদ্র, মেহনতী বস্তিবাসীদের রাজী করাতে পারে নি। আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে এসেও এরা আমাদের চিনতে পারিনি বলে কবুল করেছে।

শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে আমরাও আহার করতাম পঞ্চানন ঘোষাল লেনের একটা বস্তির দরিদ্র হোটেলে। শশাঙ্কবাবুকে অনুকরণ করে আমরাও হোটেলের মালিককে গিন্নীমা বলে ডাকতাম। খাওয়া খারাপ এবং পরিবেশ নোংরা। কিন্তু তবুও আমরা সেখানে খাওয়াই পছন্দ করতাম, কারণ গিন্নীমা ছিলেন অতি ভাল মানুষ এবং মাত্র দু'আনা পয়সায় একবেলা খাওয়া হ'ত। অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোকই সেখানে যেত যারা খাইখরচা চালিয়ে আবার পরিবার প্রতি-পালনের জন্য দেশে টাকা পাঠাত। পুলিসের হাতে শত লাঞ্ছনা অত্যাচারেও গিন্নীমা, ঝি, গাঁজাখোর পাচক ঠাকুর, কেউই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় নি!

যে প্রসঙ্গে এত কথা বললাম তা হ'ল, কিভাবে বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা (Conspiracy to wage war against the King-Emperor and to deprive His Majesty of the Sovereignty of British India) দায়ের হ'ল। এই অভিযোগে বহুলোক গ্রেপ্তার হ'ল। এঁদের মধ্যে আছেন নরেন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, যতীন্দ্রনাথ রায় (ফেগু রায়), মণীন্দ্রভূষণ রায়, বুইরা (বোস), দাশগুপ্ত (ভগবান কবিরাজের নাতি), হেমেন্দ্র মুখোটি, নলিনীরঞ্জন মিত্র, দেবেন্দ্র ঘোষ এবং আরও অনেকে। ত্রৈলোক্যবাবু নাটোর থেকে, ঢাকা থেকে রমেশ চৌধুরী, খগেন চৌধুরী ও মদন ভৌমিক এসে উঠলেন এই বস্তির ঘরে ফেরারী হয়ে—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় করে।

সে সময়ে সমিতির প্রসার এবং বিভিন্ন দিকে কাজ খুব দ্রুত আরম্ভ হয়েছিল। তখন চন্দননগরের মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ ও তাঁদের অনুগামী সকলের সঙ্গে আমরা একেবারে এক সংস্থা (organisation) হয়ে পড়েছি। তার ফলে সংগঠনের আকার ও কাজকর্ম বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা ছাড়া, অন্যান্য প্রদেশের উপরও সমিতির প্রভাব প্রসারের জন্য আমরা পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, সমিতির প্রধান কেন্দ্র কলকাতায় স্থাপিত করতে হবে। তখন কলকাতায় আমি, ত্রৈলোক্যবাবু, রবীন্দ্রমোহন সেন, নলিনী-কিশোর গুহ, শশাঙ্কবাবু এবং আরও অনেক গৃহত্যাগী সভ্য স্থায়িভাবে কলকাতায় আছি। সুতরাং চারদিকের নানা রকমের কাজ চালাতে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

অথচ পূর্ববঙ্গই সমিতির প্রাণ-কেন্দ্র এবং কাজকর্মও সেখানে খুব বেশী। অর্থ ও লোক সংগ্রহ সেখানেই প্রধান এবং সমিতির অস্ত্রশস্ত্রও সেখানেই রাখতে হয়। সুতরাং সেখানকার ভার প্রধান পরিচালকদের মধ্যেই একজনকে নিতে হবে। ত্রৈলোক্যবাবুও অনেক পূর্বেই পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন; গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হওয়ার পর আমিও আর সেখানে স্থায়িভাবে থাকতে পারি না---মাঝে মাঝে যেতে পারি মাত্র। সুতরাং রমেশ চৌধুরীকেই কার্য পরিচালনার জন্য পূর্ববঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। তাঁর গ্রেপ্তারের পর পূর্ববঙ্গের ভার যাতে সুদক্ষ হস্তে অর্পিত হয় এজন্য রমেশ চৌধুরীর সহকারী হলেন অনুকূল চক্রবর্তী।

ত্রৈলোক্যবাবুকে কলকাতা থেকেই প্রধানত কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং নলিনীকান্ত ঘোষকে চট্টগ্রাম পরিচালনার কার্য থেকে সরিয়ে এনে উত্তরবঙ্গের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়—তাঁর কর্মদক্ষতা দেখে। এভাবেই আমরা উপযুক্ত দক্ষ-সভ্যদের নানা কাজ ও দায়িত্বের মধ্য দিয়ে ছোট থেকে ক্রমে বৃহত্তর দায়িত্বে নিয়োগ করতাম, যাতে ভবিষ্যতে তারা একদিন সমস্ত সংস্থার দায়িত্ব বহনে সমর্থ হয়।

খগেন চৌধুরীকে পাঠান হ'ল হুগলী জেলায় ভাসতারা গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক করে, অবশ্য ভিন্ন নামে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেখিয়ে।

মদন ভৌমিক ঢাকা সহরে সংগঠনের কাজ করতেন এবং ঢাকা প্রধান কেন্দ্রের কাজ ও নারায়ণগঞ্জের বারদী অঞ্চলের অনেক কাজকর্ম দেখতেন। তিনি সমিতির পুরাতন সভ্য এবং দক্ষতার গুণে প্রথম পংক্তিভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভার দিয়ে যশোহর জেলার ডিঙি বাকরার এক গ্রামে সমিতির সভ্য জনৈক কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে পাঠান হ'ল। সে বাড়ীতে তিনি কবিরাজী-শিক্ষার্থী ছাত্র পরিচয়ে থাকতেন। স্থির হয় যে, তিনি প্রথমে সেখান থেকে খুলনা সহর, দৌলতপুর ও যশোহরে সমিতির প্রসার করে পরে অন্যত্র যাবেন। সেখানে তাঁর কয়েক মাস কাজ-কর্মের পর আমি সেখানে যাই পরিদর্শনের জন্য। মদনবাবুর ভ্রাতা পরিচয়েই আমি কবিরাজ মহাশয়ের ওখানে গিয়ে উঠি—অবশ্য তিনি সবই জানতেন। মদনবাবু আমাকে নিয়ে খুলনা, দৌলতপুর কলেজের ছাত্রাবাস, যশোহর সহর এবং ঝিনাইদহ প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়ে সমিতির কাজ কিভাবে আরম্ভ হয়েছে

তা দেখালেন। যশোহরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাঁকে বেশ ভুগতে হয়। সেই অসুস্থ শরীরেই এবং থাকা-খাওয়ার স্থানের অসুবিধার মধ্যেও তাঁকে কাজকর্ম করতে হয়েছে। সর্বোপরি অসুবিধা হ'ল যে, তখনও যশোহর-খুলনা অঞ্চল বিপ্লব আন্দোলনের দিক দিয়ে অগ্রসর ছিল না। এখানেও তাঁর কাজকর্ম কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

দৌলতপুর সমিতির কার্য পরিদর্শন করতে গিয়ে যে সব ছাত্র-সভ্যের সঙ্গে আমার দেখা হয় তাদের মধ্যে ছিলেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। এর আগে কলকাতা থাকার সময়ও তিনি সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি অনুশীলন-সমিতি পরিত্যাগ করে অন্য দলভুক্ত হন। গ্রেপ্তারের পর তিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। কারণ তাঁকে ওয়াই শ্রেণী (Y Class) অর্থাৎ কম বিপজ্জনক (Less dangerous) স্টেট প্রিসনার (State Prisoner) করে; এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি বলেন যে, পাছে পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে না পারেন তার জন্যই এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা যে, স্বীকারোক্তি করে অনুশোচনার ফলেই তাঁর এই চেষ্টা।

কলকাতায় পলাতক ও গৃহত্যাগী সভ্যের সংখ্যা খুব বেড়ে গেল। একই বাড়ীতে থাকলে সব নেতৃস্থানীয়দের একসঙ্গে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় সবাই ছড়িয়ে থাকতে লাগল বন্ধু-বান্ধবের মেস, হোস্টেল, বাড়ীতে। আমারও ভোজন যত্রতত্র। এক বাড়ীতে দু-তিন রাত্রির বেশী কাটাই নি। এ প্রসঙ্গে তারিণী চৌধুরী, উপেন গুপ্ত প্রভৃতির নাম খুব মনে আছে। আমি যখন ঢাকায় মিনার্ভা হোস্টেলে থাকতাম তখন তিনি সেখানে থেকে এম. এস-সি. পড়তেন। পরে বোধ হয় তিনি মেদিনীপুর কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ঢাকার মিনার্ভা হোস্টেলের ছাত্রাবাস আমি পছন্দ করেছিলাম এই কারণে, যেন সমিতির পরিচিত সভ্য বা লোক না থাকে। কিন্তু প্রথমেই সাক্ষাৎ হয়েছিল সমিতির সভ্য হেমেন্দ্র রায়ের সঙ্গে, তিনি তখন এম. এস-সি. পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হ'ল। সকলেই সাগ্রহে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছে। এই হোস্টেলের অনেককেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিনি কিন্তু অনেককেই অনেক বিষয়ে বিশ্বাস করতে পারতাম।

মিনার্ভা হোস্টেল প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদারের কথা বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি তখন এম এ. পাস করে 'ল' ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য

তৈরী হচ্ছিলেন। তিনিই ছিলেন হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। একে তো তিনি মিশুক-প্রকৃতির ছিলেন না, তা ছাড়া অনেকেরই তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা থাকায় আমিও তাঁর সঙ্গে বেশী মিশতাম না। কিন্তু তিনি আমায় আমার একান্ত অজ্ঞাতে হোস্টেলের খাতায় অনুপস্থিত লিখতেন না। বছরের শেষে যখন সবাই হোস্টেলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি আমায় তাঁর ঘরে ডেকে দরজা বন্ধ করে সব বলে বললেন—কি জানি অনুপস্থিত লিখলে হয়ত ক্ষতি হতে পারে, আর উপস্থিত লেখাতে সাহায্য হতে পারে। হয়েছিলও তাই। বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলায় রাজসাক্ষীদের বিবরণ অনেক মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল। নানা বলপ্রয়োগের কাজে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে যোগদান করেছি, কিন্তু হোস্টেলে উপস্থিত লেখা থাকার ফলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পলাতক অবস্থায় একদিন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে তিনি নিজেই রাস্তায় দেখতে পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে কত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এসে বলছি যে, আমার নামে ওয়ারেণ্ট বের হয় ১৯১৩ সালের এপ্রিল কি মে মাসে। বিভিন্ন স্থানে থাকবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে স্থির করলাম যে, বরিশাল মামলার আর একজন পলাতক যতীন ঘোষ ও আমি থাকব বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেনের মেসবাড়ীতে। গ্রীষ্মের বন্ধে ওটা তখন খালি। লিজের (Lease) মেয়াদ শেষ না হওয়ায় মালিক তখনও দখল করেনি।

প্রথম দিনই দুপুরবেলা স্টোভে রান্না করে খেয়ে একই বিছানায় শুয়ে কথা বলতে বলতে কেমন করে জানি না, ঘুমিয়ে পড়লাম। সাধারণত দিনের বেলা ঘুমাই না। হঠাৎ তিন-চারজন লোকের কথায় ঘুম ভেঙে গেল। চোখ না খুলেই আগে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। সন্দেহ হ'ল এরা পুলিসের লোক। একবার সামান্য চোখ খুলে দেখলাম পুলিসের নয়, সাধারণ ভদ্রলোকের পোশাকে এসেছে। যতীন ঘোষের সঙ্গে কথা বলছে, আবার বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে যেন কাকে কি বলছে।

এরা যে পুলিসের লোক তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি আমার জন্য এসে থাকে তবে আমারই উঠে এদের সঙ্গে কথা বলে গ্রেপ্তার বরণ করে যতীন ঘোষকে রক্ষা করা উচিত হবে। পরন্তু ওর জন্য এসে থাকলে তারই এগিয়ে যাওয়া উচিত। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে আস্তে জিজ্ঞাসা

করলাম—কার জন্য এসেছে? চুপ, আমার জন্য। চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কি করা যায়!

আগন্তুকটি স্বয়ং গোয়েন্দা ডেপুটি-সুপার কেদারেশ্বর চক্রবর্তী। নাম জিজ্ঞাসা করলেন যতীন ঘোষকে; সে অপর এক নাম বলল। পুনরায় চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করল—আপনার নাম যতীন ঘোষ? সে তখনও অস্বীকার করলে বাইরের লোকটিকে ডেকে ভিতরে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো এই যতীন ঘোষ কি না! এই ভদ্রলোক যতীনেরই আপন মামা। আগের দিন রাতে যতীন ঘোষ একবার তাদের বাড়ী গিয়েছিল। পুলিস সেখান থেকেই খবর নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, অনেকদিন দেখি নি, তবে সে রকম চেহারাই বটে। তখন কেদারেশ্বরবাবু যতীনকে বলল, আমাদের সঙ্গে আপনাকে একটু যেতে হবে। যতীন গ্রেপ্তার হ'ল।

আমিও তক্ষুণি গা মোড়ামুড়ি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে—যেন এই মাত্র ঘুম ভাঙল, গামছা কাঁধে নীচের তলায় গেলাম। কোন লোক না দেখে একটু অবাক হলাম, মনে একটু আশাও হ'ল। তাই সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কয়েকজন পুলিস প্রহরী দেখে ফিরে এসে বাড়ীর চারদিক লক্ষ্য করে দেখলাম পালাবার কোন পথই নেই। সুতরাং কলতলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখ হাত-পা ধুতে লাগলাম। হঠাৎ কেদারেশ্বরবাবুর আবির্ভাব। জিজ্ঞাসা করল, এখানে পায়খানা কোথায় মশাই? দুর্জনকে দূরে রাখাই সঙ্গত মনে করে বললাম, পায়খানা তো এখানে নেই। উপরে আছে।

কেদারবাবু মুখ ঘুরিয়ে রাগত স্বরে যেন কাকে বলল, কোথায় পায়খানা? এখানে তো নেই! তখন দেখি যতীন ঘোষ এগিয়ে এসে বলল, ঐ যে ঐখানে।

আমি ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কি জানি আজই মাত্র এসেছি। এত বড় বাড়ী; কোথায় কি ঠিক জানি নে।

আমি আবার উপরে উঠে গিয়ে দেখলাম ঘর-তল্লাশি হয় নি। তাড়াতাড়িতে দু'একখানা বই ও সমিতিসংক্রান্ত কাগজ-পত্র সরিয়ে উপরের পায়খানায় গিয়ে বসলাম। হঠাৎ মনে হ'ল ভুল করলাম তো! আমার ওদের কাছেই থাকা উচিত ছিল। যতীনের কাছে যদি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে তবে অবশ্য সে আমার অন্য নাম বলবে, কিন্তু পরে যদি আবার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে তো নাম মিলবে না এবং সন্দেহ হলে আমাকেও

গ্রেপ্তার করবে। এই সমস্ত ভাবছি, তক্ষুণি বাইরে থেকে ডাক শুনতে পেলাম —চক্রবর্তী মশায়, ও চক্রবর্তী মশাই! যাক্, পদবীটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম। বাইরে এসে খুব বিনীতভাবে বললাম, আমায় ডাকছেন! কেদারেশ্বর চক্রবর্তী পকেট থেকে নোটবই বার করে বললেন, হ্যাঁ, আপনার নাম?

—সুবোধচন্দ্র চক্রবর্তী।

—পিতার নাম?

—৺ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী।

—নিবাস?

—বেতকা। বিক্রমপুর।

—এখানে কবে এবং কেন এসেছেন?

—সম্প্রতি কয়েকদিন এসেছি। ইদানীং পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। হাইকোর্টে একটা মামলা আছে। আমাকেই সেজন্য আসতে হয়েছে।

—এ বাড়ীতে কি করে এলেন? আর তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না?

আমি একজনের নাম করে বললাম, এর অতিথি হিসাবে আছি। সে ছুটিতে গেছে, তাই আমি একা। বাড়ী ভাড়া দিতে হয় না, কারণ লিজ এখনও ফুরোয় নি। আমি প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলাম কেদারেশ্বরবাবু বলবে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে। কিন্তু সে যখন হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললে, এখন যাই, আপনাকে কষ্ট দিলাম, তখন অবাক্ না হয়ে পারলাম না। আমিও যথাযথ বিনয় নম্র হয়ে বললাম—নমস্কার।

কেদারেশ্বর চক্রবর্তী লোকজন নিয়ে চলে যাওয়া মাত্র আমিও দরজা বন্ধ করে অতি সন্তর্পণে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলাম। পেছনটা ভাল করে দেখে নিয়ে এ-গলি সে-গলি ঘুরে বাদুড়বাগান লেনে শশাঙ্কবাবুর ঘরে গিয়ে উঠলাম। সব শুনে বিচক্ষণ গোয়েন্দার হাতে পড়েও গ্রেপ্তার না হওয়ায় সকলে অবাক্ হ'ল।

রতিলাল গোয়েন্দা হত্যার পর ত্রৈলোক্যবাবু উত্তরবঙ্গে গিয়ে সমিতির গঠনমূলক কাজ করেন। তিনি সে কাজ পরিদর্শনের প্রস্তাব করলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে নাটোর গিয়ে উঠলাম শ্রীশবাবুর বাড়ী। প্রভাস লাহিড়ী, নরেন ভট্টাচার্য তখন সমিতির সভ্য। এরা পরে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রভাস গৌহাটির খণ্ডযুদ্ধে আহত হয়। সেখান থেকে পাটুল গ্রামে গিয়ে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী সভ্য কালী মৈত্রের বাড়ীতে যাই।

দিনাজপুর গিয়ে সেখানকার জিলা-পরিচালক অশ্বিনী মাস্টারের সঙ্গে আলাপ হয় এবং সমিতির বিশিষ্ট উৎসাহী সভ্য দু'ভাই প্রফুল্ল বিশ্বাস ও প্রবোধ বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচিত হই। এদের দুজনেরই তখন বয়স খুব কম। দুজনেই পরবর্তী কালে গৃহত্যাগী সভ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়। প্রবোধও গৌহাটির খণ্ডযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

পূর্ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় মালদহের কাজ খুব ভালভাবেই চলছিল। সেখানে বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন হংসগোপাল আগরওয়ালা। তাঁর কাজ দেখে স্থির করলাম তাঁকে আরও বড় জায়গার ভার দিতে হবে। পরে তাঁকে কুমিল্লায় পাঠান হয় সেখানকার ভার দিয়ে। তার পর ঢাকা জেলার চার্জও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমিতির কাজ করতে গিয়ে নাম পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে অনেকেই। ত্রৈলোক্যবাবু বহুদিন কালীচরণ নামে পরিচিত ছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার ওয়ারেণ্ট বার হওয়ার পরই তিনি এ নাম গ্রহণ করেন। খুব বড় দাড়ি রাখতেন এবং নৌকার মাঝিরূপেও তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সুতরাং কালীচরণ নামটা কোন অবস্থাতেই তার বেমানান হ'ত না। যাই হোক, তিনি উত্তরবঙ্গে এলেন দাড়ি কামিয়ে বিরজাকান্ত নাম গ্রহণ করে।

ত্রৈলোক্যবাবু সম্বন্ধে একটা কথা অনেক পূর্বেই উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। তাঁর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগের প্রায় বছর দেড়েক আগে ময়মনসিংহ সরিষাবাড়ী স্থয়াইকর গ্রামে এক ডাকাতি হয়। ডাকাতির পর বিপ্লবীরা যখন নানা দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে তখন ত্রৈলোক্যবাবু, গিরীন্দ্র ভট্টাচার্য, শশধরবাবু ও আরও দুজনের দলটি রাস্তায় পুলিস ও গ্রামবাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। এরা তখন চতুর্দিকে ছুটতে আরম্ভ করে। চারজন পালাতে সক্ষম হয়। গিরীন্দ্র হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়। তার নামে ডাকাতির মামলা রুজু হয় এবং সেসন পর্যন্ত যায়। কিন্তু বিচারে সে মুক্তিলাভ করে। এদিকে ত্রৈলোক্যবাবু একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় সরিষাবাড়ী থেকে মাণিকগঞ্জ, প্রায় আশী মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। এজন্য আমরা সবাই খুব আশ্চর্যান্বিত হই।

উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গে সমিতির কার্য পরিদর্শনে যাই। প্রথমে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে গভীর রাত্রিতে মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করি—এবং স্থির হয় যে, তিনি সকলকে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ পরিত্যাগ করে ঢাকায় বাসা করবেন। তিনি আমাকে পলাতক অবস্থায় ঘোরাফেরার জন্য কিছু অর্থ দিয়ে বললেন—নিজের কর্তব্য কাজ করে যেও; আমাদের জন্য কোন চিন্তা কর না। কেবল বেঁচে আছ এ খবরটা মাঝে মাঝে জানিও। আর কোন সংবাদ জানাবার প্রয়োজন নেই। চিঠি লিখবার দরকার নেই; লোক মারফত খবর পেলেই চলবে। সমিতির ছেলেরা তো সর্বদাই আসে আমার কাছে। পরে আশীর্বাদ করে বললেন—যেন ব্রত সফল হয়। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বার বার বললেন। কারণ উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনের পর ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়ে প্রায় এক বছর কষ্ট পাই। জ্বরটা আসত সাধারণত সকাল বেলা। প্রথমেই ১০৫° জ্বর ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হ'ত। ভীষণ শীত আর কাঁপুনিতে হাড় যেন আল্‌গা হয়ে যেত। সন্ধ্যা নাগাদ যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন খুব দুর্বল হয়ে পড়তাম।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সমিতির বলপ্রয়োগ বিভাগের পরিচালন ভার ছিল ত্রৈলোক্যবাবুর উপর। কিন্তু তাঁর পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগের পর এ ভার ন্যস্ত হয় অমৃত সরকার ও বীরেন্দ্র চ্যাটার্জির উপর। সেই সময়ের একটা ঘটনা যা সমিতির আদর্শ ও আত্মোৎসর্গের মহিমাকে অনেক উঁচুতে তুলতে সহায়ক হয়েছিল, তা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার গৃহত্যাগের পূর্বেই এ ব্যাপার সংঘটিত হয়।

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত ধুলদিয়াতে একটা ডাকাতির পরিকল্পনা হয়। আমি তখন ঢাকায়। যে সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে এই পরিকল্পনা রচিত হয় তা অনুসন্ধান করে এবং রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে এ কাজ অনুমোদন করি। ত্রৈলোক্যবাবু উপস্থিত না থাকলেও অমৃত সরকার ও বীরেন্দ্র চ্যাটার্জির মত কৃতী লোকের পরিচালনায় আমাদের সবিশেষ আস্থা ছিল। আদিত্য দত্ত, কৃষ্ট সাহা প্রভৃতি আরও অনেকের যাওয়া ঠিক হয়।

ডাকাতি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরাও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রান্ত বাড়ী ঘিরে ফেলল। দু'পক্ষেই বন্দুক চলতে লাগল। সিন্দুক ভেঙে দেখা গেল এমন অপর্যাপ্ত ধনরত্ন আমরা খুব কম জায়গাতেই পেয়েছি; কিন্তু হঠাৎ

সমিতির সভ্য যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যের হস্তস্থিত রিভলবারের গুলী অমৃত সরকারের পা বিদ্ধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন বীরেন চ্যাটার্জি। তাকে এ ভার অর্পণ করে অমৃত সরকার বলেন, এত টাকা কোথাও পাওয়া যায় নি। এ টাকায় সমিতির অনেক কাজ হবে। আপনারা আমার মাথাটা কেটে নিয়ে যান যাতে শরীরটা সনাক্ত না হতে পারে, আমাকে রক্ষার কোন চেষ্টা না করে টাকাটা নিয়ে চলে যান।

বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি বললেন, টাকা তুচ্ছ, এমন মানুষকে আমরা মরতে দেব না। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক ভাঙ্গা, টাকা সংগ্রহ সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিলেন। চারদিকে ভালভাবে বন্দুকধারী প্রহরার ব্যবস্থা করে নিকটবর্তী একটা বাঁশ-ঝাড় থেকে কয়েকটা বাঁশ কাটিয়ে আনিয়ে অমৃত সরকারকে বহন করার জন্য একটা স্ট্রেচার তৈরি করালেন। এদিকে উভয় পক্ষে গুলী সমানভাবেই চলেছে।

এই গুলী-বর্ষণের মধ্যেই স্ট্রেচারে শায়িত অমৃত সরকারকে ঘিরে সকলে বাধাদানকারী জনতা ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগল। অপর পক্ষ থেকে বর্শাও নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। ওপক্ষ আর বেশীদূর এগিয়ে এল না। বিপ্লবীরা অনেক দূর গিয়ে এক জায়গায় থেমে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এবং অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে একদল অমৃত সরকারকে নিয়ে লোকের সন্দেহ এড়িয়ে চলতে সুরু করল। সাময়িকভাবে নানা জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। রাত্রিতে কখনও কখনও গোয়াল ঘরে থাকতে হয়েছে। লোকের কৌতূহল মেটাতে হয়েছে, স্থানে স্থানে পুলিসের নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। এভাবে প্রায় আশী মাইল পথ অতিক্রম করে গৌরীপুর পৌছে চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ঢাকায় সংবাদ পাঠানো মাত্র চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাসকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। তাঁর সুচিকিৎসায় অমৃত সরকার নিরাময় হয়ে উঠলেন।

অর্থলোভ পরিত্যাগ করে অমৃত সরকারের জীবন এভাবে রক্ষা করার জন্য বীরেন্দ্র চ্যাটার্জির এ কাজ আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করলাম এবং এর পেছনে তার কৃতিত্বের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করলাম।

এর সমসাময়িক আরও দুটো ঘটনার উল্লেখ করছি। ফরিদপুর-নিবাসী লালমোহন গুহ মেদিনীপুর ডেপুটি পুলিস সুপার হিসেবে বিপ্লবীদের উপর অত্যাচার করে কুখ্যাত হয়। প্রহরীবেষ্টিত হয়ে সে বাড়ী এসেছে খবর

পেয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য লোক পাঠান হয়। কিন্তু তারা কৃতকার্য না হয়ে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় ঘটনা গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টর শরৎ ঘোষের, যে পূর্বে একবার গুলীবিদ্ধ হয়েও বেঁচে যায়। তার বরিশাল আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্র চরম দণ্ডদানের জন্য যাদের পাঠানোর ব্যবস্থা হয় তার মধ্যে ছিল বরিশাল-নিবাসী মতিলাল বিশ্বাস। কিন্তু কাজের জন্য যখন তারা বরিশাল শহরের এক বাড়ী থেকে বেরুতে যাবে, সেই সময় মতি বিশ্বাসের হাতে অটোমেটিক পিস্তলের গুলী তার কোমর বিদ্ধ করে। এই গুলী তার আরোগ্যলাভের পরও কোমরেই থেকে যায়। ফলে শরৎ ঘোষের উপর আক্রমণ হয় নি।

এদিকে মতি বিশ্বাস সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পূর্বেই তার সমিতির কর্মস্থল ময়মনসিংহ শহরের জন্য রওনা হয়। নারায়ণগঞ্জ আসবার পথে মেঘনা নদীর মাঝখানে মতি বিশ্বাস চলন্ত বরিশাল ষ্টিমার থেকে পড়ে যায়। সে পড়ে সম্মুখভাগে। সুতরাং চাকার তলায় নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কায় গভীর জলে ডুব দিয়ে ষ্টিমারের তলা দিয়ে অপরদিকে জলের উপর ভেসে ওঠে। ষ্টিমার অবশ্য থেমে তাকে উদ্ধার করে জল থেকে।

ময়মনসিংহ শহরের কার্যভার তখন তার উপরই ন্যস্ত ছিল এবং যুবকমহলে সব চাইতে বেশী প্রভাবশালী ছিল। পরে সমগ্র জেলার কার্যভারও কিছুদিনের জন্য তার উপর অর্পিত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমি পূর্ববঙ্গে সমিতির কাজ পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছিলাম। গোয়েন্দাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে চিনত না। দু-তিন জন যারা চিনত আমিও তাদের চিনতাম। সুতরাং চলাফেরায় সতর্কতা অবলম্বনের কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। তা ছাড়া আমি বিলেত যাওয়ার জন্য কলিকাতা গিয়ে আর ফিরে আসিনি। এই সুযোগে বাড়ী থেকে প্রচার করে দেওয়া হয় যে, আমি ফ্রান্সে চলে গিয়েছি। গোয়েন্দারাও অনেক দিন অনুসন্ধান করেছে যে, আমি সত্যিই চলে গিয়েছি কি না। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, ষ্টিমারে কিংবা ট্রেনে পরিচিত কেউ জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছেন প্রতুলবাবু, অনেক দিন বাদে দেখা হ'ল। আমি অসংকোচে বলতাম, আপনি ভুল করেছেন। আপনি আমার দাদার কথা বলছেন ; তিনি তো দেশে নেই। ফ্রান্সে চলে গেছেন। বিস্মিত উত্তর পেতাম, তাই নাকি? চেহারা কিন্তু একেবারে

এক রকম! কথা বলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত! আমি হেসে জবাব দিয়েছি, ঠিকই বলেছেন। আমরা দু'ভাই দেখতে এক রকম কি না, তাই এমনি ভুল অনেকেই করে! অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমি পলাতক এবং আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

ময়মনসিংহের অনেক স্থানই সেবার পরিদর্শন করি। মতিলাল বিশ্বাসের যে সমস্ত কর্মীসভ্য দেখলাম তার মধ্যে হেম লাহা, বীরেন পাল ও অমূল্য অধিকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অমূল্যর বয়স তখন খুবই কম, কিন্তু ভবিষ্যতের বিরাট কর্মীকে সেদিনই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। গৌরীপুরের রমণী দাস মহাশয় এবং জমিদারের ম্যানেজার অন্নদাবাবুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হয়। ময়মনসিংহ শহরে থাকাকালীন সময়ে কিশোরগঞ্জ গচিহাটার যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য এসে আমাকে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প জানায়। আমি তাকে আমার সঙ্গে করেই আমাদের ঢাকার বাসায় নিয়ে এলাম। অল্পদিনের মধ্যেই সে আমাদের বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেল। ভবিষ্যতে যোগেন্দ্র দিনাজপুর এবং আরও অনেক জায়গার ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে; এবং বিহারে সমিতি গঠনের কার্যে নিযুক্ত হয়ে নিজেকে বিহারবাসী রূপে পরিচয় দিয়ে মুঙ্গের এবং ভাগলপুরে সমিতি গঠনের কার্যে সাফল্য অর্জন করেছিল।

কুমিল্লায় গিয়ে পূর্ণ চক্রবর্তীর অসামান্য কৃতিত্ব দেখে খুবই উৎসাহ বোধ করলাম। কেবল যে কুমিল্লা শহর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরেই বহু যুবক ও ছাত্রকর্মী সংগৃহীত হয়েছে তা নয়, গ্রামে গ্রামে সমিতির শাখা বিস্তার লাভ করেছে। এমন কি চরিত্রবান, সাহসী এবং বুদ্ধিমান ছাত্র ও যুবক মাত্রই যেন সমিতির সভ্য হয়ে পড়েছিল। স্কুল-কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তখন সমিতির সভ্য। রেবতীলাল, প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রবোধ সেন, মনোজ দাশগুপ্ত, পাগলা, অতীন রায়, যোগেশ চ্যাটার্জি, জিতেন ভট্টাচার্য, ব্রজেন ভট্টাচার্য, শিশির দত্ত প্রভৃতি তখনই খুব উৎসাহশীল সভ্য।

অতীন রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা একটু বিচিত্র। তখন সে খুব অল্পবয়স্ক স্কুলের ছাত্র। ট্রেনের কামরায় ওর চেহারা এবং পোশাকে বিলাসিতার অভাব দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলাম সে রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত একখানা ধর্মপুস্তক পাঠ করছে। আমি আমার নিজের পরিচয় গোপন রেখে ওর সঙ্গে আলাপ করে ভাবলাম ও সমিতিভুক্ত হওয়ার খুবই উপযুক্ত। আলাপচ্ছলে কুমিল্লাতে ও যে পাড়ায় থাকে তাও জেনে নিলাম। পরে কুমিল্লায় ফিরে গিয়ে

পূর্ণ চক্রবর্তীকে বললাম ওর কথা এবং সন্ধ্যাবেলা ধর্মসাগর পারে আমরা যখন বেড়াচ্ছিলাম তখন অতীনকে দেখে পূর্ণকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম। অল্পদিন পরে আবার যখন কুমিল্লায় গেলাম তখন দেখলাম অতীন সমিতির সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত। পরবর্তীকালে অতীন গৃহত্যাগী সভ্য হিসেবে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত হয়ে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছে এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। ঢাকা বৈরাগী টোলায় একই সঙ্গে দু'জন গোয়েন্দা হত্যার কাজে অতীন ছিল। কলকাতায় এলগিন রোডে গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জিকে যারা আক্রমণ করে মৃত্যুদণ্ড দেয় তার মধ্যেও ছিল অতীন। সেই সঙ্গে ছিল মোহিনী ভট্টাচার্য, শিশির ঘোষ, প্রবোধ বিশ্বাস এবং সুরেশ চক্রবর্তী। প্রফুল্ল দাশগুপ্ত নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করে এদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

চাঁদপুরে তখন বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে ছিল ক্ষেত্রমোহন সিংহ, শচীন সিংহ, শচীন কায়েত প্রভৃতি। এদের বয়স তখন খুবই কম, কিন্তু সমিতির কাজে এরা দায়িত্ব-জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছে।

১৯১৩-১৪ সালের সমিতির কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই চট্টগ্রামের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সেখানকার জেলা-সংগঠক তখন নলিনীকান্ত ঘোষ। কুমিল্লায় যেমন পূর্ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় সমিতি খুবই শক্তিশালী হয়েছিল, তেমনি চট্টগ্রামেও নলিনী ঘোষের নেতৃত্বে সমিতি দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

কেবলমাত্র ছাত্র ও যুবক দলে টানতে পারলেই সমিতি সাফল্যমণ্ডিত হবে এ আমরা ভাবতাম না। অবশ্য এমনি কর্মীর সংখ্যা নিশ্চয় বেশী হবে। কিন্তু গৃহস্থ কর্মী, সমাজের প্রভাবশালী লোক তথা সর্বশ্রেণীর কর্মী ও সহানুভূতিশীল লোক থাকা চাই। কেননা যেখানে যত বেশী গৃহস্থ-সভ্য গৃহত্যাগীদের আশ্রয় দিতে সক্ষম হয়, এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখতে সহায়ক হয় সেখানেই তত বেশী সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলা চলে। নলিনী ঘোষ এমনি সমিতিই গঠন করেছিল চট্টগ্রামে।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের একটি ধনী পরিবারের উল্লেখ না করে পারছি না। তখন আমরা বর্মা, মালয় তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের সমিতির বৈপ্লবিক কর্ম-বিস্তারের সুযোগ অন্বেষণ করছিলাম। চট্টগ্রামের মাধ্যমে এ কাজ সম্ভব হতে পারে। কেননা এটি একটি সমুদ্রগামী জাহাজের বন্দর এবং বিদেশের সঙ্গে মাল আমদানি-রপ্তানি হয়। এমতাবস্থায় নলিনী চট্টগ্রাম থেকে সুরেন্দ্র

দাস নামে এক যুবককে গৃহত্যাগ করিয়ে ঢাকায় পাঠায়। স্বরেন্দ্র ধনীর সন্তান। চট্টগ্রামে ছিল ওদের বিপুল সম্পত্তি, ব্যবসায়; এমনকি বন্দরের মাল খালাসী ব্যবসায়ের সঙ্গেও ওদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং আমরা বিবেচনা করলাম যে, স্বরেন্দ্রকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে পরিবারের মধ্যেই রেখে সমস্ত পরিবারের ওপর প্রভাব বিস্তার করাই যুক্তিযুক্ত। ফলে সমগ্র পরিবার এবং তাদের ব্যবসায়কে আমাদের কাজে লাগাবার স্বযোগ পাব।

যদিও স্বরেন্দ্র দাস আর গৃহে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নয়, তবে সমিতির কাজের জন্য গৃহে থাকতে আপত্তি নেই। তারই প্রস্তাব অনুসারে নলিনী আমাকে জানায় যে, সে গৃহে ফিরে গেলে তার বাড়ী থেকে কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। ভাবলাম ক্ষতি কি! স্থির হয় যে, স্বরেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবে। কেননা আমি তখন পলাতক। প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করে তার সঙ্গে দেখা হলে সে করজোড়ে আমার কাছে তার ভাইকে ফেরত চাইল এবং বলল যে, এজন্য তারা সমিতিকে কিছু টাকা সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি বললাম, আপনার ভাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব, কিন্তু তার মুল্যস্বরূপ টাকা চাই না। আপনার ভাই-এর দাম দু'এক হাজার টাকা নয়। তবে সমিতির বৈপ্লবিক কার্যে যদি আপনারা অর্থ সাহায্য করেন এবং এ বিষয়ে আর কারুর কাছে কিছু না বলেন তবে আপনাদের প্রদত্ত টাকা নিতে প্রস্তুত আছি। পরে স্বরেন্দ্র বাড়ি ফিরে যায়। এবং তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজ হাতে নির্দিষ্ট স্থানে এসে গোপনে দু'হাজার টাকা দিয়ে যায়।

এই স্বরেন্দ্র দাস পরে সঙ্গীত-শিল্পী হিসেবে খুব নাম করেছিল। কলকাতায় একটা সঙ্গীত শিক্ষালয় খুলেছিল। বেতারে কাজ করত এবং নিজেও একজন বেতার-শিল্পী ছিল। তার পিতার নাম বোধ হয় শ্রীপ্রাণহরি দাস।

চট্টগ্রাম থেকে সমিতির কিছু লোক বর্মায় গেল এবং কাঠের কারবারের উপলক্ষ্যে আরাকান সীমান্তে এবং ভিতরেও গেল। খোঁজ-খবর স্বরু হ'ল চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে গোপনে বিদেশে লোক পাঠান যায় কি না; আকিয়াব ও তার চাইতেও দূরে লোক যাতায়াত করে সাম্পানযোগে ধানের ব্যবসা উপলক্ষ্যে—এ স্বযোগ আমরা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি। ভবিষ্যতে কোন বিদেশী শক্তি আমাদের সাহায্য করতে স্বীকৃত হওয়ার ফলে যদি জাহাজযোগে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসা যায় তবে সেগুলি সাম্পানে নামিয়ে চাল-বোঝাই নৌকা বলে বন্দরেও হয়ত নিয়ে আসা যেতে পারে। চট্টগ্রাম পাহাড়ী জায়গা। পাহাড়ী

রাস্তায় কোন্ কোন্ জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় সেদিকেও নজর গেল। বিপ্লব সুরু হলে এই পাহাড়ী অঞ্চল আমাদের খুব কাজে লাগবে—আত্মগোপন করে থাকার আশ্রয় এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামের সুবিধা। ওদিকে চন্দ্রনাথ-সীতাকুণ্ডের মোহান্তের পদে যদি আমাদের লোক বসাতে পারি তবে পাহাড়ীদের মধ্যেও আমাদের সমিতির প্রভাব বিস্তার করতে পারব।

চট্টগ্রাম থেকে নৌকায় অনেক দূর গিয়ে পরে পায়ে হেঁটে একটা ছোট পাহাড়ের উপর একটা ছোট মন্দির ছিল। সেখানে আমাদের কিছু লোক ছিল। বিপ্লবের সময় তা কাজে লাগান যাবে কি না তা দেখাবার জন্য নলিনী ঘোষ আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। জায়গাটাকে ভবিষ্যতের উপযোগী করে তোলবার জন্য কিছু কিছু কাজকর্মের কথা আলোচনা হয়েছিল।

চট্টগ্রামের উপর আমাদের আকর্ষণের আরও একটা কারণ ছিল। বিপ্লবের সময় এ. বি. রেলের একটি মাত্র লাইন এবং টেলিগ্রাফ লাইন নষ্ট করে দিলেই চট্টগ্রামের সঙ্গে যাতায়াত বিপর্যস্ত করা যাবে। বন্দরে জাহাজ-ঘাটায় আমাদের লোক বসান বা যারা চাকুরি করে তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে সমিতির সভ্য করার চেষ্টা হতে লাগল এবং দু-একজনকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করাও গেল।

আমি চট্টগ্রাম থাকতে থাকতেই খবর পেলাম যে, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী নগেন্দ্র রায় চট্টগ্রামে আছে। দু'একজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ঘোরাঘুরি করে সমিতির বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহেরও চেষ্টা করছে। অনেকদিন যাবতই ওদের দু'ভাই—নগেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিবারই নানা অপ্রত্যাশিত কারণে তা সফল হয় নি। সুতরাং এবার স্থির হ'ল তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেই হবে।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় আমি, নলিনী ও যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য কিংবা মণীন্দ্র ভট্টাচার্য (ঠিক মনে নেই) সদরঘাটের কাছে গেলাম। তখন নগেন্দ্র ও তার দুই বন্ধু একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সমিতিরই সভ্য একজন নগেন্দ্রের নতুন বন্ধু তাকে পেছন থেকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে সরে গেল। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে—রাস্তা, লোকজন প্রায় অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার উপর কার্য পরিচালনার ভার ছিল। সুতরাং আমিই প্রথম গুলী করলাম এবং আমার পরে গুলী করল নলিনী। গুলীবিদ্ধ হয়ে একজন পড়ে গেল। কিন্তু আমাদের এই কার্যের মুহূর্তেই নগেন্দ্র ও তার বন্ধুরা চলতে চলতে তাদের স্থান হঠাৎ পরিবর্তন করে ফেলেছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর থেকে ইঙ্গিতে সনাক্ত করাতেও ভুল হয়েছিল। মোটকথা পরে শুনতে পেলাম যে, নগেন্দ্র রায়ের এক বন্ধু নিহত হয়েছে। নগেন্দ্র রায় রক্ষা পেলেও প্রমাণ হ'ল যে, বিশ্বাসঘাতকের সাহচর্যও নিরাপদ নয়। উল্টো দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, সমিতির সভ্য নয় এবং বিপ্লবমূলক কোন কার্যের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই, কিন্তু কেবলমাত্র অজ্ঞাতসারে কোন এক গুপ্ত সমিতির সভ্যের সঙ্গে সখ্যতা আছে বলে কত লোক কারাবাস ও পুলিসের লাঞ্ছনা ভোগ করেছে।

নলিনী ঘোষ চট্টগ্রামে সাফল্য লাভ করলেও সে কিছু কিছু পরিচিতও হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেখানে তার অবস্থান আর তেমন নিরাপদ নয়। তাছাড়া কেন্দ্রের কাজের জন্য ত্রৈলোক্যবাবুর কলকাতা অবস্থান এবং তাঁর অসুস্থতা সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের, কার্যের জন্য নলিনী ঘোষকে বদলী করে সেখানে পাঠান হ'ল এবং তার কর্মকেন্দ্র হ'ল পাবনা সিরাজগঞ্জে।

নলিনী ঘোষের স্থানে নিযুক্ত হ'ল যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য। নিবাস ঢাকা বিক্রমপুর। পড়ত রাজসাহী কলেজে। সেখানে তার কৃতিত্বের জন্য গৃহত্যাগ করিয়ে আমার সঙ্গেই চট্টগ্রাম নিয়ে এসেছিলাম।

চট্টগ্রামে থাকতে আর যে সমস্ত সমিতির ছেলের সঙ্গে আলাপ হ'ল তাদের মধ্যে মোহিনী গুহ এবং মনোরঞ্জন গুহ বৃহত্তর দায়িত্বের উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

সে সময়ে বীরেন্দ্র চ্যাটার্জিও চট্টগ্রামে থেকে জ্যোতি প্রেসে কাজ করতেন। বলপ্রয়োগ ও বিপজ্জনক কাজে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কেন প্রেসের সামান্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁর তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের একটা নীতির কথা বলা প্রয়োজন। যুবক মাত্রেরই উত্তেজনাপূর্ণ এবং বলপ্রয়োগের কার্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কেউ বেশীদিন এমনি কার্যে নিযুক্ত থাকলে পাছে তার ঝোঁক এসে পড়ে, এজন্য তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্যে নিযুক্ত করা হ'ত। যাদের এমনি কাজে আকর্ষণ খুব বেশী দেখতাম তাদের বলপ্রয়োগের কার্যে নিযুক্ত করতাম না। কেননা কারুর এমনি আসক্তি থাকুক বা সমিতির পক্ষে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করুক, এ আমরা চাইতাম না। সমিতির জন্য সর্বপ্রকারের কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ। ময়মনসিংহ শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে হেঁটে যেতে হয় এমনি একটা নগণ্য গ্রামে পাঠশালার পণ্ডিতি করার কার্যে বীরেন্দ্র বহুদিন নিযুক্ত ছিলেন। অথচ বলপ্রয়োগের কার্যে তাঁর দক্ষতা ছিল অপূর্ব।

বীরেন্দ্রবাবুর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এমন ধীর স্থির, নির্ভীক ব্যক্তি কম ছিল। সর্বদা হাস্যরসে মত্ত থাকতেন। ঘোরতর বিপদ সম্মুখে, আমরা হয়ত কি করা যায় ভেবে চিন্তান্বিত ; কিন্তু তাঁর পরিহাস রসিকতার তখনও কামাই নেই। সে অবস্থাতেও তাঁর মত চাইলে তিনি রসিকতার মাধ্যমেই জবাব দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অননুকরণীয়। তিনি হয়ত কয়েকদিন সমানে রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজে, গায়ের চামড়া উঠিয়ে নৌকা বেয়ে ফিরে এলেন ; এসেই স্নান করে চুল আঁচড়ে জমকালো রেশমী পোশাক পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। আমাদের মধ্যে বিলাসিতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু বীরেন্দ্রবাবুর বেলায় কেউ দোষ ধরত না ; কারণ বিলাসিতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। প্রয়োজন হলে মুহূর্তে সমস্তকিছু জীর্ণ-মলিন বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে গামছা পরিধান করে নৌকার হাল ধরতে বা দাঁড় টানতে পারতেন। ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ কর্ম থেকে নিতান্ত নিরানন্দময় ব্যাপারে নিযুক্ত হলেও তিনি তা স্বীকার করে নিতেন।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে হয় যে, বীরেন্দ্র চ্যাটার্জিকে জ্যোতি প্রেসের কাজ ত্যাগ করে ঢাকায় যেতে নির্দেশ দিলাম।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে পরে কলকাতায় গেলাম। সে সময় আদিত্য দত্ত কারামুক্তি লাভ করেছে। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল থেকে মাত্র দেড় হাত ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে সারাদিন ঘুরে বিকেল বেলা কলেজ স্কোয়ারে এক সভ্যের সঙ্গে দেখা হয় এবং পরে আমাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমিতির কাজের জন্য আদিত্য দত্তকে পাঠাতে হবে। প্রথমে বর্মায় এবং পরে অন্যান্য স্থানে গিয়ে সমিতির শাখা-প্রশাখা স্থাপন করে তাদের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবে। যে বিশ্ব-সংগ্রাম আমরা আসন্ন মনে করে-ছিলাম তার সুযোগ ভারতবর্ষের বিপ্লবান্দোলনে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার ব্যবস্থাও আদিত্য দত্তকেই করতে হবে বলে স্থির হয়।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক সাবধানতাও কম নয়। গোয়েন্দা পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়া এবং সেখানেও এদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে চলা। কাজেই আদিত্য দত্তের রোমান ক্যাথলিক হয়ে নেটিভ খ্রীস্টানের বেশে যাওয়া স্থির হয়। খরচ চালাবার জন্য কোন বিশেষ অসুবিধেয় না পড়তে হয়

এজন্য সে টাইপ ও শর্ট-হ্যাণ্ড শিখতে আরম্ভ করল এবং যে সব জায়গায় যাবে সেখানকার স্থানীয় ভাষাও কিছু কিছু শিখতে আরম্ভ করল।

আমি ও আদিত্য দত্ত তখন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে একসঙ্গে থাকি এবং নিজেরা রান্না করে খাই। ইতিমধ্যে খবর এল যে, নগেন্দ্র রায় আদিত্য দত্তের নাম বলেছে এবং তার নামে চট্টগ্রাম খুন সম্পর্কে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। অথচ এ খুনের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এর অনেক পরে—তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, গ্রীয়ার স্কোয়ারে নরেন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র চ্যাটার্জি ও আদিত্য দত্ত গ্রেপ্তার হয়। আদিত্যকে বিচারের জন্য চট্টগ্রাম নিয়ে গেল। খুব বড় মামলা হয়। সরকার পক্ষের কর্ণধার হলেন প্রসিদ্ধ স্যার বি. সি. মিত্র, ব্যারিস্টার। বিচারে অবশ্য আদিত্য দত্ত মুক্তিলাভ করে।

জেলের বাইরেও আদিত্য দু'জন অস্ত্রধারী পুলিস প্রহরায় থাকত। এই প্রহরাধীনে থেকেই সে ঢাকা গিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে তার নিজের বাড়ী যায়। এবং সেখান থেকে এই পুলিস পাহারা এড়িয়ে পালিয়ে যায়।

অল্পদিন পরেই সেই পুনরায় চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। তখন সে দেখল যে, খ্রীস্টান হয়ে যাওরা সম্ভব হবে না। সুতরাং মস্‌জিদে গিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, মুসলমানী আচার-আচরণ ও নমাজ পড়া শিখে ছদ্মবেশে দেশের বাইরে চলে গেল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু জায়গা ঘুরে সমিতির অনেক কাজ করে। পরে বর্মাতে গ্রেপ্তার হয়। সেখানকার জেলে অনেকদিন কাটিয়ে ভারতবর্ষের জেলে বদলী হয়। বর্মাতে আদিত্য রোমান ক্যাথলিক হয়ে দেশীয় খ্রীস্টান পল্লীতে বাস করত। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীস্টানই ছিল। পরে হিন্দু পরিচয়ে বাড়ী ফিরে যায়।

যাই ঘটুক না কেন চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রীয় কার্য পরিদর্শনের জন্য কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা গিয়ে সেখান থেকে কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত আসাম বেঙ্গল রেলের স্টেশন কসবার নিকটবর্তী পাহাড় অঞ্চলে একটা প্রসিদ্ধ কালী-মন্দিরে গিয়ে সেখানকার মোহান্ত, স্বত্বাধিকারী এবং সন্ন্যাসী সর্বানন্দের সঙ্গে দেখা করে জায়গাটা ভাল করে দেখলাম। মন্দিরটি ছিল একটি অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। স্বামীজী

শুধু যে আমাদের সমিতির অনুরাগী ছিলেন তা নয়, তিনি সমিতির সভ্যই ছিলেন। এই মন্দিরে অনেক সময় পলাতক গৃহত্যাগী সভ্য এসে বাস করত। সুতরাং এ মন্দির সমিতির আর কি কি কাজে আসতে পারে এ সমস্ত সর্বানন্দ-জীর সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হয় যে, পলাতক, গৃহত্যাগী এবং পরিচিত বিপ্লবীদের যাতায়াত বন্ধ করে দিয়ে এখানে পাহাড়-জঙ্গলে মাটির নীচে একটা প্রকোষ্ঠ তৈরী করতে হবে অস্ত্রশস্ত্র রাখবার জন্য। এ বিষয়ে সামান্য কিছু অগ্রসর হওয়ার পর সমিতির উপর নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা এসে পড়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ মন্দিরের বা স্বামী সর্বানন্দের বিষয় পুলিস কখনই কিছু জানতে পারেনি।

নোয়াখালিতে গেলে খগেন্দ্র কাহিনী নগেন সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সেবারই সে জেনারেল স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। জমিদারের পুত্র। মুসলমানপাড়া বোমার মামলায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব।

নিয়মানুবর্তিতার জন্য গৃহত্যাগী গঙ্গাচরণকে শাস্তি বিধান করে আমার অনুমোদনের জন্য ঘটনাটি বললেন। গঙ্গাচরণ যখন নোয়াখালিতে প্রেরিত হয় তখন খগেনবাবু ইচ্ছে করেই দেখা করলেন না। নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন যে, তাকে একটি সাধারণ বেনের দোকানে থাকতে হবে অশিক্ষিত লোক হিসেবে। চলাফেরা, পোশাক, আচরণ সমস্তই তেমনি হবে। অথচ গঙ্গাচরণ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য খগেনবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করে। খগেনবাবু ওকে পরীক্ষা করছিলেন।

একদিন খগেনবাবু সে দোকানে গেলেন, যেন সাধারণ ক্রেতা। ইচ্ছে করেই সঙ্গে একখানি খবরের কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন। দোকানদার তাকে যত্ন করে বসিয়ে তামাক খেতে দিলেন। খগেনবাবু একটা সংবাদের উল্লেখ করে দোকানদারদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। গঙ্গাচরণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নগেনবাবুর ঘাড়ের উপর দিয়ে খবরের কাগজ পাঠ করল। এটা তার পক্ষে ঘোরতর অন্যায়। কেননা এদ্বারা সে প্রমাণ করল যে, সে অশিক্ষিত সাধারণ লোক নয়। এই অপরাধে খগেনবাবু তাকে তাড়িয়ে দিয়ে শাস্তি দিলেন। আমাকে বললেন—এমনভাবে পথ খরচ দিয়েছি যাতে ও এখান থেকে অনেক মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে তবে স্টীমার ধরতে পারে। যাওয়ার পথও নির্দেশ করে দিয়েছি।

ঢাকায় ফিরে এসে নেত্রকোণা সহরের নিকট একটা স্থানে ডাকাতির পরামর্শ হয় রমেশ চৌধুরী, অমৃত সরকার, বীরেন চ্যাটার্জি এবং অনুকূল চক্রবর্তীর সঙ্গে। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে স্থির হয় যে, বহুদূরবর্তী বাজিতপুরের নিকট মেঘনা নদী থেকে নৌকা নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং অতদূর থেকে নেত্রকোণা পর্যন্ত পথও চিনে রাখতে হবে। পথে দুটো প্রকাণ্ড বিল পড়বে—"গণেশের হাওড়", আর "বড় হাওড়"। ভরা বর্ষা, জলে থৈ থৈ। এপার ওপার দেখা যায় না। দিক ঠিক রেখে চলাই কঠিন, অথচ আমাদের সম্ভবমত দ্রুত গতিতেই যেতে হবে। ঝড় উঠলে নৌকা রক্ষা করা যাবে না। এ ঝুঁকি না নিয়েও উপায় নেই, কারণ নেত্রকোণা পর্যন্ত এখনও রেল-লাইন যায় নি। ফেরার পথে একটা ছোট নদী দিয়ে এগিয়ে এসে একটা থানা অতিক্রম করতে হবে। এদের কাছে সংবাদ পৌছার কথা এবং তাদের বাধা-দানেরও সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং আমরা স্থির করলাম যে, পুলিসের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই করতে করতেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

টেলিগ্রাফ তার কাটা ছাড়া নেত্রকোণা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ত্রিশ মাইল পথে সশস্ত্র লোক রাখতে হবে যাতে সদরে কেউ খবর না দিতে পারে।

কাজটা ছিল খুবই বিপজ্জনক। যতদূর সম্ভব বাছাই করা পরীক্ষিত লোক ও বেশী পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং যদিও পরিকল্পনা গ্রহণের পর আমার কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সকলেই একাজে আমার যাওয়ার জন্য বললেন। আমি নিজেই পরিচালক নিযুক্ত হলাম। আরও স্থির হ'ল যে, লোক আসবে নানা দিক থেকে এবং বিভিন্ন স্থানে বড় নৌকায় আরোহণ করবে। আমরা কয়েকজন ময়মনসিংহ থেকে হেঁটে নেত্রকোণা শহরে গিয়ে কোন সুবিধাজনক জায়গায় বড় নৌকায় উঠব।

এই কাজে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে করতে পারছি তাঁরা হচ্ছেন—অমৃত সরকার, বীরেন চ্যাটার্জি, রমেশ চৌধুরী, আদিত্য দত্ত, নগেন্দ্র দত্ত, কেষ্ট সাহা, ক্ষীরোদ ঘোষ, অনুকূল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। সব মিলে বোধ হয় ত্রিশজন ছিলাম।

এই কার্য পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় এবং এতে বহু সহস্র টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমাদের অর্থ সংগ্রহের প্রণালী এবং মানব-চরিত্রের একটা দিক আলোচনা না করে পারছি না। অর্থের সন্ধানের জন্য বা সিন্দুকের চাবি

আদায় করতে বাড়ির লোকদের শারীরিক যন্ত্রণা দেয়া নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য ভয় দেখান হ'ত যে, সবাইকে খুন করে ফেলব বা পুড়িয়ে মারব। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, প্রাণের চেয়েও অর্থের মায়া অনেকের বেশী। এই ডাকাতির সময় দেখেছি শিশুপুত্রকে তরবারির আঘাতে কেটে ফেলা হবে এই ভয় দেখিয়ে—এমন কি একেবারে গলার কাছে তরবারী ধরেও পিতামাতাকে অর্থের সন্ধান বা চাবি দিতে বাধ্য করা যায় নি। সুতরাং শারীরিক পীড়ন না করে সিন্দুক ভেঙেই অর্থ সংগ্রহ করতে হয়।

কার্য সমাধা হওয়ার পর আমরা ফিরে চললাম। পথে নির্দিষ্ট স্থানে প্রাপ্ত অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কারাদি ছোট-নৌকায় (Delivery Boat) দিতে হবে, এবং বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে গিয়ে কিছু কিছু লোককেও নামিয়ে দিতে হবে। সুতরাং কিছুদূর যাওয়ার পর যার কাছে যে যে অস্ত্র ও লুণ্ঠিত দ্রব্য বা অর্থ আছে তা আমার সামনে জমা দিতে নির্দেশ দিলাম। সমস্ত জমা হলে একজন বয়ো-কনিষ্ঠ সভ্যকে আমার শরীর ভাল করে তল্লাশ করতে বললাম, পরে সকলের শরীরই তল্লাশি করান হ'ল। তার পর প্রাপ্ত অর্থ ও অলঙ্কারাদি ওজন করে নিয়ে রাখলাম। ওজন করার ক্ষুদ্র যন্ত্র সঙ্গেই ছিল। সমস্ত ধন-রত্ন থলের মধ্যে বন্ধ করে তা গালা দিয়ে শীলমোহর করে রাখা হ'ল।

আমরা সবাই একে অপরকে প্রাণ দিয়েও বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তা সত্বেও শরীর তল্লাশি করা প্রয়োজন এজন্য যে, যদি ভুলে কেউ কিছু সঙ্গে নিয়ে যায় তবে ধরা পড়লে তা ডাকাতির সঙ্গে সম্পর্ক বেরিয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কাউকে লোভের সুযোগ না দেওয়াই ভাল মনে করতাম।

যাই হোক, ফেরার পথে যখন থানার পাশ দিয়ে যাই তখন প্রধানদের মধ্যে অনেকে হাল ধরে কিংবা দাঁড় টানায় নিযুক্ত হয় এবং কয়েক জনের হাতে থাকে বন্দুক। আর সবাইকে নৌকার ভিতর শুয়ে থাকতে বললাম যাতে পুলিসের গুলীর আঘাত না লাগে। দিক নির্ণয়ের জন্য যে কম্পাস সঙ্গে রেখেছিলাম তাই আমাদের খুব কাজে লাগল রাত্রিব অন্ধকারে হাওড়ের (বিলের) কূলহীন জলরাশির উপর দিয়ে ঠিক পথে আসতে।

কিশোরগঞ্জ শহরে এসে আমি, নগেন দত্ত এবং আরও দু'একজন নেমে গিয়ে হেঁটে সতের মাইল দূরে গফরগাঁও স্টেশনে ট্রেনে চেপে ঢাকায় গেলাম। নগেনবাবুকে পাঠালাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কিছু অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। তাঁর বয়েস আমাদের চাইতে বেশী ছিল এবং চেহারাতেও ধনী বলে মনে হত।

তখনকার দিনে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইউরোপীয়ান কিংবা খুব বিত্তশালী ভারতীয় ভিন্ন যাতায়াত করত না।

নগেন্দ্র দত্তকে তখন ঢাকা কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল প্রধান কেন্দ্রের নানা বিভাগে কাজকর্ম করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, যাতে আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি সমস্ত সংস্থারই ভার বহন করতে পারেন। নেত্রকোণা ডাকাতির সময়ও আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম কাজেকর্মে তাঁর দায়িত্ববোধ, দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তা কেমন। আমাদের গ্রেপ্তারের পর নগেনবাবু প্রধান পরিচালকদের অন্যতম হয়েছিলেন। উত্তর ভারতে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে সৈন্যদলের সহায়তায় সমগ্র ভারতে যে বিপ্লবায়োজন প্রথম যুদ্ধের সময় হয়েছিল তাতে তিনি, রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যালের সহকর্মী ও পরিচালক হিসেবে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে কাশী যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন সান্যাল প্রভৃতির সঙ্গে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড লাভ করেন। এ মামলায় রাসবিহারী বসুর নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছিল। নগেন্দ্র দত্ত বন্দী অবস্থাতেই আগ্রা জেলে নির্যাতনের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর বাড়ী ছিল আসামের সিলেট জিলায়।

ঢাকায় ফিরে এসে একদিন খবর পেলাম যে, বসন্ত চ্যাটার্জি ঢাকায় এসেছে। ঢাকা কেন্দ্রে এ বিষয়ে খবর দিয়ে রমেশ চৌধুরীকে বললাম তারা যেন এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয় এবং সতর্ক থাকে। বসন্ত চ্যাটার্জির চেহারার বর্ণনা যতটা জানতাম তাও জানিয়ে দিয়ে আমি চলে গেলাম কলকাতায়।

কলকাতা এসে চিঠি পেলাম কেদার গুহর—জার্মানী থেকে। নানা কথার মধ্যে লিখেছেন আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং লিখেছেন যে, যদি মত থাকে তবে যেন পথ-খরচের টাকা পাঠিয়ে দিই। এ খবর পেয়ে একটা বড় ডাচ্ ব্যাঙ্কের মারফত টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

জার্মানী থেকে লেখা কেদারবাবুর পত্র ছিল সাঙ্কেতিক ভাষায়। তিনি জানিয়েছিলেন যে, জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ অনিবার্য ও তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে এবং আমাদেরও সুযোগ আসবে। কারণ জার্মানী নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশের অধীনস্থ স্বাধীনতা-পিপাসু জাতিসমূহকে সাহায্য করতে চাইবে যাতে ইংরেজ নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যই ব্যস্ত থাকে, এবং তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিসমূহের সহায়তা না পায়। আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং সমিতির কাজকর্ম

সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছিলেন—এ সব পরে লিখব। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব করে লিখেছিলেন কেদারবাবু।

এর কিছুদিন পরেই ঢাকা থেকে বীরেন চ্যাটার্জি কলকাতা এলেন অনেক দুঃসংবাদ নিয়ে। ঢাকায় বসন্ত চ্যাটার্জির সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করে এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখে অনেক সাংঘাতিক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। বসন্ত চ্যাটার্জির সঙ্গে আমাদের সমিতির সভ্য রামদাস এবং আরও কয়েকজন গোয়েন্দা পুলিসকে ঢাকায় নদীর ধারে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। রামদাস প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে ঘুরছে আমাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। রামদাস বহুদিন পলাতক গৃহত্যাগী সভ্য থেকে দলের অনেক উৎসাহী নিষ্ঠাবান সভ্যকে চিনেছিল, অনেক খবর জানে, এবং বহু আশ্রয়স্থল তার পরিচিত। সুতরাং বিষম সঙ্কট উপস্থিত। এ ব্যাপারে কর্তব্য স্থির করতেই বীরেন চ্যাটার্জি কলকাতা এসেছিলেন।

এ সময়েই আমরা খবর পেলাম যে, রামদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশু দাসকে গোয়ালন্দে দেখা যায়। মনে হয় সে স্টেশনে খোঁজ-খবর করে। গোয়ালন্দ তখনকার দিনে পূর্ববঙ্গে যাতায়াতের একমাত্র পথ, সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আশু দাসও সমিতির পুরাতন সভ্য এবং অনেককেই চেনে। কাজেই গোয়ালন্দ দিয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ হলে আমাদের খুবই অসুবিধে হবে।

শিয়ালদহ স্টেশনে দৃষ্টি রাখবার জন্য নিযুক্ত হয়েছে রামদাসের অপর এক বন্ধু সত্যেন।

রামদাসের আসল নাম উমেশ। সে এক জমিদার বাড়ি থেকে অনেকগুলি বন্দুক চুরি করার সহায়তা করে এবং ফলে তার নামে ওয়ারেণ্ট বার হয়। সে ছিল জমিদারের বিশ্বস্ত ভৃত্য।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তার কিছুদিন পূর্বেই আমরা খবর পাই যে, রামদাস, আশু দাস, সত্যেন ও যতীন চ্যাটার্জি সমিতির মধ্যে থেকেই দলের বিরুদ্ধে কাজ করছে, কিছু অস্ত্রশস্ত্র সরিয়েছে, এবং নির্দোষ সভ্যদের সাহায্যে ডাকাতিও করেছে। পরে মাদারীপুরে অনেক লোক এদের দলভুক্ত হয় এবং বিক্রমপুরের দিকে কয়েকটা ডাকাতি করে।

রামদাস একবার সিলেট গিয়ে সেখানকার জেলা-পরিচালক রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে। তার মতলব বুঝতে পেরে রমেশ চৌধুরী তাকে নানা

কথায় ভুলিয়ে সিলেটে রেখে দিয়ে আমাকে চিঠি লিখল তাকে হত্যা করা হবে কিনা অথবা কি করা কর্তব্য। আমি লিখে জানালাম যে, সে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে এবং নিজেও অধঃপাতে গেছে। এমন লোক দল ছেড়ে ভালই করেছে। সে আর কি অনিষ্ট করবে! তাকে হত্যা করার প্রয়োজন নেই, ছেড়ে দিয়ে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করাই ভাল। রামদাস কিন্তু সর্বদাই মনে করত যে, তাকে হত্যা করা হবে। এ কথা সে একদিন আমার কাছে প্রকাশ করেছিল রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ায়। তার মাদারীপুরের বন্ধুরা সকলেই পরে জানতে পেরেছিল যে, রামদাস, আশু দাস প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য লোক নয়।

সে যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে কলকাতা বসে আমরা পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে জীবন দিয়েও রামদাসকে হত্যা করা বাঞ্ছনীয় হবে। মুস্কিল এই যে, সে সবাইকেই চেনে। এ কাজে উপযুক্ত অথচ তার অপরিচিত এমন লোক কোথায় পাওয়া যায়! স্থির হয় যে, নদীর ধারে বাকল্যাণ্ড বাঁধের রাস্তায় কিছু ভিক্ষুক বসে। সেই দলে মুসলমান ভিক্ষুকের বেশে কেউ দুটি বোমা নিয়ে অপেক্ষা করবে। রামদাস তার সঙ্গীদের সহ কাছে আসামাত্র একটার পর একটা বোমা তাদের উপর নিক্ষেপ করতে হবে। বোমার আঘাতেও যদি বেঁচে যায় তবে রিভলবার নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করতে হবে। যে যাবে তার গ্রেপ্তার, ফাঁসি বা তৎক্ষণাৎ গুলিতে নিহত হওয়া অনিবার্য। কিন্তু কাকে এই কার্যের জন্য পাঠান যায়! আমার মনে আছে যে, নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় যেতে প্রস্তুত আছেন বলে জানালেন। কিন্তু আমরা সম্মত হতে পারলাম না, কেন না তাঁর একটা পা খোঁড়া, এবং তিনি প্রখর বুদ্ধিশালী ভাল লেখক; সুতরাং তাঁর কর্মক্ষেত্রও অন্য রকমের ছিল। তাছাড়া মহারাষ্ট্র দেশে সমিতি বিস্তারে নলিনীবাবু ছিলেন যোগসূত্র। যাই হোক না কেন, নলিনীবাবুর আত্মদানের প্রস্তাব আমরা খুবই প্রশংসনীয় মনে করলাম।

বীরেন চ্যাটার্জির সঙ্গে দু'টি বোমা পাঠিয়ে দিলাম। পরিকল্পনা অনুযায়ী অথবা যদি সম্ভব হয় তবে প্রহরীর বেষ্টনী ভেদ করেও রিভলবার দিয়ে রামদাসকে হত্যা করতে হবে। বসন্ত চ্যাটার্জি কিংবা আর কারুর উপর নজর দেবে না। রামদাসই আসল লক্ষ্য, আর কেউ নয়। তাকে নিহত করার পর যদি সময় ও সুযোগ থাকে তবে অবশ্য বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যা করবে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই খবর পেলাম যে, সন্ধ্যার একটু আগে বহু ভ্রমণ-

কারীর চোখের সামনে ঢাকা নদীর ধারে নর্থ ব্রুক হলের সম্মুখে প্রহরী বেষ্টনী ভেদ করে রামদাসকে হত্যা করা হয়েছে এবং আর একজন গোয়েন্দা কর্মচারীও আহত হয়েছে। বসন্ত চ্যাটার্জি ভরা বর্ষার কূল ছাপানো বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবল স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণরক্ষা করে। এই সঙ্গে আর একজন খুব বড় গোয়েন্দা কর্মচারী ছিলো সতীশ মজুমদার। তিনিই পরে বর্মায় গিয়ে আদিত্য দত্তকে গ্রেপ্তার করেন।

গোয়েন্দা বিভাগের হেড কোয়ার্টার্স রামদাসের এই ব্যাপারটা ঢাকার স্থানীয় পুলিসের কাছেও গোপন রেখেছিল, এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। সমস্ত বিষয় খুব গোপন রেখে কয়েকজন বিশ্বস্ত বড় গোয়েন্দা কর্মচারী রামদাসকে নিয়ে ঢাকায় এক নৌকা ভাড়া করে বাস করত। শহরে আর কারুর সঙ্গেই মিশত না, কেবল নির্দিষ্ট সময়ে রামদাসকে নিয়ে বার হ'ত। তাই যখন "ঢাকা হেরাল্ড" (Dacca Herald) কাগজে বেরুল "A man named Ramdas murdered" (রামদাস নামীয় একজনকে খুন করা হয়েছে) তখন পুলিস এই ভেবে আশ্চর্য হ'ল খবরের কাগজ কর্তৃপক্ষ রামদাসের নাম জানতে পারল কি প্রকারে! তখন হেরাল্ডের সংবাদদাতাকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখে কয়েক বছর। অথচ পরেশ গুহ ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ—কিছুই জানত না। শ্রীশ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের বাসার আড্ডায় আসত খবর সংগ্রহের জন্য। সেখানে আমাদের লোকজনও যাতায়াত করত। রামদাসের হত্যার পর কথাপ্রসঙ্গে তার নাম জানতে পেরেছিল পরেশ গুহ।

রামদাসের হত্যার পর আশু দাস আর গোয়ালন্দে দাঁড়াত না এবং শিয়ালদহ স্টেশনেও আর সত্যেনকে দেখা যেত না। উভয়ে নিরুদ্দেশ—অর্থাৎ সরকারই তাদের কোন দুর্গম দূরদেশে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল।

রামদাসকে যাঁরা হত্যা করতে যায় তাঁরা হচ্ছেন অনুকূল চক্রবর্তী, অমৃত সরকার ও ভুবন বসু। কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, রামদাস ও তার সাথী পুলিসের উপর নজর রাখে।

রামদাস ও তার সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণ করে একটা বিরাট যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে বহু লোককে কারাগারে প্রেরণের যে ষড়যন্ত্র গোয়েন্দা পুলিস করেছিল তা রামদাসের হত্যার ফলে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ের নাম ১৯১০-১১ সাল থেকেই জানি। শ্রীঅরবিন্দের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুবার পর তিনি অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করেন এবং চন্দননগরে মতিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তারপর তাঁরই সাহায্যে গোপনে ফরাসী-অধিকৃত পণ্ডিচেরী চলে যান। শ্রীঅরবিন্দের পরিচালিত বিপ্লবী দলের পরিচালনার ভার মতিবাবুর উপরই অর্পিত হয়। শ্রীশ ঘোষ ও রাসবিহারী বসু ছিলেন প্রধান কর্মী ও নেতা।

ওদিকে ইংরেজ সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি ও অত্যাচারের মধ্যেও অনুশীলন-সমিতির সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন জোরের সঙ্গেই এগিয়ে চলছিল। ১৯০৮-এর শেষ কিংবা ১৯০৯-এর প্রথম দিকে অনুশীলন-সমিতি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার সময় থেকেই কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে মতিবাবু ও তাঁর পরিচালিত বৈপ্লবিক সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

আমি তখন ঢাকাতেই বেশী থাকতাম এবং ঢাকাই ছিল সমিতির প্রধান কেন্দ্র। ক্রমে সমিতির কেন্দ্রে সংগঠন-সংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত থাকায় এবং তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হওয়ায় কলকাতা কেন্দ্রের কাজকর্মেরও সমস্ত খবর রাখতাম। কাজেই, তখনও মতিবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটলেও বৈপ্লবিক কাজকর্মের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠছিল তাতে তাঁকে আপনজনই মনে করতাম। অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত ও পরস্পর সাহায্যের মাধ্যমে আমাদের দু'দল খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং দু'দল এক হয়ে যাওয়ার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের তখনকার প্রধান কর্মী অমৃত হাজরার (দলীয় নাম শশাঙ্কবাবু) সঙ্গে মতিবাবুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের খরচ নির্বাহের জন্য আমরা অনুশীলন-সমিতির তহবিল থেকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম।

১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ধরপাকড় ও আমার এবং ত্রৈলোক্য-বাবুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হওয়ার পর আমরা কলকাতা চলে আসি এবং মতিবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের সংস্পর্শে আসি।

কলকাতার বাদুড়বাগান রো'র বস্তিতে একটা খোলার ঘরে মতিবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। এই ঘরে এবং পরে রাজাবাজার বস্তির খোলার ঘরে

মতিবাবু, রাসবিহারীবাবু এবং শ্রীশবাবু প্রভৃতির সঙ্গে কত দিন কত আলোচনা করেছি, একসঙ্গে রাত্রিবাসও করেছি, এবং বোমা, পিস্তল ও রিভলবার রেখেছি।

প্রথম আলাপেই তাঁর কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পেলাম যা অতি দুর্লভ—বিশেষতঃ রাজনীতিতে। সেদিন তার সঙ্গে রাজনীতি সম্বন্ধে বেশী আলাপ হয় নি। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা, ভারতের বৈপ্লবিক সাধনার অন্তরতম আদর্শ, গীতোক্ত আত্মসমর্পণযোগ ও সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা এ সব বিষয়েই বেশী আলাপ হয়। তার পরেও তাঁর সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে এ সমস্ত বিষয়েই বেশী আলোচনা হ'ত। মতিবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী কানাইলাল দত্তের ফাঁসির মঞ্চে আত্মোৎসর্গের মধ্যে ভারতের বৈপ্লবিক সাধনার মর্মকথাটি কিভাবে রূপায়িত হয়েছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করতেন। গীতার তত্ত্ব কিভাবে কানাইলালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়েছিল তা আমাদের মধ্যে আলোচিত হ'ত। বাস্তবিক, আমাদের সেদিনের বিপ্লবী যুবকদের আমরা গীতার এই আদর্শই বোঝাতে চেষ্টা করতাম —নিষ্কাম কর্ম, আত্মসমর্পণ যোগ, সুখে-দুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ, ন হন্যতে ন হন্যমানে শরীরে ; মৃত্যু জীর্ণ বস্ত্রের মত দেহত্যাগ···ইত্যাদি।

মতিবাবুর সঙ্গে আলাপের পরই চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, মণীন্দ্র নায়েক, অরুণ দত্ত, যতীনবাবু, নলীন দত্ত, নরেন সরকার, রামেশ্বর দে এবং আরও অনেকের সঙ্গে নানা কর্মোপলক্ষে বৈপ্লবিক বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য জন্মে ও আমরা একই দলের সহকর্মী হয়ে পড়ি। কেননা অল্প কিছুদিন আলাপ-আলোচনার পরই আমাদের এই দুই দল—অনুশীলন-সমিতি ও চন্দননগরের দল একেবারে একদল হয়ে যায়।

মতিবাবুর স্ত্রী ছিলেন আমাদের পলাতক বিপ্লবীদের মাতৃস্বরূপা। তাঁদের চন্দননগরের গৃহকে আমরা আপন গৃহই মনে করতাম।

শ্রীশ ঘোষের মত রাজনীতিজ্ঞ, আদর্শনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন বিপ্লবী নেতা আমাদের দেশে বেশী ছিল না। জটিল বিষয়ে তাঁর মত এমন বিশ্লেষণ ক্ষমতা বেশী দেখি নি। অনুশীলন-সমিতির কেদারেশ্বর সেনগুপ্তের রোগজীর্ণ কঙ্কালসার দেহের মধ্যে এই দুর্লভ বস্তুটি দেখেছি। রাজাবাজারের বস্তির ঘরেই শ্রীশবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ভারতে সৈন্যদলসহ সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজনের সর্বপ্রধান নেতা ও পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার প্রচেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মি সংগঠনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ববর্তী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি ভুলবার নয়। চন্দননগরে মতিবাবুর বাড়ীতেই আলাপ হয়। রমেশ চৌধুরীও আমার সঙ্গে ছিলেন। প্রথম মিলনেই মনে হ'ল তাঁকে একজন খাঁটি বিপ্লবী—তেজ, উদ্যম, উৎসাহ ও বুদ্ধি তাঁর মধ্যে যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর সঙ্গে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল নানা অবস্থার মধ্য দিয়েও অটুট রয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয় থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে সাবমেরিনে আগত এবং ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত পবিত্র রায়ের কাছে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে শুনতে পেলাম যে, পেনাং-এর সমুদ্রের বেলাভূমিতে কতদিন রাসবিহারী বসু আমার, ত্রৈলোক্যবাবুর ও অন্যান্যের পুরোনো কথা বলতে বলতে এবং স্বাধীন ভারতে ফিরে এসে আবার বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবেন এ আশায় উৎফুল্ল হয়ে লাফিয়ে উঠতেন। বৃদ্ধ বয়সেও যেন যুবোচিত উৎসাহ উদ্যম তাঁর মধ্যে ফিরে আসত।

রাসবিহারী বসু যখন দেরাদুনে ফরেস্ট অফিসে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকুরি করতেন তখন তিনি উত্তর ভারতে—পাঞ্জাব, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশে বিপ্লবের আয়োজন করছিলেন। পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী-নেতা লালা হর-দয়াল তখন সরকারী বৃত্তি নিয়ে ইংলণ্ডে গিয়েছেন এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবী দলেই পরিচালনভার অর্পিত হয় রাসবিহারী বসুর উপর। এদিক থেকে অনুশীলন-সমিতি ও রাসবিহারী বসুর মাধ্যমে হরদয়াল পরিচালিত বিপ্লবী দলের সঙ্গে একদল হয়ে গেল। দিল্লীর আমীরচাঁদ ছিলেন এ দলের একজন বিশিষ্ট নেতা। এ ছাড়া আবদবিহারী, বালমুকুন্দ, বালরাজ, হনুমন্ত সহায় প্রভৃতি ছিলেন বিশিষ্ট সভ্য।

শিখ, মুসলমান, রাজপুত, ডোগরা, জাঠ প্রভৃতি ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচারে রাসবিহারী বসু কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে ভারতীয় সৈন্যদলকে সঙ্গে পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে খুব আশা জন্মাল। কতকগুলি সৈন্যদলের কেউ কেউ আমাদের দলের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'ল এবং সৈন্যদলের মধ্যে পরস্পর বৈপ্লবিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

এ সময়ের একটা মজার ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। বোমার আঘাতে আহত হয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দেরাদুনে চিকিৎসাধীনে ছিলেন তখন এই বোমা নিক্ষেপের তদন্তের ভার নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ (Central Intelligence Bureau)। তখন তার কর্তা ছিলেন বোধ হয় স্যার চার্লস্ ক্লিভল্যাণ্ড। তাঁর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন বাঙালী গোয়েন্দা সুশীল ঘোষ। লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে তিনিও দেরাদুন গিয়েছিলেন।

সে সময় দেরাদুন ফরেস্ট অফিসের কর্মচারীবৃন্দ এক সভা করে বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপের নিন্দা করে, তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রাসবিহারী বসু। তিনিই কিন্তু বোমা নিক্ষেপের নেতৃত্ব করেন। তথাপি নিজের রূপ ঢাকবার জন্যই তিনি এ কাজ করেন। ফলও পাওয়া গেল। সুশীল ঘোষ তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আলাপে তাঁকে খুব বিশ্বাসী রাজভক্ত এবং ব্রিটিশ রাজত্বের কল্যাণকামী মনে করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুশীল ঘোষ বলেন,—এই বোমা বাংলা দেশ থেকে এসেছে ; বাঙালীরা এর ভেতরে আছে। সন্দেহ হয় চন্দননগর এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট। আপনি চলুন বাংলা দেশে আমাদের সাহায্য করবেন। রাসবিহারীবাবু রাজী হলেন। গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে বনবিভাগ (Forest Department) রাসবিহারীবাবুকে প্রথমে ছয়মাস এবং প্রয়োজনমত যতদিন ইচ্ছা ছুটি মঞ্জুর করে। তিনি সুশীল ঘোষের সঙ্গে কলকাতায় এলেন।

কলকাতায় এসে সুশীল ঘোষ একটা অফিস খুলে বসলেন এবং রাসবিহারীবাবু প্রায়ই তাঁর কাছে গোপনে রিপোর্ট দিয়ে আসতেন। তখন রাসবিহারীবাবু, আমি, ত্রৈলোক্যবাবু, অমৃত হাজরা প্রভৃতি প্রায়ই সারাদিন একসঙ্গে কাটাতাম। বস্তির ঘরে রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে কত রাত্রে শয়নও করেছি। রিপোর্ট লিখে তিনি আমাকে দেখাতেন। আমার সম্বন্ধেও তাঁকে খবর দিতে হ'ত, কেননা আমি তখন পলাতক, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং পুরস্কার ঘোষণা ছিল। চন্দননগর আর মতিবাবুর সম্বন্ধে বিশেষভাবে খবর দিতে হ'ত কে কে তাঁর বাড়ী যায়, বাড়ীতে কি আছে, কোন ষড়যন্ত্র চলছে কি না ইত্যাদি। আমার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট যেত তা হ'ত এমনি—আমি যখন কলকাতায় তখন আমি কলকাতার বাইরে গেছি, আবার যখন কলকাতার বাইরে তখন আমাকে কলকাতায় দেখা গেছে!

যাতে তাঁর স্বরূপ বেরিয়ে না পড়ে এজন্য তাঁকে খুব সাবধানে চলতে হ'ত। সামান্য ভুলে তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং প্রতিবার সুশীল ঘোষের কাছে যাওয়ার সময়ই তাঁর আশঙ্কা থাকত সেখানেই না গ্রেপ্তার হন।

এ সময়ে (১৯১৩) উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কলকাতায় আসেন। তিনি প্রথম থেকেই অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্য ছিলেন। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় যখন অনেক লোক গ্রেপ্তার হয়, সমিতির শাখাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন শচীনবাবু সমিতির যোগসূত্র সন্ধান করতে একবার কলকাতায় আসেন এবং মামলার সাহায্যের জন্য উত্তর ভারত থেকে কিছু টাকাও সংগ্রহ করে আনেন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় বহু গ্রেপ্তারাদির সংবাদ পেয়ে তিনি পুনরায় কলকাতা এলেন দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে। সবই খুব গোপন হয়ে পড়ায় তাঁকে আমাদের খোঁজ পাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতে হয়। অবশেষে কলেজ স্কোয়ারে শশাঙ্ক-বাবুর (অমৃত হাজরা) সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি আমাদের রাজাবাজার বস্তির ঘরের ঠিকানা পান এবং এ ঠিকানাতেই তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের সাক্ষাৎ হয়।

তখন শচীনবাবু উত্তর প্রদেশে সমিতির শাখা স্থাপন করবার জন্য কাজ করছিলেন। যেহেতু তখন আমরা সকলেই সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে, সৈন্যদলকে সঙ্গে নিয়ে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজনে ব্যস্ত, সুতরাং রাসবিহারীবাবু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যালের একসঙ্গে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। তাই আমি ও শশাঙ্কবাবু শচীনবাবুকে মতিবাবু, রাসবিহারী-বাবু ও শ্রীশবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এঁদের এবং ত্রৈলোক্য-বাবুর সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, প্রথমে শচীনবাবুর সঙ্গে উত্তর প্রদেশ ভ্রমণ করে ওদিককার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি, আয়োজন, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, কর্মীদের মানসিক অবস্থা এবং চিন্তাধারা প্রভৃতি তথ্য ও তত্ত্ব সকলকে জানাতে হবে। পরে রাসবিহারীবাবু তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে শচীন-বাবুর পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং একযোগে সেখানে কাজ করতে থাকবেন।

এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি ও শচীনবাব ১৯১৩ সালেই কাশী যাই। সেখানে গিয়ে তাঁদের বাঙ্গালীটোলার বাসাতেই থাকতে লাগলাম। তাঁর ছোট ভাইয়েরা তখন সকলেই বালক মাত্র। কিন্তু এঁরা সকলেই পরবর্তীকালে সমিতির কার্যে আত্মনিয়োগ করে বহু বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন

সান্যাল উত্তর ভারতে নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন এবং সর্দার ভগৎ সিং প্রভৃতির সঙ্গে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। ভূপেন সান্যাল কাকোরী ষড়যন্ত্র এবং রবীন্দ্র সান্যাল প্রথম কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। শচীনবাবুর মাতৃদেবী ছিলেন একজন মহীয়সী মহিলা। তিনি শচীনবাবুর বৈপ্লবিক কাজকর্মের কথা জানতেন এবং সমর্থন করতেন। নিজের ছেলেদের দেশসেবায় সর্বদা উৎসাহ দিতেন এবং আমাকেও তিনি সস্নেহে ও সাদরে গ্রহণ করতেন।

কাশীতে শচীনবাবু বিজয় সঙ্ঘ নামে একটা প্রকাশ্য সংস্থা গঠন করেছিলেন। সেখানে শারীরিক ব্যায়াম ও ড্রিল হ'ত এবং একটা পাঠাগার ছিল। সঙ্ঘের কাজকর্মের মধ্য দিয়েই স্থানীয় যুবকদের আকর্ষণ করা হ'ত, তাদের মধ্য থেকে সমিতির সভ্য সংগ্রহ করবার জন্য।

কাশী এমন একটি শহর যেখানে ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকই আসে এবং অনেকে বাসও করে। সুতরাং শচীনবাবুর রিক্রুটদের মধ্যে গুজরাটী, মারাঠী এবং পাঞ্জাবীও ছিল। সমিতির সভ্যদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদের সঙ্গে শচীনবাবু আমাকে পরিচিত করালেন। কাশী থেকে অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও আগ্রা যাই। শেষের দিকে শরীর বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতায় ফিরে যাই, এবং দলীয় নায়কদের নিকট বক্তব্য বলার পর স্থির হয় যে, রাসবিহারীবাবু শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে নিজের সহকারী করে বিপ্লবের আয়োজন করতে থাকবেন ও উত্তর ভারতে কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে কার্য-পরিচালনার জন্য বাংলা দেশ থেকে আমরা উপযুক্ত লোক পাঠাব। এই নীতি অনুসারেই পরে নগেন্দ্র দত্ত (গিরিজাবাবু) এবং আরও কয়েকজন উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কার্যের জন্য গিয়েছিলেন।

১৯১৩ সালে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিপ্লবীদের সমাগম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দাদের আনাগোনাও খুব বৃদ্ধি পায়। ওরা যেমন আমাদের উপর নজর রাখত তেমনি আমরাও ওদের খোঁজখবর, কি করে না করে এসব দিকে নজর রাখবার ব্যবস্থা করতাম। আমাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে ওরা যেমন ফটো তুলে রাখত তেমনি আমাদেরও একটা বিভাগ ছিল যারা অতি গোপনে গুপ্তচরদের ছবি তুলত। ঢাকা শহরে এ ব্যবস্থা ভালভাবেই চালু ছিল; কলকাতাতেও কোথাও কোথাও এ ব্যবস্থা করা হয়।

এ সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পারলাম যে, গোয়েন্দাদের মধ্যে

নলিনী মজুমদার, নৃপেন ঘোষ, স্থরেশ মুখার্জি এবং হরিপদ দে সবচেয়ে বেশী তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। নানা রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা গেল যে, যদিও হরিপদ দে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নয়, তথাপি কলেজ স্কোয়ারে সে-ই সবচেয়ে বেশী তৎপর। আমাদের অনেক সভ্যকে চিনে ফেলেছে এবং নতুন গোয়েন্দাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। স্থতরাং হরিপদর মৃত্যুদণ্ড সর্বাগ্রে প্রয়োজন। স্থির হ'ল যে, সন্ধ্যার সময় যখন বহু গোয়েন্দা কলেজ স্কোয়ারে আসে তখন হরিপদও সেখানে উপস্থিত হয় তাদের সঙ্গে; এবং তাকে সেখানেই গুলী করতে হবে। এ কার্যের জন্য ঢাকা থেকে তিনটি রিভলবার আনাবার ব্যবস্থা করলাম।

দুপুর বেলা আমি ও রাসবিহারীবাবু আমাদের বাদুড়বাগান রো'র বস্তির খোলার ঘরে বসে কথাবার্তা বলছি, তখনই একজন একটা চামড়ার ব্যাগে করে তিনটি রিভলবার দিয়ে গেল। রাসবিহারীবাবু ব্যাগ খুলে রিভলবার বার করে যন্ত্র ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্য যেমন ট্রিগার টেনেছেন অমনি একটা গুলী সশব্দে আমার কাছ দিয়ে হুস্ করে চলে গেল। তাকিয়ে দেখি রক্ত। কিন্তু কোথা থেকে এই রক্ত, কে আমাদের মধ্যে আহত হয়েছে তা প্রথমে বুঝতে পারলাম না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতাম যে, গুলী বিদ্ধ হওয়া মাত্রই বেদনা অনুভূত হয় না। কেমন একটা অসাড় ভাব হয়। বাররা ডাকাতির সময় ক্ষীরোদ ঘোষ যখন নৌকায় দাঁড় টানছিল তখন পুলিসের গুলী তার হাতের কব্জি বিদ্ধ করে। সে কিন্তু প্রথমে বুঝতেই পারে নি কি হ'ল! যাই হোক, দেখা গেল যে, গুলী রাসবিহারীবাবুর হাতের একটা আঙ্গুল ভেদ করে গেছে! একে আমাদের ঘরটা রাস্তার একেবারে উপরে, তায় স্থকিয়া স্ট্রীট থানাও খুব সামনে। গুলীর শব্দে লোক আসতে পারে, ঘর খানা-তল্লাশি হতে পারে এবং আমরাও গ্রেপ্তার হতে পারি; স্থতরাং তক্ষুণি বেরিয়ে যাওয়া দরকার। রাসবিহারীবাবু আহত হাত নিয়েই একটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন, এবং আমিও ব্যাগের মধ্যে রিভলবার তিনটি পুরে সঙ্গে নিয়ে বার হলাম। দুজনে ভিন্ন ভিন্ন পথে গেলাম। আমি বর্তমান আমহার্স্ট রো'র স্থরেন বসু মহাশয়ের নিকট ব্যাগসহ রিভলবারগুলি রেখে আমার রাজাবাজার বস্তির ঘরে চলে গেলাম। রাসবিহারীবাবুও অতি সন্তর্পণে পায়ে হেঁটে এখানে এলেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পরে তাঁকে তাঁর চন্দননগরে নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিই। ঢাকায় খবর পাঠিয়ে চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনী-

মোহন দাসকে আনিয়ে নিলাম। তিনি রাসবিহারীবাবুকে কয়েকদিন চিকিৎসা করে গেলেন।

এ ঘটনা অনেকেই জানত না। সুতরাং পরবর্তী কালে যখন রাসবিহারীবাবু জাপানে চলে গেলেন, তখন তাঁর কাছে কোন লোক পাঠালে অঙ্গুলি আহত হওয়ার খবর বলে দিতাম, যাতে তাঁর বিশ্বাস হয় যে, সে লোকটিকে আমিই পাঠিয়েছি।

রাসবিহারী বসু আহত হলেও কলেজ স্কোয়ারে গোয়েন্দা হত্যার কাজ বন্ধ রইল না। স্থির হয় আমিই এ আক্রমণ পরিচালনা করব। ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি, রবীন্দ্রমোহন সেন ও নির্মল রায় এই কাজে গেলাম। প্রথম আমাকেই আক্রমণ ও গুলী করতে হবে, রবীন্দ্রবাবুও সঙ্গে সঙ্গে গুলী করবেন। নির্মল রায় আমাদের পাহারা দেবে।

সন্ধ্যার সময় কলেজ স্কোয়ার জনাকীর্ণ থাকে এবং অনেক গোয়েন্দাও উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মর্মর-মূর্তির সামনেকার ঘাটের উপর আসা মাত্র হরিপদকে গুলী করি এবং আমাদের কার্য সমাধা করে কলেজ স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে পূর্বদিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে মির্জাপুর স্ট্রীট পার হয়ে রাধানাথ মল্লিক লেন দিয়ে চলে গেলাম। সে রাত কাটালাম আমাদের সভ্য ডাঃ সতীন্দ্র সেন, এম্ বি মহাশয়ের ঘরে। তিনি তখন কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসে। পরদিন চন্দন-নগর গিয়ে মতিবাবু, রাসবিহারীবাবু এবং শ্রীশবাবুর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলাম।

কাজ শেষ করে যখন আমরা ফিরে যাচ্ছিলাম তখন নির্মল রায় দৌড়ে আমাদের পেছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে যায়। দেখে তাকে ডেকে থামিয়ে বললাম যে, দৌড়বার প্রয়োজন নেই, তাতে অনর্থক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া একের সঙ্গে অপরের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এবং গ্রেপ্তারের ভয় বেশী। একসঙ্গে থাকলে আত্মরক্ষার সুযোগ বেশী।

আমাদের অনুসরণকারী পুলিসের ধারণা হয়েছিল যে, আমরা একটা রিভল-বার গোলদীঘির জলে ফেলে এসেছি। সরকার ওটার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করে। আমরা কিন্তু কোন রিভলবারই ফেলে আসি নি।

১৯১৩ সালের মাঝামাঝি দামোদর নদের প্রলয়ঙ্কর বন্যায় বর্ধমান জেলার বহু স্থান ভেসে যায়। অগণিত লোক অন্নবস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, এককথায়

সর্বহারা হয়ে অসীম দুর্গতির মধ্যে পতিত হয়। বন্যার্তদের সাহায্য উপলক্ষ্য করে যুবকদের মধ্যে সেবাকার্যের অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্যম দেখা দেয়। বিপ্লবীরা তাদের গুপ্ত অস্তিত্ব থেকে বাইরে এসে বন্যার্তদের সেবার ভার গ্রহণ করল। এ সেবাকার্যের মাধ্যমে দেশের যুবকগণের মধ্যে নতুন প্রাণ জেগে উঠল, বিপ্লবীরাই এর নেতৃত্ব করল, এবং তাদের শক্তি ও প্রভাব অনেকটা বৃদ্ধি পেল তা ব্রিটিশ সরকার বুঝতে ভুল করল না। সে সময় এবং তার অনেক পরেও যখনই যে গ্রেপ্তার হয়েছে তাকেই গোয়েন্দা পুলিস জিজ্ঞেস করেছে যে, সে বর্ধমান বন্যায় সেবাকার্য করেছে কি না। ১৯১৪ সালের শেষের দিকে আমার গ্রেপ্তারের সময়ও এ কথা জিজ্ঞেস করেছিল। বন্যা সেবাকার্যের প্রধান নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন। শ্রীমতিলাল রায় মহাশয়ও নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন।

সে সময় কলেজ স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনাধীনে "শ্রমজীবী সমবায়" নামক দোকানটি বিপ্লবীদের একটা বিশেষ মিলনস্থান ছিল। স্বদেশী দ্রব্য বিশেষত স্বদেশী বস্ত্র বিক্রীই এ দোকানটির প্রধান কাজ ছিল। যতীন মুখার্জি (বাঘা যতীন), মাখনলাল সেন এবং আরও অনেক বিপ্লবী-প্রধান এখানে নিয়মিত আসতেন। পুলিস দোকানটিকে সন্দেহের চোখে দেখত এবং বিপ্লবী-প্রধানদের উপস্থিতিতে দোকানটির সামনে পুলিসেই ভর্তি থাকত। আমার নামে তখন ওয়ারেণ্ট। তথাপি মাখনবাবু, যতীনবাবু, অমরবাবুর মত সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় বিপ্লবীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপের জন্য সেখানে মাঝে মাঝে না গিয়ে পারতাম না।

যতীন মুখার্জির বিপ্লবী দল ছিল। তাঁর প্রেরণাতেই সামসুল আলম নামক এক ডেপুটি সুপার হাইকোর্টে নিহত হয় এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ছিলেন তিনি আসামী। তাঁকে তখন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা বলেই জানতাম। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিপ্লবী তাঁর দলে ছিলেন। অতুলবাবুর সঙ্গে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতাম। তাঁর দর্জিপাড়ার বাড়ীতে অনেকবার গেছি এবং রাত্রিবাসও করেছি। তিনি আমাদের সমিতির অনেক সভ্যের সঙ্গে মিশে পড়েছিলেন এবং বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাঁকে আমরা খানিকটা নিজেদের লোকই মনে করতাম, এবং তাঁর খুব ইচ্ছাও ছিল যে, আমরা দুই দল একত্রিত হয়ে কাজ করি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রস্তাবানুসারেই আমি যতীন

মুখার্জির সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন থাকতেন তাঁর মামা ডাঃ হেমন্তকুমার চ্যাটার্জির ২৭৫নং আপার চিৎপুর রোডের বাসায় (শোভাবাজারের কাছে)।

প্রথম দিন আলাপ করেই মনে হ'ল যতীন মুখার্জি মহাশয় একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা এবং অসামান্য মানসিক শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি। প্রথম দিকে নিজের প্রকৃত নাম প্রকাশ করি নি কিন্তু অচিরেই নিজের আসল পরিচয় দিতে দ্বিধা করি নি। কথা প্রসঙ্গে এক সময় যখন ব্রাহ্মণত্ব ও কৌলিন্যকে খুব গৌরবজনক বলে মনে করি না বললাম, তখন তিনি বললেন, না, আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং কুলীন। এই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করবেন এবং নিজের চারিত্রিক শক্তিতে ও মহত্ত্বে তা প্রতিষ্ঠিত করবেন। প্রতিদিন ভগবানের উপাসনা ও সম্পূর্ণ গীতা মুখস্থ করার কথা তিনি আমায় বিশেষ করে বলেন এবং এ দু'টি কাজ করার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন।

তার পর তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বার দেখা ও আলাপ হয়েছে আমাদের কাজকর্ম ও দু' দল একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমরা চন্দননগরের মতিবাবুদের (তখন বাংলা দেশে শ্রীঅরবিন্দের দল বলতে এ দলকেই বোঝাত) সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছি। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে মতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করতে পারেন।

এর অনেক পরে যুদ্ধের মধ্যে যখন ভারতবর্ষে সমস্ত দলের একসঙ্গে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কথা হয় তখন আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাসবিহারী বসু, গিরিজাবাবু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল একত্রে কাজ করা সম্বন্ধে যতীন মুখার্জি মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করেন। আমি ও ত্রৈলোক্যবাবু তখন জেলে। পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে অমিল হওয়ায় তাঁদের এই আলাপ ফলপ্রদ হয় নি। যতীনবাবুদের অভ্যুত্থান নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক সাহায্য তথা জার্মানী প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রাদির উপর। বাংলা দেশে সংগ্রাম আরম্ভ করাই ছিল পরিকল্পনা। আর অনুশীলন, চন্দননগর, উত্তর ও মধ্য ভারতের অন্যান্য দল, বিশেষতঃ হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত দল ও শিখ বিপ্লবী দল প্রভৃতির মিলিত অভ্যুত্থান নির্ভরশীল ছিল ভারতে সৈন্যদলের বিদ্রোহ এবং সেই সঙ্গে সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমগ্র ভারতে, বিশেষতঃ বাংলা দেশ, উত্তর ও মধ্যভারতে জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটায়।

রংপুরে অনুশীলন-সমিতি ছাড়াও শ্রীঅবিনাশ রায়ের পরিচালনায় আর একটি দল ছিল। এ দলের শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমাদের প্রফুল্ল বিশ্বাসের

খুব বন্ধুত্ব হয়। সে সূত্রে আমাদের সঙ্গে ক্রমে তা দলীয় সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। শ্রীভগীরথ ব্রহ্মচারী নামক একজন সন্ন্যাসী ছিলেন এ দলের শ্রদ্ধাভাজন গুরু। তাঁর সাধনার স্থান ছিল সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ের গুহায়, ঝরিয়া কাত্রাসগড় কয়লা খনি থেকে প্রায় সাত-আট মাইল দূরে। এই দলেরই নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত শশধর করের সঙ্গে এ সমস্ত স্থান পরিদর্শনে যাই।

প্রথমে যাই ঝরিয়া কাত্রাসগড় খনি-অঞ্চলে, বাঙালী নিয়ন্ত্রিত খনি কর্তৃপক্ষের আতিথ্য গ্রহণ করি। আমার নামে তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা; সুতরাং আসল পরিচয় গোপন করেছিলাম। ইউরোপীয় পরিচালিত খনিও দেখলাম। তাদের তুলনায় আমাদের দেশীয় খনির বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বোধের অভাব বড়ই চোখে লাগল। তবুও দেশীয় মধ্যবিত্ত লোকেদের মধ্যে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করবার মত হৃদয়ের আভাস অনুভব করে বুঝলাম যে, এখানে সমিতির লোক নিযুক্ত করতে পারলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় অনেক কাজ করা যেতে পারবে। নিকটস্থ পাহাড় অঞ্চল বেশ ভাল আশ্রয়স্থল পরিগণিত হতে পারবে এবং মাঝে মাঝে বাইরে এসে আক্রমণ করা যেতে পারবে। শশধরবাবুদের দলভুক্ত এক বাঙালী ডাক্তার নারায়ণ মুখার্জি থাকতেন পাহাড়ের নীচে একটা গ্রামে। এখান থেকে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে—অধিকাংশই সাঁওতাল, তাদের মানসিক গঠন পর্যবেক্ষণ করি।

ভগীরথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম ছিল এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে একটা পাহাড়ের টিলার উপরে। একখানা মাত্র ছোট ঘর ও রান্নার জন্য একটা চালাঘর। বাসগৃহের মধ্য দিয়ে একটা অন্ধকার গুহা ছিল। বসে বা হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হ'ত এবং পা ছড়িয়ে শোওয়া যেত না। শুধু বসে থাকার মত ব্যবস্থা। সে সময়ে একমাত্র ব্রহ্মচারী ছাড়া আর কোন লোকজন ছিল না। এখানে বাঘের ভয় ছিল খুব। সন্ধ্যার পর আশ্রম ঘর পরিত্যাগ করে বাইরে আসা ছিল বিপজ্জনক। গুপ্ত জায়গা হিসেবে এ স্থানটি বেশ নিরাপদ মনে হ'ল।

এখানে ছিলাম প্রায় দিন দশ-বার। কোন খবরের কাগজ আসে না এ জায়গায়। সুতরাং কোন কিছুর খবরই আর এর মধ্যে জানতে পারি নি। প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে নিজেদের আড্ডায় যাওয়া প্রয়োজন। মেছোবাজার স্ট্রীটের একটা মেসবাড়ীতে থাকত আমাদের সভ্য যোগেশ রায়। ঘরে ঢুকে কুশল প্রশ্ন করতেই হাতকড়ির মত দুটো হাত দেখিয়ে জানাল যে, আমাদের

রাজাবাজারের আড্ডা ২১শে নভেম্বর (১৯১৩) খানাতল্লাশি হয়েছে। বহু বোমার খোলস ও কাগজপত্র হস্তগত করেছে। অমৃত হাজরা, সারদা গুহ, দীনেশ দাশগুপ্ত, চন্দ্রশেখর দে এবং আরও দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ত্রৈলোক্য-বাবু ওখানে উপস্থিত না থাকায় ভাগ্যক্রমে ধরা পড়েন নি।

ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে গৃহত্যাগী ও পলাতকদের থাকবার জন্য নতুন বাড়ী ভাড়া করা হ'ল। একসঙ্গে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রোধের জন্য আমার থাকবার জায়গা হ'ল আমহার্স্ট স্ট্রীটের তিনতলার বাড়ীর একটা ঘরে, অন্যের সঙ্গে। ত্রৈলোক্যবাবু থাকবেন বরানগরের এক বাড়ীতে খগেন চৌধুরীর সঙ্গে।

রাজাবাজারের ঘর খানাতল্লাশ করে পুলিস ব্লটিং-কাগজের অক্ষর পরীক্ষা করে সুরেশ চৌধুরী, ভাসতারা, হুগলী এই নাম ঠিকানা উদ্ধার করে। খগেন চৌধুরীই সেখানে ছিলেন সুরেশ নামে। পুলিস-সুপার খানাতল্লাশ করে খগেনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় বেরিয়ে রেল-স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললেন। কিছু দূর এগিয়ে পুলিস অফিসার খগেনবাবুকে নমস্কার করে বললেন আচ্ছা যাই, বড্ড কষ্ট দিলাম, মাফ করবেন। খগেনবাবুও অবাক! তিনি ভাবছিলেন গ্রেপ্তার হয়েই তিনি পুলিসের সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁদের প্রহরাধীনে। কথা শুনে বুঝলেন গ্রেপ্তার হন নি। বাসায় ফেরামাত্রই কিন্তু একটি ছাত্র এসে খবর দিল, স্যার, ওরা ফিরে আসছে। খগেনবাবুও অন্যপথে অনেক পথ হেঁটে এক রেল-স্টেশন থেকে কলকাতার ট্রেন ধরলেন।

খগেন চৌধুরীর জিনিসের মধ্যে একখানা চিঠি পুলিস পায় যাতে লেখা ছিল —হিমাংশুবাবুর জ্বর সেরেছে, তিনি ভাল আছেন। ইতি—বিরজাকান্ত। সুতরাং আমি হিমাংশু নাম ত্যাগ করলাম এবং ত্রৈলোক্যবাবু বিরজাকান্ত নাম পরিত্যাগ করে শশীকান্ত নাম গ্রহণ করলেন।

রাত্রিতে আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে খগেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি তাঁর কথা বলে কি ব্যাপার তাই জিজ্ঞেস করলেন। আরও বললেন রাজাবাজার বস্তিতে গিয়ে কিভাবে পালিয়ে এসেছেন। অমৃত হাজরাদের গ্রেপ্তারের পর পুলিস ও-বাড়ীর দোতলা ঘরে সাধারণ পোশাকে লুকিয়ে থাকত —যদি কেউ না জেনে আসে! দোতলায় উঠে ঘরের সামনে আসতেই লোকগুলি পাকড়ো-পাকড়ো বলে ধরতে গেলে খগেনবাবু পড়ি কি মরি করে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কিছু দূর দৌড়ে বস্তিরই আর একটা গলিতে ঢুকে

পড়লেন। বস্তির লোক আমাদের উপর খুবই খুশী ছিল। তাই কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিতে এগিয়ে আসে নি। তাঁকে আমি বাদুড়বাগান রো'র বস্তির ঘরেও যেতে মানা করলাম। সেখানেও পুলিস খানাতল্লাশ করে আমাদের সব জিনিস নিয়ে গেছে।

খগেনবাবু ভাল ফুটবল খেলতে পারতেন ও খুব দ্রুত দৌড়তেন। এক হাত দূরে টের পেলেও পুলিস তাঁকে ধরতে পারত না।

পুলিস তো আমাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে গেল! আমার মাঝে মাঝেই ম্যালেরিয়ার জ্বর। ত্রৈলোক্যবাবুর হাঁপানি। একখানা হিতবাদী বা বঙ্গবাসী পেতেই আমাদের শুতে হ'ত। কাঁপুনি এলে ত্রৈলোক্যবাবু বা আর কেউ আমাকে চেপে ধরত। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ল, একবার গিয়েছিলাম শিয়ালদহ স্টেশনে খুব সকালে ঢাকা মেল এটেণ্ড করার জন্য। গোয়েন্দা ডেপুটি সুপার কেদারেশ্বর চক্রবর্তীকে চিনিয়ে দিতে হবে আমাকেই অপর দু'জন সঙ্গীকে। কিন্তু গাড়ী পৌছবার মুহূর্তে আমার ভীষণ কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেল। সঙ্গীরা আমাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেল। কেদারেশ্বর চক্রবর্তীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই আমাদের ইচ্ছে। কিন্তু নানা কারণে আর হয়ে ওঠে নি।

রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার এক প্রধান সেনাপতির নাম ছিল ক্রুপোট্‌কিন। মুকৃডেনের এক যুদ্ধে ঘেরাও হয়েও তিনি ধরা পড়েন নি। আমাদের খগেন-বাবুও নিজের ঢাকার বাড়ীতে এবং পলাতক অবস্থায় নানাভাবে পলায়ন করতে বিশেষ পটুত্ব অর্জন করেছিলেন এবং স্বভাবতই খুব সাবধানী ছিলেন বলে তাঁর সুরেশ নাম ত্যাগ করিয়ে রাখলাম ক্রুপোট্‌কিন।

আমি আর ত্রৈলোক্যবাবু কলকাতা-মফঃস্বল করে যাযাবরের মত থাকতে লাগলাম। এক জায়গায় তিনদিনের বেশী শুতাম না। আমার আর ত্রৈলোক্য-বাবুর জায়গায় যে দু'টি ছেলে থাকত দীনেশ বিশ্বাস ও মতিলাল (ওরফে হর্ষনাথ), তারা খুবই কর্তব্যনিষ্ঠ স্বল্পভাষী আড়ম্বরহীন ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র ছিল তখন কলকাতায় খুব প্রসিদ্ধ পুলিস-কর্মচারী। গোড়া থেকেই স্বদেশী দমনে ইংরাজের কাছে খ্যাতি অর্জন করে। প্রথম আলিপুর বোমার মামলায় যাতে শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি আসামী ছিলেন, তাতে তার খুব কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে। আমি যখনকার কথা বলছি (১৯১৩-১৪) তখন সে থাকত বর্তমান সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের একটা বাড়ীতে। বহু-সংখ্যক পুলিস এই বাড়ীটি পাহারা দিত। বারও হত রীতিমত

প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া স্থির হয়। তিনদিন বোমা পিস্তল নিয়ে তার অপেক্ষায় থাকা হ'ল, আমিও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। কিন্তু সে বাড়ীর বার হল না। পরে তার উপর আর আক্রমণ হয় নি।

আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, যখন যার উপর আক্রমণ হওয়ার কথা তখন যদি সে কাজ সমাধা না হয়ে থাকে তবে আর বড় একটা সে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয় নি। হয়ত কালক্রমে তার প্রাধান্য আমাদের কাছে কমে গেছে এবং অন্য কোন অধিক অনিষ্টকারীর দণ্ড দেবার প্রয়োজন হয়েছে, কিংবা সমিতির অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করতে হয়েছে।

১৯১২-১৩ সালে নলিনীকিশোর গুহ মহাশয়ের প্রভাবে কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় যুবক অনুশীলন-সমিতির সভ্য হন। এঁদের মধ্যে কেশব হেডগোয়ার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সরল, সৎ, নিষ্ঠাবান, আন্তরিক কর্মী বলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইনি ছিলেন নাগপুর অঞ্চলের লোক। পরবর্তীকালে এঁরই কর্মশক্তির ফলে এবং নেতৃত্বে সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক দল গঠিত হয় সারা ভারতে। তিনিই হন এর গুরুজী। এর আগে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন ১৯১০-১১ সালে।

১৯০৯-১০ সালের পর বোম্বাই প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বেরার অঞ্চলে বিপ্লবী দলের কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৭ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের অনুপ্রেরণায় এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র দেশে বিপ্লবী দল গড়ে উঠে। নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনের হত্যার পর এক ষড়যন্ত্র মামলা হয়। বিলাতে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিস ভারতবর্ষের দিকে রওনা হয়। পথে তিনি ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরে জাহাজ থেকে লাফিয়ে উপকূলে উঠে পালিয়ে যাওয়ার সময় ফরাসী পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ফরাসী সরকার প্রথম তাঁকে ব্রিটিশের হাতে দিতে অস্বীকার করে। পরে অবশ্য ব্রিটিশের হাতে সমর্পণ করেন। কেননা জার্মানীর ভয়ে ফ্রান্স তখন ভীত ও ইংরেজের সাহায্যপ্রার্থী।

লণ্ডনে কার্জন ওয়ালীওলালকার হত্যার পর মদনলাল ধীংড়া গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ফাঁসী হয়। সাভারকর এ সম্পর্কেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বহু লোক গ্রেপ্তার ও তাদের সাজা হওয়ায় মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী দল কিছুকালের জন্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

সাভারকরের দু'বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম, নেতৃত্বশক্তি ও ব্যক্তিত্বে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। বিলাতে থাকাকালীন তিনি ছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মেধাবী। পরে লালা হরদয়ালও বিলাতে সর্বাপেক্ষা ভারতীয় মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিগণিত হন। সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকরও দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিনায়ক সাভারকর ইউরোপে ভারতীয় বিখ্যাত বিপ্লবী নেতৃ মাদাম কামার সঙ্গে একযোগে বিপ্লববাদী কার্য করতেন। আমাদের প্রেরিত কেদারেশ্বর গুহ এই মাদাম কামার সঙ্গে প্যারীতে যোগ স্থাপন করেন।

মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী দল যখন সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয় তখন পূর্বোল্লিখিত মহারাষ্ট্র বন্ধুদের মাধ্যমে বিপ্লব পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করেছিলাম।

১৯১৩/১৪ সনেই রবীন্দ্রমোহন সেন কলকাতার রাস্তায় গ্রেপ্তার হন। তিনি তখন রিপন কলেজের ছাত্র ছিলেন। পুলিসের চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে ১০৯ ধারায় কারাদণ্ড দেওয়া সম্ভব হয়নি। এতে সমিতির কাজের খুবই ক্ষতি হল। তখন আবার ত্রৈলোক্যবাবুও কঠিন হাঁপানী রোগে ভুগছিলেন। অবশ্য রবিবাবু বাইরে থাকাকালীন বহুসংখ্যক গোয়েন্দা তাঁকে প্রকাশ্যে অনুসরণ করত, এক-রকম ঘিরেই রাখত বলা যায়।

তখন রাসবিহারীবাবু থাকেন চন্দননগরে এবং রোজ কলকাতায় এসে দলের কাজ করেন। উত্তর ভারতের চিঠিপত্র যথাসময়ে আসত। আবধ-বিহারী এক চিঠিতে পাঞ্জাবে দলের মধ্যে গলদ প্রবেশের আশঙ্কার কথা জানালেন। সুতরাং রাসবিহারীবাবু একটু সাবধান হলেন এবং গোয়েন্দা সুশীল ঘোষের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে খুব সতর্ক হলেন।

কয়েকদিন পরেই পাঞ্জাবে ও দিল্লিতে কয়েকজনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেলাম এবং জানতে পারলাম যে, দীননাথ নামে এক পাঞ্জাবী যুবক পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। তৎক্ষণাৎ রাসবিহারীবাবু আরও সতর্ক হলেন এবং সুশীল ঘোষের কাছে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল যে, দীননাথ রাসবিহারীবাবুর নামেও পুলিসের কাছে অনেক কথা বলেছে। রাসবিহারীবাবু নিজেই দীননাথকে দলভুক্ত করেছিলেন। দিল্লির আমিরচাঁদ, আবধবিহারী, বালরাজ, বালমুকুন্দ, হনুমন্ত সহায় এবং বসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতি আরও কয়েকজনের গ্রেপ্তারের সংবাদ এলো। রাসবিহারীবাবু সম্পূর্ণরূপে

আত্মগোপন করলেন এবং চন্দননগরেই থাকতে লাগলেন, কারণ তখন বৃটিশ পুলিসের পক্ষে এখানে যখন তখন গ্রেপ্তার করায় একটু অসুবিধা ছিল, অন্তত একটু দেরী হত।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা-বর্ষণ এবং লাহোরে গর্ডন সাহেবের উপর বোমা-বর্ষণ, দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলার প্রকাশ্য ঘটনা বলে গণ্য হল। এই গর্ডন সাহেবকে মৌলভীবাজারে (সিলেটে) আক্রমণ করতে গিয়েই যোগেন্দ্র চক্রবর্তী নিহত হয়। রাসবিহারী বসুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হল এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করার সহায়ককে প্রচুর পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় সরকার পক্ষ। এজন্য দেশীয় রাজন্যবর্গের অনেকে পুরস্কার ঘোষণা করে। পুরস্কারের টাকার মোট অঙ্ক দাঁড়াল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার।

এ সময়ে কলকাতায় আমার থাকা নিরাপদ নয় মনে করে আমিও কয়েক সপ্তাহ চন্দননগরে রাসবিহারীবাবুর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করি। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মহত্ত্ব, নির্ভিকতা ও ব্যক্তিত্ব আমাকে আরও বেশী আকৃষ্ট করল তাঁর প্রতি। এ সময়ে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের বিষয়ই বেশী আলোচিত হত। কেননা, তখন ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে আমাদের দলের প্রভাব অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছে। উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেক ক্যাণ্টনমেণ্টের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়ে এবং একযোগে ভারতবর্ষের বহুস্থানে আমাদের দলের সভ্য ও প্রভাবান্বিত জনগণকে নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিলাম। সেইসঙ্গে বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনাও আমাদের ছিল। রাসবিহারীবাবু শুধু বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করা উচিত মনে করতেন না। ভারতীয় বিদ্রোহী সৈন্যদলের উপরই বেশী আস্থা রাখতেন। তখন ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা করছিলেন এবং নানা গুজবও ছড়াচ্ছিল।

দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় আমিরচাঁদ, আবধবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস ও বালরাজের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।

কলকাতায় গোয়েন্দা পুলিসের তৎপরতা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরদের মধ্যে নৃপেন ঘোষ, সুরেশ মুখার্জি ও নলিনী মজুমদারের নাম আমাদের কানে খুব বেশী করে আসতে লাগল। আমাদের মধ্যে আলোচনা করার পর মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু ও শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয় যে, নৃপেন ঘোষকেই প্রথম প্রাণদণ্ড দেওয়া কর্তব্য পরে সুরেশ মুখার্জির ব্যবস্থা।

এই কার্যের জন্য নির্মল রায় (পরিচালক), খগেন চৌধুরী ও প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়। প্রথম গুলি করবে পরিচালক, খগেন চৌধুরী তার পরেই, আর প্রিয়নাথবাবু করবেন প্রহরীর কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর দুজন শরীররক্ষীসহ নৃপেন ঘোষ চিৎপুর ট্রামে যাচ্ছিল। আমাদের দল তাকে অনুসরণ করল। ট্রাম চিৎপুর ও শোভাবাজার ষ্ট্রীট সংযোগ স্থলে আসা মাত্রই নির্মল রায় নৃপেন ঘোষের দিকে রিভলবার তাক করে কয়েকবার ট্রিগার টেনেই ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথবাবুও। খগেনবাবু দেখলেন যে, নির্মল রায়ের রিভলবার থেকে গুলিই বেরোয়নি, নৃপেন ঘোষ অক্ষত আছে। সুতরাং তিনি আর কাল-বিলম্ব না করে নৃপেন ঘোষকে গুলি করলেন। নৃপেন ঘোষ পড়ে গেল, কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ সমাধা করবার জন্য তার মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করে ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়লেন।

চারদিকে তখন ভীষণ হৈচৈ। কেবল ধর ধর, আর মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ। আমাদের তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে গেল। প্রিয়নাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় শোভাবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে গঙ্গার দিকে ছুটলেন, নির্মল রায় চিৎপুর রোড ধরে কিছুদূর দক্ষিণে এসে মসজিদ বাড়ি ষ্ট্রীটে ঢুকতেই গ্রেপ্তার হলেন, আর খগেনবাবু ধীরপদে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন।

এদিকে আমি ও ত্রৈলোক্যবাবু আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের তেতলা ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছি খবরের জন্য। যতই বিলম্ব হচ্ছে, আমাদের চিন্তাও বেড়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য খগেনবাবু এসে সব বললেন। ধীর স্থির অবিচলিত অবস্থা দেখে তাঁকে প্রশংসা না করে পারলাম না।

একজন কেউ ধরা পড়লেই আমরা সতর্ক হতাম পাছে ধৃত ব্যক্তি পুলিসের অত্যাচারে স্বীকারোক্তি করে। সুতরাং সে রাত্রে আমাদের নির্দিষ্ট স্থানে না থাকাই স্থির করলাম। খগেনবাবু তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেলেন। আমি, ত্রৈলোক্যবাবু আর অনুকূল চক্রবর্তী (সে ঢাকা থেকে অনেক খবর নিয়ে এসেছিল), সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের 'বান্ধব বোর্ডিং'-এ আমাদের এক সভ্যের ঘরে রাত কাটালাম।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঘরে সেই রাতে ছিল দীনেশ বিশ্বাস এবং দেবেন গুহ। পরদিন সকালে সেখানে গিয়ে শুনলাম যে, রাতদুপুরে কয়েকজন ইউরোপীয়ান পুলিস অফিসার দুই একজন ভারতীয় অফিসারের সঙ্গে এসে, লাথি মেরে

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে ওদেরকে বিছানা থেকে টেনে তুলে দাঁড় করাল। পুলিসের পেছনে দাঁড়ান একজনকে জিজ্ঞেস করল এদের মধ্যে কেউ প্রতুল গাঙ্গুলী আছে কিনা। উত্তরে কি যেন বলল এবং তৎক্ষণাৎ ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ওরা তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। পরে জানতে পারলাম যে, ঐ পার্টিতে স্যার ক্লিভল্যাণ্ড, স্যার বুলার প্রভৃতি তখনকার দিনের বড় বড় সব পুলিস অফিসারই ছিল।

এ বাড়ির উপর নজর রাখবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হতে পারে এবং পুলিস আবার আসতে পারে। সুতরাং এ ঘর একেবারেই নিরাপদ নয় মনে করে আমরাও তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলাম। রাস্তায় রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা। তাঁর কাছে শুনতে পেলাম যে, তিনি আরও সকালে আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাসায় গিয়েছিলেন। কিন্তু উপরে উঠবার সিঁড়ির ধারে গোয়েন্দা অফিসার মধুসূদন ভট্টাচার্যকে দেখে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। সে রবিবাবুকে দেখতে পায়নি।

এমতাবস্থায় ভাল করে না জেনে ত্রৈলোক্যবাবুর পক্ষে বরানগরের বাসায় যাওয়া নিরাপদ নয়। খগেনবাবুকেও সাবধান করা প্রয়োজন, কিন্তু তার আত্মীয়ের বাসার ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না।

পরের দিন শুনতে পেলাম প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রবোধ দাশগুপ্ত ও আরও কয়েকজনকে পুলিস গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে গিয়েছে ; তারা তখনও ফিরে আসেনি। বুঝলাম আমাদের মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র ও সমিতির কাগজপত্র স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করা হল।

ত্রৈলোক্যবাবু বরানগরের বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন সদর দরজা খোলা। অথচ খগেনবাবু নিয়ম করেছিলেন যে, সদর দরজা কখনই খোলা থাকবে না। তিনি বার দুই ঘুরেও দেখেন সদর খোলাই আছে। সামনেই আর এক বাড়ির রকে কয়েকজন লোক বসে আছে। এরা গোয়েন্দা এবং ধরবার জন্যই ওৎ পেতে আছে সন্দেহ হওয়ায় ত্রৈলোক্যবাবু ফিরে এলেন।

পরে জানতে পারলাম যে, ঘটনার দিন রাতেই পুলিস আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ি থেকে সোজা বরানগরে চলে যায় খগেনবাবু ও ত্রৈলোক্যবাবুর খোঁজে। সেখানে তখন ছিল হর্ষনাথ চট্টোপাধ্যায় (মতি)। সে তখনই গ্রেপ্তার হয়, এবং খানাতল্লাসী করে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র এবং সারাই করবার সাজসরঞ্জাম নিয়ে যায়।

খগেনবাবুও কয়েকদিন পরেই বরানগরের বাড়িতে গ্রেপ্তার হলেন। রাত এগারটার সময় শেষ ট্রামে বাগবাজার টারমিনাসে নেমে তিনি হেঁটে বরানগর যান। সদর দরজায় হাত দেয়া মাত্র দরজা খুলে যাওয়ায় তাঁর সন্দেহ হয় এবং রাস্তায় গিয়ে কিংকর্তব্য চিন্তা করতে লাগলেন। এত রাতে যাবেনই বা কোথায়। ফিরে গিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলেন। সব অন্ধকার। নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে স্বগতোক্তি করলেন কি রকম লোক এরা, দরজা খোলা রেখে ঘুমুচ্ছে! ঘরে পা দেয়া মাত্র দরজার আড়াল থেকে দুজন লোক খগেনবাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরে আরও লোক এল। খগেনবাবু অনেকভাবে বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি ভুল করে এখানে ঢুকেছেন। তাঁকে ছেড়ে দেয়া হোক, পুলিস ঘুষ চাইল। তাঁর কাছে তখন মাত্র কয়েক আনা পয়সা। পুলিস বলল এতে ত একবোতলও মদ কেনা যাবে না। তিনি গায়ের কোটটা দিতে চাইলেন। তারা রাজী হল না। তাঁকে থানায় নিয়ে গেল।

খবরের কাগজে বেরুল বরানগরে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা ধরা পড়েছে। বিচারে খগেন চৌধুরী ও হর্ষনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তিন বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। খগেন চৌধুরীর নামে তখন রাজাবাজার বোমার মামলা চলছিল।

সে সময় ত্রৈলোক্যবাবুর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়ায় তাঁকে পুরীতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পাঠান হয়, সঙ্গে যান নলিনীকিশোর গুহ।

পূর্বেই বলেছি, নৃপেন ঘোষ হত্যার রাত্রিতে দীনেশ বিশ্বাস আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাসায় ছিল। সে তখন সমিতির গৃহত্যাগী সভ্য। দীনেশ খুব ধীর, স্থির, বাক্‌সংযমী, নিরহংকার এবং অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক ছিল। আমি যখন ঢাকা মিনার্ভা হোস্টেলে থাকতাম তখনই দীনেশ নোয়াখালী থেকে সমিতির কাজে এসে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করত। তখনই তার কর্মনিষ্ঠা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যাই হোক, আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের ঘটনার পর ওকে রাজসাহীতে সমিতির কাজে পাঠালাম। ওখানে আমাদের একটা মনোহারী দোকান ছিল। দীনেশ ফটো বাঁধাইর কাজ শিখে গিয়েছিল, সুতরাং ফটো বাঁধাই কাজ ও পরে ঘোলের সরবত বিক্রী সুরু হয়। নানা জায়গায় আমাদের এমনি দোকান ছিল। উদ্দেশ্য লোক এবং পুলিসের সন্দেহ এড়ান। ১০৯ ধারায় না পড়তে হয়। তাছাড়া কিছু আয় হলে স্থানীয় খরচাও কিছু নির্বাহ হয় এবং দোকান ঘরের পেছনে সমিতির একটা আড্ডা বসত। এ সমস্ত কারণে এগুলি আমরা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতাম এবং

খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করতাম। খুব বিশ্বাসভাজন, নিষ্ঠাবান এবং বাক্‌সংযমী লোক না হলে এ কাজের ভার দিতাম না। দীনেশ ছাড়া দোকান চালাবার জন্য ছিল মালদহের হংসগোপাল আগরওয়ালা। সে সমিতির কাজেই গৃহত্যাগ করেছিল।

দিনাজপুরেও আমাদের এমনি একটা দোকান ছিল। সেখানে প্রথম কাজ করে নেপাল, আসল নাম পুলিন মুখার্জি। সেও গৃহত্যাগ করেছিল। পরে অন্য এক দলে যোগদান করে এবং গ্রেপ্তার হওয়ার পর গোয়েন্দা পুলিসের কাছে সমস্ত স্বীকারোক্তি করে। তারপর সেখানে কিছুদিন কাজ করে প্রবোধ দাশগুপ্ত।

প্রবোধ আগরতলা থাকাকালীনই সমিতির সভ্য হয়। প্রথম থেকেই তার কর্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় সকলে মুগ্ধ হয়। ম্যাট্রিক পাশ করে প্রবোধ গৃহত্যাগ করে কিছুদিন ঢাকায় থাকে। তখন মৌলভীবাজার বোমা বিস্ফোরণে আহতরা নৌকোয় চিকিৎসিত হচ্ছিল। তাদের শুশ্রূষার জন্য খুব বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজনে প্রবোধই সে কার্যে নিযুক্ত হয়। পরে সে কলকাতা কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানকার বিশিষ্ট কর্মী হয়। ক্রমে উত্তরবঙ্গ, বিহার ও আসামে সমিতির কাজ করে। পরে ১৯১৮ সনে নলিনী ঘোষের নেতৃত্বে গৌহাটিতে পুলিসের সঙ্গে যে খণ্ডযুদ্ধ হয় তাতে প্রবোধ অংশ গ্রহণ করে। সংঘর্ষের সময় সে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে কপর্দকহীন অবস্থায় একশত মাইল পথ পায়ে হেঁটে নিরাপদ স্থানে চলে যায়।

ঐ সময় রাজসাহীতে প্রবোধ ভট্টাচার্য নামে একজন কলেজের ছাত্র সমিতির সভ্য হয়। তার আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠা দেখে, তাকে ভবিষ্যৎ নেতৃস্থানীয় কর্মী বলে বিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু, কুমিল্লার ললিতাসার গ্রামে ডাকাতির সময় সে সর্পাঘাতে মারা যায়।

সমিতির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আমি পুনরায় পূর্ববঙ্গে গিয়ে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, ময়মনসিংহ পরিভ্রমণ করলাম। চট্টগ্রাম গিয়ে যোগেন্দ্র ভট্টাচার্যকে তথাকার ভার অর্পণ করে নলিনী ঘোষকে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হল। ঠিক হ'ল তিনি প্রথমে পাবনা ও সিরাজগঞ্জে কিছুদিন অবস্থান করে রাজসাহী যাবেন এবং আমি পরে সিরাজগঞ্জ গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে কলকাতায় ফিরে যাব। প্রসঙ্গত এই সময়ই চট্টগ্রামে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড—আদিত্য দত্তের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয় এবং পরে বিচার হয়। এসব অবশ্য পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

পূর্বোল্লেখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি যেদিন ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জ ষ্টেশনে গেলাম, সেদিন নলিনী ঘোষকে ষ্টেশনে অপেক্ষা করতে না দেখে মনে হলো আমার কলকাতা ফিরে যাওয়াই উচিত। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, ষ্টেশনে গুপ্তচরদের আনাগোনা এতবেশী হয়েছিল যে, ঐ তারিখে কোন সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তির ষ্টেশনে যাওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না।

কলকাতা খুব ভোরেই পৌছলাম। সন্দেহভাজন নয় এমন একজন সভ্যের কাছ থেকে সব খবর জেনে তবে পার্টির আড্ডায় যাব ঠিক করলাম। এজন্য শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের চট্টল মেসে আমাদের সভ্য নগেন্দ্রবিজয় দত্তের (?) ঘরে তালাবন্ধ দেখে ফিরে আসব এমন সময় এক যুবক আমাকে জিজ্ঞেস করল, কাকে চান? আমার উত্তর শুনে সে আরেকজনের সঙ্গে আলাপ করে আমায় বলল, আছে, উপরে চলুন। আমি উপরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক যুবক আমায় ঘিরে নানা প্রশ্ন শুরু করল। বুঝতে বাকী রইল না এরা আমাকে গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করেছে। সে সময় অনেক ছাত্রহোষ্টেল, মেসে বহু নির্দোষ লোক গুপ্তচর সন্দেহে প্রহৃত হ'ত। আমাকেও মার খেতে হবে। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরোয়। আমার নামে তখন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার ওয়ারেণ্ট ঝুলছে। মার না হয় খেলাম, কিন্তু আসল পরিচয় বেরিয়ে গেলে গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা। তাছাড়া ওদের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গিয়ে পরিচয় দেয়াও সমীচীন নয়। সুতরাং শেষ চেষ্টা হিসেবে একেবারে মরিয়া হয়ে খুব জোর গলায় বললাম, আপনাদের কি মতলব শুনি? যান, সরে যান। এ কথা বলেই সিঁড়ির মুখে কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুতবেগে নেমে গেলাম। ওরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিছু ধাওয়া না করে। সন্ধ্যার পর অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে নগেন সেনের কাছে শুনলাম যে, তাদের হোষ্টেলেও একজন আগন্তুককে সন্দেহবশে খুব পিটিয়েছে। মারের চোটে সে অপরাধ স্বীকার করে রেহাই পায়।

আমি কলকাতা পৌছোবার দু'তিন দিনের মধ্যেই মদন ভৌমিক, নলিনী-কিশোর গুহ, লালমোহন দে এবং প্রফুল্ল ভট্টশালী (?) গ্রেপ্তার হলেন। মদন-বাবু সে সময় যশোর থেকে অসুস্থ হয়ে কলকাতা এসেছিলেন এবং পার্টির এক বাড়িতে থেকে চিকিৎসিত হচ্ছিলেন। পার্টির লোকেরাই তাঁর সেবা করত।

কয়েকটা ধরপাকড় এমন হল যে, সন্দেহ জাগল কেউ হয়ত ভিতর থেকে সংবাদ যোগাচ্ছে। সুতরাং আমি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনেরই আর একটা

বাড়িতে—যতদূর মনে পড়ে ৫ নং বাড়িতে, তেতলায় একটা ঘর ভাড়া করে থাকলাম। সঙ্গে থাকল আদিত্য দত্ত। নিজেরাই রান্না করে খেতাম।

পার্টির কোন সভ্যকেই আমার ঠিকানা জানালাম না কেবলমাত্র ক্ষিতীশ ব্যানার্জি ছাড়া। তার মারফতই সংবাদ আদান-প্রদান চলবে।

সন্দেহ হল নির্মল রায়ের উপর। কয়েকদিন পূর্বে সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে। তার পরিচিত সকলেই পুলিসের সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ গ্রেপ্তারও হল। অবশ্য সন্দেহের কথা নির্মল রায়কে বুঝতে দিলাম না। নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ পেলেই তাকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করতাম।

এদিকে ত্রৈলোক্যবাবু পুরী থেকে ফিরে এসেছেন। পার্টির আর গুপ্ত বাড়ি নেই। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িটাও শীঘ্র ছেড়ে দেয়া প্রয়োজন কেননা এটাও পুলিসের নজরে পড়বার উপক্রম হয়েছে। কারণ নলিনীকিশোর গুহকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় ও বাড়িরই আরেক ভাড়াটিয়া দেখে চিনে-ফেলেছিল। সে এসে আমায় বলল—"আপনাদের কাছে আসত এক ভদ্রলোক একটু খুঁড়িয়ে চলেন, তাঁকে দেখলাম পুলিসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।" আমি অবশ্য বললাম—"আপনি ভুল দেখেছেন।" অবশ্য বেশী তর্ক করলাম না। সুতরাং আমার এবং ত্রৈলোক্যবাবুর থাকার জন্য অবিলম্বে দুখানা ঘরের প্রয়োজন।

এই সময় মাখনলাল সেন মহাশয় কলেজ স্কোয়ারে এক মেসে থাকতেন। ওখানকার প্রায় সকলেই এককালে সমিতির সভ্য ছিলেন। খানাতল্লাস করে পুলিস ঐ মেসের সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। ওদের মধ্যে আমাদের বিশিষ্ট সভ্য শিশির রায়ও ছিলেন। সমিতি বেআইনী হওয়ার পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভারতবর্ষ পর্যটন করেছিলেন এবং যেখানেই যেতেন সেখানেই তিনি সমিতির আদর্শ প্রচার করতেন। সন্ন্যাসীর বেশেই তিনি গ্রেপ্তার হলেন।

একদিন আমার কাছে সংবাদ এলো রবিবাবু আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে চান। ভাবলাম বোধহয় ভাড়া করার উপযুক্ত কোন ঘর পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪, সকাল বেলা বের হলাম। তবে সতর্কতার জন্য ক্ষিতীশ ব্যানার্জিকে বললাম—"তুমি রবিবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো। আমার যাওয়া নিরাপদ কি-না। রবিবাবুর উপর তখন গোয়েন্দার প্রখর দৃষ্টি। বহু ওয়াচার তাঁকে নজরবন্দী করে রাখে। বাড়ির কি একটা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্ষিতীশ তখন যেতে চাইল না। ও সর্বক্ষণই সমিতির কাজ করত। তবে বাড়ির কাজও কিছু করে এও আমরা

চাইতাম। নতুবা অভিভাবকের সঙ্গে গোলমাল বাঁধবে। সেই ভেবে শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই রওনা হলাম।

রাস্তায় তারকেশ্বর গুহের সাথে দেখা হওয়ায় তাকেও সঙ্গে নিলাম। দুজন দুটি বাড়ি ভাড়া করবো। আমার পক্ষে বেশী কথা বলা ঠিক নয়। বাড়ি-অলাদের সঙ্গে তারকেশ্বরই কথা বলবে বেশী।

রবিবাবুর বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা এবং কথাবার্তা সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ও তারকেশ্বর গুহ পটুয়াটোলা লেন দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় কয়েকজন দৌড়ে এসে আমাদের গ্রেপ্তার করল। গ্রেপ্তারকারীদের প্রধান ছিল ইনস্পেক্টর কিরণ সেন। সে আমায় বলল—"পালাবেন না।" জবাবে বললাম—"না, যদি ভদ্র ব্যবহার করেন।" তখন সে নিজেই আমাকে ধরে চলতে লাগল যতটা সম্ভব আমার বিরক্তি উৎপাদন না করে।

আমার তখন প্রধান চিন্তা পকেটে কয়েকখানা জরুরী কাগজের জন্য। পুলিসের হাতে পড়লে খুবই বিপদের সম্ভাবনা। স্থানীয় কয়েকটা ঠিকানা ছাড়াও ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরের কয়েকটা নাম, ঠিকানা ও চিঠি ছিল। তার মধ্যে ছিল রাসবিহারীবাবুর চিঠি।

আমি নিতান্ত ভাল মানুষের মত চলতে লাগলাম। তাতে কিরণ সেনের কিছুটা ভরসাও জন্মাল। কিরণ সেন যে হাতটা ধরেছিল সেদিকেরই নীচের পকেটে ছিল কাগজগুলি আমি অন্য হাত বাড়িয়ে পকেটের মধ্যেই কাগজগুলিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে যতটা সম্ভব মিশিয়ে ফেললাম। যদি কিছু কাগজ ধরাও পড়ে তবু পড়বার অসুবিধে হবে। পরে ধীরে ধীরে কাগজের টুকরোগুলি মুখে পুরতে লাগলাম। মাঝে মাঝে থুথু ফেলার ভান করে কিছু কিছু কাগজ ফেলে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহু সাদা পোশাকধারী পুলিস চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

আমাকে, তারকেশ্বর গুহর কাছ থেকে আলাদা করে মুচিপাড়া থানায় নিয়ে গেল। আমাকে থানায় পৌঁছে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কিরণ সেন চলে গেল। বোধকরি গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে।

থানায় তখন দু'চারজন কনেষ্টবল ঘোরাফেরা করছে। দারোগাবাবুরা তখনও এসে বসেননি। মুখ্য কনেষ্টবল বা ঐ জাতীয় কর্তৃপক্ষ কেউ ভেবেছিল আমি বোধ হয় চোর, মাতাল বা বদমায়েস জাতীয় কেউ। সারারাত নষ্টামি করে এখন ধরা পড়ে এখানে এসেছি। তাই আমাকে কোথায় রাখবে জিজ্ঞেস

করায় হুকুম হল—যেখানে আর সব আছে সেখানে নিয়ে যাও। এক কনেষ্টবল আমাকে দেখিয়ে দিল ওপরে ওঠবার সিঁড়ির নীচে একটা বসবার যায়গা। ওখানটায় জনকয়েক লোক বসাই ছিল। তাদের কাছে প্রহরীও ছিল। আমি ভাবলাম মন্দ নয়, এদের সঙ্গে আলাপ করে যদি বাইরে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু ক্ষণিকেই বুঝতে পারলাম এরা চোর, বদমায়েস আর মাতাল। ওদের মধ্যেই একজন ভদ্র গোছের পোশাক পরিহিত যুবকের সাথে আলাপ করব বলে স্থির করলাম। সেই প্রথম কথা বলল, "আপনাকেও ধরে নিয়ে এলো? দেখলেনত পুলিসের কি রকম অত্যাচার! আমাকেও মশাই, হারকাটার গলি থেকে নিয়ে এলো। চুরিও নয়, ডাকাতিও নয়। নিজের পয়সায় মদ খেয়ে, নিজের পয়সা খরচা করেই ফুর্তি করছিলাম একটা মেয়ে মানুষের ঘরে। কারুর কোন ক্ষতি করিনি! কিন্তু, তবু, এখনও কি ছেড়ে দেবে না? আপনার কেস কি মশাই?"

তার মুখ থেকে তখনও মদের গন্ধ বেরুচ্ছিল। আমি যেই মাত্র বললাম "আমার নামে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল...", কথা শেষ করতে না দিয়েই উত্তেজিত হয়ে সে বলল "ঠিক বলেছেন কনস্পিরেসী, ষড়যন্ত্রের ব্যাপার! তা নইলে আমাকে ধরবে কেন? বাপের পয়সা চুরি করে ফ্রেণ্ডকে মদ খাইয়েছি। ফুর্তি করার টাকাও জুগিয়েছি। সে শালাই আমাকে ফ্যাসাদে ফেলেছে। সেইত হাঙ্গামা বাধালে। পরে সব দোষ আমার ঘাড়ে। আপনাকে সব খুলে বলছি।"

আমার আর শোনবার ধৈর্য ছিল না। এদের কথাবার্তা, সংসর্গ খুবই বিশ্রী লাগছিল। মনে হচ্ছিল জেলখানা নরকস্থান, এই বুঝি তার আরম্ভ।

এক তালাভাঙ্গা চোর বলল, "কি মশাই ভদ্রলোক, সিগারেট-টিগারেট আছে? না থাকেত পয়সা বার করুন। পাহারাঅলাকে দিয়ে আনিয়ে দিই। এরা সব আমার জানা, খাতির করে। আপনি নতুন কিনা, অনেক চাপ দেবে।" তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল—"পয়সা-টয়সা থাকেত এই বেলা সরিয়ে ফেলুন। বরং আমার হাতে দিন, কেউ জানতে পারবে না।"

নানা জনে নানা প্রশ্ন পরামর্শ দিতে লাগল। আমি চুপ করেই রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে কিরণ সেন এসে আমাকে ওদের মধ্যে দেখেই চমকে উঠলেন। সে সময় একজন দারোগা এসে এক ঘরে বসেছিল। কিরণবাবু খুব উত্তেজিত

হয়ে তাকে বলল, "একি করেছেন আপনারা? বড় সাংঘাতিক লোক। ওকে এদের সঙ্গে বসিয়েছেন! যদি পালিয়ে যায়? একটি মাত্র পাহারা! একি সেই রকম বন্দী নাকি! এক্ষুণি আলাদা করে খুব কড়া পাহারা দিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখুন।"

তারপর অফিস ঘরেই একটা চেয়ার দিল বসবার জন্য। আধঘণ্টা বাদে আমাকে নিয়ে গেল রয়েড ষ্ট্রীটে গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে (Head Quarters)। সেখানে প্রথমে টেগার্ট সাহেব এবং আরও কয়েকজন ইউরোপীয়ান অফিসার একত্রে নানা প্রশ্ন করল। আমার উত্তর তাদের পছন্দসই না হওয়ায় খুব ক্রোধ প্রকাশ করল।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। টেগার্ট সাহেবের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে যে ঘরে বসতে দিয়েছিল তা' ছিল বাঙ্গালী অফিসারদের বসবার ঘর। ঐ সময়ে একজন অফিসার যতদূর মনে পড়ে নাম স্থবোধ চক্রবর্ত্তী, আমার চেয়ারের ধারে এসে চারিদিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বললেন—"খুব শক্ত থাকবেন, একটুও ভয় পাবেন না। যে যাই জিজ্ঞেস করুক, খুব সাবধানে উত্তর দেবেন।" এই কথা বলেই তিনি সরে গেলেন। তাঁর কথা খুব আন্তরিকতা-পূর্ণ মনে হ'ল। আমি ভাবলাম এরূপ অফিসার আই বি অফিসে থাকলে খুব উপকার হয়। কোন নতুন লোক যদি এমনি শত্রুপুরীতে এসে একটুও ঘাবড়ে যায় তবে এমনি লোকের একটা কথাতে তার মনোবল ফিরে আসবে! আমি তাঁকেই জবাবে বলেছিলাম—"আমি কিছুই জানি না। কি আর বলব। আমাকেত বোধহয় জানেন, অন্তত আমার সম্বন্ধে শুনেছেনত নিশ্চয়।" তিনি আমাকে বলেছিলেন—"হ্যাঁ এরকমই চাই।" তারপর সারাদিন আর ঐ অফিসারটিকে দেখতে পেলাম না।

আমাকে একবার নিয়ে গেল লোম্যান সাহেবের কাছে। তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলেন আমার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে। আমার বক্তব্য লেখার পর মন্তব্য করলেন "all rubbish" (সব ঝুটা)। এই বলে কাগজ ছিঁড়ে ফেললেন।

বর্তমান স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ষ্ট্রীটে কর্পোরেশন দালানের উল্টোদিকে ছিল ফেরিক বাজার পুলিস ফাঁড়ি। বিকেলে আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। প্রধান অফিসঘরের পাশেরটাতেই আমাকে আবদ্ধ করল। দরজায়, জানালার ধারে, এবং ঘরের মধ্যে তিনটি কনেষ্টবলের প্রহরার ব্যবস্থা হ'ল। ঘরের মধ্যেরটি

আমার সঙ্গে তালাবদ্ধ হ'তে একটু আপত্তি করা মাত্র প্রচণ্ড ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

ঐ ঘরে আমাকে থাকতে হয়েছিল চারদিন। কিছুই খেতে দিত না। স্নান করতে পারতাম কিন্তু একবস্ত্রে ছিলাম বলে স্নানও করতে পারিনি। দারোগা, পরিদর্শন-রত বড় অফিসার, কলকাতার পুলিস কমিশনার হেলিডে সাহেব, সকলের কাছেই খাবার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কেউ সদুত্তর দেয়নি। বলত "হ্যাঁ, দেখি, কি করা যায়।" একদিন সন্ধ্যার পর পূর্বোল্লিখিত গোয়েন্দা অফিসার সুবোধ চক্রবর্তী জানালার ধারে এসে দাঁড়াতেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম "কি ব্যাপার বলুন ত?" তিনি বললেন, "বুঝতেইত পারছেন। আমিত আপনাকে আগেই বলেছি শক্ত থাকতে হবে।" এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। বুঝতে বাকী রইল না ওরা আমাকে অনাহারে রেখে মন দুর্বল করতে চায়। ঠিক আছে, খাবার আর চাইবই না। তারপর থেকে যে কদিন ছিলাম আর খাবারের কথা উল্লেখ করিনি। কোন অফিসার খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলেও এড়িয়ে অন্য কথা বলতাম।

চারদিন পর আমাকে কিড্ স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির করল। বরিশালে পাঠাবার হুকুম দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। কোর্টঘর ভর্তি উকিল ও অন্যান্য লোক। তিল ধারণের স্থান ছিল না। লোককে জানাবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বললাম যে, আমাকে চারদিন অনাহারে রাখা হয়েছে এবং তা আইনসিদ্ধ কিনা! তখন লোম্যান সাহেব আমার কাছে এসে বললেন, "অত্যন্ত দুঃখিত, তুমি আমাকে একটুও জানাওনি কেন?" জবাবে বলেছিলাম, "যাদের হুকুমে না খাইয়ে রেখেছিলে তাদের কাছেই নালিশ করব? ভেবেছিলে এভাবে দুর্বল করে দেবে! পেরেছ?" কোর্টের হুকুম হল আমাকে লালবাজার পুলিস সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া এবং তথায় আমার আহারের ব্যবস্থা করার।

একজন বাঙালী দারোগা এবং বেলচার নামক এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান আমাকে লালবাজারে নিয়ে চলল। বেলচার কোর্টে আমার কথা শুনেছিল। সে বলল—"চল, রাস্তায় কোন দোকানে বসিয়ে তোমাকে খাওয়াব।" বাঙালী দারোগা ভদ্রলোক বললে—"ওর খাওয়ার খরচাটা আমি দেব। অভুক্ত ব্রাহ্মণ, খাওয়ালে পুণ্য হবে।" ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ের কাছে একটা দোকানে বসে খেয়েছিলাম। পরবর্তী জীবনে ওপথ দিয়ে যেতে ঐ দোকানটা নজরে পড়ত।

লালবাজার গিয়ে শুনলাম লক্ আপের (Lock up) সমস্ত ঘর রাজনৈতিক বন্দীতে ভরা। রাজনৈতিক বন্দীদের একত্রে রাখত না। প্রত্যেককে আলাদা ঘরে। চোর-গুণ্ডাদের জন্য ছিল একটা ঘর। আমাকে সেখানেই রাখল। তখন সেই ঘরে আবদ্ধ ছিল একটা দুর্দান্ত পাগল। আর কেউ ছিল না। চিৎকার করে, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করে ঘরটাকে একেবারে নরককুণ্ড করে তুলল। আমার জীবন করল দুর্বহ।

আমার সামনের সেলএ (cell) এক মাড়োয়ারী যুবক আবদ্ধ ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। তিনি আর কেউ নন, প্রসিদ্ধ শ্রীপ্রভুদয়াল হিম্মত সিংকা মহাশয়। রোড্ডা অস্ত্র চুরির (Rodda Arms Theft Case) মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি থেকে খাবার এসেছিল তিনি তাঁর অংশ আমায় দিলেন। একথা কোন দিনই ভুলিনি।

খাওয়ার সময় একবার তালা খুলে জলের কলের কাছে যেতে দিয়েছিল। সেই সুযোগে দেখা হল লালমোহন দে এবং সন্ন্যাসীবেশী শিশির রায়ের সঙ্গে। খুবই আনন্দিত হলাম। বিশেষ করে শিশির রায়ের সঙ্গে দেখা হল অনেক দিন বাদে। তিনি সমিতির শ্রেষ্ঠ কর্মীদের অন্যতম। এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি খুব কম লোকেরই দেখেছি। এক পয়সা সম্বল না করেও তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছিলেন।

সেইদিনই রাত্রি দশটার পর আমাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে নিয়ে গেল। কোমরে দড়ি ও হাতকড়া দিয়ে। হাঁটিয়েই নিয়েছিল। চাপালো বরিশালগামী ট্রেনে। পরদিন পৌঁছলাম বরিশালে। ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে আমাকে নিয়ে গেল বরিশাল জেলে।

এই আমার প্রথম কারাগারে প্রবেশ। আমাকে নিয়ে যাওয়াটা একটা হিংস্র জানোয়ার রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত হয়েছিল। কেননা কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়ি। দড়ির একপ্রান্ত একজন কনেষ্টবলের হাতে। সে অবস্থায় দিনের বেলায় একবার ম্যাজিষ্ট্রেট, আবার কোর্ট, থানা প্রভৃতি স্থান পদব্রজে পরিক্রমা করে তবে জেলে ঢুকিয়েছিল।

জেলের দরজাতেই জেলার সাহেব নিজহাতে আমার শরীর তল্লাসী করলেন। কাপড় ও পাঞ্জাবী খুলিয়ে গেটে জমা করালেন। পরতে দিলেন একহাত চওড়া এক কাপড়ের টুকরো। গা রইল নগ্ন। সে অবস্থায় আমাকে জেলের ভিতরে এক নির্জন সেলে তালাবদ্ধ করে রাখল।

একদিন সকালে জেলার কয়েকজন জমাদার আর সিপাইসহ এসে সেল থেকে আমাকে বাইরে নিয়ে চলল। কোথায় এবং কেন তা জেলের বন্দীরা জিজ্ঞেস করতে পারে না। করলেও জবাব পায় না। আমাকে একজায়গায় নিয়ে গিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড় করাল সনাক্তকরণের জন্য। উপস্থিত ছিল জেলার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট কাগজ-পত্র নিয়ে, আর তখনকার দিনের নামজাদা গোয়েন্দা অফিসার কারবেট (Carbett) সাহেব। একজন লোককে ভুবার আমাদের লাইনের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল "চিনতে পারলে?" সে জবাবে বলল—"ঠিক চিনতে পারলাম না।" আবার ওকে ভাল করে দেখতে বলে জিজ্ঞেস করলে, "ঠিক ঠিক না হলেও, কাকে মনে হয় বল।" সে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, "একে মনে হয় তবে নিশ্চয় করে বলতে পারছি না। তার চোখে চশমা ছিল।"

সনাক্তকরণ শেষ হলে কারবেট সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি চশমা ব্যবহার করতাম কিনা আমি অস্বীকার করায় জানাল যে, গ্রেপ্তারের সময় আমার কাছে চশমা পাওয়া গিয়েছিল।

কেন এই সনাক্তকরণ এ কথা জিজ্ঞেস করলে কারবেট সাহেব বলল— "তুমি এ লোকটিকে চেন। কাশীতে তুমি এর সঙ্গে বৃটিশের বিরুদ্ধে কথা বলেছ। তখন তুমি অনুশীলন সমিতির কাজে কাশী গিয়েছিলে। সেখানে কি কি করেছিলে, সব সংবাদই আমরা জানতে পেরেছি।" এই কথা বলবার সময় তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আমার মুখে কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখবার জন্য। তিনি আরও জানালেন যে, অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শিগগিরই মোকদ্দমা হবে এবং সকলকেই গুরুদণ্ড দেওয়া হবে। একটু হেসে আমি জানতে চাইলাম—আমাকেও যেতে হবে নাকি? উত্তরে জানালেন—খুব সম্ভব। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা যদি না চালানো হয় তবে সেখানেই আমাকে যেতে হবে।

সনাক্তকরণের জন্য যে লোকটি এসেছিল তার নাম অন্নদা ভট্টাচার্য। কাশীতেই সমিতির সভ্য হয়। আমার সঙ্গে আলাপ হয় আমি যখন প্রথম কাশীতে সমিতির কাজ পরিদর্শন করতে যাই। ওরা ছিল কাশীর স্থায়ী বাসিন্দা।

অন্নদা ভট্টাচার্য প্রথমে পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করে। পরে ওর মনের দুর্বলতা দূর হয়ে যায় এবং শুধু কোর্টে সাক্ষী দেওয়ার সময় সমস্ত স্বীকারোক্তি

অস্বীকার করে। ফলে কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় ও আসামী হয়ে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

মাঝে মাঝে আমাকে কোর্টে নিয়ে যেত। সেখানে আমাদের উকিল মনোরঞ্জনবাবু এবং শ্রীশবাবুর কাছে জানতে পারলাম যে, কাশীতে খুব বড় একটা যুদ্ধোদ্যমের মামলার আয়োজন হয়েছে। শচীন সান্যাল, গিরিজা এবং আরও অনেকে নানা জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে। রাসবিহারীবাবুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। আরও জানতে পারলাম যে, মনিলাল নামে এক গুজরাটি যুবক এবং হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙালী যুবক পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করে রাজসাক্ষী হয়েছে।

এই কাশী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম পলাতক আসামী নরেন ব্যানার্জি পরে গৌহাটি খণ্ড যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নলিনী ঘোষের নেতৃত্বে। সেখানে সে গ্রেপ্তার হয়।

জেলে বসেই সংবাদ পেলাম যে, মুসলমানপাড়া লেনে গোয়েন্দা বসন্ত চ্যাটার্জির বাড়ির উপর আক্রমণ হয়েছে। ত্রৈলোক্যবাবু পুরী থেকে ফিরে আসার পর এবং আমার গ্রেপ্তারের পূর্বেই বসন্ত চ্যাটার্জির বাড়ি আক্রমণ করার প্ল্যান হয়। ওর বাড়ি ছিল মুসলমানপাড়া লেনের মধ্যে তিন রাস্তার মোড়ে। বাড়িটার অবস্থান এবং পার্শ্ববর্তী রাস্তাগুলি কোন্‌টা কোন্‌দিকে গেছে তা ভালকরে হেঁটে দেখে এলাম। পরে ত্রৈলোক্যবাবুও ভালকরে আর একবার সব পর্যবেক্ষণ করে এলেন।

উদ্দেশ্য এই যে, সন্ধ্যার পর তার বাড়িতে বড় বড় অফিসারদের বৈঠক বসে। এদের শরীররক্ষীরাও তখন উপস্থিত থাকে। এখানে আক্রমণ করতে পারলে অনেক অপরাধীকে শাস্তি দেয়া যাবে।

আমরা স্থির করেছিলাম যে, দুদলে বাড়ি আক্রমণ করবো, প্রথম দল একটার পর আর একটা বোমা নিক্ষেপ করে পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে ঘরে ঢুকবে। আক্রমণ ও পলায়ন উভয় পথই পূর্বে নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রথম আক্রমণ শেষ হওয়ার সংবাদ পেয়ে নিশ্চয়ই বহু বড় বড় গোয়েন্দা অফিসার আসবে সরজমিনে তদন্ত করতে। তখন হবে দ্বিতীয় আক্রমণ।

এ কাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই আমি গ্রেপ্তার হলাম এবং কিছুদিন পরে ত্রৈলোক্যবাবুও। তাঁর গ্রেপ্তারের দিন কিংবা পরের দিন এ আক্রমণ হয়। জেলে বসেই খবর পেলাম গোয়েন্দাদের মধ্যে দু একজন নিহত আর কেউ কেউ

আহত হয়েছে। একজন আক্রমণকারী বোমা বিস্ফোরণে আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা অবস্থায় গ্রেপ্তার হয় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নগেন্দ্র সেন আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছে।

নগেন্দ্র সেন গ্রেপ্তার হওয়াতে আমরা খুবই দুঃখিত হলাম। সে এ আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে না বলেই স্থির ছিল। কারণ সে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখছিল অধ্যাপক সুরেশ দত্তের কাছে। আমি এবং ত্রৈলোক্যবাবু বাইরে না থাকাতে এবং নগেন্দ্র সেনের উৎসাহাধিক্যে এ ঘটনা ঘটে। হাইকোর্টের মোকদ্দমায় অবশ্য নগেন্দ্র সেন মুক্তিলাভ করে। এ মোকদ্দমায় বিচারপতি ছিলেন স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিচারপতিগণ তাঁদের রায়ে পুলিসের মিথ্যাচারের খুব নিন্দা করেছিলেন।

যে দুটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল তা এত শক্তিশালী ছিল যে, সামনের বাড়ির ছাদের উপর একজন লোক আহত হয়। আক্রমণকারীদেরও অনেকে আহত হওয়ায় তাদের অপসারণকার্যে ব্যাপৃত হওয়ায় আর দ্বিতীয় আক্রমণ সম্ভব হয়নি।

যাই হোক, ত্রৈলোক্যবাবুর গ্রেপ্তার হওয়ার পর একে একে গ্রেপ্তার হয়ে এলেন রমেশ চৌধুরী, খগেন চৌধুরী, মদন ভৌমিক প্রভৃতি পলাতক আসামীগণ। খগেনবাবুত কয়েদীর পোশাকেই এলেন। কারণ বরানগর অস্ত্র-নির্মাণ মামলায় তখন তাঁর তিনবৎসর কারাদণ্ড হয়েছে।

কিছুদিন পরেই Supplementary Conspiracy Case আরম্ভ হল। আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন যেসব উকিল তাঁরা হলেন বরিশালের শ্রীশরৎ ঘোষ ও শ্রীরমেশ ব্যানার্জি, ঢাকার শ্রী শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জি। কলকাতা থেকে এলেন ব্যারিষ্টার বি. সি. চ্যাটার্জি। সরকার পক্ষ সমর্থন করেন বরিশালের উকিল শ্রীচাঁদমোহন চ্যাটার্জি, রাজেন্দ্র ব্যানার্জি এবং আরও একজন। কলকাতা থেকে আসেন ব্যারিষ্টার এন. গুপ্ত এবং হাইকোর্টের উকিল ফজলুল হক্।

এ মোকদ্দমায় আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল আই. পি. সি. ১২১এ এবং আরও দু'একটা ধারার। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম এবং বৃটিশ ভারতের শাসনাধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করাই (Conspiracy to wage war against the King emperor and to deprive His Majesty of the Sovereignty of British India) ছিল মূল অভিযোগের ধারা। এই

মোকদ্দমায় যে সমস্ত দলীয় লোক স্বীকারোক্তি করে রাজসাক্ষী হয়েছিল তারা হ'ল, ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর যামিনীমোহন দাশের পুত্র গিরীন্দ্র-মোহন দাশ, বরিশালের রজনী দাশ এবং ঢাকা বিক্রমপুরের প্রিয়নাথ আচার্য। সমিতির পুরাতন সভ্য, রজনী দাশকে প্রথম স্বীকারোক্তি করায় বরিশালের উকিল শ্যাম দত্ত।

মোকদ্দমার রায় বেরোয় ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে। বিচারক ছিলেন সেসন জজ কারমাইকেল, আই. সি. এস.। তাঁর দুজন বেসরকারী পরামর্শদাতা ছিল। এদের জুরীর অধিকার ছিল না। বিচার শেষে এরা মত প্রকাশ করে যে, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও মদন ভৌমিক দোষী এবং খগেন চৌধুরী সন্দেহজনক। প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরী নির্দোষ। কিন্তু জজের রায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ১৫ বছর দ্বীপান্তর আর মদন ভৌমিক, খগেন চৌধুরী, রমেশ চৌধুরী ও প্রতুল গাঙ্গুলী প্রত্যেকের ১০ বছর দ্বীপান্তর দণ্ড। কারাদণ্ড সশ্রম।

দ্বীপান্তর বাসের হুকুম শুনে কারাগারে ফিরবার অল্প সময়ের মধ্যেই জামা-কাপড় ছাড়িয়ে পরিয়ে দিল কয়েদীর পোশাক—ক্ষুদ্র জাঙ্গিয়া, হাফ্ প্যাণ্টের চাইতে ছোট এবং কুর্তা। পায়ে শিকলি বেড়ি রিভেট্ করা (rivet), গলায় লোহার বেড়ি (হাঁসুলী), তাও রিভেট্ করা। খুলতে হলে কাটা ছাড়া উপায় নেই। গলার হাঁসুলীতে ঝুলিয়ে দিল পুরু ত্রিকোণ কাঠের মাদুলী। খোদাই করা রইল কারাদণ্ড আর মুক্তির তারিখ। গায়ে দেয়া আর বিছানার জন্য দুখানা কম্বল। বাসন-কোসন—একটা করে লোহার থালা ও বাটি। একটু জল লাগলেই জং ধরে যেত।

দিনের বেলা আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে দিলেও রাত্রিবাস করতে হ'ত আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে। কাজ ছিল পাথরের চাকি ঘুরিয়ে ডাল পেষাই এবং কুলো দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করা। দিনের বরাদ্দ একমণ ডালের উপর!

প্রত্যেক জেলেই তখন কয়েদীদের উপর দিবারাত্রি অমানুষিক অত্যাচার চলত। ১৯২০ সালে কারা সংস্কারের (Jail Reforms) পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়।

দণ্ডাদেশ পাওয়ার সাতদিনের মধ্যেই বদলি হলাম কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে। আমাদের পাঁচজনের দুজন করে একসঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে দিল। এছাড়া প্রত্যেকেরই দুহাতে হাতকড়া। তারপর পাঁচজনকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধল। কম্বল আর থালাবাটি নিতে হল হাতে।

প্রেসিডেন্সী জেলার সাহেব শিকলি বেড়িটা তত নিরাপদ মনে না করে কঠিনতর ব্যবস্থা করলেন। ওগুলো কেটে ফেলে ডাণ্ডাবেড়ির (Bar fetters) ব্যবস্থা হ'ল। এটা করলেন জেলের দরজাতেই। এই বেড়ি দেয়ার ব্যবস্থার মধ্যে অবশ্য আড়ুয়া বেড়িই ছিল কঠিনতম (Cross fetters)। গুরুতর অপরাধীদেরই জেলের সাজা হিসেবে এসব পরানো হ'ত। আমাদের বেলায় এগুলোর প্রয়োগ অবশ্য নিরাপত্তার জন্য, যাতে পালিয়ে যেতে না পারি। কেননা এমতাবস্থায় ইচ্ছামত হাঁটাচলা বা শরীর চালনা করা যেত না। অবশ্য দিনের বেলায় যাতে কোন প্রকারে হাঁটতে চলতে পারি তার সুবিধার জন্য এই ডাণ্ডাবেড়ি কোমরে চামড়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। সন্ধ্যাবেলা আবার খুলে নিয়ে যেত। যদি ওর সাহায্যে পালাই!

বাস করতে দিয়েছিল কুখ্যাত চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে (44 cells)। সম্পূর্ণ নির্জন। পাঁচজনকে এক-একটা আলাদা আলাদা সেলে। চব্বিশ ঘণ্টাই ওখানে থাকতে হ'ত। কারুর সঙ্গেই কারুর দেখা হওয়ার আর কোন উপায়ই রইল না।

ওখানে কাজ পেলাম প্রথমে পাট ফেসাই। পরে চটের বস্তা তৈরী। এটা ছিল কঠিন কাজের মধ্যে একটা।

এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে কয়েক মাস থাকার পর আমাদের নিয়ে গেল লোহার শক্ত জালে তৈরী খাঁচায় (Cubical cells)। পরিসর অতি সামান্য। কোনমতে একটা মানুষ শুতে আর দাঁড়াতে পারে। এর মধ্যেই থাকত আবার আমাদের মলমূত্র ত্যাগের দুটো বেতের টুকরি। একজনের বেতের টুকরি আর একজনের মাথার কাছে! এগুলিতে সাধারণত থাকতে দিত জেল অপরাধে সাজা দেওয়ার জন্য, আর দুর্দান্ত গুণ্ডা-বদমায়েসদের। নববিধানে এলাম আমরা পাঁচজন। এখানে এসে একটা বিষয়ে আমরা খুশী হলাম। কারণ জালের ফাঁক দিয়ে পরস্পরকে দেখতে পেতাম। গুণ্ডা-বদমায়েসরাও পাশাপাশি।

এখানে এসেই প্রথমে দেখতে পেলাম পুরাতন কয়েদীরা কেমন করে গলার মধ্যে খুপরি তৈরী করে নেয় টাকা রাখবার জন্য। বাইরের লোক তা গলা না কেটে বার করতে পারত না। কিন্তু কয়েদী নিজের সুবিধেমত বার করতে পারত।

কয়েকমাস পর আবার চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে বদলি হলাম।

১৯১৬ সালের জুলাই মাসে হাইকোর্টের রায় বেরুল। আমি ও রমেশ চৌধুরী নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তির আদেশ পেলাম। ত্রৈলোক্যবাবুর পনেরো বছরের জায়গায় হ'ল দশ বছর। মদনবাবুর দশবছরই রইল। খগেন চৌধুরীর বরানগর অস্ত্র আইনের মামলায় তিন এবং বরিশাল মামলায় দশ এই মোট তের বছরের জায়গায় দশবছর। এ দুই সাজা একই সঙ্গে (Concurrently) চলবে এই হুকুম হ'ল।

হাইকোর্টের মুক্তির আদেশ জেলখানায় পৌছলে আমাকে আর রমেশ চৌধুরীকে জেল-অফিসে নিয়ে বেড়ি কেটে কয়েদীর পোশাক ছাড়িয়ে নিজেদের কাপড়-জামা পরতে দিল এবং খালাস করে জেলের দরজায় নিয়ে গেল। সেখানেই অপেক্ষা করছিল ইনস্পেক্টর কালিসদয় ঘোষাল গোয়েন্দা পুলিসসহ। সেখানেই আমরা গ্রেপ্তার হলাম ভারত রক্ষা আইনে (Defence of India Act) এবং ফিরিয়ে নিয়ে গেল সেই চুয়াল্লিশ ডিগ্রির নির্জন সেলে।

কিছুদিনের মধ্যেই, ১৯১৬, আগস্ট মাসে আমি ও রমেশ চৌধুরী বদলি হলাম আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে আমাদের আলাদা আলাদা করে রাখল জুডিসিয়াল সেল-এ। এগুলিও নির্জন।

এখানে বদলি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ১৮১৮-র রেগুলেশন থ্রি (Regulation III of 1818) অনুসারে রাজবন্দী হলাম।

আমাদের জুডিসিয়াল সেল থেকে নিয়ে গেল ইউরোপীয় সেলে। এগুলিতে থাকত ইউরোপীয় কয়েদী। ওরা ভারতীয়দের চাইতে বেশী ভাল থাকত। কলকাতা চীনাবাজারের আফিং চোরাকারবারীরাও ইউরোপীয়ানদের সুবিধা ভোগ করত।

এখানে আমরা প্রায় কুড়ি-বাইশ জন রাজবন্দী ছিলাম ভিন্ন ভিন্ন কুঠরীতে। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ ছিল, কিন্তু দূর থেকে দেখা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারত না।

আমাদের প্রহরী থাকত ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার এবং গুর্খা সৈন্য। কোন ভারতীয় প্রহরী বা জেল-অফিসার আমাদের কাছে আসতে পারত না। বিশেষ প্রয়োজনে কেবল বাঙালী ডাক্তার আসতে পারত। তাও ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার থাকত সামনে পাহারায়, আর কথা বলার নিয়ম ছিল ইংরেজীতে।

সে সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন কর্নেল মুলভেনি (Col. Mulvany)। জাতে আইরিশ। সে সময়কার ইউরোপীয়ান

সুপারদের মধ্যে সৎ, বিবেচক ও স্বাধীনচেতা। রাজবন্দীদের বেলাতেও তিনি এমনি মনোভাব নিয়ে চলার ফলে তাঁকে অনেক বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। তাঁর আর পদোন্নতি ঘটল না। যোগ্য হয়েও ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিসন্ আর হতে পারলেন না।

প্রথমদিকে 'যুদ্ধবার্তা' ছাড়া আর কোন সংবাদপত্র পড়তে দেয়া হ'ত না। সরকারই ছিল এ কাগজের প্রকাশক। তাতে ছাপা হ'ত যুদ্ধে ক্রমাগত ইংরেজের জয় ও জার্মানীর পরাজয়। অশুদ্ধ বিদ্ঘুটে ভাষায়। আর কোন সংবাদই থাকত না। ১৯১৮ সালে ইংরেজের যুদ্ধ জয়ের পর আমাদের ইংলিশম্যান ও স্টেটস্ম্যান পড়তে দেয়া হ'ত। তাও কি, কোন অনভিপ্রেত সংবাদ থাকলে তা কর্তৃপক্ষ কাঁচি দিয়ে কেটে রাখত।

একবার সকালে সমস্ত কয়েদীরা কারখানায় যাওয়ার পর এবং একবার বিকেলে পাঁচটার পর তারা ফিরে এলে, আমাদের কয়েকজন করে বেড়াতে দিত। সীমানা আমাদের চৌহদ্দির বাইরে জেলের ভিতরকার রাস্তায়। চলতে হ'ত অন্তত চার পা দূরত্ব রেখে একজনের সঙ্গে আর একজনের। সঙ্গে থাকত গুর্খা মিলিটারী সেপাই। একটু পর পরই হাঁকত 'বাত্ মত্ করো'। কয়েক মিনিট বেড়াবার পরই ফিরিয়ে এনে সেলে বন্ধ করত।

শেষের দিকে মুলভেনী সাহেব আমাদের তালাবদ্ধ থাকার সময় কমিয়ে দিলেন। কিন্তু পরস্পর কথা বলার নিষেধাজ্ঞা বলবৎই রইল।

১৯১৭ সালের শেষের দিকে আমরা আলিপুরে বসে খবর পেতে লাগলাম যে, অন্যান্য জেলে রাজবন্দীদের উপর অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং কেউ কেউ পাগল হয়েছে।

আমরা তিনভাই তখন আটক বন্দী। আমার ছোট ভাই ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ডেটেনিউ হিসেবে চট্টগ্রামে সমুদ্রের ধারে মহেশখালী দ্বীপে এবং বীরেন্দ্রও ডেটেনিউ হিসেবে কুতুবদিয়া দ্বীপে। আমার মা ওদের সঙ্গে দেখা করে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে ১৯১৭ সালের শেষের দিকে। আমার মা অতি গোপনে উপযুক্ত ঘটনাবলীর সাথে জেলে খারাপ ব্যবহার এবং পাগল হওয়ার খবর আমাকে দিয়ে গেলেন। এ যে কত সাবধানে করতে হয়েছিল তা বুঝতে হলে বলা প্রয়োজন যে, তখন বাড়ীর লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ খুবই কম হতে পারত। তাছাড়া, তখনকার রাইটার্স্ বিল্ডিং (Writers' Building)

এর রাজনৈতিক সুরক্ষা (Political security) বিভাগ থেকে হুকুম না পেলে দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। এই সব হুকুম আদায় করতে কয়েকমাস লেগে যেত। সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকত একজন জেল কর্মচারী এবং একজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী। তাদের মতে কোন কিছু আপত্তিজনক মনে হলেই তারা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিতে পারত।

এই সংবাদে মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আমার সহকর্মী শ্রীরমেশ চৌধুরীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলাম। পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে, এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য জেলের সঙ্গে মিলিত হয়ে একযোগে কাজ করার অনেক অসুবিধা। অপরাপর জেলের তুলনায় আমাদের জেলে সুযোগ-সুবিধা কিছু বেশী। তাঁর মধ্যে জেলে আমাদের একত্র হওয়ার সুযোগ প্রধানতম। এই অবস্থারই সুযোগ নিতে হবে যদিও ফলত এই সুবিধা ভোগ নষ্ট হয়ে যাবে, তবুও। সমস্ত জেলে জেলেই অনশন ধর্মঘট হওয়া উচিত এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। নানা জেলে অশান্তি আরম্ভ হলেই সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে। তা হোক বা না হোক, আমরা অন্তত এ অত্যাচার নীরবে সহ্য না করে নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারব।

এই সময় সুবিখ্যাত মাসিক 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে 'শক্ত মানুষ চাই' শিরোনামায় এক প্রবন্ধ লিখলেন প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। এ প্রবন্ধ পড়ার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে আমাদের দেশের লোকদের দুর্বলতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য দেশের রাজবন্দীদের তুলনায় আমাদের দেশের রাজবন্দীরা কি দুর্বল! আয়ারলণ্ডের কথা উল্লেখ করেছিলেন যে, সেখানে রাজবন্দীরা জেলে গিয়েও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং দরকার হলে অনশনব্রত অবলম্বন করে। কিন্তু এদেশে রাজবন্দীরা এসব কিছুই করে না। এই প্রবন্ধ আমাদের মনের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে। প্রহরীদের এড়িয়ে আমরা সকলে একত্রিত হলাম এবং ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র আচার্য মহাশয় প্রবন্ধটা পাঠ করে সকলকে শোনালেন। প্রবন্ধপাঠ ও আবৃত্তি করার ক্ষমতা ছিল হেমেন্দ্রবাবুর খুবই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের 'দিন আগত ঐ' গানটিও সুন্দর করে পড়ে শোনালেন। এই গানটি ঐ সময়কালেই রচিত এবং প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

প্রথমে দু-তিনজন, পরে সকলের মধ্যেই অনশন ধর্মঘট করা সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। অবশ্য আমাদের সঙ্গে যে কয়েকজন অবাঙ্গালী রাজবন্দী ছিল, আমরা প্রথমে তাদের কিছুই বলিনি। স্থির করেছিলাম আমাদের সংকল্প ওদের পরে জানাব। কিন্তু কোনরকমে জানতে পেয়ে দুজন পাঞ্জাবী শিখ বন্দী আমার সঙ্গে দেখা করে বলল—বাবুজী, আপনারা তো খুব বিদ্বান এবং জ্ঞানী। অনেক পড়েছেনও। আচ্ছা বলুন তো, মহৎ কার্যে আত্মবিসর্জন করতে কোন শিখ পশ্চাৎপদ হয়েছে, এমন কোন ইতিহাস পড়েছেন? আপনারা প্রাণ দেয়ার জন্য তৈরী, আর আমরা ভয়ে পিছিয়ে থাকব, এই কি আপনারা ভেবেছেন? আমি খুবই লজ্জিত হলাম এবং তখন ওদের সকলের কাছেই সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে বললাম।

অনশন ধর্মঘট কোনও বিশেষ দিনে শুরু করতে পারলেই ভাল। সে সময় ভারতের শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য ভারতে এসেছেন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব। তিনি যেদিন কলকাতায় পদার্পণ করবেন সেদিন তাঁর সঙ্গে আসবেন ভারতের বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড সাহেব। সেই দিনটিই আমরা অনশন ধর্মঘট শুরুর দিন বলে ধার্য করলাম।

অনশন ধর্মঘট সম্বন্ধে তখন আমাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এদেশে এ জাতীয় কোন ধর্মঘট হয়েছে বলেও জানতাম না। পরে অবশ্য শুনেছিলাম যে, মেদিনীপুর জেলে একবার অল্পদিন স্থায়ী অনশন ধর্মঘট হয়েছিল। তা অবশ্য বাইরে প্রকাশ পায় নি। যাই হোক, আমরা মনে করেছিলাম অনশন শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য।

শধু অনশন ধর্মঘট করলেই চলবে না। এই ধর্মঘটের সংবাদ বাইরে প্রচারের ব্যবস্থাও করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঢাকা থেকে কলকাতা এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখলাম। সাক্ষাৎ করতে এলে, আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম আমাদের আসন্ন ধর্মঘট দু'একদিনের মধ্যে শুরু হবে। আরও বললাম তিনি যেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সূত্রে দেশের লোকের কাছে এ খবর প্রচারের ব্যবস্থা করেন। আমাদের ধারণা ছিল যে, এদেশেরই দু'হাজার যুবক বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ আছে, এ খবরই হয়ত দেশের জনসাধারণ জানে না। এ কথা উল্লেখ মাত্রই উপস্থিত গোয়েন্দা অফিসার বাধা দিয়ে বললেন—এসব কথা বলা নিষেধ। নিষেধ না শুনে আবার এ কথা উল্লেখ করতেই সেই অফিসার

আমাদের সাক্ষাৎ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমাদের অনশন ধর্মঘট ঘোষণার সংবাদ বাইরে নানা পত্র-পত্রিকায়, যেমন অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, প্রবাসী এবং আরো অনেক কাগজে প্রকাশার্থ পাঠিয়ে দিলাম। চিঠি দিলাম তখনকার দিনের নেতৃবর্গের কাছে, যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. সি. চ্যাটার্জি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ ছাড়াও এমন অনেকের বাড়িতে চিঠি পাঠালাম যাঁদের বাড়ি থেকে এ খবরটা জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

এসব চিঠি চালাচালি স্বাভাবিকভাবে হওয়ার উপায় ছিল না। এ ব্যাপারে একজন জেল কয়েদী আমাদের বিশেষ সহায় হয়েছিল। এ কয়েদীটি জেল-অফিসেই কাজ করত। যে ব্যাগে করে সে সরকারী চিঠিপত্র নিয়ে যেত তাতেই আমাদের এইসব চিঠিপত্রও ভরে নিত। ওর কাছ থেকে যখন সংবাদ পেলাম যে, চিঠিগুলি নিরাপদে পোস্ট-অফিসে চলে গিয়েছে, অমনি আমরা জেল সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে অনশন ধর্মঘট শুরুর নোটিশ পাঠিয়ে দিলাম। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে আমরা ধর্মঘট শুরু করলাম।

আমরা মোট বাইশ জন অনশন ধর্মঘট করি। সকলের নাম আর আজ মনে নেই। যাঁদের নাম মনে পড়ছে, তাঁদের মধ্যে আছেন, রমেশ চৌধুরী, আশুতোষ কাহিলী, কুঞ্জ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, হেমেন্দ্র কিশোর আচার্য-চৌধুরী, অতীন্দ্রনাথ বসু, দেওয়ান সিংহ ও আরও একজন শিখ, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সতীশ (সিরাজগঞ্জ নিবাসী), সুরেশচন্দ্র দাশ এবং প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

স্যার হিউস্ ষ্টিফেনসন ছিলেন তখন রাজনীতি বিষয়ক সচিব এবং স্যার ওয়ালটার বুখানন ছিলেন কারাসমূহের ইনস্‌পেকটর জেনারেল। এঁরা উভয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা কথা বলে জানতে চাইলেন, আমাদের এই অনশন ধর্মঘটের উদ্দেশ্য কি! প্রত্যেকেই বললাম, বিনা বিচারে জেলে আবদ্ধ রাখার প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের এই ধর্মঘট। রাজনৈতিক কারণে অনশন আমাদের দেশে এই প্রথম।

আমাদের নিজেদের মধ্যে স্থির হয়েছিল যে, ব্যক্তিগতভাবে যে যতদিন পারে অনশন চালিয়ে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ এই যে,

ধর্মঘট শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নানা জেলে বদলি করে ভিন্ন ভিন্ন করে রাখবে। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদের ফলে দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে এবং জেলে জেলে অনশন ধর্মঘট হওয়ার ফলে ব্যাপকতর আন্দোলন শুরু হলেই আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তখন যে যেখানে যখন ভাল মনে করবে ধর্মঘট বন্ধ করবে।

অনুমান মিথ্যে হ'ল না। ভারতের নানা প্রদেশের বিভিন্ন জেলে আমাদের এক-একজন করে বদলি করে দিল। আমাকে পাঠাল ছত্তিশগড় বিভাগের রায়পুর সেণ্ট্রাল জেলে, তপেন দত্ত গেলেন বিলাসপুর জেলে, রমেশ চৌধুরী নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে, জিতেন লাহিড়ী জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে, এবং আরও দুজন। এই ছ'জনের সবাইকে পাঠাল মধ্যপ্রদেশে।

আমরা আরও স্থির করেছিলাম যে, ধর্মঘট চলাকালীন জল ছাড়া আর কিছুই খাব না। কিন্তু রায়পুর জেল কর্তৃপক্ষ জল বন্ধ করে আমাকে দুধ দিতে আরম্ভ করল। উদ্দেশ্য, যদি পিপাসায় কাতর হয়ে দুধ পান করি। কিন্তু দুধ স্পর্শ করলাম না এবং কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম যে, এখন জল দিলেও তা গ্রহণ করব না। যদিও তারা এরপর আবার জল দিতে শুরু করল, কিন্তু আর তাও পান করলাম না।

এরমধ্যে একবার ইনস্‌পেকটর জেনারেল জেল পরিদর্শনে এসে ধর্মঘট বন্ধ করতে অনুরোধ করলে জানালাম—খাদ্য গ্রহণ করতে পারি যদি রমেশ চৌধুরীকে নাগপুর জেল থেকে এই জেলে আমার কাছে পাঠান। কর্তৃপক্ষ অবশ্য রমেশ চৌধুরীকে রায়পুর জেলে বদলি করেছিল। ইতিমধ্যে ওরা আমাকে মুখ বা নাকের মধ্য দিয়ে জবরদস্তি খাওয়াতে (forcible feeding) লাগল। পঁয়তাল্লিশ দিন অনশন ধর্মঘটের পর খাদ্য গ্রহণ করতে লাগলাম।

অচিরেই এই ধর্মঘটের ফল ফলতে শুরু করল। বাংলাদেশের নানা জেলে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠতে লাগল। কোথাও কোথাও অনশন ধর্মঘট শুরু হ'ল। বেশ কিছু রাজবন্দী ছিল তখন হাজারীবাগ জেলে। সেখানে তিনবার দীর্ঘদিন ধরে অনশন ধর্মঘট চলে। একবার তো ষাট দিনেরও বেশী অনশন চলে এবং সব চাইতে বেশীদিন যাঁরা অনশন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রমোহন সেন এবং নলিনীকিশোর গুহ।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে আমাকে রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে এবং রমেশ চৌধুরীকে বহরমপুর জেলে বদলি করে দেয়। রাজশাহী

জেলে তখন বন্দী ছিলেন—নরেশ চৌধুরী, পূর্ণদাস, গিরীন্দ্র ব্যানার্জি, প্রবোধ দাশগুপ্ত, রসিক সরকার, সতীশ পাকড়াশী, যোগেশ চ্যাটার্জি, বসন্ত ব্যানার্জি, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, সুরেশ দাস, হেমেন্দ্র আচার্য এবং ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি। সুরেশ দাশ পরে আগ্রা জেলে বদলি হন।

ভূপতি মজুমদার ম্যানিলার কাছে সমুদ্রবক্ষে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং অনেকদিন সিঙ্গাপুরে আটক থাকার পর বাংলাদেশের জেলে বদলি হয়েছিলেন। তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম যে, আদিত্য দত্তকে বর্মা জেল থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে।

রাজশাহী জেলে এবং জেলের ভিতরে আমাদের গুর্খা মিলিটারী সেপাই পাহারা দিত। ওখানকার কুঠরীগুলিও ছিল সম্পূর্ণ নির্জন (Solitary cell)। এমনি দুটি পাশাপাশি কুঠরীতে থাকতেন ভূপতি মজুমদার এবং আদিত্য দত্ত। পাশাপাশি থাকলেও পরস্পর কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। উভয়ে তখন গান গেয়ে গেয়ে কথাবার্তা এবং সংবাদ আদান-প্রদান করতেন। এইভাবেই জানা গেল, আদিত্য দত্ত রেঙ্গুনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এই আদিত্য দত্ত প্রথমে মুসলমান হয়ে ব্রহ্মদেশে যান এবং পরে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টান হয়ে পূর্ব-এশিয়ায় অনুশীলন সমিতির কার্য করেন। জেলেও তিনি খ্রীস্টধর্মানুযায়ী আচার-ব্যবহার পালন করে যেতেন এবং খ্রীস্টান রূপেই থাকেন। পরে অবশ্য কারামুক্তির পর নিজের ধর্মে ফিরে এসে হিন্দু হন। এই সংবাদ আদান-প্রদান এদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। প্রায় সকলের সঙ্গেই গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হত। এমনকি কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় বার বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত অনুশীলনের নরেন ব্যানার্জির সঙ্গেও গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথা-বার্তা চলত।

আগেই বলেছি শ্রীসুরেশ দাশ আমাদের সঙ্গে অনশন ধর্মঘট শুরু করলে তাঁকে আগ্রা জেলে বদলি করে দেয়। পরে রাজশাহী জেলে বদলি হয়ে এলে নগেন দত্তের শোচনীয় মৃত্যুর খবর পাই। তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। তিনি গিরিজাবাবু নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে যে বিপ্লবের আয়োজন চলছিল গিরিজাবাবু তাতে রাসবিহারী বসুর প্রধান সহকর্মী ছিলেন। কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হয়ে তিনি যখন আগ্রা জেলে দণ্ড ভোগ করছিলেন, তখন তাঁর উপর ভীষণ অত্যাচার চলতে থাকে। তার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একে এই অবস্থা, তাতে নির্জন কুঠরীতে আবদ্ধ। চিকিৎসা, ঔষধ বা

আহারাদি কিছুই তাঁর একরকম মেলে নাই। বলতে গেলে তিনি একরকম অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসাতেই মারা যান।

রাজশাহী জেলে যাঁরা রাজবন্দী ছিলেন তাঁরা সকলেই অনুশীলন দলভুক্ত ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে আমি, যোগেশ চ্যাটার্জি, সতীশ পাকড়াশী, প্রবোধ দাশগুপ্ত, রসিক সরকার এবং জিতেন চৌধুরী ছিলেন অনুশীলনের। মাদারীপুর দলের ছিলেন শ্রীপূর্ণদাস। যাদুগোপাল মুখার্জির দলের ভূপতি মজুমদার, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও সুরেশচন্দ্র দাস। ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী দলের ফণীন্দ্র চৌধুরী ও নরেশ চৌধুরী। কলকাতার বিপিন গাঙ্গুলীর দলের ছিলেন গিরীন্দ্র ব্যানার্জি। বাইরে দল বিভাগ থাকলেও, জেলখানায় আবদ্ধ অবস্থায় আমরা জেল-কর্তৃপক্ষ, পুলিস, জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট তথা সরকারের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে একদল হিসেবেই চলতাম। আমাদের মধ্যে দলাদলি ছিল না। খাওয়া-দাওয়া এবং থাকার ব্যাপারেও আমরা দল হিসেবে চলতাম না। অবশ্য পরবর্তী কালে ১৯৩০ সালের পর থেকে জেলের ভিতরেও দল হিসেবে ভিন্ন হেঁসেল এবং বাসস্থানের জন্য আলাদা ওয়ার্ড থাকত। যদিও রাজবন্দীদের মধ্যে এই ভেদ-বিভাগে সরকারের প্রত্যক্ষ হাত ছিল না, কিন্তু এটা তারা পছন্দ করত এবং পরোক্ষভাবে উস্‌কানি দিত। যদিও অনুশীলন সমিতি এই ভেদ-বিভাগ মোটেই পছন্দ করত না, কিন্তু আস্তে আস্তে এক-একবার যখন সব দল আলাদা আলাদা ভাবে থাকা-খাওয়া শুরু করল তখন স্বাভাবিকভাবেই অনুশীলনও আলাদা হয়ে গেল একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। কিন্তু যেহেতু জেলের বাইরে অনুশীলন সমিতির সভ্য ও কর্মীসংখ্যা অন্যান্য সব দল থেকেই বেশী থাকত, সুতরাং জেলের ভিতরেও সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

রাজশাহী জেলে একটা শোচনীয় দুর্ঘটনায় আমরা সকলেই মর্মাহত হয়েছিলাম। টাঙ্গাইল নিবাসী, আমাদের অনুশীলনেরই সভ্য, রসিক সরকার (দলীয় নাম জগদীশ) নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কুঠরীতে থাকতাম। সন্ধ্যার সময় তখন এই কুঠরীগুলি সব একে একে বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। আমার কুঠরীও ততক্ষণে বন্ধ। দেখলাম রসিক সরকার আমার কুঠরীর দরজায় এসে প্রণাম করে গেল। তখন বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারলাম না বা সন্দেহ হলো না যে, ও আমার কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে গেল।

রাত তখন দশটা। হঠাৎ আগুন-আগুন চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। জানতে পারলাম রসিক সরকার আত্মহত্যা করেছে। পরদিন সকালে আমাদের কুঠরীর দরজা খোলার পর ওর কুঠরীতে গিয়ে দেখলাম যে, এই ছোট্ট কুঠরীতেও মশারী যেমন টাঙ্গানো থাকে তেমনি আছে, জামা-কাপড় ছড়ান। দেখলে মনেই হয় না যে, একজন লোক এরমধ্যে এভাবে আগুনে পুড়ে মরতে পারে! যখন জেলা-শাসক দুজন বাইরের ভদ্রলোক সঙ্গে করে অনুসন্ধানের জন্য এলেন, তখন তাঁরা সব দেখেশুনে ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। বাইরের ভদ্রলোক দুজনের ধারণা হ'ল যে, রসিককে কর্তৃপক্ষ নির্যাতন করে হত্যা করেছে এবং পরে গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে একটা মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। ওঁরা বারে বারেই আমাদের মতামত জানতে চাইলেন। সে সময় জেল-সুপার রেজিনাল্ড এ্যাশ (Reginald Ash) সাহেবের সঙ্গে আমাদের খুব ঝগড়া চলছিল। এ্যাশ সাহেব ভেবেছিলেন যে, এই সুযোগে আমরা নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেব। কিন্তু আমরা যা জানি তার বাইরে কিছুই বলিনি বা মিথ্যা কোন অজুহাতও উপস্থিত করতে চেষ্টা করিনি। আমাদের এই আচরণে কর্তৃপক্ষ একটু আশ্চর্য হয়েছিল বৈকি!

রসিক সরকার ছিল খুব উদ্যমশীল নির্ভীক কর্মী। বাইরে অনেক বিপ্লবাত্মক সংঘর্ষে সবিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। চরিত্র ছিল ঘোর-প্যাঁচ রহিত সহজ। ওর কথাও ছিল খুব মূল্যবান। কোন বিষয়ে একবার কথা দিলে তা প্রাণপণে প্রতিপালন করতে চেষ্টা করত। জেলখানার অবসর সময়টা যাতে ও নানা বিষয়ে বিদ্যা অর্জনের জন্য ব্যয় করে সে বিষয়ে আমি ওকে অনেক উপদেশ দিতাম। এবং সময় ভাগ করে নানা বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করতেও ওকে বলেছিলাম। উত্তরে কেবলই বলত, আর কয়েকদিন পরেই শুরু করব। পরে বুঝতে পারলাম, অনেকদিন ধরেই ও এ সম্বন্ধে নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছিল এবং সেভাবে প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছিল।

রাজশাহী জেলে তখন বিজলি বাতির ব্যবস্থা ছিল না। কুঠরীতে কুঠরীতে দিত কেরোসিনের লণ্ঠন। সেই লণ্ঠনে যে পরিমাণ তেল দিত তাতে রাত্রি দশটার বেশী চলত না। কিন্তু রসিক ও থেকেই কিছু তেল প্রতিদিন বাঁচিয়ে রেখে দিত। কিন্তু তেল ওকে কম দেয়া হচ্ছে বলে প্রতিদিনই অভিযোগ করত।

আত্মহত্যার কয়েকদিন আগে থাকতেই ও বোধহয় একটু বেপরোয়া

হয়েছিল। একটা কিছু দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য খুব ব্যাকুল হয়েছিল। আমাকে প্রায়ই বলত, আচ্ছা, একটা কিছু করি। রুশ দেশের বিপ্লবীরা পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি পার হয়ে পালিয়ে যেত। আমরাও তেমন একটা কিছু করি!

রাজশাহী জেলের কাছেই পদ্মানদী। বর্ষার পদ্মা বিক্ষুব্ধ হয়ে মাঝে মাঝে ভীষণ আকার ধারণ করত। জেল-হাসপাতালের দোতলায় সিঁড়িতে উঠে আমরা তা দেখতাম। সেই দিকে দেখিয়ে রসিক বলত—এমনি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পদ্মা আমরা সাঁতরে পার হব। না হয় মরব।

তখন যুদ্ধের শেষ অবস্থা। বাইরে দলও প্রায় ছত্রভঙ্গ, খবর পেলাম দলের কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। এমতাবস্থায় বাইরে দলের সঙ্গে যোগাযোগ না করে পালানো অনুচিত মনে করলাম। নইলে জেলের দেয়াল টপকে ওধারে গিয়েই ধরা পড়তে হবে। কোন লাভই হবে না। সতীশ পাকড়াশী মাত্র অল্পদিন পূর্বে গ্রেপ্তার হয়েছে। তার কাছে অনেক খবর পেলাম। একটা ঠিকানাও সংগ্রহ করা হ'ল। চিঠিও পাঠালাম। বাইরে যোগাযোগ করে একটা প্ল্যান-মাফিক আমরা তিনজন পালাবো বলে স্থির হ'ল। এমনি সময় একদিন দুপুরে রসিক আমাকে কুঠরী থেকে ডেকে বাইরে দেয়ালের ধারে নিয়ে গেল। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট তিন-চারজন প্রহরী একটা কুঠরীর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির জন্য। বাইরে গিয়ে দেখি রসিক ততক্ষণে টেবিল-চেয়ার বার করে দেয়ালের ধারে নিয়ে গিয়েছে দেয়াল টপকাবার জন্য। আমি বললাম—বাইরে থেকে চিঠির কোন উত্তর এলো না। অবস্থা কিছুই জানি না। দিনের বেলা দেয়ালের ধারে সেপাইদের হাতে সহজেই ধরা পড়ে যাব। একটা দুঃসাহসিক কাজ হবে, কিন্তু ফল কিছুই হবে না। এর মধ্যে প্রহরীদের কেউ কেউ কুঠরীর বাইরে এসে গেল। ক্রমে বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় তখন সব সেপাইরাই বাইরে এসে গেল। তখন আর পালানোর কোন সুযোগ রইল না। পলায়নে ব্যর্থ হয়ে রসিক খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হল। বাইরে দলের কাছে পুনরায় জরুরী চিঠি লিখলাম। কিন্তু, উত্তর আসার পূর্বেই রসিক আত্মহত্যা করল।

সেপাইদের কাছে শুনলাম যে, রসিক শরীরে আগুন লাগিয়ে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে পুড়ে যাওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ধীর স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটু কাঁপেনি, একটুও হেলে পড়েনি, গলা থেকে এতটুকুও কাতরোক্তি বের হয়নি।

বসন্ত চ্যাটার্জি নিহত হওয়ায় সরকার ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেলকে বলেন যে, সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে শারীরিক উৎপীড়ন করা কর্তব্য, খবর বার করার জন্য। তা না করলে যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যের বিপদ উপস্থিত হবে। লর্ড কারমাইকেল প্রথমে ইতস্ততঃ করে-ছিলেন, কিন্তু পরে উৎপীড়ন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ খবর আমি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছেই পেয়েছিলাম।

প্রবোধ বিশ্বাসকে তার ৬০ নং মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে গ্রেপ্তার করে ৪নং কিড স্ট্রীটের গোয়েন্দা অফিসের সেলে আবদ্ধ করে। তারপর পনেরো দিন ধরে তার উপর যে অত্যাচার হয় তা ১৯১৬ সালের শেষদিকে আমি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে থাকা কালেই শুনেছিলাম। পরে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে প্রবোধ বিশ্বাসের কাছে সব শুনে লিখে নিয়েছিলাম।

তখন গোয়েন্দা অফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন লোম্যান সাহেব। শারীরিক উৎপীড়ন তাঁরই নির্দেশে চলেছিল। স্বরু হ'ত সাধারণত বিকেলবেলা এবং চলত সারা রাত ধরে। লোম্যান সাহেব—দু-একবার এসে জিজ্ঞেস করত—Is he divulging anything? (কিছু ফাঁস করছে কি?) প্রবোধকেও জিজ্ঞেস করত—কিছু বলবে? উত্তরে প্রবোধ বলত—না, কিছুই বলব না। তখন লোম্যান সাহেব উৎপীড়কদের বলে যেত—Allright, carry on (ঠিক আছে, চালিয়ে যাও)। হিন্দি করেও বলত—তব চালাও আচ্ছা তরছে।

প্রবোধকে উৎপীড়ন করত সামসুজ্জোহা, মনোজ পাল, মণি বোস এবং বোধ হয় লক্ষ্মীনারায়ণ পাঁড়ে। এই পাঁড়ে অন্যান্যদের চাইতে কম অত্যাচার করত।

অফিস-ঘরে পেছন হাতকড়ি অবস্থায় এনে দু'তিনজন সেপাই প্রবোধকে ধরে রাখত। এমনি অবস্থায় অফিসাররা একের পর আর এক উৎপীড়ন চালিয়ে যেত। প্রবোধকে জিজ্ঞেস করত সে অনুশীলন সমিতির সভ্য কিনা, তার দাদা অনুশীলন সমিতির পলাতক সভ্য প্রফুল্ল বিশ্বাস কোথায়, বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যার ব্যাপারে ছিল কিনা, কয়েকটি নাম দেখিয়ে—সে এদের চেনে কিনা। উত্তরে না শুনে প্রথম দিত অশ্লীল গালি, তারপর অফিসারদের কেউ নিজেই রুল দিয়ে মারতে শুরু করত। আবার প্রশ্ন এবং মার!

কতরকমেই যে চলত এ উৎপীড়ন তার অন্ত নেই। আঙুলের মধ্য দিয়ে

পেন্সিল দিয়ে মুচ্‌ড়ে গাঁটগুলি ভেঙে দিয়েছিল। টেবিলের উপর মাথা চেপে ধরে পিঠে, পেছনে, উরুতে ভীষণভাবে বহুক্ষণ ধরে আঘাত করত। দু'তিন দিন ধরে এমনিভাবে চলায় আহত স্থানগুলি পেকে যাওয়ার মত হল। কিন্তু অত্যাচার বন্ধ হ'ল না।

তিনদিন পর রুলের জায়গায় এলো বেত। বেতের প্রতিটি আঘাতে মাংস উঠে আসত এবং রক্ত বেরুত। অফিসাররা ক্লান্ত হলে সেপাইরা অত্যাচার চালাত। আটদিন এমনি চলার পর প্রবোধের পিঠের, পেছনের এবং উরুর পেছনের চামড়া উঠে গেল। ও না পারত বসতে, না পারত শুতে। এভাবে বারদিন চলল। এ ক'দিন কিছুই খেতে দিত না, স্নানও নয়। তারপর তিনদিন বিরাম দিল। তখন সারাদিনের খাদ্য ছিল এক টুকরো রুটি—সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিত।

মাঝে একদিন মনোজ পাল একজন মুসলমান সেপাই দিয়ে গরুর মাংস আনাল। এবং তারই হুকুমে পেছনে হাতকড়া অবস্থায় প্রবোধকে জোর করে খাওয়াতে চেষ্টা করল এবং তার ঠোঁটে ও মুখে লাগিয়ে দিল।

একদিন মণি বোস বলল—শালারা ব্রহ্মচর্য করে, শরীরে শক্তি হবে তারপর ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে। দিচ্ছি শালাদের ব্রহ্মচর্য ঘুচিয়ে! বলেই প্রবোধের পুরুষাঙ্গে রুল দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল। মণি বোস প্রায় রোজই প্রবোধের পুরুষাঙ্গ ধরে টেপাটেপি করত বীর্যপাত করবার জন্য। ব্যর্থ হয়ে শেষে আঘাত করত। শেষ পর্যন্ত প্রলোভন দেখিয়ে বলত—যে কোন জাতের মেয়ে চাও এনে দেব, ইউরোপীয়, পার্শী, কাশ্মীরী। যেমনটি চাও। আরে শালা বিনি খরচে মজা লুটে নে না!

জল খেতে দেওয়ার হুকুম ছিল না। সেপাইরা অনুমতি চাইলে বলত—হেঃ, শালাকে জল দেব! শখ্‌ দেখ না! যাও, শালার মুখে প্রস্রাব করে দাও।

পনেরো দিন পর প্রবোধকে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে, একমাস পর বর্ধমান জেল এবং দেড়মাস পর পুনরায় কলকাতা দালান্দা হাউসে পাঠিয়ে দিল।

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে দালান্দা হাউসে প্রবোধের সঙ্গে নলিনী ঘোষের দেখা হয়। এরা দুজনে নভেম্বর মাসেরই ২২ তারিখে দালান্দা হাউস থেকে পালিয়ে চন্দননগরে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং শ্রীমতিলাল রায় মহাশয় ওদের সাদরে গ্রহণ করেন।

এর পরে প্রবোধ এবং আর একটি ছেলের আমেরিকা যাওয়া স্থির হয়।

তখনকার আইন অনুসারে কেউ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকা প্রবেশ করতে পারত না। যদিও তাদের জাহাজের নাবিক বা খালাসী হয়ে যাওয়াই স্থির ছিল, কিন্তু আইন বাঁচাবার জন্য কিছু টাকার জোগাড় করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা গোলযোগে তাদের আমেরিকা যাওয়া হয়নি।

তখন চন্দননগরে পলাতকদের আশ্রয়স্থল কয়েকটা ছিল। অনুশীলন এবং যাদুবাবুদের বাড়ি ছিল। পুলিস এই সব আড্ডারই খবর পেয়ে গিয়েছিল। সে সময় ব্রিটিশ পুলিস ফরাসী চন্দননগরে সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত কোন বাড়ি খানাতল্লাশি করতে পারত না—যদিও পাহারা দিতে পারত।

একদিন বিপ্লবীরা খবর পায় যে, পলাতকদের বাড়ি তল্লাশি করবে পুলিস। তখন যাদুবাবুর ও অনুশীলনের সব সভ্যরা সবাই মিলে সব বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বেড়িয়ে পড়বে স্থির হয়। যদি পূর্বেই পুলিস এসে পড়ে তবে লড়াই করা ও তাদের বাধা দেয়ার জন্য কৃষ্ণ সাহা ও প্রবোধ বিশ্বাস পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। সবাই বাইরে বেরিয়ে এসে ব্রিটিশ এলাকায় একটা মাঠে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যা ছ'টার পর ফরাসী চন্দননগরে ফিরে আসেন। এই সঙ্গে শ্রীযুত অমর চ্যাটার্জি ও সতীশ চক্রবর্তীও ছিলেন।

এরপর প্রবোধ বিশ্বাস ও বিনায়ক রাও কাপলে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবক (অনুশীলনের সভ্য) প্রথমে আসামের গৌহাটী এবং পরে তিনসুকিয়ার কাছে নাহারকাটিয়া যায়। সেখান থেকে তাঁরা পায়ে হেঁটে বর্মা যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সে সময়ই তাঁরা গৌহাটীর খণ্ডযুদ্ধ এবং নলিনী ঘোষ প্রভৃতির গ্রেপ্তারের খবর পান। প্রবোধ দাশগুপ্ত ও নলিনী বাগচী গৌহাটী থেকে পালিয়ে প্রবোধ বিশ্বাসদের কাছে এসে নাহারকাটিয়াতে মিলিত হন। জিতেন লাহিড়ীও সেখানে ছিলেন। পরে এঁরা দুদলে বিভক্ত হয়ে ডিব্রুগড় চলে যান। সেখান থেকে পরের ট্রেনেই এঁরা বিহারের মজঃফরপুরে রওনা হন। প্রবোধ দাশগুপ্ত এক দলে এবং অপর দলে ছিল নলিনী বাগচী ও জিতেন লাহিড়ী। দুটি দলই আসামের পার্বত্য অঞ্চলে রেল লাইনে (লামডিং থেকে বদরপুর) চাঁদপুর এসে ষ্টিমারে গোয়ালন্দ গেলেন।

ষ্টিমারে এক সাদা পোশাক-ধারী পুলিস অফিসার প্রবোধ দাশগুপ্তকে চিনে ফেলেন। তিনি তখন নলিনী ও জিতেনবাবুকে মজঃফরপুরে চলে যাওয়ার কথা জানিয়ে বলে দেন, তারা যেন স্টেশনে কয়েকদিন গাড়ির অপেক্ষা করেন। উদ্দেশ্য যদি পুলিস অফিসারকে এড়িয়ে মজঃফরপুর চলে আসতে পারেন।

পুলিস অফিসারের ফন্দি ছিল প্রবোধ দাশগুপ্তকে গোয়ালন্দ নামবার সময় ধরবে। কিন্তু টেপাখোলা স্টেশনে যখন জাহাজ ছাড়বার পূর্বে ওঠানামার সমস্ত তক্তা তুলে নিল তখন পুলিস নিশ্চিন্ত হয়ে যেই একটু সরে গেল অমনি প্রবোধ লাফিয়ে লঞ্চে পড়ল। এই স্টেশনে বড় ষ্টিমার নদীর ধারে ভিড়তে পারত না। কাজেই এই লঞ্চের ব্যবস্থা। দুজনেই ফরিদপুর সহরে গিয়ে অপর এক স্টেশন থেকে ট্রেনে নবদ্বীপ হয়ে মজঃফরপুর যান। সেখান থেকে এঁরা নবদ্বীপ ফিরে আসেন। এঁরা তখন দারুণ অর্থাভাবের মধ্যে ছিলেন। ময়মনসিংহে একজনের কাছে দলের টাকা ছিল। এই টাকা আদায়ের জন্য যখন এঁরা রওনা হন, তখন দুজনই নবদ্বীপেই ধরা পড়ে গেলেন।

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি ইউরোপে যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, খুব বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ইতিকর্তব্য চিন্তা করতে গিয়ে মনে হ'ল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আয়ারল্যাণ্ড, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটবে বলে জার্মানী আশা করেছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হতে পারাই বোধহয় বিলম্বের কারণ। ব্রিটিশ সামাজ্যের মধ্যে গোলমাল বাধলে ইংরেজ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তা হবে জার্মানীর সুযোগ। জার্মানীর যুদ্ধ-প্রস্তুতির নানা দিকের এ আশাও একটা অঙ্গ ছিল। সুতরাং ভাবছিলাম দেশের নানা স্থানে ব্যাপকভাবে ইংরেজের উপর গুলি ছোঁড়া ও বোমা নিক্ষেপ করলে দেশব্যাপী একটা অশান্তি দেখা দেবে এবং ইংরেজের আন্তর্জাতিক শত্রুশক্তিও বিব্রত ইংরেজকে আক্রমণ করতে পারে। তাছাড়া ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে আমাদের কাজ এতটা এগিয়ে গিয়েছিল যে, এ অবস্থায় বেশী কালক্ষেপ করা সমীচীন নয়। অনতিবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান না ঘটলে সৈন্যদল নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে এবং বেশীদিন গোপনতা রক্ষা করাও হয়ত সম্ভব হবে না।

প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জির (বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জি) সঙ্গে একদিন কথা প্রসঙ্গে আলাপ করে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আমাদের সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সমিতিকে ঐকান্তিকভাবে সাহায্য করতেন। একরকম গৃহী-সভ্যের মতই ছিলেন। তিনি স্বোপার্জিত অর্থ সমিতির কাজের জন্য আমার হাতে দুবারে পাঁচশ' করে হাজার টাকা দিয়েছেন। তাছাড়াও মাঝে মাঝে দিতেন। পলাতক অবস্থায়ও তাঁর বাড়ি গিয়েছি। তিনি বলতেন স্যার রাসবিহারী ঘোষের মত কয়েকজন যদি

তোমাদের নিয়মিত সাহায্য করে তবে তো তোমরা ডাকাতি বন্ধ করে দিতে পার। আমরা বলেছিলাম যে, সমিতির জন্য লোকের দান সংগ্রহ করতে পারলে ডাকাতি নিশ্চয়ই বন্ধ করব। এতে আমাদের খুবই উপকার হবে। ডাকাতি করা আমরা পছন্দ করি না। আমি জানি তিনি টাকার কথা স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ভূপেন বসু, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও আরও কয়েকজনের নিকট উত্থাপন করেছিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ একবার কিছু টাকা দিয়েছিলেনও। অল্প সামান্য হলেও তাঁর মত লোকের সহানুভূতি পেয়ে আমরা খুব উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আগে থেকেই ছিল। বিপ্লবী-যুগের প্রারম্ভে বারীন ঘোষ ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বি. সি. চ্যাটার্জির ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত ইংরেজী দৈনিক বন্দেমাতরম (Bandemataram)-এর সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং কাজও করতেন। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় প্রবন্ধও লিখতেন। বহু রাজনৈতিক মোকদ্দমায় তিনি আসামী-পক্ষ সমর্থন করেছেন। যাই হোক, তিনি বলেছিলেন যে, যদি আপনারা খুব বেশী রকম সন্ত্রাসবাদী কাজ চালান তবে দেশব্যাপী খুব ধর-পাকড় হবে এবং আপনাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির দারুণ ব্যাঘাত ঘটবে। তার ফলে শীঘ্রই যে যুদ্ধ বাধবে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন না। জার্মানী তার নিজের প্রয়োজনে সুযোগমতই যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবং শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে। বাস্তবিক, এই আলোচনার অল্পদিনের মধ্যেই যুদ্ধ ঘোষিত হয়। সমিতির নেতৃবর্গের মধ্যে আলোচনান্তেও স্থির হয় যে, সন্ত্রাসবাদী কার্য অবশ্যই চলতে থাকবে, তবে তেমনভাবে নয়। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে আসন্ন যুদ্ধের সুযোগে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষেও সৈন্য-চলাচল আরম্ভ হয়। তাদের মধ্যে আমাদের দলীয় যোগাযোগ স্থাপিত হ'ল। পেশোয়ার থেকে দানাপুর পর্যন্ত সমস্ত সেনা-নিবাসে সংযোগ বিশেষরূপে স্থাপিত হ'ল। এমনকি ঢাকায় যে স্বল্প-সংখ্যক সৈন্য ছিল তাদের সঙ্গেও ঢাকার সমিতির নেতৃবর্গের সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। লাহোর, ফিরোজপুর, মীরাট, বেনারস, দানাপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি সেনা-নিবাসগুলিতে বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। অন্যান্য সেনা-নিবাসেও গোপনে সংবাদ যেতে লাগল। রাসবিহারী বসু সেনাদলের উপরই বেশী জোর দিতেন এবং অনেকদিন আগে থেকেই তিনি তাদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। রাসবিহারী বসু, মতিলাল রায় এবং আমরা

সর্বদাই নিজেদের শক্তির উপর বেশী জোর দিতাম। বৈদেশিক সাহায্য পেলে ভাল, না পেলেও সৈন্য-বিদ্রোহের মাধ্যমে নিজেরাই ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাব বলে স্থির করেছিলাম। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতির সভ্যদেরও অভ্যুত্থানের জন্য মানসিক প্রস্তুতি চলতে লাগল। আমাদের গ্রেপ্তারের পর গোপনে ব্যাপকভাবে ড্রিল-প্যারেড এবং বন্দুক-চালনা শিক্ষাও শুরু হয়েছিল।

পাহাড় অঞ্চলে আমাদের কাজ আরম্ভ হ'ল খুব জোরের সঙ্গে। উদয়পুর ও বিলোনিয়াতে কৃষি-ফার্ম স্থাপিত করে সভ্যদের নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কসবা পাহাড়ে কালীবাড়ীর মাধ্যমে আমাদের কাজ শুরু হয়। চট্টগ্রাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সীতাকুণ্ড অঞ্চলে ও অন্যান্য জায়গায় কাজ চলতে লাগল। প্রয়োজনমত পাহাড় অঞ্চলে পিছিয়ে গিয়ে সেখান থেকে পুনরাক্রমণ করার পরিকল্পনাও ছিল।

বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থাও হতে লাগল। কসবা কালীবাড়ীতে মাটির নীচে ঘর করে অস্ত্র রাখবার পরিকল্পনা হয় এবং সে উপলক্ষে আমি সেখানে যাই। মোহান্ত সর্বানন্দ স্বামী ছিলেন সমিতির সভ্য।

বিদেশ থেকে কেদারেশ্বর গুহের চিঠি পেয়েও আমরা উৎসাহিত হলাম। বিদেশে তাঁর কার্যাবলী যথাস্থানে আলোচনা করব।

১৯১৪ সালের শেষের দিক থেকেই সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন খুব দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। তখন রাসবিহারী বসু ও তাঁর দুজন প্রধান সহকর্মী শচীন সান্যাল ও গিরিজাবাবু উত্তর-ভারতে সমস্ত বন্দোবস্ত করছিলেন। বাংলাদেশে সে কাজে ন্যস্ত ছিলেন অনুকূল চক্রবর্তী। ১৯১৫ সালে পরিকল্পিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে গিরিজাবাবু (ওরফে নগেন্দ্র দত্ত) অভ্যুত্থান পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় উপস্থিত থাকেন।

গিরিজাবাবু বাংলাদেশে সকলকে আসন্ন অভ্যুত্থানের দিনে কি করতে হবে তা জানিয়ে দিলেন। ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের সৈন্যদলের সঙ্গে অভ্যুত্থানের সমস্ত কথাবার্তা স্থির হয়ে যায়। ওদের উৎসাহ ছিল খুব। এই সৈন্যদলের মাধ্যমেই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

স্থির হয় যে, প্রথমে আমাদের সমিতির সভ্যগণ সমিতির অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসবে। প্রবোধ বিশ্বাস বলেছেন যে, তাঁর উপরও এই নির্দেশ ছিল। ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে যে সমস্ত অস্ত্র পাওয়া যাবে তা

নিয়েও সমিতির সভ্যগণ সজ্জিত হবে। পরে ফোর্ট উইলিয়াম দখল হলেও অনেক অস্ত্রই সমিতির হস্তগত হবে।

অভ্যুত্থানের নির্দিষ্ট দিনের কার্যসূচী এরূপ ছিল—১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে প্রথম অভ্যুত্থান শুরু হবে। প্রথমে সেখানকার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে সমস্ত সহর দখল করতে হবে। সেদিন আর পাঞ্জাব মেল চলতে দেয়া হবে না। তখন সব রেলস্টেশন বিপ্লবীদের দখলেই থাকবে। যদি নির্দিষ্ট দিনে পাঞ্জাব মেল কলকাতা এসে না পৌছয়, তবে তাকেই কলকাতায় বিপ্লব শুরু করার সংকেত বলে ধরে নিতে হবে। গিরিজাবাবু সেদিন কলকাতাতেই ছিলেন। প্রবোধ বিশ্বাসের হোস্টেলে তারই ঘরে। ১২৭, বহুবাজার স্ট্রীট। উল্লেখ্য, এটা ছিল রিপন কলেজেরই লাগোয়া (attached) হোস্টেল। কেননা তাঁর উপরই ছিল অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করার ভার। সবাই প্রস্তুত। উত্তর-ভারতে কিছু ঘটেছে কিনা সেই সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্টেশনে লোক যেতে লাগল ঘন ঘন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, পাঞ্জাব মেল নিরাপদে কলকাতা পৌছে গেল, তখন গিরিজাবাবু প্রবোধ বিশ্বাস ও অন্য সকলকে বললেন যে, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল ঘটেছে যার ফলে নির্দিষ্ট দিনে অভ্যুত্থান আরম্ভ হতে পারেনি। যদিও এদিকে সমিতির সভ্য, সমর্থক ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিলেন এবং কার্যসূচী ছিল যে, প্রথমেই লালবাজার পুলিশ অফিস, ব্যারাক, রাইটারস্ বিল্ডিং সহ সমস্ত সরকারী ভবন, টেলিগ্রাফ অফিস এবং যানবাহন দখল করে নিতে হবে।

পরে খবর এলো যে, পাঞ্জাবের কৃপাল সিং নামে একজন লোক বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সব ধরিয়ে দিয়েছে। মীরাট ক্যাণ্টনমেণ্টে পিংলের গ্রেপ্তারের খবরও এল। তাঁর সঙ্গে ছিল অনেক বিস্ফোরক পদার্থ, যা দ্বারা অর্ধেক ক্যাণ্টনমেণ্টই ধ্বংস করা যেত।

বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার পর রাসবিহারীবাবু কলকাতায় আসেন এবং কন্টিনেণ্টাল হোটেলে থাকতে শুরু করেন। তখন গিরিজাবাবু এবং শচীন সান্যালও কলকাতায়।

এই সময়ই রাসবিহারী বসু জাপান চলে যান। অনুশীলন সমিতিই রাসবিহারী বসুর বিদেশ গমনের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেয়। প্রয়োজনীয় অর্থ বাবদ এক হাজার টাকা দেয়া হয়। টিকেটের এবং অন্যান্য সমস্ত খরচই সমিতি থেকে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সে সময়ে গিরিজাবাবু, নলিনী ঘোষ, অমৃত সরকার প্রভৃতিই সমিতির নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং প্রবোধ বিশ্বাসের মেসে তাঁরা অনেক রাত কাটিয়েছেন।

এই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পরে যে সব ডাকাতি সংঘটিত হয় তার মধ্যে ১৯১৫ সালে কুমিল্লা জেলার হরিপুরা গ্রামে রাজনৈতিক ডাকাতি অন্যতম, যার নেতৃত্ব স্বয়ং অমৃত সরকার করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রবোধ বিশ্বাস।

মতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময় কিছু ঘটনা

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অনুশীলন সমিতি এবং চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু ও শ্রীশ ঘোষ পরিচালিত দল ১৯১১/১২ সালেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং ১৯১৩ সালে এই দু'দল সম্পূর্ণ এক হয়ে যায়। চন্দননগরের দলের সর্বাধিনায়ক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। অনুশীলন সমিতির সভ্য কাশীর শচীন সান্যাল অনুশীলন সমিতির মারফতই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরিচিত হন। ঐ সময়ে আমি ও শচীন সান্যাল উত্তর-ভারতে নানা জায়গায় সমিতির কার্য পরিদর্শন করি (১৯১৩)।

এই সম্বন্ধে শচীন সান্যালও তাঁর 'বন্দীজীবনে' লিখেছেন, "ঢাকা অনুশীলন দল চন্দননগরের দলের সহিত এক হইয়া যায়, কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মারফতই রাসবিহারীর উত্তর-ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব বাঙ্গলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একযোগে কার্য করে। পাঞ্জাবের বিপ্লবিগণের সংবাদও অধিকাংশ স্থলে এই ঢাকা সমিতির মারফতই বাংলার বিভিন্ন দলের নিকট পাঠান হইত। লাহোর, দিল্লি, কাশী, চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবী দল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাংলার অন্যান্য দল ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।" চন্দননগরের মতিলাল রায় তাঁহার পুস্তকে লেখেন—"কাশীর দল ঢাকা সমিতির মারফত রাসবিহারীর উত্তর-ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। লাহোর, দিল্লি, কাশী, চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবীদল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়।"

আলিপুর বোমার মামলায় (১৯০৯) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পরিচালিত দল গ্রেপ্তার হওয়ার পর চন্দননগর দলের সঙ্গে সম্পর্কিত সুরেশ দত্ত ছাড়া ভারতবর্ষের

কোথাও বিপ্লবীদের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা তৈরী করতে আর কেউ জানত না। সুরেশ দত্ত মশায়ের কাছ থেকে শেখেন চন্দননগরের মণীন্দ্র নায়েক। তখন বোমার খোল তৈরী করতেন অনুশীলন সমিতির অমৃত হাজরা। অনুশীলন সমিতি ও চন্দননগরের দল একত্র হয়ে যাওয়ায় এই সম্মিলিত দলই কেবল বোমা তৈরী করতে পারত। এই বোমাই দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর, মৌলভী বাজারে, ময়মনসিংহে, লাহোরে গর্ডন সাহেবের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। পিংলের সঙ্গে মীরাটে যে শক্তিশালী বোমা পাওয়া যায়, যাদ্বারা সেনা-ব্যারাকের সমস্ত ধ্বংস হতে পারত তা'ও এই দলের তৈরী। ১৯২০ বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষের যেখানে যে বোমা বিদীর্ণ হয় তা সবই এ দলের তৈরী।

রাসবিহারী বসু দেরাদুন বন গবেষণা মন্দিরে (Forest Research Institute) প্রধান সহকারী (Head Assistant) ছিলেন। ইউরোপীয়ানদের হিন্দী ও বাংলা পড়িয়েও কিছু উপার্জন করতেন।

তিনি দিল্লির সেণ্ট যোসেফ একাডেমীর (St. Joseph's Academy) শিক্ষক আমীরচাঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। আমীরচাঁদ ছিলেন খুব উচ্চ-শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী ও দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী রামতীর্থের শিষ্য। ক্রমশ রাসবিহারী বসুর সঙ্গে অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ, বালরাজ, রঘুবর শর্মা, হনুমন্ত সহায়, দীননাথ তলোয়ারকরদের পরিচয় হয়। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন লাহোরের অধিবাসী। এঁরা সকলেই লালা হরদয়ালের দলভুক্ত ছিলেন। এই সূত্রেই রাসবিহারী বসু ও হরদয়ালের যোগ স্থাপিত হয়।

দিল্লির অধিবাসী লালা হরদয়াল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখে ১৯০৬ সালে বার্ষিক দু'শ পাউণ্ড জাতীয় বৃত্তি পেয়ে বিলেতে যান। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সেকালে যদিও সাধারণত মেধাবী ছাত্ররাই বিলেত যেত, কিন্তু সে সময়ে লালা হরদয়ালের মত মেধাবী ভারতীয় বিলেতে খুব কম ছিল। তিনি বিলেত যাওয়ার পূর্বেই লাহোর ও দিল্লিতে বিপ্লবী দল গঠন করেন। বিলেতে গিয়েও তিনি বৈপ্লবিক কার্য পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর সাহায্যে ভারতবর্ষে বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করবার যে প্রচেষ্টা হয়, ভারতবর্ষের বাইরে অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকায়, তার সর্বাধিনায়ক ছিলেন লালা হরদয়াল এবং ভারতবর্ষে সেই সশস্ত্র বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক ছিলেন রাসবিহারী বসু। এই দুজনের পরিচালিত দু'দল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই এক হয়ে যায়। ভারতবর্ষে হরদয়ালের দল রাসবিহারী

বসুর নেতৃত্বেই পরিচালিত হ'ত। এভাবেই ঢাকার অনুশীলন সমিতি, চন্দননগরের মতিলাল রায় পরিচালিত দল, কাশী, দিল্লি, লাহোর, পূর্ববঙ্গ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একই দল হয়ে যায়। এই সম্মিলিত দলই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদলকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করে।

সর্দার অজিত সিং ও সুফী অম্বাপ্রসাদ গোপনে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইউরোপে গিয়ে লালা হরদয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একযোগে কাজ করেন এবং ১৯০৯ সালে পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ বিলেত গিয়ে হরদয়ালের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করতে থাকেন।

লালা হরদয়াল পরে আমেরিকায় গমন করেন ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে গদর পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ কার্যে তিনি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সাহায্য লাভ করেছিলেন। তখন আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে (প্রশান্ত মহাসাগর তীরে) যুক্তরাজ্য ও কানাডায় বহু ভারতীয় শ্রমজীবী অর্থোপার্জনের জন্য গমন করত। এদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবী শিখ। লালা হরদয়াল এই ঔপনিবেশিকদের এবং ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করে যে দল গঠন করেন, তাই গদর পার্টি নামে খ্যাত। হরদয়াল হিন্দুস্থানী ও গুরুমুখী ভাষাতেও গদর পত্রিকা প্রকাশ করেন।

এই গদর পার্টির সভ্যগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই দলে দলে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য আসতে থাকে এবং হরদয়ালের নির্দেশেই গদর পার্টির সভ্যগণ রাসবিহারী বসুর নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং আমাদের সঙ্গে এক হয়ে যায়।

রাসবিহারী বসু আমাদের অনুশীলন সমিতি প্রকাশিত লিবার্টি (Liberty) পত্রিকায় লিখতেন। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ঘোষিত হওয়ার পর আমাদের দেশের নরমপন্থী রাজনীতিকগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে রাসবিহারী বসু আলোচনা করে লিবার্টি পত্রিকায় লেখেন—"মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার কিছুই নয়, আমরা চাই স্বাধীনতা; ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ধ্বংস। আমাদের কাজ হইল General massacre of all foreigners, অর্থাৎ সে সমস্ত বিদেশী এদেশকে পরাধীন করিয়া রাখিবার জন্য আসিয়াছে তাহাদের হত্যা। আমাদের আন্দোলন নির্ভর করে আমাদের আত্মত্যাগের উপর। আমাদিগকে দেশের মুক্তি কামনায় আত্মত্যাগী হইতে হইবে। আমাদের সাধনা ও আদর্শের ভিত্তি হইল ভগবদ্গীতা।"

তখন আন্দামান দ্বীপে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কিছু কিছু সংবাদ ও আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত ইন্দুভূষণ রায় অত্যাচারের ফলে আত্মহত্যা করেছেন এ খবর আমরা পেলাম।

এই সময় রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে এসে বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ ঘোষণা করে বললেন, ভারতবর্ষে শান্তি বিরাজ করছে, ভারতবাসী রাজভক্ত। বঙ্গবিভাগ রদ হওয়ায় দেশের বহু লোক খুশী হয়েছিল এবং একদল লোকের মধ্যে রাজভক্তির বন্যা বয়ে যায়। ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবাসী সুখী এমনি একটা ধারণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বদ্ধমূল হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং আমাদের দল স্থির করল যে, এমন কিছু করতে হবে যার ফলে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়। তখন রাসবিহারীবাবু ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

রাসবিহারী বসু তাঁর কাজের সাহায্যের জন্য বসন্ত বিশ্বাসকে বাংলাদেশ থেকে দেরাদুন নিয়ে যান। দেরাদুন থেকে তাকে লাহোরে পাঠানো হল এবং সেখানে বসন্তকে পপুলার ডিসপেন্সারী নামে এক ঔষধের দোকানে কম্পাউণ্ডার করে দেন বালরাজ।

রাজা পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করেছিলেন যে, এর পর থেকে দিল্লিই হবে ভারতবর্ষের রাজধানী। এর আসল কারণ এই যে, তখন বাংলাদেশ ছিল রাজনীতিতে ও ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সর্বাগ্রগণ্য। সুতরাং কলকাতা থেকে রাজধানী অপসারণ করা প্রয়োজন। এর ফলে ভারতবাসীর উপর বাংলার রাজনৈতিক প্রভাবও কতকটা কমে যাবে। শাসনকার্যেও তাই। পাঠান-মোগল যুগে দিল্লিই ছিল ভারতবর্ষের রাজধানী এবং তার আগেও দিল্লি ছিল ভারতবর্ষের একটা প্রধান স্থান। দিল্লির সম্রাটই ভারতবর্ষের সম্রাট বলে গণ্য হ'ত। পূর্ববর্তী যুগে দেশীয় রাজন্যবর্গ দিল্লীশ্বরকেই আনুগত্য জানিয়ে এসেছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ স্থির করল যে, দিল্লিতে রাজধানী স্থাপিত করলেই ব্রিটিশ শাসনের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাই বিপ্লবীদলও স্থির করলেন যে, ঠিক এই স্থানেই ব্রিটিশকে আঘাত হানতে হবে।

নতুন রাজধানীতে উৎসব করে রাজকীয় প্রবেশের দিন ধার্য হয় ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১২। এই দিন ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন রাজধানীতে রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। হাতিতে চড়ে রাজছত্র মাথায় দিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ চললেন শোভাযাত্রাসহকারে। সেই শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিল বহু

রাজা, মহারাজা, সর্দার, উচ্চ সরকারী কর্মচারী, ছিল সৈন্যদল। শোভাযাত্রা কুইন্‌স গার্ডেন হয়ে চাঁদনী চক্‌ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তা, বাড়ীর ছাদ ও জানালাগুলি জনাকীর্ণ।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বাড়ী ছিল তিনতলা। সেখানে স্ত্রীলোক দর্শকদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। বসন্ত বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধান করে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মিশে অপেক্ষা করছিল। গায়ে গরম কাপড় জড়ানো। একজন পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নাম কি বহিন? উত্তরে বসন্ত বলেছিল, লীলাবতী। একজন বসন্তের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ঠিক এমনি সময় শোভাযাত্রা খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। বসন্ত ওদের দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণ করবার জন্য বলল—কি চমৎকার, বড় আজব, সামনে দেখ বহিন। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সামনের দিকে। বসন্ত লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতির উপর বোমা নিক্ষেপ করল। বড়লাট সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন, নিহত হ'ল চোপদার, এবং আরও কেউ কেউ আহত হ'ল। চারদিকে ভীষণ হুলস্থুল পড়ে গেল। রাসবিহারী বসু কাছেই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বসন্তের পোশাক বদলে তাকে লাহোরগামী গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে দেরাদুনের গাড়িতে উঠলেন।

কয়েক মাস পরে বড়লাট স্বাস্থ্যের জন্য দেরাদুন গিয়ে সার্কিট হাউসে বাস করতে লাগলেন। তখনও তাঁর শরীরে বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনেকগুলি আলপিন বিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে সেগুলির অবস্থান রঞ্জনরশ্মি দ্বারা স্থির করে তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা হ'ত।

কর্মচারীদের এক সভায় রাসবিহারী বসু লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের প্রকাশ্য নিন্দা করে তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। বড়লাটের মিলিটারী সেক্রেটারী রাসবিহারী বসুর কাছে বাংলা পড়তে আরম্ভ করলেন। এই সময় দেরাদুনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর উচ্চ পদাধিকারী সুশীল ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনিই এই বোমা নিক্ষেপের তদন্তে নিযুক্ত ছিলেন; এবং রাসবিহারী বসুকে কর্মস্থল থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি দিয়ে বাংলাদেশে পাঠান হ'ল। এই সময়ই আমি ও রাসবিহারী বসু একসঙ্গে অনেকদিন বাস করেছি। আমি তখন বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী।

কিছুকাল পর গভর্ণর স্যার জেমস্‌ মারটন (Sir James Merton) ও বড়লাট উভয়ে পাঞ্জাবের কর্পূরতলা রাজ্য পরিদর্শন করতে যাবেন বলে শোনা

গেল। তাঁদের সেখানে বড়দিনের সময় যখন বল-নৃত্য চলতে থাকবে তখন বোমার আঘাতে নিহত করার আয়োজন চলতে লাগল। এজন্য চন্দননগর ও রাজাবাজার আড্ডায় তৈরী বহু বোমা যুক্ত প্রদেশে নিয়ে যান রাসবিহারী বসু।

১৯১৩ সালের ১৭ই মে তারিখে লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে গর্ডন, আই. সি. এস.কে হত্যা করার জন্য বসন্ত বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপ করে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, একজন দারোয়ান নিহত হয়। এই গর্ডন সাহেবকেই মৌলভীবাজারের ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন একবার হত্যার আয়োজন করা হয়। সে ঘটনা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি।

দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় দিল্লি ও লাহোরে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা বর্ণিত হয়। ১৯১৪ সালে মামলার রায়ে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসীর হুকুম হয়। বালরাজ ও বালমুকুন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

এরপর রাসবিহারী বসু বেনারস, দানাপুর, এলাহাবাদ, মীরাট, দিল্লি, রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোরের সেনা-নিবাসে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রচারকার্যে খুব জোর দেন।

১৯১১ সালে ভন বার্ণহার্ডি (Von Bernhardi) তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'জার্মানী ও আগামী যুদ্ধ' (Germany And the Next War) প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশগুলির স্বাধীনতাকামী জনগণের মনে আশা সঞ্চারিত হয়। বার্ণহার্ডি লেখনে—যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভারতবাসীরা যেন পিছিয়ে না থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে দেয়। এতে ব্রিটিশ সাম্রাজ বাদীরা বিশেষ ভীত হয়। হরদয়াল ও অন্যান্য ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানীর সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় সঞ্চার হয়।

১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্যাক্রামেন্টো সহরে ভারতীয়দের এক সভায় হরদয়াল ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এই যুদ্ধই আমাদের সম্মুখে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ উপস্থিত করবে। এখানে রামচন্দ্র পেশোয়ারী তাঁর সহযোগী ছিলেন।

এসময়ই হরদয়াল ভারতবর্ষে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চম্পকরায় পিল্লে জুরিখ থেকে বার্লিনে এসে ভারতীয় জাতীয় সমিতি (Indian National Party) গঠন করেন।

হরদয়াল এই সমিতির সঙ্গে যোগদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সে সময়ে সুইজারল্যাণ্ডে এসেছিলেন, এবং তাঁর উৎসাহে এবং নির্দেশেই এ সমিতি গঠিত হয়।

সুইরাজল্যাণ্ডে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় হরদয়ালের। তাঁরা একমত হয়ে একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত করে দুজনই বার্লিনে চলে যান।

বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বরকত্‌উল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী এবং হেরম্বলাল গুপ্ত এই সমিতিতে যোগদান করেন। এঁদের সমস্ত খরচ তখন জার্মানীর অর্থেই নির্বাহিত হ'ত।

এ সময়ই বিদেশবাসী ভারতীয়দের সহায়তায় ইউরোপ, আমেরিকা, তুর্কী, আফগানিস্তান, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশে কাজ শুরু হয়। উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করা যায়।

হেরম্ব গুপ্ত ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্রথমে আমেরিকায় কাজ করতে থাকেন। পরে হেরম্ব গুপ্ত শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্ককে গমন করেন এবং চন্দ্রকান্তবাবু যান নিউইয়র্কে। এ সময়ই সুফী অম্বাপ্রসাদ এবং অজিত সিং পারস্য ও কাবুলের দিকে যান।

যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুর্কী প্রভৃতি আঠারটি দেশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। ১৯১৪ সালেই জার্মানী ক্রুজার এম্‌ডেন ভারতমহাসাগর এমনকি বঙ্গোপসাগরে এসে ঘোরাফেরা করতে থাকে এবং ব্রিটিশ জাহাজ আটক করে কোন কোনটা ডুবিয়ে দেয়; মাদ্রাজ, পুরী, ম্যাঙ্গালোর ও সিংহলে গোলাবর্ষণ করে। এর ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। অপরদিকে ভারতবাসীদের মনে উদয় হয় আশার আলো। অপরাজেয় ব্রিটিশ শক্তির মর্যাদায় ভীষণ ফাটল ধরে।

যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয়ের সংবাদ ক্রমাগত ভারতবর্ষে আসতে লাগল। মেসোপটেমিয়ায় তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজ শোচনীয়ভাবে পরাজিত। জেনারেল টাউনসেণ্ড দশ হাজার ইংরেজ সৈন্যসহ তুর্কীর হাতে বন্দী। ভারতবাসীর মন উল্লসিত।

ভারতবাসীর মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ এতখানি দানা বেঁধেছে তা প্রথমে সাম্রাজ্য-বাদীরা বুঝতে পারেনি। শিখ সৈন্যদল তো অসন্তুষ্ট ছিলই, তুর্কী যুদ্ধে যোগদান করাতে মুসলমান সৈন্যদলও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বহু মুসলমান সৈন্যদল যুদ্ধে

যেতে অস্বীকার করল। এই অপরাধে অনেক লোকের প্রাণদণ্ড ও কারাবাসের হুকুম হ'ল।

এইরূপ একদল মুসলমান সৈন্যের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমি তখন সেখানে রাজবন্দী (State Prisoner)। তাদের সঙ্গে সহজেই আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। আলাপ করে বুঝলাম তাদের মন ইংরেজ বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তাদের কাছেই শুনলাম যে, তাদের অনেকের প্রাণদণ্ড বা কারাবাসের পূর্বে একটা বিচার প্রহসন হয়েছিল। তাদের ডেকে শুধু দণ্ডাজ্ঞা শোনান হয়েছিল।

ইউরোপ ও আমেরিকায় কেদারেশ্বর গুহর কার্যাবলী

কেদারেশ্বর গুহের বিদেশে কার্যাবলী সম্বন্ধে তাঁর চিঠিপত্র মারফত যে সব সংবাদ পেয়েছিলাম এবং পরে তাঁর শান্তিনিকেতন থাকাকালে সেখানে গিয়ে তাঁর নিজমুখে বিস্তৃত বিবরণ যা লিখে নিয়েছিলাম, তাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি:

১৯১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমিতির খরচে কেদারেশ্বর গুহকে ইউরোপে পাঠিয়েছিলাম। তখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির—ইংরেজ ও জার্মানী—প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরমে উঠেছিল। পৃথিবীর আর সবার মত আমরাও মনে করতাম যুদ্ধ শীঘ্রই শুরু হবে। সুতরাং মনে করেছিলাম বিদেশে ইংরেজ শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। তারা তাদের স্বার্থেই আমাদের সাহায্য করবে। বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, অস্ত্র নির্মাণ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা এবং গেলে আরও যুবক পাঠাব সে সমস্ত শিক্ষা করার জন্য, এও ছিল আমাদের কার্যসূচীর মধ্যে।

এর আগেও একবার কেদারেশ্বর গুহ জাপান গিয়েছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য জাপান থেকে ফিরে এসেছিলেন। তবে সেই পাশপোর্টই কাজে লাগানো হ'ল।

যদিও সমিতির অধিকাংশ সদস্যের কাছেই কেদারেশ্বর গুহর বিদেশ যাওয়ার বিষয় গোপন ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয় আমার, নরেন্দ্রমোহন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এবং রমেশ চৌধুরীর মধ্যে।

তখন ওরিয়েন্ট লাইনের জাহাজ অস্ট্রেলিয়া থেকে কলম্বো হয়ে ইউরোপ

যেত। এই লাইনে ভাড়া একটু কম এবং সম্ভবত তৃতীয় শ্রেণীর কেবিন ছিল; সুতরাং কেদারবাবু এই জাহাজেই যাবেন বলে স্থির হয়।

কেদারবাবু কলম্বো গিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়েন এবং এক মহারাষ্ট্রীয় ছাত্রের সাহায্যে এক বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

কেদারবাবু কলম্বো থেকে লণ্ডন হয়ে ম্যানচেস্টার গেলেন। সেখান থেকে তিনি রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নের অজুহাতে আমাদের লক্ষ্য জার্মানী যাওয়া স্থির করলেন। তিনি প্রথমে হাল (Hull) গেলেন এবং যেখান থেকে সুযোগমত হামবুর্গ (Humburg) চলে যান।

যাওয়ার আগেই ঠিক ছিল কেদারবাবু জার্মানী গিয়ে জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি তাঁকে সাহায্য করবেন এ ভরসা আমাদের ছিল। জ্ঞানবাবু কলকাতায় ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র ও সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি বার্লিন স্টেশনে কেদারবাবুর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন।

অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের ভাই শ্রীধীরেন সরকার তখন বার্লিনে ছিলেন। তিনি কেদারবাবুর পূর্ব-পরিচিত বন্ধু এবং তিনিও কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

প্রথমে কেদারবাবু তাঁর উদ্দেশ্য প্রকাশ করেননি, এমনকি তাঁর পুরনো বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্যের কাছেও নয়। অবিনাশবাবুর পুরনো বন্ধুগণ সকলেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় এঁরা সকলেই সরকারী বিদ্যালয় বয়কট করে ন্যাশন্যাল কলেজে পড়াশুনা করেন। তবে সকলেই গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন না।

সমিতির খরচে থাকবেন, তাই কেদারবাবু যত কম খরচে সম্ভব সেরূপ হোটেল খুঁজে বার করলেন 'হল অন দি রিভার সেল' (Hall on the River Sale)। সেখানে তিনি থাকতেন অবিনাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

ক্রমে কেদারবাবু অবিনাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা করতে লাগলেন। প্রথমেই সাংকেতিক চিঠি সাদৃশ্য কালিতে লেখার জন্য ঠিক করলেন যে, এ কাজ Phenolphthleine solution দিয়ে সম্ভব হবে এবং এ খবর আমাদের জানালেন। তখন আমাদের সঙ্গে তাঁর গোপন চিঠি লেখা শুরু হয়।

এ সমস্ত চিঠি যে গোপন নামে আসত আমি তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে নরেনবাবুর সঙ্গে সমস্ত আলোচনা করে তাঁর নির্দেশমত জবাব দিতাম।

কেদারবাবুকে থাকা-খাওয়া এবং সমিতির খরচের জন্য টাকা পাঠাতাম ডাচ্ ব্যাঙ্কের মারফত।

মাস পাঁচ-ছয় পর কেদারবাবু যান প্যারীতে পার্শী মহিলা ম্যাডাম কামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এই সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী নেত্রী পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে একযোগে ভারতবর্ষে বিপ্লব সংগঠনের জন্য কাজ করতেন এবং এজন্য নিজের অর্থ অকাতরে ব্যয় করতেন। শ্রীবিনায়ক সাভারকরও তাঁর সঙ্গে বৈপ্লবিক কার্যে যুক্ত ছিলেন। সাভারকর প্যারীতে ম্যাডাম কামার সঙ্গে দেখা করে লণ্ডনে গিয়েই গ্রেপ্তার হন। ম্যাডাম কামাকে গ্রেপ্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার অনেক চেষ্টা করছিল। এ কারণেই তিনি ব্রিটিশ রাজ্যের বাইরে থাকতেন—প্যারী বা জেনেভাতেই বেশীর ভাগ সময় থাকতেন। তাঁর পরিচালিত খবরের কাগজ ছিল—Bandemataram.

ম্যাডাম কামা তখন থাকতেন প্যারীতে রু ডি পন্থু (Rue de Panthu) রাস্তায় একটা বোর্ডিং-এ। কেদারবাবু এখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পার্শী শাড়ি পরিহিতা ম্যাডাম কামা 'বন্দেমাতরম' বলে অভিবাদন করেন এবং উপরতলায় একটা ছোট ঘরে কেদারবাবুকে নিয়ে যান। তিনি বললেন—সাভারকর যে ঘরে ছিল সে ঘরেই তোমাকে বাস করতে দিলাম।

কেদারবাবু অনুশীলন সমিতির কথা এবং তাঁর ইউরোপ যাওয়ার উদ্দেশ্য সব কথাই ম্যাডাম কামাকে বললেন। তিনি প্রথমেই বললেন—সমিতির সভ্যদের আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিও। আর বলো যে, আমিও তাদের একজন। আরও বললেন—আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে। আমাকে মা বলে ডাকবে।

কেদারবাবু ম্যাডাম কামার সঙ্গে আলোচনা করলেন বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরীর জ্ঞান কিভাবে অর্জন করা যায়, কিভাবে প্রয়োজনীয় মাল ভারতে পাঠানো সম্ভব, অস্ত্র সংগ্রহ ও ভারতে প্রেরণ এবং অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতি শিক্ষার সুযোগ।

ম্যাডাম কামা জানালেন যে, আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের উৎপাত খুব বেশী। তারা তৎপর আছেই, তদুপরি ব্রিটিশ গুপ্তচর তাঁর পেছনে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে। কাজেই ঘরে বসে আলাপও খুব মৃদুস্বরে করা দরকার। কেদারবাবুর সব কথাই তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনে তাঁর আন্তরিক সমর্থন জানালেন। অস্ত্র প্রেরণ সম্বন্ধে বললেন—খুব সাবধানে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। আসবাবপত্র যেভাবে প্যাক করা হয়—যেন কেউ সন্দেহ না করতে পারে,

তেমনিভাবেই পাঠাব। প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রাদি কলকাতা কিংবা চন্দননগরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব এবং পৌঁছানোর পর তা নিরাপদে গ্রহণের ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে।

ম্যাডাম কামা কেদারবাবুকে সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। Sociologist নামক একখানা সংবাদপত্র তিনি পরিচালনা করতেন। ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল যে, তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন না। বিদেশে থেকেই তিনি ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনের সহায়তা করতেন।

তিন-চারদিন পর কেদারবাবু প্যারী থেকে বার্লিনে ফিরে এলেন। তিনি যাতে নিরাপদে যেতে পারেন সেজন্য ম্যাডাম কামা একজন লোক সঙ্গে দিলেন। আরও উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সেই ব্যক্তি বার্লিনে এসে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করে যাবে।

বার্লিনে ফিরে এসে কেদারবাবু সমস্ত বিষয় অবিনাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করলেন। পরে তিনি সদৃশ্য কালিতে সমস্ত বিবরণ দিয়ে যে চিঠি দেন তা যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হয়।

১৯১৪ সালে কেদারবাবু আমেরিকা যাওয়ার প্রস্তাব করে সমিতির অনুমোদন চেয়ে পত্র দেন। আমাদের সমর্থন পেয়ে তিনি ঐ বছরই ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথমে নিউইয়র্ক এবং সেখান থেকে সিকাগোতে গমন করেন। তথায় কসমপলিটন ক্লাবে প্রমথ সাহার নির্দেশে ডঃ সুধীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ডঃ বসু তখন আইওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে তখন ছাত্রের পক্ষে উপার্জন করে খরচ চালাবার সুযোগ ছিল। ডঃ বসুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করে কেদারবাবু সিকাগোতে ফিরে এসে অনুশীলনের পুরাতন সভ্য সুরেন নাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মিসিগানে ফলের বাগানে যান।

শেষ পর্যন্ত তিনি ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কৃষিবিদ্যা পড়তে শুরু করেন। এতে খরচ কম। এক হোটেলে ওয়েটার (Waiter) হয়ে কাজ করে যা উপার্জন করতেন তাতেই খরচ নির্বাহ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

১৯১৪ সালে জুলাই-আগস্ট মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বেধে গেল। অক্টোবর মাসে শ্রীধীরেন সরকার হঠাৎ জার্মানী থেকে আমেরিকার নিউইয়র্কে এসেই কেদারবাবুর খোঁজ করে সিকাগোতে এসে সাক্ষাৎ করে যুদ্ধ-পরিস্থিতি আলাপ করে

কিভাবে জার্মানী থেকে সাহায্য পাওয়া সম্ভব এবং জার্মানী কিভাবে কত পরিমাণ সাহায্য করতে প্রস্তুত তা কেদারবাবুকে জানালেন এবং জানালেন যে, তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমেরিকা এসেছেন। আমেরিকা তখনও যুদ্ধে নামেনি, সুতরাং জার্মানী সম্ভবমত আমেরিকা থেকেই সাহায্য করবে। অন্যান্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকে সাহায্য পাঠান সম্ভব কিনা তাও দেখবেন। জানালেন যে, শ্যাম রাজ্যের মাধ্যমে কিছু করা যায় কিনা তারও অনুসন্ধান চলছে। পরিশেষে তিনি কেদারবাবুকে বললেন—আপনি প্রস্তুত আছেন কিনা বলুন। জার্মানী থেকে সমস্ত সাহায্য পাওয়া যাবে। অস্ত্রশস্ত্রাদি, যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সকলরকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য জার্মানী দিতে প্রস্তুত। জল বা স্থলপথে কিংবা উভয়তই ভারতবর্ষে মাল পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। দেশে গিয়ে সমস্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। ভারতবর্ষে তা গ্রহণ ও নিরাপদভাবে রক্ষার ব্যবস্থা ভারতবর্ষ থেকেই করতে হবে। দু-তিনদিনের মধ্যেই আপনাকে ভারতবর্ষের জন্য রওনা হতে হবে। ইংরেজের বাধা দেয়ার ব্যবস্থা, ভারতের উপকূল প্রহরার সুব্যবস্থা প্রভৃতি যুদ্ধের সময়োপযোগী সুরক্ষিত হওয়ার পূর্বেই ভারতবর্ষে মাল পৌছানোর ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

তিনি আরও বললেন—ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা, সাংকেতিক ভাষায় বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ, সবই করতে হবে। আমরা এদিকে প্রস্তুত আছি, জার্মানীও অবিলম্বে সাহায্য পাঠাবার জন্য তৈরী। ভারতের পক্ষ হয়ে সব বন্দোবস্ত আপনাকেই গিয়ে করতে হবে। শীঘ্র দেশে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সংগঠন ভালভাবে করে আসুন।

ধীরেন সরকার কেদারবাবুর ভারতবর্ষে যাওয়ার জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলেন। কেদারবাবু সব কিছু ফেলে কেবলমাত্র সামান্য কিছু নিয়ে সানফ্রান্সিসকোতে চলে গেলেন। নির্বিঘ্নে ভারতবর্ষে পৌছানো তখন আসল কথা। বিপ্লবীরা যে সাধনা এতদিন করে এসেছে আজ তা সিদ্ধির পথে। যাওয়ার সব ব্যবস্থাই অবশ্য খুব গোপনে করতে হয়েছিল।

সানফ্রান্সিসকোতে পৌছে কেদারবাবু অনুশীলন সমিতির পুরাতন সভ্য ডঃ তারকনাথ দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে সব কথা বললেন। তিনি সব শুনে তাঁকে দেশে যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী হলেন এবং কিছু সাহায্যও করলেন। তিনি একটা জাপানী জাহাজের নাম করে বললেন, এই জাহাজেই

আপনি যান, গদর পার্টির অনেকে যাবে, কিছু সুবিধাও হবে। তারকবাবু কিছু বইও কেদারবাবুকে দিলেন। কেদারবাবু দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়ে জাপানের ইওকোহামা বন্দরে এসে উপস্থিত হলেন। সাতদিনের মধ্যেই তিনি পরবর্তী জাহাজে রওনা হয়ে অক্টোবর মাসেই কলম্বো পৌছলেন।

জাপান থেকে কলম্বোর পথে জাহাজে কেদারবাবুর সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচিত ভূপেন মুখার্জি ও নারায়ণ রাও নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সাক্ষাৎ হয়। নারায়ণ রাও বার্লিন থেকে আসছিলেন। ১৯২১ সালে নাগপুর কংগ্রেসে আমার ও শচীন সান্যালের সঙ্গে রাও-এর দেখা হয়েছিল। ভূপেন মুখার্জি আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেন।

এঁরাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আসছিলেন। জার্মানীর সাহায্যে ভারতবর্ষে অস্ত্রশস্ত্র পৌছানো ও গ্রহণের বন্দোবস্ত এবং ভারতবর্ষে অভ্যুত্থানের সমস্ত রকম সাহায্য জার্মানী করতে প্রস্তুত। এই সংবাদ দেওয়াই ছিল তাঁদের ভারতবর্ষে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

তখন বিভিন্ন জাহাজে গদর পার্টির শিখগণ দলে দলে ভারতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। কেদারবাবুদের জাহাজেও অনেকে ছিলেন।

সানফ্রান্সিস্‌কো ও আমেরিকার পূর্বকূলে তখন বহু পাঞ্জাবী শিখ জীবিকা সংস্থানের জন্য এসে চাষ-বাস করে বসতি স্থাপন করছিলেন। শিখগণ সাধারণতই ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন। ইংরেজের শাসন ও শোষণে দেশে থাকতে না পেরে তাঁরা দূর আমেরিকায় অন্ন-সংস্থানের জন্য গিয়েছিলেন। এতেও ব্রিটিশ সরকার নানভাবে বাধা দিতে লাগল। বাবা গুরুদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে একদল শিখ ষ্টিমার চার্টার (charter) করে ক্যানাডার পূর্ব-উপকূলে ভেঙ্কুভারে গিয়েছিলেন। তাঁদের তীরে অবতরণ করতেই দেওয়া হয়নি। ফলে সমস্ত পাঞ্জাবীদের মধ্যেই অসন্তোষের বহ্নি ছড়িয়ে পড়েছিল। লালা হরদয়াল এই পাঞ্জাবীদের মধ্যেই বিপ্লববাদ প্রচার করছিলেন এবং এরা তাঁরই নেতৃত্বে গদর পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত এই গদর পার্টি তখন ভারতবর্ষে কাজ করছিল রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এবং তাঁরা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের বাইরে—ইউরোপ ও আমেরিকায়—লালা হরদয়ালই হয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা। জার্মানীর সাহায্য গ্রহণ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে পরিকল্পনা ইউরোপে হয়েছিল, তার প্রধান নেতা ছিলেন লালা হরদয়াল।

প্রত্যাবর্তন পথে ষ্টিমারে গদর পার্টির শিখযাত্রীরা খোলাখুলিভাবে ম্যাপ খুলে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। গোপন না করে তারা উদ্দেশ্য প্রকাশ্যেই বলতেন। অবশ্য কেদারবাবু, ভূপেন মুখার্জি, ও নারায়ণ রাও তাঁদের উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে খুব সতর্কতার সঙ্গে কথা বলতেন।

কেদারবাবু জাপানে ইউকোহামায় হোটেলে থাকতেন। জাপান থেকে কেদারবাবুরা কলম্বো এলেন একটা ইউরোপীয় ষ্টিমার লাইনে। কেদারবাবু ও ভূপেনবাবু একসঙ্গে কলকাতা এলেন আর নারায়ণ রাও গেলেন বোম্বেতে। যাওয়ার পূর্বে পরস্পরের ঠিকানা দিয়ে গেলেন। একই উদ্দেশ্য নিয়ে সকলে এসেছেন, একই সঙ্গে কাজ করবেন, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেই হবে।

কেদারবাবু কলকাতায় এসে উঠলেন এক আত্মীয়ের বাসায়। পরে সমিতির সভ্যদের খোঁজ করতে লাগলেন। সমিতির নেতাদের মধ্যে কেদারবাবু যাঁদের চিনতেন তাঁরা সকলেই তখন কারারুদ্ধ। আমিও তখন বরিশাল জেলে আটক —বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায়। গুপ্ত সমিতির কঠোর গোপনতার জন্য বহু লোককেই কেদারবাবু চিনতেন না, এবং কেদারবাবুর বিদেশে যাওয়ার কথাও নেতৃস্থানীয় অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতেন না। তখন সরকারী দমন নীতি খুব সক্রিয়। কেদারবাবু এও জানতেন না যে, আমরা চন্দননগরে মতিবাবু এবং রাসবিহারীবাবুদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছি বা তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল না। নতুবা মতিবাবুর কাছে উপস্থিত হতে পারতেন।

কেদারবাবুর বাবা দুঃখিত হলেন যে, তাঁর ছেলে বিদেশে কোন কিছু না শিখে—অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত না করে, অনর্থক দেশে ফিরে এল। কেদারবাবু তাঁর বাবা ও আত্মীয়স্বজনদের বোঝালেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না পেলেও কৃষি-ফার্মের কাজ শিখে এসেছেন।

ভূপেন মুখার্জি কোন বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলেন না, কাজেই কোন খোঁজও পেলেন না বা কোন কিছু করতেও পারলেন না।

কেদারবাবু প্রতিদিন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, পার্কে পার্কে, নানান্ স্থানে ঘুরতে লাগলেন যদি দলের সভ্য কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হেদোর ধারে (বর্তমান আজাদ হিন্দ্ বাগ) একদিন হঠাৎ অনুকূল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন পলাতক, তাঁর নামে ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। কেদারবাবুর

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনুকূল চক্রবর্তী বললেন—আমরা ছোটরা এখনও আছি। বড়রা সব ধরা পড়েছেন। কাজ ভালই চলছে।

কেদারবাবু জার্মানীর সাহায্যপ্রাপ্তির আশার কিছু আভাস দিয়ে বললেন—আমি খুব জরুরী খবর নিয়ে এসেছি। কার কাছে সব বলতে পারি? কি করে সব সংগঠন করব বলুন তো?

অনুকূল চক্রবর্তী ছিলেন তখন পুর্ববঙ্গের প্রধান পরিচালক। তিনি বললেন—আমরা ছোটরা তো আছি। আমার কাছেই সব বলুন। কাশীতে রাসবিহারীবাবু আছেন। তাঁর ঠিকানা, পরিচয়পত্র এবং সাঙ্কেতিক বাক্য (Pass word) আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি কাশী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। তিনিই আমাদের নেতা। সেখানেই এখন আমাদের প্রধান কেন্দ্র। তাঁর লিখিত পত্রে ছিল—আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু। ১৯১২ সালে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এঁর কাছেই সব শুনবেন।

কেদারবাবু ভূপেন মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে কাশী রওনা হলেন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পোশাকে সজ্জিত হয়ে তাঁরা ইউরোপীয়ানদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় ভ্রমণ করলেন। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন—গুপ্তচর এড়িয়ে নিভৃতে আলাপ করার প্রয়োজন। এ কাজ করব সন্ধ্যার পর মাঝ-গঙ্গায় নৌকার মধ্যে। একজন গাইড আপনাকে নিয়ে যাবে ছোট নৌকায়। পরে বড় নৌকায় উঠে আলাপ হবে।

নির্দিষ্ট গাইড কেদারবাবু ও ভূপেন মুখার্জিকে নিয়ে ছোট নৌকায় করে মাঝনদীতে গিয়ে একটা বড় পানসীতে উঠিয়ে দিল। পানসীর হিন্দুস্থানী মাঝিরাও ছিল দলের বিশ্বাসভাজন লোক। পানসী চলতে লাগল ধীরে ধীরে, আর তাঁরা ছাতে বসে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। পরিশেষে কেদার-বাবু বললেন—সমুদ্রপথে ও স্থলপথে (আফগান-সীমান্ত ও অন্যপথে) অস্ত্রশস্ত্র পৌছবে। আমরা এদেশে যেন প্রস্তুত থাকি। সময়মত সব গ্রহণ করে যেন সংগ্রাম করতে পারি এবং সফলকাম হই।

রাসবিহারীবাবু বললেন—আপনারা আসতে আমাদের শক্তি বেড়ে গেল। কিন্তু শুধু পরের (জার্মানীর) সাহায্যের অপেক্ষা করে লাভ কি? পাঞ্জাবী সৈন্য ও অন্যান্য সৈন্যদলকে আমাদের মতে এনে—আমাদের সভ্যসংখ্যাও তো বহু সহস্র—সকলকে সংগঠিত করে নিজেরাই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই করব। বিদেশীর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে, বিদেশীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর

করে থাকতে নেই। কারণ, তাহলে তারা পেয়ে বসবে; এবং ভক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। অনুশীলন সমিতি ও আমরা চন্দননগর এবং পাঞ্জাবী বন্ধুগণ—এই সম্মিলিত শক্তির এই নীতি। বিদেশীর সাহায্য পাই ভাল—তবে তা সাহায্য হিসেবেই—লড়াই আমাদেরই করতে হবে। তবেই আমাদের দেশ হবে আমাদের। সবাই যার-যার সীমানায় সংগঠন করবে এবং একটা দিন ও সময় স্থির করে সেই দিন ও সময়ে সর্বত্র লড়াই শুরু করব। ইতোমধ্যে সাহায্য আসে ভাল, নয়ত আমরাই লড়াই শুরু করে দেব।

ঠিক এই নীতি অনুসারেই এতদিন আমাদের সমিতি কাজ করে আসছিল। রাসবিহারীবাবুও এই নীতি অনুসারেই ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটা দিন স্থির করেছিলেন। জার্মানী প্রেরিত অস্ত্র আসুক, না আসুক, রাস্তায় কোন বিপদ ঘটুক, যাই হোক ঐ তারিখে লড়াই আরম্ভ হবে।

রাসবিহারীবাবু কেদারবাবুকে বললেন—আপনারা ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারেন। যেখানেই থাকেন সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

কেদারবাবু কলকাতায় ফিরে এসে অনুকূল চক্রবর্তীকে সব বললেন। কলকাতা আসার পর অবিনাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকেও কেদারবাবু রাসবিহারী বসুর সঙ্গে দেখা হওয়ার সব বিবরণ বললেন। অবিনাশ ভট্টাচার্যও জার্মানী থেকে এসেছিলেন ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সাহায্য করার জন্য।

কেদারবাবু কলকাতা থেকে প্রথমে ঢাকা এবং পরে চট্টগ্রামে গিয়ে পার্টির গুপ্ত আড্ডায় বাস করতে লাগলেন। উভয় স্থানেই তিনি সারাদিন ঘরে থেকে রাত্রিতে বার হতেন। খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা এবং পোশাক পরতেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মত, এবং বাঙ্গালীদের এড়িয়ে চলতেন। তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্র উপকূলে, কিংবা নোয়াখালী ও বরিশাল জেলার দিক দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করার সুযোগ আছে কিনা।

তখন প্রত্যেক জেলায় পার্টির সভ্যদের একত্র করে গোপনে ড্রিল-প্যারেড করান হচ্ছে। রাইফেল, রিভলবার এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। বহু লোকের সাহায্যে প্রত্যেক জেলার জল ও স্থলপথ চিনিয়ে রাখা এবং ব্রিটিশের অস্ত্রাগার, সৈন্যদল ও সশস্ত্র পুলিশের আড্ডা দেখিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঢাকার সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। তারাও অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য তখন প্রস্তুত।

কোথাও কোথাও সৈন্যদলের মধ্যে একটা কথা হ'ত—আপনারা প্রথম আক্রমণ করে অভ্যুত্থান আরম্ভ করুন, আমরা পরমুহূর্তেই যোগদান করব। নতুবা আমরা আরম্ভ করব, আর যদি কোন কারণে আপনারা যোগদান না করেন তবে আমরা মারা পড়ব।

তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন খুব দ্রুত এগিয়ে চলছে। অনতি-বিলম্বেই সংগ্রাম শুরু করতে হবে, সুতরাং প্রতিদিন একজন সংবাদ নিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকা এবং কাশী থেকে কলকাতা আসত। ভারতের প্রতি প্রদেশের সঙ্গে তখন এভাবে সংবাদ চলাচল করত। দলের সকলেই তখন প্রতিদিন আশা করত অভ্যুত্থানের ডাক বুঝি এলো!

তখন উত্তর-ভারতে রাসবিহারী বসু ও তাঁর দুই প্রধান সহকারী শচীন সান্যাল ও গিরিজাবাবু (নগেন দত্ত) নেতৃত্ব করছিলেন।

কেদারবাবু আমেরিকা থেকে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরেন দাশগুপ্তকে আমেরিকা থেকে জার্মানী পাঠান হ'ল। তিনি সেখানে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে টার্কিশ সীমান্তে অফিসার হয়ে সংগ্রামে যোগদান করেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে সংযোগ রক্ষার জন্য এ সীমান্তের গুরুত্ব ছিল খুব।

ঢাকায় জোড়া খুন

১৯১৬ সালের প্রথমদিকে শীতের সময় ঢাকা শহরের বৈরাগীটোলা গলিতে দুজন গোয়েন্দা কর্মচারী নরেন ব্যানার্জি ও আর একজন (আমার নাম জানা নেই), বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এ ব্যাপারটাই সেকালে ঢাকায় 'জোড়াখুন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিপ্লবী অতীন রায় ও কৃষ্ণ সাহা তখন গৃহত্যাগী কর্মী। এদের ধরবার জন্য পুলিশ বাংলাদেশের নানাস্থানে চেষ্টা করছে। ঢাকার নদীর ধারের রাস্তায় যখন এরা বুঝতে পারল যে, উক্ত গোয়েন্দা কর্মচারীরা এদের অনুসরণ করছে তখন বিপ্লবীরা নদীর ধারের রাস্তা (বাকল্যাণ্ড বাঁধ) পরিত্যাগ করে সহরের ভিতরের রাস্তায় প্রবেশ করল। গোয়েন্দারা ওদের পিছু তখনও। অতীন রায় ও কৃষ্ণ সাহা জুবিলি স্কুলের পাশ দিয়ে এসে সুত্রাপুর রোডে প্রবেশ করল। এ রাস্তায় তখন আমাদের বাড়ি ছিল। যদিও আমি তখন জেলে কিন্তু আমার ভাই ধীরেন, বীরেন, মা, বোনেরা, ভগ্নিপতি মনোরঞ্জন ব্যানার্জি এবং অন্যান্য সকলেই কেউ সমিতির সভ্য, কেউ সমর্থক, কেউ হিতাকাঙ্ক্ষী।

সুতরাং এরা অনায়াসেই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারত। একে তো অনুসরণকারীরা গোয়েন্দা, তাছাড়া আমাদের বাড়ির সামনেও সর্বদা গোয়েন্দা উপস্থিত থেকে আমাদের বাড়ির উপর নজর রাখত, কাজেই ওরা আর আমাদের বাড়ি প্রবেশ করেনি।

অতীন রায় ও কৃষ্ণ সাহা আমাদের বাড়ির পেছনে বৈরাগীটোলার গলিতে প্রবেশ করল। গোয়েন্দারা তখনও অনুসরণ করছে। উদ্দেশ্য ছিল এদের গ্রেপ্তার করা ; কিন্তু দুজন দুজনকে গ্রেপ্তার করতে সাহস করল না। ভেবেছিল দলে ভারী হলে তখন গ্রেপ্তার করবে, নিদেন পক্ষে এদের আড্ডাস্থল অন্তত দেখে রাখবে। কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না।

অতীন রায় ও কৃষ্ণ সাহা বেগতিক দেখে কিছুদূর এগিয়ে এসে গলির মোড়ে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। গোয়েন্দারা বুঝতে না পেরে গলির মোড় ফিরে একেবারে বিপ্লবীদের সামনে পড়ে গেল। ওরা তক্ষুনি গোয়েন্দাদের গুলি করল। ওদের সঙ্গেও রিভলবার ছিল, কিন্তু ওরা তার অবসরই পায়নি। গোয়েন্দাদের মধ্যে একজন খুব শক্তিশালী ছিল। সে প্রথম গুলি খেয়েও একজন বিপ্লবীকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু পুনরায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল। পরে অতীন রায় ও কৃষ্ণ সাহা খুব তাড়াতাড়ি সূত্রাপুর বাজারের দিকে চলে গেল।

এ ব্যাপারের এক সপ্তাহের মধ্যেই অতীন রায় বসন্ত চ্যাটার্জিকে নিহত করার কার্যে অংশ গ্রহণ করে। একথা পূর্বেই বলেছি।

অতীন রায়দের গোয়েন্দারা অনুসরণ করছে দেখতে পেয়ে তাদের কি হয় দেখবার ও প্রয়োজনমত সাহায্য করার জন্য একটু দূরে থেকে গোয়েন্দাদের অনুসরণ করতে লাগল অমৃত চক্রবর্তী। গোয়েন্দারা নিহত হওয়া মাত্র অমৃত চক্রবর্তী দ্রুত আমাদের বাড়ি প্রবেশ করে আমার ভাই ধীরেন গাঙ্গুলীকে সব বলল। বাড়ির সবাই তো সতর্ক হ'লই, সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত পলাতক কর্মী ছিল তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমাদের বাড়ি খানাতল্লাশি হওয়া একেবারে নিশ্চিত।

অমৃত চক্রবর্তী তখন ঢাকা জেলার ভারপ্রাপ্ত জেলা-পরিচালক। তারপরে পরিচালক হয়ে আসেন মনোরঞ্জন গুহ।

যোগেশ চট্টোপাধ্যায়-অত্যাচার কাহিনী

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের উপর যে অমানুষিক শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে অত্যাচার করা হয়, তার বর্ণনা ১৯১৮ সালে রাজসাহী জেলে বসে যোগেশবাবুর কাছে শুনেছিলাম। পুনরায় সেই বিবরণ ১৯৫৩ সালের জুন মাসে তাঁর কাছ থেকে লিখে নিয়েছিলাম। এই অত্যাচার কাহিনী মানুষকে সত্যের পথে সাহস যোগাতে সহায়ক হবে মনে করেই লিখছি।

যোগেশবাবুর বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। লেখাপড়া করেন কুমিল্লায়। যে সময়ের কথা বলছি তখন তিনি কুমিল্লা কলেজে পড়ছিলেন। তখন তাঁর বয়স পনেরোর বেশী নয়। অনুশীলন সমিতির সভ্য।

১৯১৬ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিস তাঁর বাসস্থান ঘেরাও করে। কিন্তু তিনি পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে পলায়ন করে কলকাতায় এসে সমিতির গুপ্ত আড্ডা, পলাতকদের বাসস্থান, পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। এই বাড়িতেই এক রাতে ইনস্‌পেক্টর সতীশ মজুমদার পুলিস বাহিনী নিয়ে এসে যোগেশবাবুকে গ্রেপ্তার করে। সেখানেই তাঁকে চুলে ধরে কিল, ঘুষি, লাথি মেরেছিলেন এবং অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়েছিলেন। এই সতীশ মজুমদারই আদিত্য দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ইনি পরে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে বৃত হয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার করে প্রথমে যোগেশবাবুকে জোড়াসাঁকো থানায় নিয়ে যায়। পরে শেষরাত্রির দিকে তাঁকে ৪নং কিড্‌ স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে আসে। এ বাড়িতে একটা ঘোড়ার আস্তাবলকে কিছু অদল-বদল করে দুটো সেল করা হয়েছিল। যোগেশবাবুকে এরই একটার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল।

বিকেল বেলা অফিস ছুটির পরই অত্যাচার শুরু হ'ত, আর তা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। সাব-ইন্‌সপেক্টর মনোজ পাল একটা কাঠের রুল হাতে করে ঘরে ঢুকেই, কোন কথা জিজ্ঞেস না করেই ভীষণভাবে মারতে শুরু করত। হাত-পায়ের সংযোগগুলিতে জোরে জোরে আঘাত করত। অন্য ঘরে অত্যাচার করত সাব-ইনস্‌পেক্টর মনি বোস। সেও মাঝে মাঝে এসে এ অত্যাচারে যোগদান করত।

সময়ে সময়ে বেত মারা হ'ত। মনোজ পাল ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেপাইদের আদেশ করে যোগেশবাবুকে বুটের লাথি মারাত। কখনও বা যতদূর সম্ভব দু-পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে রাখা হ'ত। একটু নড়াচড়া করা চলবে না। ক্লান্ত হয়ে

পড়ে গেলে কিংবা নড়াচড়া করলে সেপাইরা লাথি মেরে টেনে তুলে আবার অমনি করে দাঁড় করিয়ে রাখত। এরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে খানিক বিশ্রাম করে পুনরায় শুরু করত।

এ ঘটনা যখন ঘটে, যোগেশবাবুর বয়স তখন ষোল বছর হবে। অত্যাচার এমনই নৃশংস হ'ত যে, একদিন এক বিহারী সেপাই চোখে দেখতে না পেরে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর এর ফলে অফিসারের কাছ থেকে সে ভীষণ ধমক খেল।

রাত্রিতে ঘুমোতে দিত না। দাঁড় করিয়ে রাখত। চোখে একটু ঘুমের ভাব দেখলেই সঙ্গিনের খোঁচা দিয়ে রক্তপাত ঘটাত। একদিন যোগেশবাবু দাঁড়ানো অবস্থাতেই ঘুমিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তখনই মনোজ পাল ঘরে ঢুকে লাথি মেরে দাঁড় করিয়ে মারতে মারতে বলতে লাগল—বলবি না শালা, কিছুই বলবি না! শালাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলব। মা, বোনকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল।

আর একদিনের কথা। মনোজ পাল যোগেশকে মারতে মারতে তাঁর কাপড় টেনে খুলে ফেলল। দেখল যোগেশের লেঙট পরা। মনোজ পাল আরও চটে গেল—শালারা লেঙট পরে ; ব্রহ্মচর্য ঠিক রাখে, বীর্যপাত ঘটতে দেবে না, তার ফলে গায়ের জোর বেড়ে যায় এবং খুন-ডাকাতি করে। বলা শেষ করেই আবার মারতে শুরু করল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমি জেলে থেকেই শুনেছিলাম এবং পরে যোগেশবাবুর কাছেও শুনেছিলাম যে, পুলিন মুখার্জি এবং আরও দু'একটি ছেলেকে এমনিভাবে ওরা নির্যাতন করেছে। উলঙ্গ করে পুরুষ ধরে মৈথুন করিয়ে বীর্যপাত করাবার চেষ্টা করেছে। এই বিষয়ে তখন লিখিতভাবে সরকারের কাছে অভিযোগ পেশ করা হয়। যতদূর মনে পড়ে মিসেস এনি বেসান্তের স্মারকলিপিতে নির্যাতন সম্বন্ধে এ ঘটনার উল্লেখ ছিল।

যোগেশবাবুর উপর এই অত্যাচার চলে আটদিন ধরে। এ ক'দিন তাঁকে ঘুমোতে দেয়া হয়নি। স্নান তো নয়ই। সারাদিনের আহার ছিল একখানা ছোট লুচি ও একটি আলু।

এই নির্যাতন চলতে থাকাকালীন টেগার্ট (Tegart), গ্লেডিস্ (Glaydis), কলসন (Colson) মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতেন যোগেশের মন দুর্বল হয়েছে কিনা, কিংবা স্বীকারোক্তি করতে প্রস্তুত আছে কিনা। যোগেশকে মাঝে মাঝে এদের কাছেও নিয়ে যাওয়া হ'ত।

নলিনী মজুমদার বোধহয় তখন সাব-ইনস্পেক্টর। পরে তিনি স্পেশাল সুপাররূপে গোয়েন্দা বিভাগে বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। এই নলিনী মজুমদার একদিন মাঝরাতে নিয়মিত নির্যাতনের পর যোগেশকে তাঁর ঘরে নিয়ে খুব সহানুভূতি দেখালেন। খুব আবেগের সঙ্গে গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন—ছিঃ ছিঃ, এত অত্যাচার! এ তো ভাল নয়। আহাঃ, আহাঃ, ছোট ছেলের উপর এমনি ব্যবহার! একেবারে খেতে দেয়নি! বড্ড অন্যায় হয়েছে। সেই দুপুর রাতেই তিনি চারখানা লুচি ও কিছু তরকারী এনে যোগেশকে খেতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—বীরের মত সমস্ত বলে দিলেই হয়; খামোকা মার-ধোর খাওয়া কেন? আরও অনেক সদুপদেশ দেয়ার পরেও কোন ফল হ'ল না দেখে মনোজ পালকে ডেকে যোগেশকে নিয়ে যেতে বললেন।

তার পরদিনই হ'ল নির্যাতনের চূড়ান্ত। বিকেলবেলা মনোজ পাল কয়েকজন মেথরকে ডাকিয়ে এক কমোড ভর্তি প্রস্রাব ও মল গুলে রাখল। তারপর তারই আদেশে মেথররা যোগেশকে ধরে তার মাথা ও মুখ সেই কমোডের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল। দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়ায় পুনরায় দাঁড় করান হ'ল। একজন তার নাক টিপে ধরে রাখল যাতে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়। এমনি অবস্থায় সেই কমোডের মলমূত্র যোগেশের মাথায় মুখে ঢেলে দিয়ে, সে অবস্থাতেই একটা সেলে বন্ধ করে রেখে দিল।

এর কিছুদিন পরে যোগেশবাবুকে রেগুলেশন থ্রী স্টেট প্রিজনার করে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

যোগেশের মত বালকের উপর এই বীভৎস অত্যাচার কাহিনী শুনে আমরা শিউরে উঠলাম। সমিতির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ঐ জেলে তখন আমিও ছিলাম। স্থির করলাম এই অত্যাচারের বিবরণ জনসমক্ষে প্রচার করতে হবে। দেশের মানুষ জানুক স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে এদেশেরই এমনি অল্প বয়সের ছেলেরা কি প্রকার নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেও নিজের ব্রত ভুলে যায় না। ফলে লোকের মনে আত্মবিশ্বাস জন্মাবে, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতে শিখবে।

মনে করলাম, কোন সংবাদপত্র হয়ত সাহস করে এই সংবাদ ছাপবে না। তাই, প্রথমে যোগেশকে দিয়ে একটা দরখাস্ত সরকারের নিকট পাঠালাম। সেই দরখাস্তের অনুলিপি নানা খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলাম। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, যোগেশ নিজের সরল ইংরেজীতেই দরখাস্ত লিখেছিল। তাতে

অত্যাচারের বীভৎসতা যেন আরও ভীষণ হয়ে উঠেছিল। কোন্ কোন্ কাগজে এ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল তা জানি না, তবে নির্ভীক সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মডার্ন রিভিউ'তে (1918, August, Issue 16) অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল। রামানন্দবাবু নিজেও এর উপর মন্তব্য লিখেছিলেন।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই অত্যাচার আমাদের দেশীয় বাঙ্গালী গোয়েন্দা কর্মচারীরাই নিজেরা সম্মুখে দাঁড়িয়ে, হুকুম দিয়ে করিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বাঙ্গালী ইনস্পেক্টর, সাব-ইনস্পেক্টর, ডেপুটি সুপার তো থাকতেনই, কখনও কখনও এরা নিজের হাতে প্রহার করেছেন এবং বুটের লাথি মেরেছেন বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে। ইউরোপীয় সুপাররা মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়ে নানা আদেশ দিয়ে যেত।

কুঞ্জ ঘোষ-অত্যাচার কাহিনী

বরিশাল নিবাসী কুঞ্জ ঘোষ ছিলেন অনুশীলন সমিতির গৃহত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মী। নিষ্ঠা, ত্যাগ ও আন্তরিকতার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তিনি ছিলেন চিররুগ্ন। নানান রোগব্যাধিতে ভুগে ভুগে তাঁর শরীর এমনি ভেঙ্গে গিয়েছিল যে, তাঁর বয়স অনুমান করা শক্ত হ'ত। অথচ সমিতির কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন।

ময়মনসিংহ জেলায় কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ই তিনি গ্রেপ্তার হন। গোয়েন্দা অফিসে তাঁর উপর নির্যাতনের কাহিনী যখন তিনি আমাদের কাছে আলিপুর জেলে বসে বর্ণনা করেন তখন কেউ কেউ অবিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি যে, কুঞ্জ ঘোষের ঐ জীর্ণ দেহ এমনি নির্যাতন সহ্য করতে পারে। কিন্তু আমি ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখলাম কুঞ্জ ঘোষ একটুও বাড়িয়ে বলেনি। ময়মনসিংহের মত ছোট সহরে অত্যাচারীর সদম্ভ চিৎকার এবং এ বিষয়ে জেলের বাইরে ও ভেতরে অনেকেই সাক্ষী দিয়েছিল।

বেত, লাঠি, পা, অনাহার সবকিছু কুঞ্জ ঘোষের উপর অবিশ্রান্ত বর্ষণ করার পর রক্তাক্ত দেহে জেলে পাঠান হ'ল, জেল কর্তৃপক্ষ মনে করল যে, একে বাঁচানো যাবে না, এবং তাদের কৈফিয়তের ভাগী হতে হবে। তাই তারা কুঞ্জ ঘোষকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

কুঞ্জ ঘোষের উপর অত্যাচার কাহিনী দরখাস্ত আকারে সরকারের কাছে

পাঠিয়েছিলাম, এবং কলকাতার নানা খবরের কাগজে ছাপাবার জন্যও গোপনে পাঠিয়েছিলাম। ছাপা হয়েছিল কিনা জানতে পারিনি। কেননা যুদ্ধে ইংরেজের যুদ্ধজয় ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন খবরের কাগজই আমাদের পড়তে দেওয়া হ'ত না। পরে স্টেটস্‌ম্যান ও ইংলিশম্যান পড়তে পারতাম।

পরে অবশ্য নানা অত্যাচার-নির্যাতন কাহিনী খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার পর মিসেস এনি বেসান্ত এক স্মারকলিপি পেশ করেন। ফলে সরকার দুজন নামজাদা আই. সি. এস.কে সভ্য করে—বোধ হয় ষ্টিভেনসন মুর ও বিচ্‌-ক্র্যাফ্‌ট—এক নির্যাতন কমিটি স্থাপন করেন। তাঁরা রিপোর্ট দেন অত্যাচার হয়নি। কারণ টেগার্ট ও লোম্যান সাহেব সাক্ষীতে বলেছেন যে, নির্যাতন করা হয়নি। অথচ স্মারকলিপিতে তাঁদের বিরুদ্ধেও এ বিষয়ে অনেক অভিযোগ ছিল। তাঁরা স্বহস্তে বা আদেশ দিয়ে নির্যাতন করিয়েছিলেন। আর তাঁরাই বললেন, এ সব ঝুট! অভিযুক্তের কথাই ঠিক! এই হ'ল বিচার!

আমাদের দেশের গোয়েন্দা পুলিস নির্যাতনের নানা উপায় উদ্ভাবন করেছিল। সমিতির ছেলেরা ব্রহ্মচর্য পালন করত এও তাদের আক্রোশের একটা কারণ ছিল। ছোট ছোট ছেলেদের উলঙ্গ করে, হাত পেছনে এনে হাতকড়ি দিয়ে পুরুষাঙ্গ নিয়ে টানাটানি করা, আঘাত হানা, বীর্যপাত করাবার চেষ্টা—সবই চলত। গোয়েন্দা পুলিস বলত—শালাদের ব্রহ্মচর্য পালন করা বার করছি। যারা ব্রহ্মচর্য পালন করত, অসদালাপ না করে সব সময় সৎকথা আলোচনা করত, তাদেরই সরকার মনে করত অপরাধী, সাংঘাতিক বিপ্লবী। অনুশীলনের নেতৃস্থানীয় অমৃত সরকারের উপর অত্যাচারের সময় তার পুরুষাঙ্গের উপর এমনি বীভৎস কাণ্ড করে যার ফলে শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার করে সরকারী ডাক্তারই এক অংশ ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মজা এই যে, এনি বেসান্তের স্মারকলিপি পাওয়ার পরেও তখনকার বাংলার গভর্ণর (বোধ হয় লর্ড রোনাল্‌ডসে) এক বক্তৃতায় এই অশ্লীল অত্যাচারের বিষয় উল্লেখ করে তা বেমালুম অস্বীকার করেন।

আশুতোষ কাহিলী

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী-কর্মী ও নেতা আশুতোষ কাহিলীর বিপ্লবী জীবন সম্বন্ধে নীচে যা লিখছি তার কিছু আমার জানা, বাকীটা তাঁর কাছেই শুনেছি।

"আমার ছোটভাই আশুকে অনুশীলন সমিতিতে গ্রহণ করুন", এই কথা

বলে আশুবাবুর বড়ভাই সমিতির নেতা পুলিনবাবুর হাতে ছেড়ে দিলেন। সে সময় দক্ষিণ বিক্রমপুরের বীরেন সেন নেতৃস্থানীয়। ফরিদপুর জেলার পালং অঞ্চলে সমিতির কাজ চালাতেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর আশুবাবু কলকাতায় সিটি কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করলেন এবং থাকতেন ৫৯, পটুয়াটোলা লেনের মেসে। সেখানে তখন শ্রীযুত মাখনলাল সেন বাস করতেন এবং নগেন সরকার (পরে স্বামী সহজানন্দ) এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট সভ্যগণ অতিথিরূপে থাকতেন। রাত্রিতে আশুবাবু যেতেন নবাবী ওস্তাগার লেনে (বর্তমান আমহার্স্ট রো) শ্রীযুত সুরেন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর ছাপাখানায় কাজ করতে। ওখান থেকে তখন আমাদের কাগজপত্র, বেআইনী পত্রিকা এবং পুস্তিকা প্রভৃতি প্রকাশিত হ'ত।

কিছুদিন পরের কথা। আশুবাবু ফিরবেন কলকাতা, গ্রামের বাড়ি থেকে অবকাশান্তে। বীরেন চ্যাটার্জি তাঁকে বললেন, কেন আর কলকাতা যাবে, গৃহত্যাগ করে একেবারে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যাও সমিতির। আশুবাবুও গৃহত্যাগ করে সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় গেলেন। তখন সমিতির কাজ পরিচালনা করতেন শ্রীযুত নরেন্দ্রমোহন সেন এবং আমি তাঁর সহকারী। তিনি আমাদের বাড়িতেও যাতায়াত করতেন।

আশুবাবুর ঢাকায় আসার দিনই ঢাকার নদীর ধারে যতীন রায়কে (ফেগু রায়) গ্রেপ্তার করে নিশিকান্ত চক্রবর্তী। আমিও তখন নদীর ধারে ছিলাম। খবর পেয়ে গিয়ে দেখি তাঁকে ধবে নিয়ে যাচ্ছে (১৯১৩, জানুয়ারী)! এই নিশিকান্তই গোয়েন্দা ইনস্‌পেক্টর কেদারেশ্বর চক্রবর্তীর সহকারীরূপে সমিতির ভিতরকার তথ্য অনুসন্ধান করছিল রজনী দাসের স্বীকারোক্তির পথ ধরে এবং বরিশালে সমিতির পরিচালিত বেঙ্গল বোর্ডিং-এ জ্যোতিষী পরিচয়ে। গ্রেপ্তারের আগের দিনও ফেগু রায়ের সঙ্গে নিশিকান্তর দেখা হয়, কিন্তু তার উপর ওদের কোন সন্দেহ ছিল না।

জানুয়ারী (১৯১৩) মাসেই আশুবাবু কাজ করতে কুমিল্লায় যান আমাদের নির্দেশে। তখন পুলিন গুপ্ত সমিতির গৃহত্যাগী বিশিষ্ট কর্মী। কুমিল্লা জেলাতেই তাঁর বাড়ি। তিনি পাবনা জেলার সংগঠক ছিলেন কিছুদিন, বরিশালেও কাজ করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আশুবাবু গেলেন আগরতলায়। ঐ সময় এক ঘটনা হয়। সমিতির উৎসাহী কর্মী প্রবোধ দাশগুপ্ত কিছুদিনের জন্য গৃহত্যাগ করে ঢাকা গিয়ে থাকে। তখন তার বয়স খুবই অল্প। ফলে আশুবাবুর নামে

Kidnapping Charge-এ ওয়ারেণ্ট বের হয়। আশুবাবু আগরতলা পরিত্যাগ করে কুমিল্লার অন্তর্গত রায়পুরে যান স্কুলের শিক্ষক হয়ে।

এই প্রবোধ দাশগুপ্ত পরে সমিতির প্রসিদ্ধ কর্মী হন। বাংলা, বিহার ও আসামে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতেন। কুখ্যাত দালান্দা হাউস, যেখানে পুলিসের তত্ত্বাবধানে সেলে আবদ্ধ করে রাখত এবং অত্যাচার চালাত, সেখান থেকে পলায়ন করেন। পরে গৌহাটির খণ্ডযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে পুলিস-বেষ্টনী ভেদ করে চলে আসতে সমর্থ হন। পরে অবশ্য নবদ্বীপে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে (১৯২২-২৪) তিনি শচীন চক্রবর্তী সহ এক কারেন্সী নোট জাল করার অভিযোগে সাত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সমিতির খরচ নির্বাহ করবার জন্যই আমরা দশ ও একশ টাকার নোট জাল করার ব্যবস্থা করেছিলাম। পরে প্রবোধবাবু প্লুরিসী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

আশুবাবুর কথায় ফিরে আসা যাক্। তিনি মাঝে মাঝে সমিতির কাজ উপলক্ষে কসবা কালীবাড়ীতে যেতেন। তখন সেখানে থাকতেন স্বামী সর্বানন্দ আর থাকত সমিতির অস্ত্রশস্ত্র।

কেদারেশ্বর গুহ মহাশয় আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তিনি কাশী গিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় এলেন। তখন সমগ্র ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। সুতরাং ১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই আশুবাবুকে ঢাকায় ডেকে পাঠান হয়। তখন গিরিজাবাবু ও অনুকূল চক্রবর্তী সেখানে ছিলেন। তাছাড়া বরিশালের জেলা-সংগঠক জীবন গুহঠাকুরতা এবং প্রতি জেলা-সংগঠক বা তাঁদের সহকারী এসে উপস্থিত হন।

গিরিজাবাবু ও কেদারেশ্বর গুহ মহাশয় সবার সঙ্গে অভ্যুত্থানের মোটামুটি কাঠামো সম্বন্ধে আলাপ করেন। সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহ, বিদেশ থেকে সাহায্য, দেশের অসন্তুষ্ট জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ, আমাদের সমিতির আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং দুর্বলতা সমস্তই আলোচিত হয়। স্থির হয় যে, নির্দিষ্ট দিনে সমগ্র ভারতে শত্রুকে আক্রমণ করতে হবে। থানা, অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ অফিস, পোস্ট অ'ফস, রেল-ষ্টিমার স্টেশন, সমস্ত যানবাহন, ব্যাঙ্ক, ট্রেজারী সমস্তই দখল করতে হবে। ইংরেজ-পক্ষভুক্ত সকলকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ঢাকার সৈন্যদল কথা দিয়েছিল অনুকূল চক্রবর্তী ও পূর্ণ চক্রবর্তীকে—আপনারা আরম্ভ করা মাত্র আমরা এসে আপনাদের পাশে দাঁড়াব।

দেশে যেখানে যতরকমের অস্ত্রশস্ত্র তার অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। জীবন গুহ ঠাকুরতাকে নির্দেশ দেওয়া হয় বরিশালস্থিত উজিরপুর থেকে রামদা, বর্শা, ছোরা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে। আশুবাবু নির্দেশ পেলেন শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার থেকে তলোয়ার সংগ্রহ করার—পরে অবশ্য অন্য লোকের উপর এই ভার দিয়ে আশুবাবুকে ময়মনসিংহ পাঠান হয়েছিল। তখন তাঁর উপর ভার ছিল বিপ্লবী বাহিনীর পোশাক তৈরী করার। তিনি কয়েকজন দর্জিকে অর্ডারও দিয়েছিলেন। ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশও তাঁকে দেওয়া হয়। অভ্যুত্থানের কথা পরে আলোচনা করেছি।

মৌলভীবাজার বোমা বিস্ফোরণের পর যখন লালমোহন দে শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখন আশুবাবুকে শ্রীহট্ট ও শিলচর জেলাদ্বয়ের ভার দিয়ে পাঠান হয়। শ্রীহট্টে তিনি একবার গ্রেপ্তার হন, কিন্তু পুলিস ইনস্পেক্টর তাঁর কথা শুনে নির্দোষ ভেবে ছেড়ে দেয়।

শ্রীহট্ট অবস্থানের প্রকাশ্য কারণ হিসেবে আশুবাবু কলেজে ভর্তি হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অধ্যক্ষ অপূর্ব দত্তের প্রতিকূলতায় বাধা পান, কিন্তু অধ্যাপক সুরেশ সেন (পরবর্তী সময়ে বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ) মহাশয় খুব সাহায্য করেন। আশুবাবু খেতেন পূর্ণেন্দু সেনের বাড়িতে। পূর্ণেন্দুবাবু পরবর্তী জীবনে পাকিস্তানের এম. এল. এ. হন। চা বাগানে কাজ করতে গিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে পরে মুক্তি পান। এই সময়ই তাঁকে ঢাকায় ডেকে পাঠান হয় অভ্যুত্থানের আয়োজনের জন্য—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সমিতির একটা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আশুবাবু শ্রীহট্টে পাঁচশ টাকার মূলধন নিয়ে একটা সাইকেলের দোকান করে নিকুঞ্জলালকে তার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। বছর দুই-তিন পর নিকুঞ্জ ও গোবিন্দ কর পুলিস বাহিনীর সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম করে সিরাজগঞ্জে। পুলিস ওদের ঘেরাও করলে ওরা এক পাটখেতে ঢুকে পড়ে। উভয়পক্ষেই আহত হয়। ওরা দুজনেই আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। গোবিন্দ করের দেহে আজ পর্যন্তও দুটি গুলি বিদ্ধ হয়ে আছে।

কিছুদিন পরে আশুবাবু ময়মনসিংহের জেলা-সংগঠক হয়ে আসেন এবং শ্রীহট্টে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ময়মনসিংহ নেত্রকোণার রমেশ চৌধুরী (দলীয় নাম নবীন)।

১৯১৫ সালে ময়মনসিংহ চন্দ্রকোণা বাজারের ডাকাতি আশুবাবুর পরিকল্পনা

ও পরিচালনায় হয়। কৃষ্ণ সাহা, রসিক সরকার, প্রফুল্ল রায়, ভগবান দাস, চন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি আরও অনেকে এই ডাকাতিতে যোগদান করেন। আক্রমণের পূর্বেই টেলিফোনের তার কেটে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা নষ্ট করা হয়। বাজারে পুলিস প্রহরী ও ধনী ব্যবসায়ীদের হস্তে মোট রাইফেল সংখ্যা ছিল ষোল, কিন্তু আক্রমণ করা মাত্রই রাইফেলধারীরা আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করে। বাজারে কারুর উপরই কোন অত্যাচার বা জুলুম কিছুই করা হয়নি, এমনকি চাবি আদায় করার জন্যও নয়। আক্রমণ-কারীরা নিজেরাই লোহার-হাতুড়ি ছেনী দিয়ে সিন্দুক ভেঙ্গেছিল। লুণ্ঠিত মাল নিরাপদ স্থানে পৌছানোর বন্দোবস্ত আশুবাবুই করেন।

এবছরই কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত হরিপুরা গ্রামে এক মহাধনী সাহা মহাজনের বাড়িতে ডাকাতি হয়। তার বাড়িতে একটা রাইফেল (Magazine Rifle), কয়েকটা ·450 Bore-এর রিভলবার ও কতকগুলি তলোয়ার ছিল। ডাকাতির প্রধান আকর্ষণ ছিল এই অস্ত্রগুলি। উভয়পক্ষেই গুলি চালায়, ফলে স্থানীয় একজন নিহত হয়। লুণ্ঠিত দ্রব্য নিরাপদ স্থানে প্রেরণের বন্দোবস্ত করেন আশুবাবু।

এই সময় ময়মনসিংহের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যতীন ঘোষের উদ্যোগে অনুশীলন সমিতি ধ্বংসের জন্য এক ষড়যন্ত্র মামলায় বিপ্লবীদের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা চলছিল। এজন্য কলকাতা থেকে অনেক উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা কর্মচারী ময়মনসিংহে যাতায়াত আরম্ভ করে। পুলিসের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য সমিতির কেন্দ্র থেকে আদেশ আসে যতীন ঘোষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য।

যতীন ঘোষ সন্ধ্যার একটু আগে তখন সবেমাত্র আফিস থেকে ফিরে একটি আরাম কেদারায় বসেছেন স্ত্রীর কাঁধে হাত দিয়ে এবং শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে। এমন সময় আশু কাহিলী, কৃষ্ণ সাহা, রসিক সরকার যতীন ঘোষকে আক্রমণ করে। বাড়ির একদিকে প্রহরীর কাজ করেন আশুবাবু, অন্য দরজায় প্রহরারত ছিলেন অমৃত সরকার ও চন্দ্রকুমার ঘোষ। যতীন ঘোষের রিভলবার-ধারী প্রহরীরা সমিতির সভ্যদের আক্রমণ করতে এসেছিল, কিন্তু আশু কাহিলী তাদের উপর গুলি চালায়, ফলে তারা পলায়ন করে। সমিতির সভ্যদের ১৭টি গুলি খরচা হয়েছিল। যতীন ঘোষ নিহত হয় এবং সঙ্গে শিশুপুত্রটিও মারা যায়। যদিও ব্রিটিশ পুলিস বিপ্লবীদের গৃহ আক্রমণ করে বৃদ্ধ পিতামাতা

এবং শিশুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত, কিন্তু বিপ্লবীরা কোথাও আক্রমণ করে শিশুহত্যা করত না। যতীন ঘোষের শিশুপুত্রের উপরও কেউ আক্রমণ করেনি। কিন্তু যে অবস্থায় যতীন ঘোষের উপর আক্রমণ হয় তাতে অতি আকস্মিকভাবেই ছেলেটির শরীরে গুলি বিদ্ধ হয়। যতীন ঘোষের স্ত্রী অতি নিকটে স্বামীকে প্রায় জড়িয়েই ছিলেন। কিন্তু তিনি অক্ষত থাকেন।

এই সময় আশুবাবু প্রকাশ্যে ময়মনসিংহ শহরে শিক্ষকতা করতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন আরও অনেকের মধ্যে বরিশালের কুঞ্জ ঘোষ। গৃহত্যাগ করে তিনি ময়মনসিংহ জেলার মফঃস্বলে সমিতির কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শরীর খুব ভাল ছিল না, প্রবল হাঁপানী রোগ সত্ত্বেও তিনি ২৫-৩০ মাইল পায়ে হেঁটে চলতেন। কোন প্রকার যানবাহন ব্যবহার করে সমিতির পয়সা খরচ করতেন না।

ওদিকে উত্তর-ভারতে কাশী-ষড়যন্ত্র মামলা (যুদ্ধোদ্যোগের ষড়যন্ত্র) আরম্ভ হয়। শচীন সান্যালের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হওয়ায় তিনি পলাতক অবস্থায় ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মকালে ঢাকায় আসেন। তাঁর গ্রেপ্তারের পর আশুবাবু উত্তর-ভারতের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ময়মনসিংহে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন প্রবোধ দাশগুপ্ত। তিনি প্রথমে কাশী যান এবং সেখান থেকে এলাহাবাদে। সে সময়ে সমিতির কার্যোপলক্ষে তরণী সোম ও নলিনী বর্ধন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ক্ষেত্র সেনকে তাঁর কাশীর কার্যক্ষেত্র থেকে এলাহাবাদ পাঠান হয় এবং সেখানে তিনি কায়স্থ পাঠশালায় ভর্তি হন। কলেজে ভর্তি হওয়া সর্বক্ষেত্রেই লোক-দেখানো উপলক্ষমাত্র।

তখন এলাহাবাদ দুর্গে সমর দপ্তরে সমিতির লোক ছিল। তাঁদের মধ্যে এক-জনের নাম রঘুবীর সিং। তিনি বিহারে অনুশীলন সমিতির লিবার্টি (Liberty) নামক ইংরেজী কাগজ বিতরণ উলপক্ষে নাম প্রকাশ পাওয়ায় পলাতক হন। সে অবস্থায়ই তাঁকে এলাহাবাদ দুর্গে সমর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে চাকুরী গ্রহণ করে সৈন্যদলের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে অনেক কাজ করেন। আদর্শ প্রচার করে তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তুলছিলেন। আশুবাবুর উপর নির্দেশ ছিল তিনি যেন রঘুবীর সিং-এর সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতিশীল সৈন্য-দলের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মধ্যে একটা সুশৃঙ্খলতার ব্যবস্থা করেন।

ওদিকে রঘুবীরের এলাহাবাদের ঠিকানা পুলিস কোন প্রকারে জানতে পারে। দুর্গে রঘুবীরের বাসস্থান খানাতল্লাশি হয়। ক্ষেত্র সেন আশুবাবু

সম্বন্ধে চিঠি লিখে সুশীল লাহিড়ীর হাত দিয়ে দুর্গে রঘুবীরের নিকট পাঠান। সেই চিঠিসহ আরও তিনখানা চিঠি ধরা পড়ে। এই সমস্ত চিঠিতে সৈন্যদলের মধ্যে সমিতির কার্য সম্বন্ধে অনেক কথা ছিল। রঘুবীর গ্রেপ্তার হয় এবং পুলিস ক্ষেত্র সেনের হোস্টেলে গিয়ে তাঁকে এবং আশুবাবুকে গ্রেপ্তার করে।

কিন্তু পূর্বে কথা ছিল এই যে, নলিনী ঘোষ আশু কাহিলীকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর-ভারতে যাবে, এবং যুক্ত প্রদেশ (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ), পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে সমিতির শাখাগুলিতে নিয়ে গিয়ে সভ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এই সব প্রদেশে যাঁরা সৈন্যদলের মধ্যে সমিতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেবেন। এই উপলক্ষে নলিনী ঘোষও প্রধান পরিচালক হিসেবে এই সমস্ত প্রদেশে সমিতির শাখাগুলি এবং সেনানিবাসগুলি পরিদর্শন করবেন। কিন্তু জরুরী সংবাদ পেয়ে নলিনী ঘোষ প্রথমে জব্বলপুর যান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি পূর্ব-ব্যবস্থামত আশুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবেন এই স্থির হয়। তিনি এলাহাবাদে ক্ষেত্র সেনের কাছে চিঠি দিলেন কবে কোন্ ট্রেনে এলাহাবাদ পৌছবেন। পুলিস এই চিঠি হস্তগত করে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য এলাহাবাদ স্টেশনে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু চিনতে না পেরে তাঁকে প্রথমে গ্রেপ্তার করতে অসমর্থ হয়। তিনি ডাক্তার সত্য সেন নামে পকেটে একটা স্টেথিসকোপ নিয়ে স্টেশনের বাইরে যান। এক্কা ভাড়া করার সময় যখন তিনি ক্ষেত্র সেনের হোস্টেলের নাম বলেন গন্তব্যস্থানরূপে তখন সেকথা পুলিসের কর্ণগোচর হয়। একজন পুলিসও এসে বলে যে, সেও সেখানেই যাবে। সুতরাং পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথে অতি গোপনে এই গোয়েন্দাটি এক্কাওয়ালাকে টাকা দেওয়ার কবুল করে একেবারে পুলিস অফিসে এনে উপস্থিত করে এবং নলিনী ঘোষ সেখানে গ্রেপ্তার হয়। সেখানে নলিনী ঘোষ এবং অন্যান্য অনেককে জেরা করে নামজাদা গোয়েন্দা ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জিতেন মুখার্জি। ব্রিটিশ শাসনকালে স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধিতা করে যারা খ্যাতি অর্জন করেছিল জিতেন মুখার্জি ছিল তাদের অন্যতম।

এলাহাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হয়ে নলিনী ঘোষ, আশু কাহিলী, ক্ষেত্র সেন এবং রঘুবীর কলকাতার কিড্ স্ট্রিটের পুলিস অফিসে আনীত হয় (১৯১৬, ৩০ জুলাই), এবং সেখানে তাঁদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়।

এই পুলিস অফিসে কয়েকটি সেল তৈরী হয়েছিল রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রেখে অত্যাচার করার জন্য। কলকাতা পৌছেই এদের এই সমস্ত সেলে

আবদ্ধ করা হয় এবং সন্ধ্যার একটু আগে এক-একজনকে এক-এক পুলিস অফিসারের আফিসে নিয়ে আসা হ'ল। আশুবাবুকে এনেছিল গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার লোম্যান (Lowman) সাহেবের অফিসে। পরবর্তী-কালে এই লোম্যান সাহেব ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিস হয়েছিলেন এবং ১৯৩০ সালে ঢাকায় বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন।

শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করার কার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হ'ত কুখ্যাত মণি বোস, বিজয় বোস এবং একজন অবাঙ্গালী অফিসার—এরা বোধ হয় তখন ইনস্‌পেক্টর। এরাই বিভিন্ন ঘরে পর্যায়ক্রমে গিয়ে নিজ হাতে বা কনস্টেবলের সাহায্যে অত্যাচার চালাত। সেলগুলি পাহারা দিত সেপাইরা।

প্রথম সম্বোধনই হ'ত—শালা, কি জানিস বল? এবং সঙ্গে চলত কিল, ঘুষি, লাথি ও দেয়ালে মাথা ঠোকা। হাতে হাতকড়া পরানো অবস্থায় দুজন কনস্টেবল দু'হাত ধরে ওঠ-বস করাত অনেকক্ষণ, পরে হাঁটু ভেঙে চেয়ারে বসবার মত করে থাকতে হ'ত। পড়ে গেলে কিল, ঘুষি আর লাথি। অজ্ঞান হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়ে পুনরায় গোড়া থেকে শুরু।

এই অত্যাচার যেদিন থেকে আরম্ভ হয় তার সাত দিন আগে থেকে আশুবাবু জ্বরে ভুগছিলেন। এ কয়দিন তাঁর কোন চিকিৎসা হয়নি বা তিনি কোন ঔষধ খেতে পাননি। এ অবস্থাতেই তাঁকে এলাহাবাদ থেকে আনা হয়। পুলিস গোয়েন্দা জগবন্ধু ভট্টাচার্যের কাছে আশুবাবু তাঁর শারীরিক অবস্থা বলেছিলেন। সে বোধহয় আসন্ন অত্যাচার স্মরণ করে বিদ্রূপভরে বলেছিল, কিড্ স্ট্রীটের বাড়িতে গেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। লোম্যান সাহেবকেও আশুবাবু সব বলেছিলেন; তাতেও কোন ফল হয়নি।

মণি, বিজয়ের অত্যাচার হয়ত কিছুক্ষণ চলল, পরেই আর একজন এসে বলল—থাক্, থাক্, ওকে আর মারবেন না, ও সব বলে দেবে। দাও বাবা, সব বলে দাও, তাহলেই তো আর মারবে না। কিন্তু আশুবাবু বিশ্বাসঘাতকতা করতে অস্বীকার করামাত্র অত্যাচার শুরু হ'ত।

আবার এমনও হয়েছে যে, অত্যাচার যখন পুরোদমে চলছে তখন আর একজন অফিসার এসে বলত—থাক্, আর মারবেন না ওকে। ও ঘরে নলিনী ঘোষ স্বীকারোক্তি করেছে। ও এক্ষুনি সব বলে দেবে। কেননা নলিনী ঘোষের মত লোকই বলেছে এই আশু কাহিলী চট্টগ্রাম গুলি মারার ব্যাপারে যোগদান

করেছিল। সব যখন আমাদের জানাই হয়ে গেল তখন আর বলে দিতে বাধা কি? কি বল, আশু কাহিলী?

নলিনী ঘোষ স্বীকারোক্তি করতে পারেন না একথা আশু কাহিলী ভালভাবেই জানতেন; তাছাড়া আশুবাবু চট্টগ্রাম গুলি মারার ব্যাপার কিছুই জানতেন না। সুতরাং এ যে একেবারে ধাপ্পা তা বুঝতে আশুবাবুর বাকী রইল না। সুতরাং আশুবাবুর উপর অত্যাচার চলতেই লাগল।

এই চট্টগ্রাম গুলি মারার ব্যাপারে ছিলাম আমি, নলিনী ঘোষ ও স্থানীয় একটি ছেলে। এ মোকদ্দমায় আদিত্য দত্তের সেসন পর্যন্ত বিচার হয়েছিল, অথচ সে ছিল নির্দোষ।

সন্ধ্যার পূর্বে শুরু হয়ে রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত অত্যাচার চলার পর আশুবাবু অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন একজন বাঙ্গালী অফিসার মাথার ধারে বসে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। আশুবাবুর পরিধেয় সার্ট খুলে যখন দেখলেন বুকে তুলো বাঁধা (এলাহাবাদে এক কম্পাউণ্ডার তুলো বেঁধে দিয়েছিল), তখন তিনি মণি বোসকে বললেন—আর মারবেন না মশাই, মরে যাবে। মণি বোস জবাবে বলেছিল—মরলে কি হবে? কটা তো মরল, কি হ'ল তাতে? গভর্নর বলেছেন এদের মারলে কিছু হবে না, তাঁর হুকুম আছে।

নলিনী ঘোষের উপর অত্যাচার চলছিল পাশের ঘরে। এ ঘরের সব কথাই শুনতে পেলেন।

আশুবাবু একটু জল খেতে চাইলে সেই বাঙ্গালী অফিসারটি এক কনস্টেবলকে জল আনবার হুকুম দিলেন। কিন্তু মণি বোস বলল—হ্যাঃ, জল না আবদার! যাও প্রস্রাব নিয়ে এস, তাই খেতে হবে!

ক্ষেত্র সেনের আবার হিন্দুস্থানী ধরনের লম্বা গোঁফ ছিল। কাজেই তাঁকে এই গোঁফ ধরে এমনভাবে টানাটানি করে ছিঁড়েছিল যে, তাঁর ওপরের ঠোঁটে ঘা হয়ে যায় এবং সমস্ত মুখই ফুলে ওঠে।

সারাদিনের খোরাকী বরাদ্দ ছিল একবেলায় চার পয়সার কেনা আহার্যদ্রব্য। সে পয়সা থেকেও সেপাইরা চুরি করত। ক্ষুধার জালায় আরও দুর্বল করার জন্য অত্যাচারীরা এ খাবার আরও কমিয়ে দিত। এক হাতের মুঠোতে যে কটা মুড়ি ধরত তাই ছিল বরাদ্দ! তাও দিত সেলের দরজা বা গরাদের মধ্য দিয়ে ছুঁড়ে; তার কিছু পড়ত মাটিতে। উড়ে দোকানে তৈরী গুড়ের লাড্ডু

জাতীয় একটা, আর জল দিত বন্দীর হাতে ঢেলে গরাদের মধ্য দিয়ে, তাও অতি সামান্য মাত্র।

এক বাঙ্গালী গোয়েন্দা পাহারা ছিল একটু ভাল, সে পুরো চার পয়সার খাবারই দিত। পয়সা চুরি করত না। ব্যবহারও একটু ভাল ছিল। জল চাইলে ইচ্ছা মত জল খেতে দিত।

কয়েকদিন অত্যাচারের পর নলিনী ঘোষকে এলাহাবাদ বদলি করে। তখন এক সরকারী ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে তাঁর আঘাতগুলি রেকর্ড করে রেখেছিল।

পনেরো দিন পর আশু কাহিলী ও ক্ষেত্র সেনকে এলাহাবাদ বদলি করা হয়। সৈন্যদলকে উস্কানি এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর অভিযোগে সরকার এক মামলার আয়োজন শুরু করে। ম্যাজিস্টেট এবং পুলিস-সুপাররা মাঝে মাঝেই শাসাত—আপনাদের ফাঁসী না হয় দ্বীপান্তর অবধারিত। কিন্তু এলাহাবাদ দুর্গে কোন সাক্ষীই পাওয়া না যাওয়ায় মামলা চলল না। দু'মাস পর আশু কাহিলীকে চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকূলের নিকট মহেশখালি দ্বীপে অন্তরীণ করে, আর ক্ষেত্র সেনকে পাঠায় কুতুবদিয়া দ্বীপে। নলিনী ঘোষকে আর একটা মোকদ্দমায় বিচারের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়—অভিযোগ অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গ করা। এই মোকদ্দমায়ও তাঁকে শাস্তি দেয়া চলল না। পরে তাঁকে কলকাতায় দালান্দা হাউসে পাঠিয়ে দেয়।

নলিনী ঘোষ এই দালান্দা হাউস থেকে পলায়ন করে এই অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করে দেন। সমিতির সাময়িক কাগজ "স্বাধীন ভারত"-এ খবর বেরোয়। জেলে আমরা সময় সময় স্বাধীন ভারত আনতাম গোপনে। তাতেই এ অত্যাচারের কথা পাঠ করি।

এলাহাবাদ থেকে মহেশখালি যাবার পথে কলকাতা থাকাকালীন আশুবাবু ছিলেন পূর্বোক্ত অপেক্ষাকৃত ভাল প্রহরীর ওপর। সে বলল—বলুন কি খাবেন, এনে দিচ্ছি। আশুবাবুকে অবাক হতে দেখে সে বলেছিল, এক্ষুনি অন্তরীণের আদেশ পাবেন। তখন ছিল অত্যাচারের হুকুম। কাজেই তখনকার ব্যবস্থাও আলাদা ছিল।

বোধহয় সাত-আট মাস পরে আশু কাহিলীকে মহেশখালি দ্বীপ থেকে কলকাতায় দালান্দা হাউসে বদলি করার হুকুম যায়। অবশ্য যথারীতি পুলিস গন্তব্যস্থান গোপন করে আশুবাবুকে চট্টগ্রাম শহরে পুলিস ক্লাবে নিয়ে আসে।

উদ্দেশ্য সেখান থেকে কলকাতাগামী ট্রেনে পাঠিয়ে দেয়া। আশুবাবু পুলিস পাহারা নিয়ে এক জামার দোকানে গেলেন জামা কেনবার নাম করে। সে দোকানে সমিতির সভ্য সুশান্ত কাজ করত। গোপনে তার সঙ্গে আশুবাবু পলায়নের সব ব্যবস্থা করে আসেন। কথা ছিল সুশান্ত নির্দিষ্ট সময়ে ঐ পুলিস ক্লাবের কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করবে। অবশ্য আশুবাবু মহেশখালি থাকা অবস্থাতেই পলায়নের কথা চিন্তা করেছিলেন। এজন্য তিনি সমুদ্র-খাড়িতে স্নান করতেন এবং কদ্দূর ভেসে গেলে সামপান বা মালবাহী নৌকায় উঠতে পারেন তা ভাব ছলেন। এসমস্ত কথা পুলিসের কানে পৌছে। তাই তারা আশুবাবুকে বদলির হুকুম পাঠায়।

যাইহোক, নির্দিষ্ট দিনে পুলিস ক্লাবে তখন আশুবাবুর ছয়জন প্রহরী সিপাই একত্র হয়ে গান করছিল। আশুবাবু খালিগায়ে এবং খালিপায়ে হাতে গাড়ু নিয়ে পায়খানার দিকে চললেন। সেপাইরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কিন্তু কোন সন্দেহ হয়নি তাদের। আশুবাবু একটু আড়ালে গিয়ে গাড়ু রেখে দিয়ে নিজের ঘরের জানালার ধারে গিয়ে হাত বাড়িয়ে সার্টটা নিয়ে গায়ে পড়লেন। যথা-স্থানে সুশান্ত অপেক্ষা করছিল। আশুবাবু তার সঙ্গে মিলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে রওনা হলেন।

যাওয়া স্থির ছিল চট্টগ্রাম থেকে ৩২ মাইল দূরে সীতাকুণ্ডের নিকট সমুদ্রোপ-কূলস্থ গ্রামে সমিতির একটি ছেলের বাড়িতে। যাতায়াতের একমাত্র বাহন রেল। সুতরাং তা মোটেই নিরাপদ নয়। কাজেই আশুবাবু ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা হলেন। ১৬ মাইল পথ যাওয়ার পরই আশুবাবু ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। তদুপরি মাথায় ও সর্বশরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। আর হাঁটা একেবারেই অসম্ভব। তখন অনেক রাত। সামনেই ছিল একটা মসজিদ। তারই চত্বরে কোন লোক না দেখতে পেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। খুব ভোরে ইমামের নামাজের শব্দে আশুবাবুদের ঘুম ভেঙে গেল। কেউ কিছু টের পাওয়ার পূর্বেই তাঁরা সে স্থান পরিত্যাগ করেন। আশুবাবু সেই ছেলেটির কাঁধে ভর দিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন।

বাড়ি পৌছে ছেলেটি তার মাকে বলল—এই ছেলেটিকে রাস্তায় খুব অসুস্থ অবস্থায় পেয়েছি। খুব জ্বর। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ছেলেটিও খুব ভাল। বোনের বিয়ের জন্য তুমি সর্বদা ভাব ; এই ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেব।

মা খুশী হলেন। আবার খুবই বিপন্ন বোধ করলেন এই ভেবে যে, তাঁরা

এত দরিদ্র যে, কি খেতে দেবেন কোথায় রাখবেন কিছুই যেন ভেবে পেলেন না। ছেলেটি মায়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, তুমি কিচ্ছু ভেব না মা, আমার এই সঙ্গীটি বড় ভাল। কোন অহংকার নেই, তাছাড়া খুব কষ্ট সইতে পারে।

মানুষ যে কত দরিদ্র হতে পারে তা এদের না দেখলে বোঝা যায় না। একখানা মাত্র ঘর। বেড়াগুলি জীর্ণ। চালে খড় নেই। তখন সেখানে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়তে থাকলে আর শোয়ার জায়গা থাকে না। ঘরে পুরোনো আমলের একটা ভাঙ্গা সিন্দুক ছিল। সেটা বসানো ছিল ইটের উপর একটু উঁচু করে। আশুবাবু তারই নীচে প্রথমে পা পরে শরীরটা ঢুকিয়ে কোন প্রকারে চিৎ হয়ে শুতেন। বৃষ্টি হ'লে সেই ভাঙ্গা সিন্দুকের ফাটল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। তাই মা সিন্দুকের উপর একখানা কাঁথা বিছিয়ে দিলেন। এই দরিদ্র পরিবারের আহার্যের মধ্যে ছিল স্বর্যপোনা নামে একরকম খুব ছোট মাছ। বর্ষাকালে ডোবাখানায় পাওয়া যেত। দরিদ্ররাই এইসব মাছ খেত। বাড়িতে হাঁস ছিল। তার ডিমও মাঝে মাঝে পাওয়া যেত। এক ছটাক তেলে সপ্তাহ চালাতে হ'ত—রান্না, মাথায় দেয়া, গায়ে মাখা সব কিছুই। ডিমের কিছু রাঁধতে হলে বা ভাজতে হলে একটা ছোট নেকড়াতে একটু তেল মেখে সেটা দিয়ে কড়াটাকে ভিজিয়ে নিতে হ'ত। ষষ্ঠী পুজোর দিন মা খেতে দিলেন খই আর শাকআলু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। মা দুঃখ করে বললেন—আমাদের গুড় কেনবার পয়সা নেই বাবা, যে গুড় দিয়ে খই খেতে দেব। আশুবাবুকে তাঁরা খুবই যত্ন করেছেন।

এদিকে আশুবাবু সমিতির তখনকার পরিচালক কলকাতায় নলিনী ঘোষের কাছে খবর পাঠালেন তাঁকে সরিয়ে নেওয়া কিংবা কর্তব্যের নির্দেশের জন্য। যদি নলিনী ঘোষ কোন ব্যবস্থা না করতে পারেন বা দেরী হয়, এই ভেবে আশুবাবু নিজেই চলে যাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে লাগলেন। বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমা থেকে অনেক নৌকা চট্টগ্রামে আসত সমুদ্রপথে মাটির হাঁড়ি-কলসী বোঝাই করে। ফেরবার পথে গরু বোঝাই করে নিয়ে যেত। অনেক দরিদ্র যাত্রীও থাকত এতে। মানুষের বসবার ব্যবস্থা ছিল ছই-এর উপর, যার নীচে থাকত গরু। সময় সময় এই সব গরুর নৌকায় একশ-দেড়শ লোকও যাতায়াত করত। প্রধানত যারা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও আরাকান অঞ্চলে ধান কাটতে যেত তারাই মরশুম শেষে এই সব নৌকায় ফিরে যেত। কখনও কখনও কেবলমাত্র যাত্রীবাহী নৌকাও চলাচল করত রেল-ষ্টিমারে অনেক পয়সা

লাগে বলে। অনেক সময় ধান কেটে তা বোঝাই করেও নৌকা চলাচল করত। এই সব নৌকার ধারগুলি খুব উঁচু হ'ত, যেন ঢেউ-এর জল ঢুকতে না পারে। তক্তাগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জোড়া দেওয়া হ'ত বেত দিয়ে। লোহার স্ক্রু বল্টু নোনাজলে নষ্ট হয়ে যেত। প্রতিবার সমুদ্রযাত্রার পূর্বে বেতের বাঁধন শক্ত করে নিতে হ'ত। এ নৌকা চলত দাঁড় বা গুণ টেনে। অনেকগুলি পালও থাকত। মাঝিমাল্লারা এমনভাবে পাল খাটাত যে, বাতাস যেদিকেই থাকুক না কেন তারা তাকে তাদের অনুকূল করে নিতে পারত।

আশুবাবু স্থির করেছিলেন এক হাটবারে এমনি এক গরুর নৌকায় ওখান থেকে সরে পড়বেন। কিন্তু তাঁর এখানকার থাকার খবর কলকাতায় বেরিয়ে পড়ল নলিনী ঘোষকে খবর দেওয়ার মারফতে। এবং যে হাটবার তাঁর যাওয়ার কথা সেদিনই তিনি আর সেই ছেলেটি গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তারের সময় পুলিস মাকে ধমক ও ভয় দেখিয়ে বলেছিল—এই ডাকাতকে কেন বাড়িতে থাকতে দিলেন? মা বলেছিলেন, বাবা, ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে এই ছেলেটি এল। আমি মা হয়ে কি তাড়িয়ে দিতে পারি—তা তোমরা যত ভয়ই দেখাও! মায়েরা তা পারে না।

গ্রেপ্তারের পর পুলিস আশু কাহিলীকে কলকাতায় দালান্দা হাউসে পাঠায় এবং ছেলেটিকে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়ে ভীষণ শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে।

আশুবাবু দালান্দা হাউস থেকে পালাবার জন্য দু'বার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর সেলের চাবি তৈরী করে ফেললেন। যে রাতে তাঁর পালাবার কথা সেদিনই সন্ধ্যার আগে ফণি পাল নামক এক ডেটেনিউর সঙ্গে পুলিস প্রহরীদের খুব ঝগড়া হয়। ফলে আশুবাবুকে অন্য সেলে বদলি করে। সেই সেলের চাবি ছিল ভিন্ন।

দ্বিতীয়বার স্থির হয় যে, আশুবাবুর সঙ্গে অনুশীলন সমিতির ললিত মৈত্রও যাবেন। গোপেশ রায়েরও ঐ সঙ্গে পালাবার কথা ছিল। কথামত আশুবাবু রাতে বেরিয়ে এসে কাশি দিয়ে সংকেত করলেন। ললিত মৈত্রেরও কাশি দিয়ে জবাব দেয়ার কথা। কিন্তু তাঁর ছিল কাশির ব্যায়াম, একবার একটু কাশতে গিয়ে তিনি এমন ভীষণভাবে কাশতে আরম্ভ করলেন যে, পুলিশ প্রহরী কাছে এসে গেল। বেগতিক দেখে আশুবাবু সেলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দু'বারের প্রচেষ্টাই এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়।

এর কিছুদিন পরই, বোধহয় ১৯১৭ সালের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে, অনুশীলন সমিতির প্রবোধ দাশগুপ্ত দালান্দা হাউস থেকে পলায়ন করেন গভীর রাত্রিতে—সেলের ভেন্টিলেটরের লোহার শিক ভেঙে। সে সময়ে দালান্দা হাউসে ডেটেনিউরা কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রবোধ দাশগুপ্তর পালানো তখন সব ঠিক, সুতরাং তাঁকে আর অনশন করতে দেয়া হয়নি। পুলিসে কিন্তু তাঁর উপর এজন্য একটু খুশীই ছিল। প্রবোধ এর পূর্ণ সুযোগ নিল।

আমি, রমেশ চৌধুরী এবং অন্যান্য দলের আরও অনেকে তখন বোধহয় ১৯১৭ সালের ২১শে নভেম্বর, এখানে বদলি হয়ে এলাম। আমরা ঐ তারিখেই অনশন শুরু করি। আশুবাবু দালান্দা হাউস থেকে অনশন করে এখানে বদলি হয়ে এলেন। আবার এখানে আসামাত্রই তিনি আমাদের সঙ্গে অনশন শুরু করে দিলেন।

দীনেশ বিশ্বাস

ইনস্পেক্টর নৃপেন ঘোষের হত্যার রাত্রিতেই (১৯১৪, ১৯ জানুয়ারী) আমহার্স্ট স্ট্রীটের এক তিনতলা বাড়ির ত্রিতলস্থ ঘরে পুলিস হানা দেয়। ওটা ছিল আমার বাসস্থান। ঘরে ছিল তখন দীনেশ বিশ্বাস ও দেবেন্দ্র গুহ। টর্চ ফেলে আমাকে দেখতে না পেয়ে পুলিস বেরিয়ে যায় বরানগরের বাড়ি তল্লাশী করতে।

দীনেশ বিশ্বাস তখন সমিতির গৃহত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মী। তাকে রাজসাহী কেন্দ্রে পাঠানো হলো। সেখানে সে হংসগোপাল আগরওয়ালের সঙ্গে কেন্দ্রের মনোহারী, ঘোলের সরবত ও ফটো বাঁধাইর দোকান চালাত। ঐ সময় রাজসাহীতে সমিতির পরিচালক ছিলেন যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য (দলীয় নাম জ্যোতিবাবু) এবং প্রধান কর্মীদের মধ্যে ছিলেন প্রবোধ ভট্টাচার্য ও প্রভাস লাহিড়ী।

১৯১৫ সালেই রাজসাহী কেন্দ্রের দোকান প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দোকান তখন কোচবিহারে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে দীনেশ বিশ্বাস ও ক্ষেত্র সিং ছিল। কোচবিহারে তখন সমিতির প্রধান কাজ ছিল সৈন্যদের মধ্যে সমিতির প্রভাব বিস্তার, অস্ত্রসংগ্রহ এবং কলেজের ছাত্রদের মধ্য থেকে কর্মীর সন্ধান। এই ক্ষেত্র সিং একটা স্টেশনে ধরা পড়ে শিবনাথ ও অপর একটি ছাত্রের সঙ্গে।

এরা তখন ফিরছিল নাটোর মহকুমায় ধরাইল গ্রামে ডাকাতির পর। এই তিনজন টিকিট কিনতে গিয়ে স্টেশন-মাস্টারের সন্দেহভাজন হয়ে গ্রেপ্তার হয়। কেউ কেউ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে, তারা কোন বিপদে পড়েনি। পুলিস অনেক চেষ্টা করেও এদের কারুর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের করতে পারল না। কিন্তু ১০৯ ধারায় চালান করে এক বছর কারাদণ্ড দেয়।

দীনেশ বিশ্বাসকে আমি অনেকদিন থেকেই চিনি। আমি যখন ঢাকা থাকতাম দীনেশ তখন নোয়াখালী থেকে ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করত। আর ক্ষেত্র সিংকে দেখি চাঁদপুরে সমিতির কাজ পরিদর্শন করতে গিয়ে। তখন সে স্কুলের ছাত্র।

দীনেশ বিশ্বাসকে কোচবিহারের দোকানে গ্রেপ্তার করে এবং ১৯১৬-১৭ সালে কোচবিহার থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। সে তখন নিজের গ্রামে গিয়ে মাসখানেক পরে পুনরায় সমিতির কাজে গৃহত্যাগ করে।

কোচবিহারে থাকাকালেই দীনেশ বিশ্বাস ও ক্ষেত্র সিং ভুটানে যায় অস্ত্র সংগ্রহের কাজে। সেখানে কেবল গাদা-বন্দুক দেখতে পেয়ে নিরস্ত হয় এ সংগ্রহ নিরর্থক মনে করে। তখন এ সীমান্তে লোক গেলেই গ্রেপ্তার করা হ'ত।

১৯১৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯১৬ সালে পুনরায় অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। তখন সমস্ত কর্মীকে অন্তরীণ বা গৃহত্যাগ করে সমিতির কাজে সর্বসময় নিয়োগ করার নির্দেশ দেয়া হয়। সৈন্যদলের মধ্যে তখনও অসন্তোষ বিদ্যমান। রাসবিহারী বসু জাপান চলে গিয়ে বিদেশ থেকে সাহায্য পাঠাবার চেষ্টা করছেন। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনা তখনও সম্ভব মনে হ'ল। এজন্যই দীনেশ পুনরায় গৃহত্যাগ করে এবং ক্ষেত্র সিং কুমিল্লার হাজিগঞ্জে অন্তরীণাবস্থা থেকে পলায়ন করে। সমস্ত পূর্ববঙ্গে তখন গোয়েন্দারা খুব সতর্ক, সুতরাং পলায়ন করে আত্মগোপন করে থাকা খুবই কঠিন কাজ ছিল।

নির্দেশমত দীনেশ বিশ্বাস বহরমপুর যায়। নলিনী বাগচী তাকে সমিতির বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে তখন ছিলেন গিরিশবাবু, নলিনী ঘোষ ও হংসগোপাল। বহরমপুর থেকে দীনেশ পূর্ণিয়াতে জেলা-সংগঠক হয়, এবং হেমেন্দ্র রায় নামে পরিচিত হয়। লোক-দেখান কাজ হিসেবে সে থাকে এক কবিরাজের দোকানে ছাত্র হিসেবে।

নলিনী বাগচী বহরমপুর থেকে আই. এ. পাশ করে সমিতির কাজের জন্য পাটনা কলেজে ভর্তি হয়। সেখানে পূর্ণিয়া থেকে একটি ছাত্র পড়তে এসে ধরা পড়ে এবং দীনেশের পূর্ণিয়া অবস্থানের কথা প্রকাশ করে দেয়। ফলে এক বছরের মধ্যেই দীনেশকে পূর্ণিয়া ত্যাগ করতে হয় এবং নলিনী বাগচী পলাতক হয়ে কাজ চালান ও সমিতির কাজে কিছুদিন গিয়ে গয়ায় থাকেন।

দীনেশ পূর্ণিয়া থেকে মালদহ যায়। সেখানে তখন জেলা-সংগঠক ছিলেন সতীশ পাকড়াশী। সেখানকার হেডমাস্টার নিহত হওয়ায় মহেন্দ্র দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এ ঘটনার ফলে সতীশ পাকড়াশী মালদহ পরিত্যাগ করেন। সেখানে তিনি থাকতেন এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার পরিচয়ে।

দীনেশ কিছুদিন মালদহে কাজ করার পর ভাগলপুর যায়। রেবতী নাগ তখন দলের কাজের জন্য কলেজে ভর্তি হয় এবং হোস্টেলে থাকে। সে সময় আরও চার-পাঁচজন পলাতক সভ্য ভাগলপুর থাকতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহের) ও মোহিনী ভট্টাচার্য (চট্টগ্রামের)।

তখন সমস্ত বিহারের সংগঠক ছিলেন রেবতী নাগ। সমিতি পরিচালনা ও সংগঠনে তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। তখন সমিতির পরিচালক ছিলেন নলিনী ঘোষ। তাঁর এলাহাবাদে গ্রেপ্তার, দালান্দা হাউসে ভারত-রক্ষা আইনে আবদ্ধ থাকা এবং সেখান থেকে পলায়নের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রবোধ বিশ্বাস ও প্রবোধ দাশগুপ্তের দালান্দা হাউস থেকে পলায়নের কথাও পূর্বে বলেছি।

পুনরায় অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি হিসেবে বিহারের রাস্তা-ঘাট, মানচিত্র, সৈন্য ও পুলিস ঘাঁটি, যাতায়াতের পথ এবং অন্যান্য সমস্ত তথ্য দ্রুত সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছিল। সে সময় যাঁরা পলায়ন করে বিহারে এসেছিলেন এবং সমিতির কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—ক্ষেত্র সিং, দীনেশ বিশ্বাস, প্রবোধ বিশ্বাস, প্রবোধ দাশগুপ্ত, নলিনী বাগচী, রেবতী নাগ, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য, বসন্ত বক্সী, বিপিন দে, প্রভাস লাহিড়ী, জিতেশ লাহিড়ী। এঁদের মধ্যে বিপিন দে পলাতক অবস্থাতেই এক বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান।

প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য ছিলেন কাশী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী। তিনি গয়াতে সমিতির কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং এখানেই তাঁর সঙ্গে দীনেশ বিশ্বাসের দেখা হয়।

রেবতী নাগের উপর সন্দেহ হওয়ায় পুলিস ভাগলপুর কলেজ হোস্টেল এবং আরও অনেক জায়গা খানাতল্লাশ করে এবং অনেক ধরপাকড় হয়। রেবতী নাগের কাপড়ে ধোপার দাগ অনুসন্ধান করে পুলিস ধোপার মারফত দলের আড্ডার সন্ধান পেয়ে যায়।

আনন্দমোহন সহায় ভাগলপুরে সমিতির সভ্য হন। তিনি পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা হন এবং নেতাজীর সহকারী হিসেবে জাপানে কাজ করেন। কিশোরীলালও ভাগলপুরেই সমিতির সভ্য হন। বনোয়ারীলাল, রামবিনোদ সিং, কামতা প্রসাদ মজঃফরপুরে সমিতির সভ্য হন। কিশোরী-লাল মজঃফরপুর জেলে স্টেট প্রিজনার হন। রামবিনোদ সিংও স্টেট প্রিজনার হয়ে নানা জেলে আটক থাকেন। তিনি পরবর্তী কালে বিহারের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতারূপে পরিচিত হন।

রাসবিহারী লাল ও তাঁর বড় ভাই (উকিল) রেবতী নাগ দ্বারা সমিতির সভ্যভুক্ত হন ভাগলপুরে। এঁরা ছিলেন ভাগলপুরের নিকটস্থ নাথনগরের বাসিন্দা।

বিহারী সভ্যরা অনেকেই প্রথম যুদ্ধের সময় কারাগারে আবদ্ধ হন।

ভাগলপুরে সংস্কৃত টোল ছিল। টোলের অনেক ছাত্র সমিতির সভ্য হয়। এ কারণে সমিতির গুপ্তবাড়িতে মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। বিহারী ছাত্ররা, বিশেষত টোলের ছাত্ররা মাছ খাওয়া পছন্দ করত না। যদিও মাছ-মাংস খাওয়া সমিতির সভ্যদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু কারুর কোন সংস্কারে আঘাত দিয়ে তা নষ্ট করা হ'ত না। আস্তে আস্তে কর্মের মাধ্যমে তা নষ্ট হয়ে যেত।

প্রথম ভাগলপুরে ছিল সমিতির প্রধান কেন্দ্র। সমস্ত বিহারের পুলিসের খানাতল্লাশী ও ধরপাকড়ের ফলে যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন গয়া হয় প্রধান কেন্দ্র। দীনেশ বিশ্বাস এক বরযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে এখানে পালিয়ে আসে। ক্রমে মোহিনী ভট্টাচার্য, নলিনী বাগচী, যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য, ক্ষেত্র সিং, গোপেন চক্রবর্তী, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি পলাতকরা একত্রিত হন। গয়াতে শুকদেব পাঠক নামক একটি লোক সমিতির সভ্য হয়। পরে তার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে এবং পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করে।

দীনেশ বিশ্বাস ১৯১৭-১৮ সালে মজঃফরপুর যায় জেলা-সংগঠক হয়ে। প্রফুল্ল দাশগুপ্ত তখন মজঃফরপুর কলেজে বি. এ. পড়ত। তার সম্বন্ধে পরে বলছি।

এখানেই ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দলভুক্ত হয়। তখন এদের দ্বারাই অধ্যাপক কৃপালনী ও অধ্যাপক মালখানীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হ'ত। কৃপালনীজী মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত প্রফুল্লর হাত দিয়ে অর্থ সাহায্য করতেন।

তখন বিহারে ভাগলপুর, গয়া, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, ছাপরা, পাটনা, মতিহারী, বেতিয়া প্রভৃতি জেলায় সমিতির শাখা স্থাপিত হয়েছিল এবং প্রত্যেক জেলায় সমিতির দুজন করে কার্য পরিচালনার জন্য থাকতেন। সমিতিই এঁদের খরচ বহন করত।

দীনেশ বিশ্বাসের প্রধান কাজ ছিল অর্থ সংগ্রহ। বাংলাদেশ থেকে টাকা যেত বিহারের প্রত্যেক জেলায় কর্মী বসাবার জন্য। কলকাতা থেকে পলাতক কর্মীদের নিয়ে বিহারের নানা জেলায় বসানোর বিশেষ কাজ ছিল দীনেশের।

মজঃফরপুর থেকে দীনেশ বিশ্বাস বহরমপুর আসে। কিছুদিন পর এখানে মোহিনী ভট্টাচার্য, কেদারেশ্বর সেন, প্রিয়নাথ দত্তগুপ্তের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়। কেদারেশ্বর সেন ও দীনেশ বিশ্বাসের ১০৯ ধারায় এক বছর কারাদণ্ড হয়। তখন বহরমপুরে বিনায়ক রাও কাপলে ছিল।

দীনেশ বিশ্বাস এক বছর পর মুক্তিলাভ করে যশোহর জেলার মণিরামপুরে অন্তরীণাবদ্ধ হয় এবং সেখান থেকে কিছুদিন পরে পলায়ন করে গয়ায় যায়। সেখানে কাউকে না পেয়ে মজঃফরপুর যায় ব্রজেন্দ্র ব্যানার্জির কাছে এবং ক্ষেত্র সিং ও অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা হয়।

সেখানে তারা পুলিশ অফিসের এক হেড-ক্লার্কের সঙ্গে পরিচিত হয়। এ লোকটি ছিলেন জাতিতে পার্সী—অস্পৃশ্য। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন বেশ্যাসক্ত, মদ্যপায়ী। তাঁর চরিত্র অনেকটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'পথের দাবীর' শশী কবির মত। তাঁর একদিকের চরিত্র যতই খারাপ হোক না কেন, অন্যদিকে তিনি ছিলেন উদার, সাহসী ও দেশভক্ত। সমস্ত রকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন, আশ্রয় দিয়ে পালাতে সাহায্য করে, নিজের স্বল্প আয় থেকে অর্থ দিয়ে তাঁর উৎসাহ ও বেপরোয়া ভাব দেখে বিপ্লবীরাই তাঁকে মাঝে মাঝে সতর্ক করে দিত। কিন্তু তিনি জবাবে বলতেন—চিরদিন অসৎ কাজ করে এখন না-হয় একটা সৎ কাজ করে নিঃশেষ হলাম।

তিনি নিয়মিত সকালে ও বিকেলে পলাতক বিপ্লবীদের আহার্য ভাত-রুটি তরকারী নিজ হাতে দিয়ে যেতেন এবং আহার শেষে থালা উঠিয়ে জায়গা পরিষ্কার করতেন, থালাবাটিও নিজেই পরিষ্কার করতেন। পলাতকরা

শেষরাত্রে নদীর ধারে পায়খানা করত এবং দিনের বেলা হাঁড়িতে প্রস্রাব করত। অসুস্থ হলে দিনের বেলাতেই হাঁড়িতে পায়খানা করত। এই পুলিস অফিসারই নিজহস্তে ময়লা পরিষ্কার করতেন। অপর কাউকেই পলাতকদের আশ্রয়স্থলে ঢুকতে দিতেন না। সমিতির কাগজপত্র ও পুস্তিকা টাইপ করার জন্য তিনি পুলিস অফিসের টাইপ মেশিন দিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। পুলিসের কিছু অস্ত্রশস্ত্রও বিপ্লবীরা এঁর সাহায্যে সংগ্রহ করে। মজঃফরপুরের একজন এংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করতেন। পরে বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল খানাতল্লাশীর ফলে পুলিসের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়।

এই মজঃফরপুরেই রাম সিং নামে আর একজন পুলিস সাব-ইন্‌সপেক্টর বিপ্লবীদের খুব সাহায্য করেছেন। গোয়েন্দাদের গুপ্ত খবর বিপ্লবীদের আগেই জানিয়ে দিতেন। এতে তাঁর চাকরি যেতে পারত, জেল হতে পারত, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করতেন না। পরে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এঁদের কথা লিখতে গিয়ে বাংলাদেশের পুলিস কর্মচারী অশ্বিনীকুমার গুহ মহাশয়ের কথা মনে পড়ছে। ১৯১০ সালের প্রথমে আমি যখন বিপ্লবী বলে সন্দেহভাজন হই, তখন এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হয় গুহ মহাশয়ের উপর। তিনি তখন গোয়েন্দা ইন্‌সপেক্টর।

আমি তখন নারায়ণগঞ্জে থাকি এবং ডেইলী প্যাসেঞ্জার হিসেবে ঢাকায় যাতায়াত করি। তিনি আমায় নারায়ণগঞ্জ থানায় একদিন ডেকে আমার সঙ্গে সমস্ত খোলাখুলি আলোচনা করে আমার নামে রিপোর্টের কথা বলেন। আমি অবশ্য সমস্তই অস্বীকার করি। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি রিপোর্ট দেন যে, আমার সঙ্গে কোন বিপ্লবী সম্পর্ক নেই, বিপ্লবী অভিযোগ মিথ্যে, এবং আমি নির্দোষ।

ঢাকার রাস্তায় তাঁর সঙ্গে আর একদিন আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তখন দুজন দেহরক্ষী-সহ সাইকেলে যাচ্ছিলেন। আমি কয়েকজন সভ্যকে নিয়ে রমনার কালীবাড়ী যাচ্ছিলাম সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবার জন্যে। সাইকেল থেকে নেমে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমি আমার সঙ্গীদের একটু দূরে সরে যেতে বললাম এবং তাঁকে চিনে রাখতে বললাম। গোয়েন্দা পুলিসকে চিনে রাখা আমাদের সকলেরই কর্তব্য ছিল।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আমার নামে যখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয় তখন অশ্বিনীবাবু আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য খুব উৎসুক হন। তাঁর পরিচিত কোন কোন বিপ্লবী কর্মী দ্বারা তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। খুব জরুরী সংবাদ আছে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর মনের ভাব ও উদ্দেশ্য ভাল করে না জানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করা সমীচীন মনে করিনি। পরে মাদারীপুরের বিপ্লবী নেতা শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের সঙ্গে জেলখানায় যখন দেখা হয়, তখন তিনি থানায় বললেন যে, অশ্বিনীবাবু তাঁকেও বিশেষ করে বলেছিলেন, 'প্রতুল গাঙ্গুলী এখন পলাতক। তাকে একটা খবর দেবেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। খুব জরুরী খবর আছে।' পরে তিনি জরুরী খবরটাও প্রকাশ করেছিলেন এবং তা হচ্ছে—

বরিশাল যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্র মামলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দ্রষ্টব্যবস্তু নিয়ে কলকাতারই এক রাস্তা দিয়ে পুলিস কয়েকদিন যাতায়াত করবে। তখন আক্রমণ করে কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলতে পারলে মোকদ্দমা ফেঁসে যাবে, মামলাই আর হতে পারবে না। এ খবর পূর্ণবাবুও আমার কাছে পৌঁছে দিতে পারেননি, আমিও আর অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে দেখা করিনি বা কোন ব্যবস্থাই করতে পারিনি।

ফরিদপুর গ্যাঙ্গ কেস-এ (Gang Case) পূর্ণবাবু ও তাঁর পরিচালিত দলের বহু লোক গ্রেপ্তার এবং বিচার হয়। অশ্বিনীবাবু এই মামলার তদন্ত করে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। গোপনে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি সমস্ত গুপ্ত খবর পূর্ণবাবুর কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। যারা স্বীকারোক্তি করেছিল তারা যাতে তা প্রত্যাহার করে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্ণবাবু যাতে এপ্রুভার (approver)-দের মত পরিবর্তন করতে পারেন তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

অশ্বিনীবাবু যে পূর্ণবাবুর সঙ্গে বিশ্বাস রক্ষা করে চলছেন এ খবর জানতে পারলে আমিও তার সঙ্গে দেখা করে পুলিসদলকে আক্রমণ করিয়ে কাগজপত্র ছিনিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতাম।

মোকদ্দমা চলাকালীন সাক্ষী দেয়ার সময় কাঠগড়ার কাছে এসে তিনি আমায় গোপনে বলেছিলেন—বাইরে দেখা হলে আজ এই বিপদ ঘটত না। তখন তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। পরে অবশ্য সবই বুঝতে পেরেছিলাম। পরবর্তী কালে পূর্ণবাবু কোচবিহার রাজ্যে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়েছিলেন।

আমার সহকর্মী রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে গোয়েন্দা-সুপার ব্রজবিহারী বর্মণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়। ব্রজবিহারীবাবু গোয়েন্দার গতিবিধি সম্বন্ধে এবং আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা তা যথাসময়ে আমাদের খবর দেবেন। যদি তাই হয় তবে সমিতিও ব্রজবিহারীবাবুকে প্রাণদণ্ড দেবে না।

গোয়েন্দা ডেপুটি-সুপার প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাসের সঙ্গে আমার ও ত্রৈলোক্য-বাবুর হৃদ্যতা জন্মেছিল। যদিও আমরা আমাদের কোন বিষয় তাঁকে জানতে দিতাম না, তবে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজাবেন বা অসৎ উপায়ে আমাদের সাজা দেয়ার চেষ্টা করবেন তা মনে করতাম না। ত্রৈলোক্য-বাবু যখন বরিশাল মামলার পলাতক আসামী তখন তাঁকে ধরবার জন্য প্রভাত-বাবু নিযুক্ত হন। টেগার্ট সাহেব জানতে পারেন যে, ত্রৈলোক্যবাবু অসুস্থতার দরুন প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন। কিন্তু তাঁর সংবাদদাতা পাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় টেগার্ট সাহেব তাঁকে দিয়ে প্রকাশ্যভাবে ত্রৈলোক্যবাবুকে গ্রেপ্তার করাতে পারেন না। সুতরাং ঢাকা থেকে প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাসকে আনিয়েছিলেন। ইনিই ত্রৈলোক্যবাবুকে গঙ্গার ঘাটে গ্রেপ্তার করেন।

বরিশাল মামলা চলার সময় তিনি আমাদের নির্দেশে কতকগুলি সত্য ঘটনা যা সরকার গোপন করে গিয়েছিল, তা প্রকাশ করে দেন জেরার সময়।

* * *

রাজসাহী জেলার নরেন ভট্টাচার্য ১৯১৫ সালে সমিতির কাজে গৃহত্যাগ করেন এবং কলকাতায় বৃন্দাবন পাল লেনের গুপ্ত বাসায় বাস করতে থাকেন। এ বাড়িতে পলাতক গৃহত্যাগীরা থাকত। এখানে তাঁর সঙ্গে গণেশ বিষ্ণু পিংলের আলাপ হয়। পিংলে ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন আসন্ন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে যোগদানের জন্য। পরে নরেন ভট্টাচার্য পলাতক হিসেবে মধুপুর গিয়ে বাস করেন।

এই সময়ে একই উদ্দেশ্যে যশোহরের সত্যেন সেন ভারতে ফিরে আসেন। তিনিই পিংলেকে যশোহরের বিজয় রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সত্যেন সেন যুক্ত ছিলেন যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে সাম্মিলিত একটা দলের সঙ্গে। ঐ দল সত্যেন সেনের বিরুদ্ধে দুর্নাম করায় তিনি পিংলেকে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে পিংলে উত্তর-ভারতে রাসবিহারী বসুর নিকট প্রেরিত হন। পিংলে বাংলা শিখেছিলেন এবং বাংলা বলতে পারতেন।

ক্ষেত্র সিং বলেছিলেন যে, প্রথম যুদ্ধের শেষের দিকে সমিতির অবস্থা খুবই খারাপ হয়। বাংলা দেশ থেকে অর্থ সাহায্য বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হ'ত। অধ্যাপক কৃপালনী ও অধ্যাপক মালখানী এবং জমিদার বৈদ্যনাথ সিংহের সাহায্য তাদের অনেক উপকার করেছে। এমনকি জমিদার বৈদ্যনাথ সিংহ তখনকার পরিচালক এবং দালান্দা হাউস থেকে পলাতক নলিনী ঘোষকে জমিদারীর ম্যানেজার করে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে নলিনী ঘোষ গৌহাটিতে গ্রেপ্তার হন। এই গ্রেপ্তার সরকারের পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য। কেননা নলিনী ঘোষ তখন সমিতির প্রধান পরিচালক। সরকার তাঁকে খুবই সাংঘাতিকের পর্যায়ে বিবেচনা করত এবং গ্রেপ্তার করার জন্যে ভীষণ সচেষ্ট ছিল।

প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত ১৯১৬ সালে গৃহত্যাগ করে সমিতির নির্দেশে বিহারে যান। সেখানে বৈপ্লবিক কার্যে তাঁর সঙ্গে আচার্য কৃপালনীর ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর সমিতিতে যোগদান এবং তিনি কি কি কাজ করেছেন সে সম্বন্ধে আমার কাছে তাঁর লিখিত পত্রের প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম। তাঁর বাড়ি ছিল ঢাকা বিক্রমপুর। বাল্যাবস্থায় থাকতেন কুমিল্লা সহরে। জীবনে সমিতির প্রভাব সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

"আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনুশীলনের প্রভাব"

"আমার এই ৫৬ চলিয়াছে। জীবনের এই ধাপে দাঁড়াইয়া যদি পিছন দিকে তাকাই হাসিমুখে বলিতে পারি I lived a happy life এবং বিশ্বাস করি happier will I die. আশেপাশে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যখন কথা বলি মনে হয় না অনেক বেশী সংখ্যা মানুষ জীবনের এই পাকা ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। জীবনের এই ভিত্তি তৈয়ারী করিয়াছিল অনুশীলনের কঠোর অনুশাসন। যতদূর মনে হয় ১৯১১ সালের সরস্বতী পূজার দিন আমি কৌপীনসহ দীক্ষা গ্রহণ করি। তখন আমার বয়স ১৩-১৪। জীবনের সে কী উদ্দীপনা, সে কী মাধুর্য! 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' ছিল মুখের মন্ত্র; প্রাণের তন্ত্রীতে ধ্বনিত। স্বাধীনতা কাহাকে বলে জানিতাম না। বুঝিও নাই, শুধু যেন কী মাদকতায় প্রাণমন হইল মত্ত। আমরা ধন্য হব মায়ের জন্য লাঞ্ছনাদি সহিলে, ওদের বেত্রাঘাতে,

কারাগারে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে। এটিই ছিল ধ্যান, জ্ঞান, জীবনের একমাত্র কাম্য। এই ধ্যান-ধারণার পোষক, পরিবেশক একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য এ ধারণা তখন ছিল জীবনে বদ্ধমূল। তখন একটা ভাঙ্গা পিস্তল বা দুইটা টোটা তাহার গুণ, তাহার মাধুর্য, কল্পনায় চিত্তকে যতটা স্পন্দিত করিত, তথাকথিত কাম-কাঞ্চন তাহার চতুঃসীমায় আসিতেই সাহস করিত না।

"তবে এখন একথা বলি ঐ পথে চলিতে চলিতে অজ্ঞাতসারে 'কামিনী সম্বন্ধে' এমন একটা কাল্পনিক বিভীষিকা মনপ্রাণ আশ্রয় করিয়াছিল যে, পর-জীবনে তাহার জন্য অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। বিশেষত ৩৩ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়া প্রতি পদে পদে ঠোক্কর খাইয়াছি। নিজের অজ্ঞতায় নভেল পড়া ছিল যেন একটা crime. স্ত্রী আসিয়া একে একে আমাকে শরৎবাবুর পল্লীসমাজ, বিন্দুর ছেলে হইতে হাতে খড়ি আরম্ভ করেন। আমার চা খাওয়া তালিম দেন। তারপরে সিনেমা! মনে পড়ে তখন কলিকাতায় B. Sc. পড়ি। আমার মামা ল্যঁা মিজারেবল্ দেখিয়া আমাকে দেখাইবার জন্য মহা উৎসাহে টিকেট কিনিয়া নিয়া আসেন। আমি গেলামই না—তখন ধারণা সিনেমা ঘরগুলি নরকের দ্বার। মনে পড়ে মামার রাগারাগিতে কাঁদিয়াছিলাম পর্যন্ত। তবে এও বলিব, ঐ rigidity জীবনের ভিত্তি গড়িয়াছে পাকা বুনিয়াদে যাহার উপর দাঁড়াইয়া আজ বুক ফুলাইয়া বলি I lived a happy life. আজ আমি যা তার বিন্দু বিন্দু গড়িয়াছে 'অনুশীলন'। ১৯১৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর কলেজে পুলিস স্কোয়াড আনিয়া যখন আমাকে ধরে এবং সোজা মজঃফরপুর জেলে নিয়া সেলে বন্ধ করে, মনে পড়ে প্রাণ-মন মহা আনন্দে যেন উথলিয়া উঠিয়াছিল, যেন তৃষিত কুমারী এতদিনে স্বামীসঙ্গ লাভ করিল। তারপর চার বৎসর ভিন্ন ভিন্ন জেলে একক সেল-এ—তাহা ছিল আমার যেন জীবনের মহামূল্যবান—The most enjoyable moments. এই প্রস্তুতির মূলে অনুশীলনের বিন্দু বিন্দু গঠন মনের ও প্রাণের। মহাত্মাজী সীতাকে বলিতেন মা—The nursing mother. আমি বলি আমার ক্ষেত্রে 'অনুশীলন' আমার সেই মা। অনুশীলন nursed me in the womb, অনুশীলন nursed me in infancy, অনুশীলন nurses me even to day by the reserve put in me.

"বিহার গমন: হয়ত ২৩শে জুলাই বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীদের কর্ম-অন্তে নিরাপদে স্বস্থানে পৌঁছান ছিল আমার কাজ। আমি

কোট হাতে নিয়া বেলা আড়াইটা নাগাদ লণ্ডন মিশন কলেজের কাছে জলটুঙ্গীর ধারে ওত পাতিয়া ছিলাম। অতীন ও ব্রহ্ম আসিল সাদা শার্ট গায়ে। অতীন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শেষ করে এলাম। একটু আড়ালে তাহাদের সরাইয়া শার্টের উপরে কোট পড়াইয়া তাহাদের নিয়া চলিলাম। পথে দুইটি ছেলে অপেক্ষায় ছিল। যতদূর মনে পড়ে পিস্তল দুইটি অতীনদের হাত হইতে নিয়া ঐ ছেলেদের হাতে অন্যপথে চালান করিয়া আমরাও ওপথ ঘুরাইয়া বেহালার পথ ধরিলাম। ঠিক মনে নাই, একটা ছিল হয়ত মসা পিস্তল, অপরটা ওয়েবাল রিভলবার।

পরদিন সকাল হইতেই কলিকাতা সহর গরম হইল টেগার্ট সাহেবের উষ্ণ-শ্বাসে। ৭ই আগস্ট প্রত্যুষে সমিতির কর্তৃপক্ষ আমাকে বলিলেন যে, উত্তর প্রদেশে কাশীর দিকে সমিতির কর্মী ধরা পড়ায় আমাদের East Indian Railway পথ অচল হইতে চলিয়াছে। তুমি বিহারে যাও, উত্তর ভারতের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা কর। আমি তখন St. Xaviers College-এ B. Sc. পড়ি Chemistry Honours লইয়া। মাত্র আগের দিন Chemistry Honours-এর একখানা মোটা বই কিনিয়া আনিয়াছি। একে মা মনসা, তায় ধুঁয়োর গন্ধ! কোথায় B. Sc. পড়া! সেই সন্ধ্যায়ই পাঞ্জাব মেলে রওনা! তখন আমার কাকা মজঃফরপুরে পি. ডব্লিউ. ডি. (P.W.D.)-র ওভার-সিয়ার। আসিয়া বলিলাম—কলকাতায় শরীর টেকে না, এখানেই পড়ব। একটা সুযোগও জুটিয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। ১৯শে আগস্ট বেনারসে গিয়া কিছু ছিন্নসূত্র খোঁজ করিলাম। বিশেষ সুবিধা হইল না, তবে তা পরে খুব কাজে লাগিয়াছিল। পুলিসের নজর না পড়িলেও কাশীবাসী দুইজন অনুশীলনীর দৃষ্টি আমার চালচলনে আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং সেইমাত্র পরিচয়ে যখন আমি পুলিসের হাতে বন্দী, সেই অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে আমার সহজ আদান-প্রদানের খুব সুবিধা হয়। মজঃফরপুরে তখন বাঙ্গালী-বিহারী কেউ যেন এ বিষয়ে কিছুই ভাবিত না। খবরের কাগজে পড়িয়া বাহবা দিত মাত্র। একজন সহযোগী পাইলাম—ব্রজেন্দ্র ব্যানার্জি (এখন প্রবর্তক ইনসিওরেন্সের মালিক)। তাহা ছাড়া আর সব বহিরঙ্গ। ১৯১৬, ৫ই ডিসেম্বর কলেজে আমাকে ধরে। অবশ্য সেই দুপুরে কলেজে 'বোমা পিস্তলওয়ালা ধরা' ক্ষুদিরামের পর একটা মস্ত Field create করিল। প্রফেসর কৃপালনী আগাইয়া আসিলেন। আমি ঐ অবস্থায় তাঁহাদের কোন বিশেষ কিছুই দিয়া যাইতে পারি নাই। তবে ঐ

ব্যাপারের পর হইতে ব্রজেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া মজঃফরপুরে আশ্রয় গড়িয়া ওঠে, যেখানে ক্ষেত্র সিং, বিনায়ক রাও কাপলে ইত্যাদি পরে গঠনমূলক কাজ করে। সে সব খবর আমি রংপুর জেলে কিছু কিছু পাই।"

প্রবোধ বিশ্বাস

গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চ্যাটার্জিকে গুলি করে হত্যা করার ব্যাপারে প্রবোধ বিশ্বাস প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। এই ঘটনা এবং তার জীবনের অন্যান্য কার্যাবলী তার কাছে শুনে যা লিখে নিয়েছিলাম তাই বিবৃত করছি।

অনুশীলন সমিতির প্রথম যুগে, বোধ হয় ১৯০৮ সালে বাররা ডাকাতির পর অমৃত হাজরা ঢাকা থেকে দিনাজপুর সহরে গিয়ে সমিতির এক প্রকাশ্য শাখা স্থাপন করেন। বহু ছেলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সমিতির সভ্য হয় এবং প্রকাশ্যেই ড্রিল, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষা করে। বাল্যাবস্থাতেই প্রবোধ বিশ্বাস ও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্ল বিশ্বাস সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। দিনাজপুর সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তথাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীসতীশচন্দ্র রায়। ১৯১৩ সালে আমি ও ত্রৈলোক্যবাবু বরিশাল মামলার পলাতক আসামীরূপেই দিনাজপুর যাই সমিতির কার্য পরিদর্শনের জন্য। সতীশবাবুর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর বাড়িতে। তার মধ্যে তখন স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করলাম।

এই সময়ে দিনাজপুরে সমিতি সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ। অনেক পূর্বেই সমিতি বেআইনী ঘোষিত হয়। এমনি অবস্থায় অশ্বিনী ভট্টাচার্য, মাস্টার মশাই, সমিতিকে পুনর্গঠনের জন্য গোপনে চেষ্টা করছেন। আর ছোট ছেলেদের মধ্যে যারা এ কাজে অগ্রণী হয়েছিল তারা হচ্ছে প্রফুল্ল ও প্রবোধ। দিনাজপুর গিয়ে শুধু এ ক'জনকেই দেখতে পেয়ে ছলাম। এদের বাড়ি ছিল যশোহর জেলায়। অশ্বিনী ভট্টাচার্য সমস্ত জেলার ভার পান অমৃত হাজরার দিনাজপুর পরিত্যাগের পর, তখন তাঁর নামে ছিল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

সমিতির প্রথম অবস্থায় দিনাজপুরে ভূপাল সেন নামক এক ভদ্রলোকও সমিতির আন্তরিক সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি ছিলেন কালেক্টর অফিসের কর্মচারী। তাঁর কাছে বন্দুকের পাশ ছিল। এই বন্দুকের সাহায্যে আমাদের সভ্যদের কেউ কেউ বন্দুক চালনা শিক্ষা করত।

প্রফুল্ল বিশ্বাস ১৯১৩ সালে মেট্রিক পাশ করার পর কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় এসে আপার সারকুলার রোডের এক মেসে বাস করে। এ মেস ছিল আমাদের রাজাবাজার আড্ডার কাছে।

প্রবোধ বিশ্বাস ১৯১৪ সালে দিনাজপুর থেকে একটি রিভলবার চুরি করে রাজাবাজারের আড্ডায় আমাদের হাতে দেয়। এ রিভলবারটি ছিল আমাদেরই সমিতির এক সভ্যের পিতার। সে-ই এটা চুরি করে। কিন্তু সকলের ধারণা হল, এমনকি পুলিসেরও, সাধারণ চোরেই এটা চুরি করেছিল।

১৯১৫ সালে কুমিল্লা জেলার হরিপুরা গ্রামে অমৃত সরকারের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক ডাকাতি হয় তাতে প্রবোধ বিশ্বাস সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

১৯১৫ সালের প্রথম দিকে সারা ভারতে অভ্যুত্থানের আয়োজনে প্রবোধ বিশ্বাসের উপর নির্দেশ ছিল অন্যান্য অনেক সভ্যের মতই সমিতির অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রাথমিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করা।

১৯১৬ সালে গ্রীষ্মের ছুটির সময় এক গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরকে হত্যা করার কার্যে প্রবোধ বিশ্বাস নিযুক্ত হয়। এই গোয়েন্দার শ্যালক সুরেন সেনগুপ্ত অথবা দাশগুপ্ত, সমিতির সভ্য, তার ভগ্নীপতির গতিবিধির সংবাদ সমিতির কর্তৃপক্ষকে দিত। একদিন সন্ধ্যেবেলা সুরেন খবর দিল যে, তার ভগ্নীপতি তাদের বকুলবাগানের বাড়িতে এসেছে। ফেরবার পথে তাকে গুলি করে মারবার সুযোগ আছে। খবর পেয়েই প্রবোধ এবং আর দুজন বকুলবাগান ও বেলতলা রোডের মোড়ে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু ঐ গোয়েন্দা সেদিন শ্বশুরবাড়ি এসেই এত তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়েছিল যে, এ কাজের সমস্ত বন্দোবস্ত প্রবোধ করে উঠতে পারেনি।

প্রথমেই বলেছি বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যার ব্যাপারে প্রবোধ বিশ্বাস সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। এই বসন্তবাবু ছিল তখনকার দিনের গোয়েন্দা কর্মচারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার প্রথম বিপদ হয় ঢাকায় নদীর ধারে বাকল্যাণ্ড বাঁধে—নর্থব্রুক হলের সামনে বিকেল বেলায়। দলের বিশ্বাসঘাতক রামদাসকে নিয়ে বসন্তবাবু বেরুত সন্দেহভাজন লোকদের দেখিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেদিনের লক্ষ্য ছিল অবশ্য রামদাস। বসন্তবাবু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করে। রামদাস নিহত হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ছিল অনুকূল চক্রবর্তী, অমৃত সরকার ও ভূষণ বসু।

বসন্তবাবুর দ্বিতীয় বিপদ ঘটে তার কলিকাতাস্থ মুসলমান পাড়া লেনের

বাড়িতে, ১৯১৪ সালের শেষের দিকে। সন্ধ্যার পর এ বাড়িতে গোয়েন্দাদের পরামর্শ-সভা বসত এবং কড়া প্রহরী থাকত। অনুশীলন সমিতির সভ্যরা বোমা ও পিস্তল নিয়েই এ বাড়ি আক্রমণ করে এবং প্রহরীদের মধ্যে অনেকে হতাহত হয়। আমাদের লোকেরা প্রায় সকলেই নিজেদের বোমায় অল্প-বিস্তর আহত হয়। নগেন সেন ভীষণভাবে আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। কিন্তু বসন্ত চ্যাটার্জি রক্ষা পায়।

এর পর বসন্তবাবু এ বাড়ি পরিত্যাগ করে ভবানীপুরের হরিশ মুখার্জি রোডে বাস করতে থাকে এবং বাড়িটি যথেষ্টভাবে সুরক্ষিত করে। বাড়িতেই থাকত ১৬ জন রাইফেলধারী প্রহরী, তাছাড়া তার রাস্তার শরীররক্ষী এবং সাদা পোশাকের অন্যান্য গোয়েন্দাও থাকত। সুতরাং এ বাড়িতে আক্রমণ করলেও প্রথমে এদের সঙ্গেই লড়াই করতে হবে। হয়ত এদের কেউ কেউ মরবে, কিন্তু মুসলমান পাড়ার মত এখানেও বসন্তবাবু পালাতে সমর্থ হবে। সুতরাং দিনের বেলা কোন রাস্তাতেই প্রথমেই তাকে আক্রমণ করে ঘায়েল করতে পারলে সব থেকে সুবিধে হয়।

বসন্ত চ্যাটার্জির বাড়ি থেকে ইলিসিয়াম রোর অফিসে যাতায়াতের পথ কিছুদিন লক্ষ্য রেখে দেখা গেল, সে সাধারণত চারজন রিভলবারধারী শরীররক্ষী নিয়ে যাতায়াত করে।

পথেই আক্রমণ করা এবং তারিখ স্থির হওয়ার পর প্রবোধ বিশ্বাস, অতীন রায়, সুরেশ চক্রবর্তী, মোহিনী ভট্টাচার্য ও শিশির ঘোষ (দলীয় গুপ্তনাম ব্রহ্ম) এ কাজ সমাধা করার জন্য নিযুক্ত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী টেরাসের মোড়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজ গোয়েন্দা কর্মচারী আমারই এক বন্ধুর কাছে যা বলেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য—

সেদিন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র ইলিসিয়াম রোডে এই মর্মে খবর আসে যে, একজন প্রধান গোয়েন্দা কর্মচারী নিহত হবে, এবং কারা এই কাজ করবে সে সম্বন্ধেও খবর আসে। এ সংবাদের সূত্র অবলম্বন করে ডেপুটি-সুপার বসন্ত চ্যাটার্জি তার দেহরক্ষীদের নিয়ে সাইকেলে চেপে বের হলেন অনুসন্ধান ও আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তার করার জন্য। সবে অফিস থেকে বেরিয়ে এলগিন রোড দিয়ে খানিকটা এগিয়েছে, এমনি সময় তারা অতর্কিতে আক্রান্ত হয় বেলা পাঁচটা নাগাদ। বসন্ত চ্যাটার্জি ও একজন দেহরক্ষী নিহত হয়।

আক্রমণের প্ল্যান হয় এরূপ—অতীন রায় ও সুরেশ চক্রবর্তী একসঙ্গে একই সময়ে বসন্ত চ্যাটার্জিকে গুলি করবে। প্রবোধ বিশ্বাস ও শিশির ঘোষ প্রহরীদের গুলি করবে। মোহিনী ভট্টাচার্য আক্রমণকারীদের প্রহরীর কাজ করবে এবং চারদিকে নজর রাখবে। প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত এলগিন রোড ও আশু মুখার্জি রোডের সংযোগস্থলে লণ্ডন মিশন কলেজের সম্মুখে আক্রমণকারীদের নিরাপত্তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সকলের হাতেই রিভলবার ছিল, কেবল সুরেশ চক্রবর্তীর হাতে ছিল মসার পিস্তল। এঁরা সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিল। কেননা বসন্ত চ্যাটার্জি রিভলবারধারী প্রহরী বেষ্টিত হয়ে রাস্তায় বার হয়। আক্রমণও করতে হবে দিনের বেলা রাজপথের উপরে। সুতরাং শত্রুপক্ষের গুলিতে অন্তত কয়েক-জনকে মৃত্যু বরণ করতেই হবে।

বসন্ত চ্যাটার্জিকে সাইকেলে আসতে দেখেই ওরা প্রস্তুত হল। সেদিন ঘটনাক্রমে একজন মাত্র শরীররক্ষী ছিল। আক্রমণকারীরা দু'দলে বিভক্ত হল—দুজন বসন্তকে আক্রমণ করবে, দুজন প্রহরীদের এবং একজন সবদিকে নজর রাখবে।

কাছে আসতেই সুরেশ চক্রবর্তী ও অতীন রায় একই সঙ্গে বসন্ত চ্যাটার্জিকে গুলি করল। শরীররক্ষী অতীনদের গুলি করবার জন্য রিভলবার ওঠাতেই প্রবোধ বিশ্বাস শরীররক্ষীকে গুলি করল। সেও ভূপতিত হ'ল। শিশির ঘোষও শরীররক্ষীকে গুলি করেছিল। বসন্ত চ্যাটার্জিরও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'ল।

আকাশে তখনও সূর্যের আলো—রীতিমত দিন। কোন্‌দিক দিয়ে কোন্ পথে পালাতে হবে তা স্থির করবার ভার ছিল প্রবোধ বিশ্বাসের ওপর। বসন্ত চ্যাটার্জির নিশ্চিতরূপে মৃত্যু হয়েছে বুঝতে পারার পর এরা একই সঙ্গে পশ্চাদপসরণ শুরু করল এজন্য যে, ভাগাভাগি হয়ে পালাতে শুরু করলে কেউ না কেউ হয়ত ধরা পড়তে পারে। কিন্তু পাঁচজন একসঙ্গে পিস্তল ও রিভলবার নিয়ে এগুতে থাকলে কেউ সহসা কিছু করতে পারবে না।

পথচারীরা প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও কিছু সময়ের মধ্যেই বহু লোক তাদের অনুসরণ করতে করতে চেঁচাতে লাগল—ধর-ধর। এরা শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট ও রসা রোড পার হয়ে এলগিন রোডে এসে পড়ল। জনতা তখনও এদের অনুসরণ করছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের কাছে এসে এরা ডানদিকের

একটা গলিতে ঢুকল। অনুসরণকারী জনতাকে ঐ গলিতে প্রবেশ করতে দেখে এরা একসঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়তেই জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এরা এই গলি দিয়ে এগিয়ে এসে পদ্মপুকুর রোডে উপস্থিত হ'ল। তখন প্রবোধ বিশ্বাস এবং সম্ভবত মোহিনী ভট্টাচার্য সমস্ত অস্ত্রগুলি নিয়ে বকুলবাগান রোডে স্থরেন দাশগুপ্তর (অথবা সেনগুপ্ত) কাছে পৌছে দিল।

প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্ত এলগিন রোড ও আশু মুখার্জি রোডের সংযোগস্থলে লণ্ডন মিশন স্কুলের সামনে অপেক্ষা করছিল বিপ্লবীদের নিরাপত্তার জন্য। অতীন রায় ও ব্রহ্ম এই পথে আসে ; অন্যরা যায় উপরে লিখিত পথে। এ সম্বন্ধে বিশদভাবে উল্লেখ করেছি প্রফুল্লরঞ্জন দাশগুপ্তের কথা বলতে গিয়ে।

ফিরবার পর প্রবোধ বিশ্বাস খবর পেল যে, মসার পিস্তলের হাতুড়ী (Hammer) ছিল গুলি বার হওয়ার জন্য তৈরী অবস্থায়, কিন্তু সেফ্‌টি ক্যাচ (Safety Catch) দেয়া ছিল না। ফলে যে কোন সময়ে গুলি বার হয়ে বিপদ ঘটাতে পারে। অবশ্য অবিলম্বে প্রবোধ বিশ্বাস গিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এল। এই ঘটনার পর প্রবোধ বিশ্বাস ৬০নং মির্জাপুর স্ট্রীটে নিজের কলেজ মেসে চলে গেল। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খোলার কিছুদিনের মধ্যেই প্রবোধ বিশ্বাস গ্রেপ্তার হয়।

একদিন পুলিসের তাড়া খেয়ে

ইংরেজ সরকার তখন আমাদের দেশের হর্তা-কর্তা বিধাতা। ঠিক তারিখটা আজ আর মনে নেই। তবে তা ছিল ১৯২৪ সালের জুন মাসেরই একটা দিন। নীচে যা লিখছি তা সেদিনেরই এক কাহিনী। বিবরণ শুরু করার আগে তখনকার পটভূমি হিসেবে আমাদের কথা, অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির কর্মধারা সংক্ষেপে বিবৃত করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

তখন অনুশীলন সমিতি বেআইনী সমিতিরূপে পরিগণিত। অবশ্য এটা যে একটা গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি তা সকলেই জানত। আইনের চোখে সমিতির যে মর্যাদাই থাকুক না কেন, আমরা ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবেই যোগদান করেছিলাম। এবং সেই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কাজও করে যাচ্ছিলাম। তবে একথা বলে রাখা ভাল যে, আমরা গান্ধীবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। কেননা,

সেকালে অহিংস আন্দোলন করে সাফল্য অর্জন করা যাবে, এ মতবাদে আমরা বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু সহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছিলাম এই কারণে যে, এই সংগ্রামে গণ-আন্দোলনের ব্যাপক সুবিধে রয়েছে। আর আছে দেশব্যাপী গণ-সংযোগ এবং প্রকাশ্যে সংঘ গঠনের ব্যাপক সুযোগ। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। গুলি বা বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি সমস্তই বন্ধ করা হয়েছিল। এসব বন্ধ করলেও আমাদের আসল লক্ষ্য সশস্ত্র বিপ্লব, তার জন্য আমরা নিশ্চিত-ভাবেই প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, যেন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে দেশের মুক্তি সাধন করে বিপ্লব সার্থক করতে পারি। এবং তার জন্যই আমরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

একই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ইউরোপ থেকে এলেন নলিনী গুপ্ত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংঘের দূত হিসাবে। তিনিও আমাদের সঙ্গেই কাজ করতে লাগলেন। তাঁকে পাঠিয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়। নলিনীবাবু বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ও বোমা তৈরীতে খুবই অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম যুদ্ধের সময় ইংরেজের অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় নিযুক্ত হয়ে এসব কাজ শিখেছিলেন তিনি। তাঁরই সাহায্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। কলেজের ছাত্রসমিতির কয়েক জন সভ্য—আই. এস-সি, বি. এস-সি ক্লাসের ছেলেদের তিনি বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী এবং বোমা-কার্তুজের খোল তৈরী করা শেখাতে লাগলেন।

অর্থ সংগ্রহের কাজও চালিয়ে যেতে লাগলাম এককালীন দান ও নোট তৈরীতে সাফল্য অর্জন করে।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু মহাশয় তখন জাপানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষের উপরই প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আমরা ক্রমাগত লোকও পাঠাতে লাগলাম।

যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবী প্রথম যুদ্ধের সময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় সক্রিয় হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধের শেষে আর দেশে ফিরতে পারেননি। তাঁরা ইউরোপ, আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলাম। তাঁদের

মধ্যে কারুর ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলেই আমরা প্রথমে সমিতির প্রকাশ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা 'শঙ্খ' পাঠাতাম। তারপর চিঠিপত্র লেখা ও যোগাযোগ স্থাপন। এভাবেই আমরা প্রসিদ্ধ বিপ্লবী পরলোকগত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলাম। তিনি প্রথমে আমেরিকায় পলাতক ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি লণ্ডনে ভারতীয় হাই-কমিশনের দপ্তরে শিক্ষা-সচিব পদে বৃত হয়েছিলেন।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংঘই ছিল তখন ইউরোপে একমাত্র বিপ্লবী সংস্থা। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যও আমরা গোপনে একজনের পর আর একজনকে পাঠাতে লাগলাম। তারা হয় জাহাজের খালাসী, নয়ত পাচক বা বয় হিসেবে যেত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছতে বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। এইসব যোগাযোগে উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রসংগ্রহ এবং ব্রিটিশ-বিরোধী কোন শক্তি বা দলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন।

এই সময়েই মানবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভূতপূর্ব সহযোগী অবনী মুখার্জিও গোপনে এসে আমাদের সাথে যোগদান করেন।

তখন পর্যন্ত আমরা সাম্যবাদী মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিনি। অবশ্য সাম্য-বাদের উপর আমাদের যে কোন আকর্ষণ ছিল না তা নয়। তার প্রথম কারণ এই যে, উহা দরিদ্র জনগণের বিপ্লবী সংস্থা, এবং দ্বিতীয় কারণ, ওদের রুশ-বিপ্লবে সাফল্য অর্জন। সুতরাং এ মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ না করেও গণ-সংযোগ, গণ-অভ্যুত্থান এবং গণ-বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়েছিলাম। তখন পর্যন্ত আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা।

এই ছিল তখনকার সময়ে আমাদের সমিতির কর্মধারায় এক অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই পরিবেশে, ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় দিল্লীতে। আমি সেই অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। তারপর উত্তর ভারতে সমিতির কাজে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াবার সময় শুনতে পেলাম যে, আমার নামে (বোধহয়) বেঙ্গল রেগুলেশন থ্রি, ১৮১৮, বলে সমন বেরিয়েছে। শোনামাত্রই আমি গা-ঢাকা দিয়ে গোপনে কলকাতা ফিরে এলাম।

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মাথায় ঝুলছে সত্য, কিন্তু তার জন্য তো আর চুপ করে বসে থাকা চলে না। আমরা তখন সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনে সর্বক্ষণ নিয়োজিত

এবং তার রূপদান ও পরিচালনা কার্যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠরূপে ব্যাপৃত থাকতে হ'ত।

সে সময় আমার মনে একটা বিশেষ পরিকল্পনা দানা বেঁধে ছিল। সমগ্র ভারতে কিংবা একটা প্রদেশের সমস্ত জেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন একযোগে না করতে পারলেও যে ক'টা জেলায় পারি তাই করব। কারণ, আমাদের অভ্যুত্থানের আদর্শে যদি সমস্ত দেশ সাড়া না দেয় তবে আমাদের সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আদর্শ দেশে স্থাপিত হবে। ছোটখাট সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপে দেশের যুবকগণ আর আকৃষ্ট হবে না। সমগ্রভাবে সশস্ত্র বৈপ্লবিক আয়োজনের দিকেই অগ্রসর হতে চাইবে।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল তখনকার অবিভক্ত বাংলার কয়েকটা জেলা আমরা অধিকার করে নেব। কলকাতা অধিকার করতে পারব না। কিন্তু কয়েকশ' অস্ত্রধারী বিপ্লবী অশান্তি সৃষ্টি করতে থাকবে। ঢাকা সহর দখল করার চেষ্টা করব। না পারলে সেখানেও কলকাতার মত অশান্তি সৃষ্টি করব। দেশের আভ্যন্তরীণ যানবাহন, ষ্টিমার, রেল, মোটর, নৌকা, সাইকেল, ঘোড়া প্রভৃতি সবই আমাদের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করব। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, পোস্ট-অফিস প্রভৃতিও আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

সে সময় অবিভক্ত বাংলাদেশে কলকাতার বাইরে সৈন্যদল বলতে তেমন কিছু কোথাও ছিল না। কেবলমাত্র ঢাকায় ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস নামে এক ব্যাটালিয়ান গুর্খা মিলিটারী পুলিস থাকত। বাংলাদেশের আর সমস্ত জেলা একরকম অরক্ষিতই ছিল। অন্তর্বিপ্লব রোধ করার কোন উপায়ই ছিল না। আর একাজ সাধারণ পুলিসের দ্বারা সম্ভবও নয়।

যে পরিকল্পনার কথা এত সংক্ষেপে বিবৃত করলাম তার বিস্তৃত রূপরেখা প্রদান করতে আমি কয়েকশ' পৃষ্ঠাব্যাপী এক হস্তলিখিত পুস্তিকা রচনা করেছিলাম। এই পুস্তিকা অবশ্য নষ্ট করে ফেলতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

আগেই বলেছি যে, ১৯২৩-এর ডিসেম্বর মাসে উত্তর ভারতে থাকাকালীন আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুবার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়ে থাকি।

এই পটভূমিকায় ১৯২৪-এর জুন মাস। পলাতক অবস্থায় আমি তখন ঢাকাতেই থাকি আর আগতপ্রায় অভ্যুত্থানের আয়োজন করছি। আমি ঢাকার লোক। অনেক লোক আমায় চেনে। তাই আমার পক্ষে দিনের বেলা চলাফেরা করা একরকম অসম্ভব ছিল। অতি গোপনে বৃহৎ আকারে বিস্ফোরক

তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতা বন্দর থেকে তখন কিছু রিভলবার এবং পিস্তলও আমাদের হাতে এসে গিয়েছে।

এ সময়েই একদিন আমি ঢাকায় আমাদের বাড়ি গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও আমি নিজের বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। তার কারণও অবশ্য ছিল। আমাদের বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পুলিসের সন্দেহভাজন ছিল। আমার তিন ভাই জেল-ফেরত বিপ্লবী, আমার ভগ্নীপতি বিপ্লবী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিপ্লবী। তাছাড়া, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী মতাবলম্বী ছিলেন না, তাঁরাও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এমনকি আমাদের বাড়ির ঝি, চাকর, পাচক তারাও সহানুভূতিশীল ছিল। আর আমার মা-ভগ্নীদের তো সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ছিল। কাজেই কেউ আর আমাকে আগ বাড়ায়ে ধরিয়ে দেবে না। তাছাড়া বিপ্লবী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বাড়ি—যে বাড়ি অনেকবার থানাতল্লাশী হয়ে গিয়েছে, যে বাড়ি থেকে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, আর যে বাড়ির সামনের রাস্তায় বহু-সংখ্যক গোয়েন্দা পুলিস দিবারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, সে বাড়িতে কোন পলাতক বিপ্লবী এসে থাকতে পারে এমন কথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

এত সব কারণ সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হ'ল না। সাত-আট দিন জর ভোগের পর সেদিন প্রথম ভাত-পথ্য করেছিলাম। আহারান্তে দুপুরে কেবল একটু বিছানায় শুয়েছি, তখনি বাইরের রাস্তায় মোটর গাড়ি আসবার আওয়াজ পেলাম। শুনেই একটু শংকিত হয়ে ভাবছি জানালা দিয়ে দেখব কি দেখব না। ভাবতে ভাবতেই কিন্তু সিঁড়ির দরজায় ঠক্ঠক্ আওয়াজ—খুব আস্তে।

উঠে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই আমার তৃতীয় ভাই বীরেন ইসারা-ইঙ্গিতে জানাল বাইরে কয়েকখানা মোটর থেমেছে, কয়েকজন সাদা পোশাকের লোক এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। ওরা যাতে ঢুকে পড়তে না পারে সেজন্য আর সদর দরজা খোলেনি। জানালার খড়খড়ি দিয়ে দেখতে বলল কি ব্যাপার।

খড়খড়িটা একটু খুলেই দেখতে পেলাম কয়েকজন ইউরোপীয় ও ভারতীয়কে। বুঝতে বাকী রইল না পুলিস আমাদের বাড়ি ঘেরাও করার চেষ্টা করছে। ওকে বললাম, 'এসেছে, আমার জন্য ভাবিস নে। যা হয় হবে, কিন্তু তোকে এই যে কাগজগুলি দিচ্ছি তা কিন্তু তোকে প্রাণের বিনিময়েও নষ্ট করে ফেলতে হবে।' কারণ, এই কাগজগুলিই ছিল আমার

লেখা সেই সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সবিস্তার পরিকল্পনা। বীরেন চলে গেল।

এদিকে আমি শক্ত করে ধুতি পরে নিলাম। শার্ট গায়ে দিয়ে ঘড়িটা হাতে বাঁধলাম। মানিব্যাগে কিছু টাকা নিয়ে পকেটে রেখে দ্রুত বাড়ির পিছনের দিকের ছাতে গিয়ে উঠলাম। লাফিয়ে আরেক বাড়ির ছাতে গিয়ে পড়লাম। সে বাড়ির মালিক তখন ছাত-সংলগ্ন ঘরে দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। আর ঐ ঘরের মধ্য দিয়ে ছাড়া আর যাওয়ারও কোন পথ ছিল না। ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম দরজাটা খুলে দিতে, অনুরোধ করলাম যেন তিনি আমাকে তাঁর বাড়ির মধ্য দিয়ে পালিয়ে যেতে দেন, কারণ পুলিস আমাকে ধরতে এসেছে।

ভদ্রলোক আমাকে জানতেন, এবং এও জানতেন যে, আমি স্বদেশী করি আর পুলিস প্রায়ই আমার খোঁজ করে, মাঝে মাঝে ধরেও নিয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও ভদ্রলোক সহজ ভাষায় অস্বীকার করে বললেন—আপনার জন্য কি আমরা বিপদে পড়ব? দরজা আমি খুলব না। আপনি যান। আমি ওঁকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই ওঁর মন গলাতে পারলাম না। আমায় শুধু বললেন—আপনি যান। আর সাথে সাথেই শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন।

এমনি ব্যবহারে তাঁর ওপর বিরক্তি বা রাগ হ'ল না। কারণ, এর আগে এঁরা এ জাতীয় ব্যাপারে আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। অনেক বিপ্লবী পলাতক এঁদের সাহায্যে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। আজ যদি ভয় পেয়ে থাকেন তবে রাগ করার কি আছে! এতদিন অনেক উপকার করেছেন, আজ তা নাই-বা করলেন!

সে যাই হোক, এখন আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে। কিন্তু সেখান থেকে আমাদের বাড়ির ছাতে ফিরে আসা ভিন্ন আর কোন পথ ছিল না। কাজেই, ফিরে দাঁড়িয়ে লাফ দেয়ার উপক্রম করতেই দেখতে পেলাম যে, মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা উঁচু দেয়ালের উপর কয়েকজন গোয়েন্দা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের বাড়ির একতলার অংশের ছাতের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই রিভলবার ছিল। ওরা সকলেই হয়ত আমাকে চেনে। আমিও ওদের কাউকে কাউকে চিনি। মনে হ'ল ওরা আমাকে দেখে খুব অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। আমিও ওদের দিকে খুব কঠিন দৃষ্টি দিয়ে

তাকিয়ে রইলাম। আর এমন ভাব দেখালাম যেন কিছু একটা করে ফেলতে পারি।

আমার সঙ্গে রিভলবার ছিল না, তবুও ডান হাতটা শার্টের নীচে কোমরে রাখলাম। ওরা যেন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল। মনে হ'ল, যেন ভাবছে এগুবে, কি পিছুবে। যাই হোক না কেন, আমার পক্ষে কোন সময় বা সুযোগ নষ্ট করার মত অবস্থা ছিল না। আমি আমাদের বাড়ির ছাতের দিকে লাফ মারলাম। আর ওরাও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—স্যার, স্যার, সাহেব, সাহেব, আসামী পালাচ্ছে! বলতে বলতে ওরাও আমাদের বাড়ির ছাতের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ছাতের উপর আসতেই আমার দেখা হ'ল মায়ের সঙ্গে। তাঁর হাতে একটা ঘটি ছিল। তিনি সে সময় আবার কানে কম শুনতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে রে? আমি অঙ্গুলি-সংকেতে গোয়েন্দাদের দেখিয়ে দিয়ে বললাম—ওরা আমায় ধরতে এসেছে। কথা শেষ করেই আমি ছাতের অপর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চেঁচাতে চেঁচাতে গোয়েন্দারা খুব তাড়াতাড়ি দেয়ালের উপর দিয়েই এগিয়ে আসছিল। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুনীতিও সে সময় ছাতের উপর এসেছিল। তাকে দেখেই আমার মা চেঁচিয়ে বললেন—আয় তো দেখি, কার সাধ্য আমাদের বাড়ি ঢোকে! বলতে বলতেই তিনি হাতের ঘটিটা ছুঁড়ে মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে দুখানা বাঁশের লাঠি হাতে তুলে নিয়ে ওদের দিকে আক্রমণোদ্যতা হলেন। এই দেখে গোয়েন্দারা দেয়ালের উপর একটা বিপদজনক অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এগুতে যেন সাহস পাচ্ছিল না। আমার মা আমার বোনকে উদ্দেশ করে বললেন—আয়, আমরা 'চোর-চোর ডাকাত-ডাকাত' বলে চেঁচাই।

আমাদের বাড়ির চারদিকেই অনেক বাড়ি ছিল। নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনে প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই লোক বেরিয়ে এলো। সবাই বলতে লাগল—কে তোমরা, পাকড়ো, পাকড়ো··· ! গোয়েন্দারা তখন ওদের নিবৃত্তি করার জন্য বলল—আজ্ঞে, আমরা চোর বা ডাকাত নই, গোয়েন্দা পুলিস। বোমার আসামী ধরতে এসেছি। ওদের কথা শুনে অনেকেই চলে গেল, বাকীরা আর কিছু বলল না।

এদিকে আমার মায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। কেননা মা আশা করেছিলেন

যে সামান্যক্ষণের জন্য হলেও ওদের বাধা দিতে পারলে আমি হয়ত পালাবার সুযোগ পাব।

এদিকে পুলিসের লোক ততক্ষণে সোরগোল শুরু করে দিয়েছে—ধর ধর, পাকড়ো পকড়ো!

আমি ততক্ষণে ছাতের পশ্চিম দিক থেকে যে বাড়িতে লাফিয়ে পড়লাম তা ছিল আমারই প্রথমা ভগ্নী অমিয়বালার বাড়ি। ভগ্নীপতি তখনকার দিনের বিপ্লববাদী এবং প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পেশা ওকালতি। সে সময় তিনি ছিলেন আদালতে। বাড়িতে আমার ভগ্নী ছাড়া আর ছিল তার পাঁচ বছরের একটি মেয়ে।

উঠোনের পাশেই ছিল একটা একতলা সমান উঁচু দেয়াল, আর তাতে হেলান দেয়া একটা মই। আমি অবিলম্বে মই-এর সাহায্যে পাশের বাড়িতে লাফিয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই অমিয়বালা মইটা সরিয়ে ফেলল, যেন পুলিস কোন কিছু সন্দেহ না করতে পারে।

অবশ্য, পুলিস ততক্ষণে বোনের বাড়ির পেছনের দিকের দরজায় ঘা মারতে শুরু করে দিয়েছে। বোন তার মেয়ের হাত ধরে এসে সেই দরজার সামনে দাঁড়াল। গোয়েন্দা-সুপার হেনসেন সাহেব, ডেপুটি-সুপার বসন্ত মুখার্জি প্রভৃতি বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। তাদের সকলের হাতেই রিভলবার ছিল। বোন তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। হেনসেন সাহেবের রিভলবারের নল তখন বোনের বুকে ঠেকানো। আমার বোন তা মোটেই গ্রাহ্য না করে বলল—কে তোমরা, চোর-ডাকাতের মত বাড়িতে ঢুকছ? চলে যাও এখান থেকে। গোয়েন্দারা অবশ্য এতে নিরস্ত হ'ল না। বোনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়িতে কিছু সময় ছোটাছুটি করে আমায় না পেয়ে আবার ছাতের দিকে ছুটল।

ছাতে ঢোকবার মুখে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুনীতি ডেপুটি-সুপার বসন্তবাবুর পথ রোধ করে দাঁড়াল। বসন্তবাবু তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ছাতে এল। তার পেছন পেছন এল হেনসেন সাহেব। পরে ওরা যখন আমাদের বাড়ির ছাতের দেয়াল থেকে পেছনের বাড়ির দোতলায় যাওয়ার উপক্রম করল, তখন সুনীতি ওদের দুজনকেই পর পর জামার পকেট ধরে টেনে নীচে নামিয়ে দিল। উদ্দেশ্য যতক্ষণ দেরী করিয়ে দেয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওরা সেভাবেই গেল। পেছনের বাড়ির দোতলায় ওদের লোক দেয়ার

কারণ হ'ল, ওদিকের একটা ঘরের দরজা খোলা ছিল, এবং ওরা তো বটেই, আমার বোনও ভেবেছিল আমি ও-পথেই পালিয়েছি।

এদিকে আমি একটার পর একটা করে কয়েকটা বাড়ির দেয়াল টপকে পার হয়ে গেলাম। শেষ যে বাড়িটায় লাফিয়ে পড়েছিলাম, সে বাড়িতে অনেক লোক থাকত। জাতিতে সাহা, ছোটখাট ব্যবসা করে সংসার চালাত। ইংরেজী শিক্ষা বলতে ওদের কিছু ছিল না।

আমি যখন লাফিয়ে পড়ি তখন বাড়ির মেয়েরা সবাই উঠোনে বসে আহার করছিল। আমি যদিও এ পাড়ারই লোক, কিন্তু ওরা কেউ আমাকে চিনত না। তার কারণ, আমাদের পরিবার যখন এ পাড়ায় আসে, আমি তখন থেকেই পলাতক। গ্রেপ্তার হয়ে অনেক বছর পর বাড়ি ফিরলেও ঢাকাতে প্রায় থাকতামই না। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বৈপ্লবিক কাজে ঘুরে বেড়াই। আমাকে না চেনাই স্বাভাবিক।

লাফিয়ে পড়তে দেখে ওরা ভাবল আমি চোর কিংবা ডাকাত। ভয়ে ছোট-বড় সবাই চেঁচামেচি করতে করতে বাড়ির রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমিও ওদের পেছন পেছন গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। ওদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললাম—আপনারা ভয় পাবেন না, আমি চোর বা ডাকাত নই, বামুনের ছেলে, ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চাই বলে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। আপনাদের আশ্রয় চাই।

ওরা সকলেই গোঁড়া হিন্দু। সুতরাং আমি আশা করেছিলাম যে, ব্রাহ্মণ-সন্তান জেনে হয়ত ওরা আমায় আশ্রয় দেবে। সেদিন কিন্তু আমার পৈতেটা খুব কাজে লাগল। দ্বিতীয় কারণ, ভাবলাম স্বদেশী করি, তাতে হয়ত কিঞ্চিৎ সহানুভূতি হতে পারে।

আমার কথা শুনে ওরা মুহূর্ত কালের জন্য চুপ করে রইল। পুলিস ততক্ষণে সব বাড়ির ছাতে উঠে দেখছে। আর চেঁচাচ্ছে—ঐ যায়, ঐ যায়!

ও বাড়ির মেয়ে-বউরা আর কাল-বিলম্ব না করে আমার হাত ধরে বলল—চল। আমরা আশ্রয় দেব। দোতলায় এস। আমাকে নিয়ে ওরা দোতলায় উঠে এল এবং একটা ঘরের মধ্যে বসিয়ে বলল—তুমি এই ঘরে থাক, আমরা নীচে যাচ্ছি। যাওয়ার সময় রেখে গেল একটি তের-চৌদ্দ বছরের কিশোর বালককে। পুরুষ বলতে বাড়িতে তখন ঐ ছেলেটিই ছিল।

ঘরে বসেই চারদিকে হৈ-চৈ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। মাঝে একবার

ঐ বালক নীচে নামল। খবর নিয়ে এল যে, পুলিস এই পল্লীটা পুরো ঘেরাও করেছে। হয়ত সব বাড়িই খানা-তল্লাশী করবে।

যতক্ষণ দৌড়ঝাঁপের ওপর ছিলাম ততক্ষণ শরীরের অসুস্থতার কথা কিছুই টের পাইনি। কিন্তু যেই মাত্র একটু সুস্থির হয়ে বসলাম, অমনি শরীরের অসুস্থতা ভীষণভাবে অনুভব করতে লাগলাম। প্রবল জ্বর-ভাব, মাথা ও সারা শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা। দুটো পা-ই হয় মচকেছে, না হয় ভেঙেছে। ক্রমে ফুলে উঠছে, আর খুব ব্যথা। মাথা সোজা রেখে আর যেন বসতে পারছিলাম না। অথচ কিছু একটা না করেও যেন কেমন লাগছে। হঠাৎ মনে হ'ল সঙ্গের ছেলেটাকেই কেননা স্বদেশী মন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। কারণ, দেখেছি এমনি পরিস্থিতিতেই এমন কাজ সহজ হয়। ছেলেরা তাড়াতাড়ি দলভুক্ত হয়। এবং এই ছেলেটির সাহায্যেই আমাকে এ বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। আমি ধীরে ধীরে ছেলেটির সাথে আলাপ করতে শুরু করলাম।

একটু পরেই আমার কাছে দুজন লোক এসে উপস্থিত হলেন। বুঝলাম ওঁরাই এ বাড়ির কর্তা। ওঁদের দুজনেরই বয়েস পঁয়ত্রিশ এবং চল্লিশের মধ্যে। সহরের বাজারে এদের দোকান। দুপুর-বেলা সাময়িক বন্ধ রেখে বাড়িতে খেতে এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই আমাকে উদ্দেশ করে বললেন—ঠাকুর মশাই, আপনি বাড়িতে থাকলে আমাদের বিপদ ঘটতে পারে। দয়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান।

ওঁদের অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করে বললাম—আমি যে আপনাদের আশ্রয়প্রার্থী স্বদেশী কর্মী হিসাবে তো বটেই, আবার ব্রাহ্মণ-সন্তান হিসেবেও। কোনমতেই ওঁদের রাজী করাতে পারলাম না। হঠাৎ ওঁরা দুজনেই আমার পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমরা গরীব, ছাপোষা মানুষ, কোনমতে সংসার চালাই কর্তা, আমরা কি পারি পুলিসের সাথে বিবাদ করতে! আপনি আমাদের রক্ষা করুন। দয়া করে বাড়ি থেকে চলে যান। ওঁরা আমার পা ছাড়লেন না। ক্রমাগত চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

ওঁদের এই অবস্থা দেখে আমি ছেলেটিকে বললাম—তুমি একবার দেখে এস তো কোনদিক দিয়ে বেরুবার পথ আছে কিনা। ছেলেটি ফিরে এসে বলল—কোন রাস্তাই নেই। পুলিস চারিদিকই ভাল করে ঘেরাও করে রেখেছে।

আমি একটু বিষাদগ্রস্ত হলাম। এজন্য নয় যে, আমি ধরা পড়ে যাব।

এজন্য যে, এত কষ্ট করলাম, হাত-পা জখম হ'ল। অথচ একরকম অক্ষম দেহ নিয়ে গ্রেপ্তার হতে চলেছি। বরং বাড়ি বসে সুস্থ দেহে ধরা দিলেই বুঝি ভাল ছিল। বিশেষ দুঃখ হ'ল এই ভেবে যে, বিপদ-মুক্ত হওয়ার মুখে এসে ধরা পড়ে গেলাম।

যাই হোক, শেষবারের মত বাড়ির কর্তাদের আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই হ'ল না। ওঁরা শুধু হাত জোড় করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলতে লাগলেন—ঠাকুরমশাই, আমাদের মারবেন না, গরীবকে মারবেন না। দোহাই আপনার! আপনি এখনি চলে যান। আমি তখন বললাম—বেশ, তাই হবে। পুলিসের হাতে ধরা দিতেই চললাম। ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম—চল, তোমার কাঁধে ভর করেই তোমাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত যাই।

কিন্তু উঠে দাঁড়াতে পারলাম না। ভাঙ্গা পায়ের উপর ভর দিতে গিয়ে কাতরে উঠে পড়ে গেলাম। তখন, ওঁরা দু'জনে আমাকে দু'দিক থেকে ধরে নিয়ে চললেন। আমি বসে বসে কোনমতে শরীরটা হিঁচড়ে হিঁচড়ে সিঁড়ি বেয়ে অতিকষ্টে নীচে নামতে লাগলাম।

আমাকে উপরে রেখে এসে বাড়ির মেয়েরা আবার উঠোনে বসে কেবল খেতে শুরু করেছিলেন। আমি যেই সিঁড়ির নীচে উঠোনে নেমেছি, অমনি ওঁরা আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে রেখে কাছে ছুটে এসে কর্তাদের উদ্দেশ করে বললেন—একি, এ কি করছ, তাড়িয়ে দিচ্ছ! ব্রাহ্মণের ছেলে, চোর নয়, ডাকাত নয়, দেশের সেবা করে, সকলের ভাল করে। তাকে আশ্রয় দেবে না? তাড়িয়ে দেবে? এ যে মহা পাপের কাজ। এ বাড়ি নির্বংশ হবে। সর্বনাশ হবে!

কর্তারা রেগে গিয়ে বললেন—আমাদের হাতে যখন হাতকড়ি পড়বে, তখন পিণ্ডি গিলবে কোত্থেকে শুনি!

মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলেন—উপোস করব, তবু অধর্ম হতে দেব না। পুলিস ধরবে? কেন? আমরা কী করেছি? আর যদি ধরেই, ধরুক না, তবু আশ্রিতকে তাড়িয়ে দেব না। যাই হোক না কেন, কিছুতেই অধর্মের কাজ করব না।

আমার চোখে জল এসে গেল। কেননা, আমার মন তখন এক অপূর্ব আনন্দে দুলে উঠেছিল। ভাবলাম, এতদিন যা করেছি, আজ তা সার্থক

হ'ল। এখন যদি ধরাও পড়ি তথাপি আমার কোন দুঃখ নেই। এরা অশিক্ষিত, অনগ্রসর। এদের হাতে ছোঁয়া জল পর্যন্ত অনেকে পান করে না। কিন্তু, এদের মধ্যেও যখন প্রাণ জেগে উঠেছে তখন আমাদের সাফল্য কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের জয় সুনিশ্চিত। আমার মত শত শত কর্মীর মৃত্যুতেও এখন আর কিছু যায় আসে না। জয় আমাদের হবেই।

মেয়েরা কর্তাদের হাত ছাড়িয়ে সরিয়ে দিল। সকলে মিলে আমাকে ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে তুলে একটা ঘরে বসিয়ে দিয়ে বলল, আজ আমরা কেউ খাব না। আমরা সবাই এখানে বসলাম। দেখি, কে এঁকে তাড়িয়ে দেয়!

বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ারা আমার গায়ে হাত দিয়ে বললেন—ইস, গা যে পুড়ে যাচ্ছে! পা-ও যে দেখছি ফুলে উঠেছে! এ অবস্থায় কেউ মানুষকে তাড়ায়! জন্তু-জানোয়ারকেও কেউ তাড়ায় না। কি মহাপাপ, কি মহাপাপ! এ পাপে বংশ থাকে না।

তাড়াতা'ড় বিছানা পেতে ওঁরা আমায় শুইয়ে দিলেন। কেউ বা মাথায়, কেউ বা শরীরে, কেউ বা পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একজন তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে নিজের সযত্নে রক্ষিত ধনেশ পাখির তেল এনে আমার পায়ে মালিশ করতে লাগলেন। এই তেল মালিশ করলে নাকি ভাঙা বা মচকানো সেরে যায়।

দু'তিন জন বৃদ্ধা আমাকে খুব বকাবকি করতে লাগলেন—কেন? কিসের জন্য এসব কাজ করতে গিয়েছিলে? দেশের জন্য? স্বাধীনতা চাই? দেশ উদ্ধার করতে? কিন্তু, জিজ্ঞেস করি, কার জন্যে করবে? দেশের লোকের ব্যবহার তো দেখলে! আমাদের ব্যবহারও দেখলে! এক মিনিটের জন্যও আশ্রয় দেব না! কুকুর-বেড়ালের মত তাড়িয়ে দেব! কোন মায়া, কোন দয়া, কিছুই নেই! এই পোড়া দেশের মঙ্গল চাও তোমরা, যে দেশের লোক এমনি নিমকহারাম! তোমরা হতভাগা, আহাম্মক, বেয়াকুফ, লক্ষ্মীছাড়ার দল জুটেছ! নিজের সর্বনাশ করছ, আবার বলছ কিনা পরের ভাল করব! দুই গালে চড় মারতে ইচ্ছে হয়। নিজের মা-বোনকে কাঁদিয়েছ, নিজের সংসার ছারখার করেছ। নিজে এখন ফাঁসিতেই ঝোল বা গুলিতেই মর, কিংবা দ্বীপান্তরেই থাক! যত সব সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড! সত্যি সত্যি ইচ্ছে করে গালে-মুখে চড় মারি।

বকতে বকতে ওঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল, চোখে জলের কণা টলটল করছিল। আর কিছুই বলতে পারলেন না। নীরবে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। হলফ করে বলতে পারি, এমন দরদভরা মধুমাখা তিরস্কার জীবনে আর কোনদিন শুনিনি। আমি 'মা' বলে ওঁদের পায়ে হাত দিতে গিয়ে অভিভূত হয়ে চোখের জলে ভেঙে পড়লাম। মহিলারা কি কর, কি কর! বামুনের ছেলে, একি কাজ! কথাগুলি বলেই তড়িতাহতের মত পিছনে ছিটকে পড়লেন। বলতে লাগলেন, পাগল ছেলে, জান না তুমি ব্রাহ্মণ আর আমরা অস্পৃশ্য! আমাদের ছোঁয়া জল পর্যন্ত তুমি পান করতে পার না! এতে যে পাপ হয়! আমি বললাম—না মায়েরা, পায়ে হাত দিলে পাপ হয় না। ওঁরা বললেন, না, ওসব ভাল নয়!

এ বাড়ির সবাই কিন্তু এক পরিবারভুক্ত ছিল না। প্রায় সকলেরই হাঁড়ি আলাদা। তার উপর এদের নিজেদের মধ্যে ঝাগড়া, চেঁচামেচি আর গালা-গালিতে পাড়া-প্রতিবেশী অতিষ্ঠ থাকত। কিন্তু, আজ এই মুহূর্তে সকলে ঐক্যবদ্ধ। মহা উৎসাহে সকলেই আজ এক হয়ে বিপদের সম্মুখীন।

ওদের মধ্যে আলোচনা হ'ল। কেউ কেউ বললেন, কেন? আমাদের বাড়ি পুলিস ঢুকবে কেন? আমরা তো কোন দোষ করিনি! আমরা বাধা দেব। পুলিসকে আসতে দেব না। এ জুলুম আমরা সহ্য করব না।

একটু পরেই এক অশীতিপর বৃদ্ধ ঘরে এলেন। কপালে, গালে, সর্বাঙ্গেই তিলক ছাপ, রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা। হাতে কুঁড়োজালি, গলায় কণ্ঠি, চোখে পুরো চশমা। ঘরে ঢুকে হাতড়াতে লাগলেন, যেন কাকে খুঁজছেন আর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—কোথায় তিনি? আমাকে তোমরা কেউ একবার স্পর্শ করাও গো। আমি ধন্য হয়ে যাব। নারায়ণ, নারায়ণ। অতিথি নারায়ণ, আশ্রিত নারায়ণ। ব্রাহ্মণ-সন্তান, দেশের সেবা করেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আজ আমাদের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছেন। তাড়িয়ে দিলে মহাপাপ হবে। সর্বনাশ হবে। বংশ লোপ পাবে। হরি বোল, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, বিপদ হবে, আমাদের ছেলেদের পুলিস ধরে নিয়ে যাবে। এই তো মাত্র বিপদ! বলতে বলতে তিনি হেসে উঠলেন। হাসি থামলে আবার বলতে লাগলেন—আর, এই দেশেরই শিবিরাজা আশ্রিত একটা পাখির প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের বুকের মাংস দিয়েছিলেন। আর আমাদের ছেলেদের তো শুধু ধরে নিয়ে যাবে। নেয় নেবে! ছেলেরা বলছিল, পুলিস ধরে নিয়ে গেলে দোকান-পসার

বন্ধ হবে, না খেতে পেয়ে মরতে হবে। যত সব নির্বোধের দল! আমাদের মরা-বাঁচা যেন পুলিসের হাতে! দূর দূর, যত সব আহাম্মকী কথা। কথায় বলে, মুখ দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা। রাখে কৃষ্ণ মারে কে? বিপদ আসে, আসুক। লীলাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। হরিবোল, হরিবোল, রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ!

তিনি দ্রুত জপের মালা ঘোরাতে লাগলেন। আবার বললেন—আমি বড় বেশী কথা বলি, না দাদা? জ্ঞান কম কিনা, তাই বেশী বক্‌বক্‌ করি। ভক্তিও কম। ভক্তিরসে ভরা থাকলে আর অত আওয়াজ বের হ'ত না।

বৃদ্ধ আমার কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিজের মাথায় ঠেকালেন। তারপর তুলসীর মালা ঘোরাতে ঘোরাতে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমি অভিভূত। একটা কথাও বলতে পারলাম না।

এর মধ্যেই খবর এলো যে, পুলিস এ বাড়িও খানাতল্লাশী করতে চায়। বিপ্লবী পলাতক এ বাড়িতে লুকিয়ে আছে কিনা দেখতে চায়।

মেয়েরা পুলিসকে ভিতরে আসতে দিতে চাইছিল না। আমি বললাম, তা হবার নয়। যে করেই হোক ওরা আসবেই। এলে পর কি করা যায় তাই ভেবে দেখা যাক।

একজন মহিলা বললেন—আমরা সবাই ওঁকে ঘিরে বসে থাকব। দেখি, কেমন করে ওকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়!

আমি বললাম, এটা ভাল পরামর্শ। আপনারা, বাড়ির মেয়েরা সবাই এ ঘরেই ভিড় করে থাকুন। এই ছেলেটি পুলিসকে সমস্ত বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাক। ও বলুক যে, পর্দানশীন মেয়েরা সব এক ঘরে জমায়েত হয়ে আছে। তা জানলে পুলিস এঘরে নাও ঢুকতে পারে।

এ পরামর্শমতই কাজ হ'ল। পুলিস এসে সারা বাড়ি ঘুরে দেখল। আমি যে ঘরে আছি, সে ঘরের কাছে এসে দোড়-গোড়ায় একবার দাঁড়িয়ে চলে গেল। মেয়েরা আমার সারা শরীর চাপা দিয়ে এমনিভাবে ঘিরে বসে ছিল যে, বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় ছিল না।

সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়িতে খবর পাঠালাম। এ বাড়িরই একজন আমাকে ধরে বাড়িতে পৌছে দিলেন। আমাদের বাড়িই তখন নিরাপদ মনে করলাম। কারণ, একবার যে বাড়ি এমনভাবে খানাতল্লাশী করা হয়েছে সে বাড়িতে পুলিস একেবারে পাকা খবর না পেলে আসে না।

আমার মা ও বোনেদের সাথে পুলিসের যে সংঘর্ষ হয়েছে তা বাড়ি গিয়ে সবিস্তারে শুনতে পেলাম। জেনে নিশ্চিত হলাম বীরেন আমার দেয়া পাণ্ডু-লিপিটা ভালভাবেই নষ্ট করতে পেরেছিল। পরে সে রাস্তার ধারের ছাতে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ ও তার পুলিসের জুলুমের কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে রাস্তার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রাস্তাতেও তখন অনেক লোক জমে গিয়েছিল। এর মূল্যই বা কম কি!

তরুণের প্রতি

প্রিয় বন্ধুগণ,

নিখিল-বঙ্গ যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। যুবক-বন্ধুদের ভালবাসার আহ্বানে সাড়া দিতেছি, যোগ্যতা-অযোগ্যতার চিন্তা করি নাই। তরুণের অনেক কিছু খেয়ালের মত আমাকে সভাপতি করাও হয়ত তেমনি একটা খেয়াল; তেমন হিসাব-বুদ্ধি হয়ত ইহাতে নাই। তা হউক, নিজকেও আমি তরুণ-ধর্মী মনে করি, তাই তরুণ বন্ধুদের এই বে-হিসেবী, খেয়ালী আহ্বান ভালবাসার দান বলিয়া মাথায় করিয়া লইলাম।

বাংলার তরুণদের উপর অগাধ বিশ্বাস চিরকালই পোষণ করিয়া আসিতেছি। বাংলার তরুণকে দেখিয়াছি সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া মাতৃ-শৃঙ্খল মোচন কামনায় ছুটিয়া যাইতে, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে মুক্তির বাণী প্রচার করিতে, তাহাদিগকে দেখিয়াছি বন্দুক-পিস্তলহস্তে বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে, ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে আরোহণ করিতে, কারাগারে, দ্বীপান্তরে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ কারতে। বাংলার কিশোরের এমন গঠনশক্তি দেখিয়াছি যে, বড় বড় জ্বালাময়ী বক্তৃতায় যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহাই তাহারা সম্ভব করিয়াছে। পঞ্চদশ বৎসরের কিশোর, ক্লাশে বসিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট ছাত্রবন্ধুকে দেশাত্মবোধে এমনই উদ্বুদ্ধ করিল যে, দেশের জন্য প্রাণ দিতে সে কুণ্ঠিত হইল না। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন দাস, প্রমোদরঞ্জন বাংলার তরুণের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কানাইলাল, বীরেন্দ্র দত্ত, চারু বসু, বসন্ত বিশ্বাস, সুশীল লাহিড়ী, গোপীনাথ, রাজেন্দ্রনাথ, অনন্তহরি, প্রমোদরঞ্জন, যতীন মুখার্জী, চিত্তপ্রিয়, তারিণী মজুমদার, নলিনী বাগচী, নরেন্দ্র, মনোরঞ্জন

প্রভৃতি তাঁহাদের মৃত্যুহীন প্রাণ দেশের মুক্তি কামনায় বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন ; বাংলার তরুণ শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দচরণ কর, মন্মথ গুপ্ত, শচীন বক্সী, রাজকুমার সিংহ, ধ্রুবেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চন্দ, অনন্ত চক্রবর্তী, রাখাল দে, রবীন্দ্র করগুপ্ত, মনোমোহন গুপ্ত, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী, বিন্ধ্যমোহন সান্যাল, উপেন্দ্র ধর প্রভৃতি আজও কারাগারে তিল তিল করিয়া আত্মদান করিতেছেন। বাংলার তরুণ-আন্দোলনের নেতা শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাসবিহারী বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জী, হেরম্ব গুপ্ত প্রমুখ আজও দেশত্যাগী হইয়া মাতৃমন্ত্র সাধনায় ব্যাপৃত আছেন। বাংলার সেই তরুণের সভায় সভাপতির সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আজ বাংলার তরুণদের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রথমেই মনে হইতেছে, একটা বৎসর তো চলিয়া গেল। Astronomical year বা পঞ্জিকার বৎসরের অন্ত হইল। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ৩৬৫ দিন ঘুরিল, কালপ্রবাহে একটা বৎসর অতীত হইল। কিন্তু আমাদের গতির পরিচয় কি? নূতন পুরাতনে কতটুকু নিঃশেষ হইল, পুরাতন নূতনে কতটুকু বাঁচিল? তাহার পরিচয় কি? কাল অনন্ত, ইহার মধ্যে তো রেখাপাত হয় না। কাল-সমুদ্রে রেখা আপনিই মিলাইয়া যায়। এ যেন প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের সীমা নির্দেশ। একই জলরাশির ভিন্ন নাম, কিন্তু কোথায় যে সীমা, বলা কঠিন। পুরাতন নূতন বৎসরে জন্মলাভ করিল। বসন্ত চিরনূতন ও চিরপুরাতন। পুরাতন পাতা ঝরাইয়া নবপল্লবে শোভিত হইয়া পুরাতনই নূতন হইয়া দেখা দিল।

ঋগ্‌বেদে আছে,

উষা যুবতী ও পুরানী।

উষা নবযৌবনসম্পন্না ও অতি বৃদ্ধা। ক্লান্ত দিন রাত্রির অন্ধকারে ডুবিয়া যুবতী উষার মধ্যে নবজন্ম লাভ করিল। তরুণের পেছনে মূলে এ অনন্ত (infinity) ও সম্মুখেও অনন্ত। বারে বারে সে বার্ধক্য বর্জন করিয়া নবীন বসন্তে মুকুলিত হইয়া উঠে। Eternity and ever fresh, যুবতী ও পুরানী। চিরনূতন ও চিরপুরাতন। ইহাই তারুণ্য।

তারুণ্যের ভিতর অনন্তত্বও (eternity) আছে, নূতন শক্তিও আছে। প্রাচীন, সনাতন বলিতে পারে যে, আমিই তো পুনর্নব, পুনরায় নবীন আকারে আবির্ভূত হইলাম। প্রাচীনের উপর নবীনের প্রতিষ্ঠা, আবার নবীনই প্রাচীন

হইয়া যায়। দিন ও রাত্রি একটিই আর একটিকে রূপ দেয়। Eternal বালক মৃত্যুর ভিতর দিয়া eternally fresh—চিরনূতন হইয়া জন্মলাভ করে। পিতাই আবার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। পুরাতন ও নূতন দুই-ই যোগযুক্ত।

পুরাতন বৎসর গিয়া নব-বৎসর আরম্ভ হইল। তরুণ কি কি পুরাতনত্ব —exhausted truth পরিত্যাগ করিয়া নূতনত্ব আনয়ন করিল? এই একটা বৎসরে সে নূতন সৃষ্টি কিছু করিয়াছে কি? কালধর্মানুসারে বৎসরের পরিবর্তন হইল। পশুর মত আমরাও তাহা আপনা হইতেই মানিয়া লইলাম। কিন্তু যৌবনের দাবী ইহাতে আছে কি? যৌবন তাহা নিজের সৃষ্টির গৌরবে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে কি? সেই পরিচয়ও এই বৎসরান্তে চাই।

তন্ত্রে পশ্বাচার ও বীরাচার সাধন-পথ আছে। পশ্বাচার কি? না, পশুর মত সাধনা বিনা আপনা হইতেই বস্তুলাভ করা। Accepting things as they come taking lying down. যেমন স্বাধীনতা আপনি পাওয়া পশ্বাচার, নিজের ত্যাগের দ্বারা সাধনা দ্বারা পাওয়া বীরাচার। জন্মের পর প্রকৃতির নিয়মানুসারে সময়মতই যৌবন আসে। মানুষেরও আসে, পশুরও আসে। পশু-ধর্মানুসারে সকলেরই আসে। ইহাই পশ্বাচার। ইহা তো সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত যৌবন নয়। মানুষের মহিমা হয় তাহাতে, যদি নিজে কিছু সৃষ্টি করে। কালধর্মের দয়ায় প্রাপ্ত যৌবন আবার কালধর্মানুসারেই লুপ্ত হইবে। কিন্তু নিজের সৃষ্টিই থাকে। যৌবন বয়সের দ্বারা নিরূপিত হয় না। বিশেষ কয়েকটা বৎসরের ব্যক্তি মাত্রেই যুবক নয়। আবার পলিতকেশ লোলচর্ম হইলেই বৃদ্ধ হয় না। মনু বলেন, চুল পাকিলেই বৃদ্ধ হয় না, জ্ঞান হইলেই হয়। এই জ্ঞানচুল পাকা আপনা হইতেই হয় না। উপার্জন করিতে হয়।

নূতন সৃষ্টি-শক্তিই যৌবন। ইহা তপস্যা-সাধ্য। শুইয়া থাকিয়া কেবল অপেক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। ভক্তকবি রবিদাস বলেন,

নিত প্রভাত ভব তিমির ছুটে,
অন্তর তিমির ছুটত নাহি,
সত্যরূপ প্রেমরূপ রবি
পেটহ অন্তর মাহি।

এ তো প্রকৃতির প্রভাত। এ তো আমার নয়। এই উৎসব প্রকৃতির কালধর্মানুসারে প্রভাত হইয়াছে। আমার প্রভাত হউক, তবেই আমার উৎসব সার্থক হইবে।

সাধকেরা বলেন, সিংহ অন্যের শিকার খায় না, শৃগালে খায়। বীর যে, সে নিজে স্বীয় শক্তি দ্বারা অর্জন করে, নিজে সৃষ্টি করে। বীর পরকৃত ফল গ্রহণ করে না। কালধর্মানুসারে কয়েক বৎসরের যৌবন, এ তো প্রকৃতির উচ্ছিষ্ট। ইহা পশ্বাচার। Passivity সিংহধর্ম নয়। বীরের ধর্ম নিজেকে বিসর্জন করিয়া সেই ত্যাগের শক্তিতে সিদ্ধিলাভ করা।

বাংলাদেশে যৌবনের পূজা নূতন নয়। বাংলার বাউল মত—এই কৈশোরকে ধ্যানে উপলব্ধি করা, উপাসনা করা, তাহার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করা। ভারতবর্ষের সমস্ত দেবতাই তরুণ। গ্রীকদের সমস্ত দেবতাই বৃদ্ধ। আমাদের হইল "বয়ঃ কৈশোরকম বয়ঃ", দেবতার মূর্তি তৈয়ারীর আদর্শও এই যৌবন। দেবতা সদা আনন্দময়। ঈষদ্‌হাস্য বিশুদ্ধতা। Chastened by a smilc. আমরা কোনদিনই বার্ধক্যের উপাসক ছিলাম না। আমাদের দেশ চিরদিন তরুণের, যৌবনের উপাসক। কৃষ্ণ ও রাধিকা কিশোরমূর্তি। দুর্গামূর্তিও নবযৌবনসম্পন্না। দুর্গা কখনও বৃদ্ধা হন না।

বীরের ধর্ম, যৌবনেরই ধর্ম, তাহা সৃষ্টির ধর্ম। ভক্ত-কবি রজ্জব বলেন—

শুর বিনা সংসারকো
বিরচ্যা কঠিন যায়
রজ্জব কায়রো কোটি মিলি
বাহার ধরে ন পায়।

শুর বিনা, বীর বিনা এই সংসার বিরচনা হয় না। ভীরু কাপুরুষ নিজের limitation-এর গণ্ডীর বাইরে এক পাও যায় না, যেমন orthodox-রা নিজের গণ্ডীর বাইরে যায় না। কিন্তু বীর যে সে গণ্ডী হাঁটিয়া বাহিরে যাইতে পারে। বীর আদর্শের জন্য বাইরে যায়, প্রাণও দেয়।

মরণে মাহি জীবনা
জীবনমে জী নাহি
রজ্জব ভাবমে জীবন ত্যাজ
জীবৎহি মর যাহি।

মরণের মধ্যেই জীবন, বাঁচার মধ্যে জীবন নাই। হে রজ্জব, ভাবের জন্য জীবন ত্যাগ কর। জীবৎহি মর যাহি। বাঁচিয়াই মরিয়া যাও। নূতন ভাবের মধ্যে জীবন লাভ কর। জীবিত অবস্থায়ই মরণ বরণ করিয়া নবজন্মলাভ, ইহাই

তারুণ্য ধর্ম। কামারের হাপর ফোঁস-ফোঁস করে। সে শ্বাস ফেলিলেও তাহাকে কেহ জীবিত বলে না।

সত্যকে খর্ব করিলে সত্য আর থাকে না—তাই তরুণ সত্যের পূর্ণতাকেই রূপ দিতে চায়। আমাদের জীবনেও সত্যের পূর্ণ অপরিহার্য রূপকে উপলব্ধি করিতে চাই। যাহাকে বলি সনাতন সেই সনাতন সত্যই নূতন করিয়া আমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, নূতন ব্যঞ্জনা ও নূতন সৌন্দর্য লাভ করে। নূতনের প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা যাহাই থাকুক, প্রকাশের মূলে রহিয়াছে সত্যেরই পূর্ণরূপ। আমাদের জাতীয় কবি তাই বলিতে পারেন, 'নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন।'

তরুণের ধর্মই বীরের ধর্ম। এই নবসৃষ্টির জন্য চাই revolution in all spheres of life, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটন। রাজা ও প্রজা, ব্যক্তি ও সমাজ, নর ও নারী সম্পর্কে প্রচলিত ব্যবস্থার যথাসম্ভব আমূল পরিবর্তন সাধন চেষ্টাই বিপ্লবীর কাজ। আজ দিকে দিকে বিপ্লবীর মুখে প্রলয়ের শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। বিপ্লবী তরুণ, তোমার তরুণ বন্ধুকে বল, তুমি তরুণ, পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া নবসৃষ্টির প্রেরণা তোমার অন্তরে আসুক। সংসারের প্রলোভনে আবদ্ধ না হইয়া দিকে দিকে বিপ্লবের বার্তা ঘোষণা যে তোমারই কাজ। চাষীর অন্তরে আজ এই প্রশ্ন জাগাও, আমরা পুরুষানুক্রমে বন-জঙ্গল কাটিয়া, সর্প ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়া, তিলে তিলে নিজের রক্ত দিয়া যে ভূমিকে উর্বরা করিয়াছি, শস্যশালিনী করিয়াছি, এই জমির প্রকৃত মালিক কে? শ্রমিকের মনে আজ এই প্রশ্ন জাগাও, আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কঠোর পরিশ্রমে আমার মুখে রক্ত উঠিয়া আমারই পরিশ্রমে উৎপন্ন যে বিপুল ধনরাশি, ইহার প্রকৃত মালিক কে? নারীর অন্তরে আজ এই প্রশ্ন জাগাও, আমরা সর্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ হইয়াও আজ সর্ববিষয়েই তার অধীন কেন? নির্যাতিতকে ডাকিয়া বল, তোমার সংখ্যা অগণিত, তুমি আর নির্যাতন সহিবে না বলিয়া দৃঢ়-সংকল্প হইলে পৃথিবীর কোন শক্তিই আর তোমাকে নির্যাতন করিতে সাহসী হইবে না।

ভারতবর্ষে শুধু শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হইবে না। সর্বক্ষেত্রে মহাপরিবর্তন সাধিত হইবে। শুধু বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও ঘটিবে। ফরাসী-বিপ্লব ও রুশ-বিপ্লব যেমন শুধু একটা বিদ্রোহ মাত্র নয়, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় একটা নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে; তেমনি ভারতবর্ষেও মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়া মানুষের মঙ্গলকর নূতন ব্যবস্থার প্রণয়ন হইবে।

আজ এদেশে বৈদেশিক শাসন-ব্যবস্থা আছে বলিয়াই যে তাহার পরিবর্তন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, শুধু তাহাই নয়। আজ যদি মুসলমান, মারাঠী, রাজপুত অথবা শিখ রাজত্বও থাকিত তাহা হইলেও রাষ্ট্র-বিপ্লব আজ অনিবার্য হইয়া উঠিত। এমন কি আজ যদি ইংলণ্ড, আমেরিকা বা ফ্রান্সের মত প্রতিনিধিমূলক স্বদেশী শাসন-ব্যবস্থাও থাকিত তবুও এদেশে আজ বিপ্লবের দেবতা বজ্রহস্তে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইতেন। স্বদেশী রাজা হইলেও তাহার একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ বহুকাল হইল অবসান হইয়াছে। প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায়ও যে সাধারণের দুঃখের অন্ত হয় না তাহা আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের ক্রমোন্নতির ধারায় শেষ কথা (last word) কিছুই নাই। আজ যাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এযুগের তরুণ বদ্ধপরিকর হইতেছে, তাহারই ধ্বংস সাধনের জন্য আগামী-কালের তরুণ এমনি করিয়াই বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইবে। এমন যে বলশেভিক ব্যবস্থা, ইহার বিরুদ্ধেও ভাবী-কালে—white বা reactionary revolution নয়—ভালর দিকেই, মানুষের মঙ্গলের জন্যই বিদ্রোহ অনিবার্য হইয়া উঠিবে। প্রত্যেক সমাজগঠন প্রণালীর ধ্বংসের বীজ ইহার সঙ্গেই থাকে।

Soviet শাসন-ব্যবস্থায় State-এর অসীম ক্ষমতা, মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের সকল দিকের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতাই ইহার বিরুদ্ধে মানুষকে একদিন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবে। Soviet system অবশ্য পৃথিবীর আর সব প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা হইতে ভাল। ইহা মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় one step forward. সর্বাপেক্ষা অগ্রসর, উন্নত ব্যবস্থা। কিন্তু ইহার মধ্যে জবরদস্তিটুকু রহিয়া গিয়াছে, তাহাই ইহাকে ধ্বংসের পথে একদিন লইয়া যাইবে। মানুষকে জোর করিয়া ভাল পথে লইয়া গেলে—স্বর্গে লইয়া গেলেও স্বর্গের অধীনতাই একদিন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিবে!

আজিকার দিনে পৃথিবীতে জনসাধারণ বাঁচিবার অধিকার, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার (right to exist) ঘোষণা করিতেছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠাই আজ পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের মূল কথা। আকাশ, জল, বায়ু, ভূমি, সম্পত্তিতে সকলের সমান অধিকার। কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারিবে না, নিজেও কিছু হইতে বঞ্চিত হইবে না। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মানুষে মানুষে বৈষম্য, সকল বৈষম্যের আমূল পরিবর্তনই বিপ্লব। ভারতের বাঁচিবার আন্দোলন সুরু হইয়াছে, তাই মরিতে তাহার পরোয়া নাই।

মহাত্মা গান্ধীর লবণ-আইন অমান্যের ভিতরেও এই মুক্তির বাণীই ধ্বনিত হইতেছে, মানুষের বাঁচিবার অধিকার ঘোষিত হইতেছে। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না, এই কথাই লবণ-আইন অমান্যের মর্মকথা।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা লাভ যে শুধু লবণ-আইন অমান্য আন্দোলনে সফলতা লাভের উপরই নির্ভর করে, এমন কথা কেহই বলিবে না। মহাত্মা গান্ধীও ইহার পরে অনেকগুলি steps-এর কথা বলিয়াছেন। একথা সকলেই জানেন যে, পুলিস স্টেশনে পুলিস থাকিবে, ব্যারাকে, কেণ্টনমেণ্টে ও কিল্লায় ব্রিটিশ-সৈন্য নির্বিবাদে অবস্থান করিবে, বড়লাট, ছোটলাট হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট ও দারোগা পর্যন্ত নিরুপদ্রবে দেশ শাসন করিবে, ইংরেজের আদালতে justice বিতরণ কার্য চলিবে আর আমরা স্বাধীন হইয়া যাইব, এমন হাস্যকর কল্পনাও বোধ হয় কেহ করেন না। মহাত্মা গান্ধীর কার্যপ্রণালীর মধ্যে উপরোক্ত স্থান হইতে বিদেশীর অপসারণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। প্রয়োজনমতই মহাত্মা সেই নির্দেশ করিবেন, ইহাই সম্ভব।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংসপথে স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা জগতে অভিনব। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশে অহিংসপথে স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হয় নাই। একমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা সর্বদেশে সবকালে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইয়াছে। দেবতাদের শক্তির মন্ত্রবলে স্বর্গরাজ্য অসুরের কবল হইতে উদ্ধার এই কল্পনা প্রাচীন শাস্ত্রকারগণও করেন নাই। রীতিমত সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারাই স্বর্গরাজ্য উদ্ধার সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু মহাত্মা আজ এক নূতন আদর্শ সকলের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ ভারতবর্ষে অসম্ভব বলিয়াই মহাত্মার অহিংস পন্থা অবলম্বন করা কর্তব্য। কিন্তু এই যুক্তির ভিত্তি কিছুই নাই। অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতবর্ষেও তেমনি সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব। যে সংঘবদ্ধতা, ঐকান্তিকতা, দৃঢ়সংকল্প ও রাজনীতিজ্ঞান থাকিলে সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব হয়, এদেশের লোকের সেই সমস্ত গুণ অর্জন করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য পৃথিবীর আর সমস্ত মুক্তি-প্রয়াসী জাতি যেভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল এদেশের বিপ্লবীদের পক্ষেও তাহা অসম্ভব নয়। যে পররাষ্ট্র নীতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকিলে অপর বৈদেশিক শক্তি আসিয়া স্বাধীনতা-প্রয়াসী জাতিকে সাহায্য করে সেই জ্ঞান ও দক্ষতা ভারতীয় বিপ্লবীর নাই বা কখনও

জন্মিবে না, এইরূপ ধারণা করিবার কি যুক্তি আছে? পৃথিবীর অন্য দেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে এদেশেও তাহা সম্ভব। কিন্তু মহাত্মার অহিংসপথে যদি স্বাধীনতালাভ সম্ভব হয়, তবে সশস্ত্র বিদ্রোহের আনুষঙ্গিক বিদেশীয় ও স্বদেশীয় জনগণের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত হইবে না। পৃথিবীতে এক নূতন আদর্শ স্থাপিত হইবে।

কিন্তু নীতি-দুর্নীতির কথা নহে। বড় কথাই আছে। বর্তমান অহিংস আইন অমান্যের বড় কথাই হইল mass action. একথা সত্য, একটা জাতির অপর একটা জাতির শাসন ও শোষণ-বন্ধন ছিন্ন করিতে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের অস্ত্র প্রয়োগ যথেষ্ট নহে। অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাহা লাভ করিতে হইলেও চাই mass action. আর এই অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে চাই mass action-ই। অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পরিবর্তন করিতে চাহিলেই কিন্তু তাহা অমনি হইবার নহে। তারপর বর্তমানকেও অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশবাসীর শক্তির সম্ভাবনা যতই থাকুক বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগাইতে, বিদেশী শাসনের উপর অনাস্থা জানাইতে, বিদেশী শাসনের ভীতি ভাঙ্গিতে, বর্তমান ভারতে মহাত্মার প্রবর্তিত অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। একথা সত্য, জনসাধারণ সংঘবদ্ধ হইয়া যদি স্বাধীনতা চাহে, স্বাধীনতার জন্য যদি ব্যাপক আইন অমান্য করিতে চাহে, তবে স্বাধীনতা লাভের শক্তি অর্জনের অধিক বাকি থাকে না। Mass যদি action-এর জন্যই দাঁড়ায় তবে স্বাধীনতা লাভ অদূরবর্তী হয়। বর্তমান ভারতে তাই এই অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন শ্রেষ্ঠ আন্দোলন, কারণ mass action-এর এতবড় অনুকূল আন্দোলন আর কিছুই নাই। এই আইন অমান্য পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনেরই প্রথম ধাপ বলিয়া—ইহা যুবকদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থনযোগ্য। ইহাকে অনন্যচিত্ত হইয়া সফল করিতে হইবে। ত্রিশ কোটি লোকের ত্রিশ লক্ষ লোকও যদি অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হইয়াই মৃত্যুপণ করিয়া স্বাধীনতা চায়, সে জাতির স্বাধীনতা কেহ ঠেকাইতে পারে না।

কতিপয় অহিংসাবাদী যাহাই বলুন না কেন সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ দুর্নীতি নয়, পাপ নয়, গ্রহণের অযোগ্যও নয়। সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতা লাভ আজ পর্যন্ত ইতিহাসে একমাত্র কার্যকরী পন্থা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আজ যদি সেই পথে স্বাধীনতা লাভ-

এখনই practical হইত, তবুও সমগ্র জাতি কাহারও নীতির খেয়াল চরিতার্থ কারবার জন্য সেই কার্যকরী পন্থা অবলম্বন যদি না করিত তবে সেই জাতির দুঃখ কখনও ঘুচিবার নহে। জাতির সর্বদুঃখের মূল কারণ পরাধীনতা দূর করিবার পথে নীতিশাস্ত্রের কোন সূত্রই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্যই এই কথাগুলি বলিতে হইল।

আজ মহাত্মা-নির্দিষ্ট অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতি অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে কৃতকার্য হইলে ভারতবর্ষ জগতে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিবে। কিন্তু এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যদি দেখা যায় যে, এপথে অভীষ্ট লাভ সম্ভব নয়, তবে পন্থা পরিবর্তন অবশ্যই করিতে হইবে। সেই জন্য জাতির মন প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। যাহারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা লইয়া পথে চলিতেছে তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু, ইহাই তাহাদের পণ। যে পথে, যেভাবেই হউক তাহারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেই। বিশেষ শাস্ত্রসম্মত পন্থায় স্বাধীনতা লাভ হইল না বলিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সুখে-সচ্ছন্দে ঘর-সংসার করিতে থাকিবে না। স্বাধীনতালাভ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিপথযাত্রী আর ফিরিতে পারে না।

এই কথাটা আজ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ আর terrorism (বিভীষিকা পন্থা) এক নয়। Terrorism দ্বারা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কোথাও স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয় নাই ; বিশেষতঃ যেখানে একটা জাতি আর একটা জাতির উপর রাজত্ব করিতেছে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের মৃত্যুতে বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এই দেশ পরিত্যাগ করিবে এমন কল্পনা সম্ভবত কেহই করেন না। এমন কি ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ যদি আজ নিহত হন তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে না। এখানে একটা জাতির প্রতিনিধিগণ রাজত্ব করিতেছে, তাহারাই আবার ভারতবর্ষের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা চালাইতেছে। জাতির জাগরণের প্রথম অবস্থায় জাতির ভয় ভাঙ্গিবার জন্য, সহস্রপ্রকারে নির্যাতিত হইয়া দুর্বল জাতিও কিছু করিতে পারে এবং আমাদের শতাধিক লোক হত হইলেও আমরা অন্ততঃ একজন বিপক্ষকেও নিহত করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারি এইরূপ বিশ্বাস মুক্তি-সৈনিকের প্রাণে জাগ্রত করিবার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে terrorism-এর কিছু প্রয়োজন হয়ত থাকিতেও পারে। কিন্তু terroristic পন্থা সর্বদা অনুসরণ করিলে জাতি

চরম মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। প্রস্তুত হওয়ার মধ্যপথেই মুক্তি-প্রচেষ্টা ধ্বংস করিবার সুবিধা বিপক্ষদলই পায়।

স্বাধীনতা লাভের জন্য চাই জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা এবং দৃঢ়-সংকল্প, নির্ভীক, তেজস্বী ও আত্মত্যাগী যুবক-গণকে লইয়া দল গঠন। কেহ কেহ মনে করেন, কেবল mass movement দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ করিব, আবার কেহ কেহ মনে করেন, শুধু একদল স্কুল-কলেজের ছাত্র লইয়া দলবদ্ধ হইতে পারিলেই স্বাধীনতা লাভ হইবে। কিন্তু এই দুই-এর সামঞ্জস্য ছাড়া স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয়। কর্মিগণকে বুঝিতে হইবে যে, সকলের মুক্তির জন্যই তাহারা আত্ম-বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে ; আর জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে যে, তাহাদের জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে canan fodder রূপে কামানের মুখে বলি-প্রদত্ত হইবার জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে না।

হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর যুবকগণকেই যুব-আন্দোলনে যোগদান করিয়া মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান করিতেছি। সাম্প্রদায়িক চেতনা বর্জন করিয়া ভারতবাসীর চেতনায় তাঁহারা উদ্বুদ্ধ হউন! আজ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুরাই বেশীর ভাগ যোগদান করিতেছে, এই আন্দোলনে অল্প-সংখ্যক মুসলমানকে মাত্র দেখা যায়। মুসলমান ও তথাকথিত নিপীড়িত শ্রেণীর হিন্দু যুবকগণকে একটা বিষয়ে সতর্ক করিতেছি। মুসলমানগণ হিন্দুর উপর এবং নিপীড়িত শ্রেণীর যুবকগণ তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর উপর রাগ করিয়া জাতির মুক্তি-সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিলে চলিবে না। ইহাতে ক্ষতি সকলেরই হইবে। একটা কথা তাঁহারা মনে রাখিবেন যাঁহাদের রক্তদানে স্বাধীনতা অর্জিত হইবে ক্ষমতা তাঁহাদের হাতেই প্রথমে আসিবে। যুদ্ধের অবসানে সন্ধি হয় উভয় পক্ষের নেতৃবর্গের সঙ্গে, তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হয় না। আজ মহাত্মা জয়ী হইলে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা হইবে মহাত্মার, সাপ্রু বা সফীকে কেহ ডাকিবে না।

আজ যদি বিপ্লবীদের বুকের রক্তদানে বিদেশী পরাজিত হয় তবে সন্ধির আলোচনা হইবে বিপ্লবী নেতা ও বিদেশী সরকারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, কে কোথায় আপন সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া চেঁচামেচি করিতেছে তাহা কেহ লক্ষ্যও করিবে না। তাই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের যুবকগণকে আপন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া জাতির মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করিতে আহ্বান

করিতেছি। এই সংগ্রামে যাঁহারা যোগদান করিবেন না তাঁহারা শুধু দেশের নয়, আপন সম্প্রদায়েরও অনিষ্ট সাধন করিবেন।

আবার বলি, ভারতে মুক্তি-সংগ্রাম শুধু বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব। ইহ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব আনিয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভারতীয় সভ্যতার মূলতত্ত্ব। সকল মত ও পথকে উদার দৃষ্টিতে দেখিয়া ভারতবর্ষ চিরকাল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জয় ঘোষণা করিয়াছে। বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়া নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যেই, বহুর মধ্যেই একের উপলব্ধি ভারতের সাধনা; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য—individual freedom বজায় রাখিয়া সমাজের হিতার্থে পরহিতে আত্মবিসর্জন ইহাই ভারতের বাণী। ভবিষ্যৎ ভারত ব্যক্তির voluntary co-operation—স্বেচ্ছাবৃত সহযোগিতা সমাজ গঠনের ভিত্তি হইবে। রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার ব্যবস্থার মূলে থাকিবে voluntary co-operation—স্বেচ্ছাবৃত সহযোগিতা। কোন ব্যক্তি-বিশেষের, শ্রেণী-বিশেষের কাহারও জবরদস্তি চলিবে না। Organisation—সংঘ মাত্রই তাহা রাষ্ট্র, সমাজ যাহাই হউক না কেন তাহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য খর্ব করিয়া ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের পথ রুদ্ধ করিতে পারে। তাই সর্বপ্রকার organisation-এর ভিত্তি হইবে voluntary co-operation—স্বেচ্ছাবৃত সহযোগিতা। A free citizen in a free country—স্বাধীন দেশে স্বাধীন মানুষ ইহাই আদর্শ।

ব্যক্তি সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করিবে ইহাই বীরের ধর্ম। তাই ভক্ত কবি বলেন—

অরে মন সবহি বন্ধন ত্যাগ,
মোচন মন্ত্র সমঝি উর অন্দর
পুরন দীক্ষা মাগ,
অনন্ত অপার রস করলে অনুভব,
বন্ধন সবসে দান।

সমস্ত বন্ধন দগ্ধ কর। সমস্ত বন্ধনে আগুন ধরাও, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বিধিনিষেধে আগুন ধরাও। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বপ্রকার বন্ধনে প্রলয়ের আগুন জ্বালাও। যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা দ্বারা নিজেকে ক্ষুদ্র করিয়াছ সেই ক্ষুদ্রতায় আগুন ধরাও। নূতন সৃষ্টির জন্য নিজকে আহুতি দাও।

সেই ভস্মস্তূপের মধ্য হইতে মুক্ত স্বাধীন মানুষ মানবতার পূর্ণ মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।*

বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবিত মীমাংসার অজ্ঞাত অধ্যায়

সময়টা তখন ১৯৩১ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি। গান্ধীজী লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের জেলগুলি তখন রাজ-বন্দী, বিচারাধীন এবং দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীতে ভরপুর। একমাত্র বক্সা ক্যাম্পেই আমি সহ দেড়শএরও বেশী বিপ্লবী আবদ্ধ ছিলাম। দেশের নানা দিক থেকেই বিপ্লবী বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন যদিও গোল-টেবিল বৈঠকের জন্য সাময়িকভাবে মুলতুবি ছিল, তবু কংগ্রেসও একেবারে চুপ করে বসে ছিল না।

তখন দুপুর। আমি পড়াশুনায় ব্যস্ত। এমনি সময় ক্যাম্পের সেনানায়ক ফিনে (Finnay) সাহেবের আরদালি আমার হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে দিল। তাতে লেখা ছিল, দয়া করে এখনি একবার আমার সাথে দেখা করতে পারবেন কী? কেন এই অনুরোধ তার কোন কারণ অনুমান করতে পারলাম না বা অনুমান করতে চেষ্টাও করলাম না। প্রয়োজনও ছিল না। কেননা যে অসংখ্য কারণে এমনি অনুরোধ আসে, বর্তমানে তার যে কোনও একটা হতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ না করে আমি ওঁর অফিসে গেলাম। উনি আমায় দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে ইঙ্গিতে ওঁকে অনুসরণ করতে বলে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমরা জেল-ফটকের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। না, কেউ তো আমাদের অনুসরণ করছে না। কোন বাক্যালাপ নেই, নেই কোন পিছু নেয়ার লোক। এ যে একেবারে আজীব ব্যাপার! একবার মনে হলো ওরা বোধহয় আমাকে অন্য জেলে বদলি করবে। কারণ, অনেক সময় এভাবে বন্দীদের বদলি করত হৈ-চৈ এড়াতে।

অল্প সময়ের মধ্যেই জেল-ফটক পার হলাম। সামনেই ছিল একটা ফুটবল মাঠ। সেটাও পার হয়ে প্রবেশ করলাম ফিনে সাহেবের বাংলোর চৌহদ্দির

* এপ্রিল ১৯৩০-এ নিখিল-বঙ্গ যুব-সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির (লেখকের) অভিভাষণ।

মধ্যে। এক্ষণে আমি সত্যই অবাক হতে শুরু করেছি। ফিনে সাহেবও পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন—এবার কিন্তু সত্যই আপনি বিস্মিত হবেন। সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। ওঁর বাংলো-বাড়িটা ছায়া-ঘন। সেই বাংলোর একটা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্ত মশাই আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক্।

অভিবাদনের পালা শেষ হলে তিনি জানালেন যে, এইমাত্র কয়েকদিন পূর্বেই তিনি দিল্লী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এবং সেখান থেকেই কলকাতা হয়ে এসেছেন এখানে আমাদের সাথে দেখা করতে। উদ্দেশ্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

ফিনে সাহেব ঘর ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। যাওয়ার আগে আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে, আমাদের কথাবার্তা কেউ ওত পেতে শুনবে না বা কোন পুলিসের লোকও আমাদের খবরদারি করবে না।

সেনগুপ্ত মশাই তখনকার দিনের রাজনৈতিক অবস্থা সমীক্ষা করে যা বললেন তার মর্মার্থ হ'ল এই যে, আমাদের বিপ্লবী কাজকর্মের ফলে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এবং ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার মোকাবিলা করতে সরকার অসমর্থ। ব্রিটিশ সরকারেরও ধারণা, যদি এ অবস্থার অবসানকল্পে কোন সূত্র আশু খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে ঘোরতর সঙ্কট সৃষ্টি হবে।

দেশের নেতারাও তখন রাজনৈতিক জট ছাড়াবার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এদিকে গান্ধীজীও আমাদের বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটু শংকিত ছিলেন। অর্থাৎ যদি লণ্ডনের গোল-টেবিল বৈঠকে কোন মীমাংসা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় তবে তার বাস্তব রূপায়ণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বৈপ্লবিক কাজকর্ম বন্ধ রাখতে প্রস্তুত আছি কিনা। এমনি পরিস্থিতিতে কোন কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সরকার নিজেই সেনগুপ্ত মশাইকে বার বার অনুরোধ করছিলেন যদি তিনি আমাদের বিপ্লবী ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা যোগাযোগের সূত্র বার করতে পারেন। অর্থাৎ, যদি ব্রিটিশ সরকার কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আমাদের কাছে পেশ করেন তবে আমরা তাতে সাড়া দিতে রাজী আছি কিনা।

দেশের স্বার্থই আমাদের একমাত্র কাম্য। সুতরাং এ জাতীয় প্রস্তাব বিবেচনা করাটা আমি যুক্তিসংগত বলেই মনে করলাম। বিষয়টি অতীব

গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা দুজনেই একমত হলাম যে, অন্যান্য নেতাদের সঙ্গেও এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং অবিলম্বে অনুশীলন, যুগান্তর এবং অন্যান্য দল-উপদলের প্রায় সাত-আটজন নেতার সঙ্গে আলোচনার জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করা হ'ল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে, একটা বিষয়ে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা কোন চাপপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সরকারের সঙ্গে আপস-মীমাংসায় বসতে রাজী নই। অর্থাৎ আমাদের বিনাসর্তে মুক্তি দিতে হবে। তাছাড়া, শ্রীসূর্য সেনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত হুকুমনামা ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী ছিল তাও বিনাসর্তে তুলে নিতে হবে, এবং যদি এই মীমাংসা প্রচেষ্টা কোন কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে তাঁকে (সূর্য সেনকে) তাঁর পূর্বাবস্থায় নিরাপদে ফিরে যেতে দিতে হবে।

যদিও সাম্রাজ্যবাদীদের সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না, তবু আমরা এক নতুন দিগন্তের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে লাগলাম। আমরা আমাদের লক্ষ্য ভাল করেই জানতাম, সুতরাং আমাদের কোনকিছু হারাবার ভয় একেবারেই ছিল না।

অবিলম্বে দল-উপদল যে-যার মত নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে গেলাম। যুগান্তর দল থেকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং অনুশীলন দল থেকে আমি প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলাম। তবে এটা স্থির হয়েছিল যে, আমরা দুজনে সমস্ত বিপ্লবীদের হয়েই কথা বলব, কেবলমাত্র যুগান্তর বা অনুশীলনের প্রতিভূ হিসাবে নয়। এও স্থির হ'ল যে, আলাপ-আলোচনা চলাকালে সে সমস্ত বিষয় সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে না, যা এই মীমাংসা প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশাইকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলাম। আর স্থির হ'ল যে, আমাদের আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে চলবে, এবং আমাদের ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সকল প্রকার পত্রালাপ সিল-মোহর-করা খামের মাধ্যমে করতে হবে।

এ সবই সেদিন অপরাহ্নের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘটিত হয়ে গেল। আমরা সেনগুপ্ত মশাইর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করে তাঁকে বিদায় জানালাম। তিনি বলে গেলেন যে, তিনি এখন দার্জিলিং যাচ্ছেন। সেখানে বাংলার গভর্ণর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন (Sir Stanley Jackson) সাহেবের সঙ্গে দেখা করে

তাঁকে সব কিছু অবহিত করবেন। পরে গান্ধীজীর নির্দেশমত বিলেত যাবেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ফলাফল নিয়ে কথাবার্তা বলবেন।

প্রথম ধাপের অগ্রসর বেশ সন্তোষজনক মনে হ'ল; যদিও এ প্রচেষ্টার ফলাফল সম্পর্কে তেমন আশান্বিত হইনি, তবু আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম তাও বলতে পারি না।

সেনগুপ্ত মশাইর বিদায়ের অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্মানিত হোম মেম্বার স্যার উইলিয়াম প্রেনটিস (Hon. Home Member Sir William Prentice) সাহেবের কাছ থেকে বক্সা ক্যাম্পের সেনানায়কের মাধ্যমে একখান পত্র পেলাম। এই চিঠিতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সবিশেষ নিবদ্ধ হ'ল। প্রথমত, আমাদের মনে হ'ল ফিনে সাহেব এই চিঠির কিছু অদল-বদল করেছেন। দ্বিতীয়ত, চিঠির বিষয়বস্তুও যেন কেমন লাগল। কারণ, চিঠিতে ছিল বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চায় বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা যায় কিনা তার উপায় উদ্ভাবন করতে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব এই যে, বিপ্লবীরা যদি একটা সুস্পষ্ট প্রস্তাব সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারেন তবে তা নিশ্চয় বিবচনা করা যেতে পারে। কারণ, বর্তমানে যে প্রস্তাব তাদের কাছে করা হয়েছে তা একান্ত অস্পষ্ট। সুতরাং আমরা য দ সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করতে পারি তবে সম্মানীয় হোম মেম্বার প্রেন্টিস সাহেব আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এই বক্সা ক্যাম্পেই। উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ সরকার এবং আমাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সভার প্রাথমিক বিষয়গুলি নিয়ে কথাবার্তা বলা। সবিস্ময়ে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ঐ পত্রে শ্রীসূর্য সেন সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই!

আমাদের উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল না। প্রথমেই আমরা প্রতিবাদ জানালাম ফিনে সাহেবের চিঠির অদল-বদল করা নিয়ে। দাবী জানালাম যে, এর পরে সব চিঠিপত্র যেন আমাদের কাছে সরাসরি পাঠানো হয়—ফিনে সাহেবের মধ্যমে নয়। দ্বিতীয়ত, শ্রীসূর্য সেন সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকাতে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করলাম। সর্বোপরি আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা বিপ্লবী, নিজে থেকে কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠাইনি। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশাই আমাদের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ

করেছিলেন, যেন আমরা এমনি কোন আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজী হই। তাঁর এই অনুরোধের ফলেই আমরা এবম্বিধ আলোচনার কথা ভেবে দেখতে রাজী হয়েছিলাম যদি বাংলার বিপ্লবীদের, কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের, কিংবা সাংবিধানিক বিষয়ের উন্নতি করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং, আমরা বিপ্লবীরা কোন প্রস্তাব নিয়ে সরকারের দ্বারস্থ হইনি যা মহামান্য ব্রিটিশ সরকার বাহাদুর সুবিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ করলাম যে, আমরা ব্যক্তিগতভাবে কেউই মুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত নই। শুধু এবম্বিধ আলোচনার রীতি অনুসারেই আমরা আমাদের মুক্তির কথা উল্লেখ করেছিলাম। কেননা, বন্দী এবং তার প্রভু এ দুয়ের মধ্যে আলোচনা কখনও মুক্ত হতে পারে না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সরকার একটা মর্যাদার ভিত্তি স্থাপন করতে চাইছিলেন। অর্থাৎ, একটা লিখিত প্রমাণের সৃষ্টি করতে চাইছিলেন যা থেকে তাঁরা বলতে পারতেন যে, বাংলাদেশের বিপ্লবীদের কাছ থেকে আপসের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেয়েই ব্রিটিশ সরকার তা সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করতে রাজী হয়েছেন। সুতরাং, আমরা চিঠিতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলাম যে, আমাদের পক্ষে এমনি মিথ্যা মর্যাদাকে মেনে নেয়া সম্ভব হবে না। এ চিঠির কোন উত্তর আমরা পাইনি, অবশ্য প্রত্যাশাও করিনি। সেনগুপ্ত মশাই যে প্রচেষ্টা সুন্দরভাবে শুরু করেছিলেন সেই প্রস্তাবিত মীমাংসার আলোচনা এমনিভাবেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল।*

বিঃ দ্রঃ যে সমস্ত কাগজপত্রে আমি এবং শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় দস্তখত করেছিলাম, এবং যে চিঠি আমরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম তার সব প্রতিলিপি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর নিকট পেশ করা হয়েছে।

স্বাঃ—প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

* মূল রচনা ইংরেজিতে। অনুবাদ—পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিবর্তন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও (১৯১৪-১৮) কারাগারে ছিলাম, বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের সময়ও আছি। আজ পৃথিবীব্যাপী মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলেছে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পরস্পরকে ধ্বংস করতে নিজ নিজ দেশের নির্যাতিত, শোষিত জনগণকে শত্রুর কামানের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ফ্যাসিস্ট হিটলার ও মুসোলিনী পৃথিবী শোষণের অধিকার দখল করতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও আমেরিকার সঙ্গে মরণ আহবে মেতেছে।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের শত্রু সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট রাশিয়া বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত, শোষিত জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অস্তিত্বই বিশ্বের শ্রমিক ও কৃষকের প্রাণে আশার সঞ্চার করে। ঠিক সেই কারণেই রাজ্যলোভী এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছেন।

হিটলার ও মুসোলিনী হলেন গিয়ে ফ্যাসিবাদের নেতা। ফ্যাসিবাদ শ্রমিক কৃষকের শত্রু, এবং বিশ্বের যা-কিছু ভাল তার বিরোধী। ন্যায়, সত্য, ধর্ম বলে কিছু ফ্যাসিবাদের অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা, শোষণ, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা এবং জনসাধারণকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করা, এ সবই যে ফ্যাসিবাদের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং, ফ্যাসিবাদের ধ্বংস সাধনই সমস্ত স্বাধীনতাকামীর কর্তব্য। হিটলার ও মুসোলিনীর পরাজয়ে বিশ্বের মঙ্গল।

সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। এ দুই-ই এক। ফ্যাসিবাদকে বলা চলে সাম্রাজ্যবাদেরই নগ্ন, জঘন্য বাস্তব রূপ। যেমন ফ্যাসিবাদ, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অবসানেই নির্যাতিত, শোষিত জনগণের মুক্তি।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং আমেরিকা সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে চায় কিনা এ বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহ জেগেছে। সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদী শক্তির সহজাত-দ্বন্দ্বের ফলেই একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এর মধ্যেই আজ একদল নিতান্ত সাময়িক প্রয়োজনে সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক্‌জোট হয়েছে।

প্রতিদিনই রাশিয়ায় জার্মানীর অগ্রগতির সংবাদ আসছে। মস্কোর পতন আসন্ন। সমস্ত ইউরোপে হিটলারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া,

রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস প্রভৃতি সব দেশ হিটলারের পদানত। বাকীরাও তাঁর করতলগত।

প্রাচ্যে জাপান যুদ্ধোন্মুখ হয়েছে। কোন্‌দিকে আক্রমণ করবে বোঝা যাচ্ছে না। বাংলার স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন সবাইকে ডেকে বলছেন যে, বাংলা-দেশের বিপদ অত্যাসন্ন ; কলকাতায় শত্রুর বিমান-আক্রমণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন সংকটজনক এবং ফলাফল অনিশ্চিত, তখন একটা কথা আশ্চর্য হয়ে ভাবছি। গত যুদ্ধে (১৯১৪-১৮) রাজবন্দীরা ভাবত ইংরেজের পরাজয় হোক এবং জার্মানী জয়লাভ করুক। এবার কিন্তু আমাদের কামনা—জার্মানীর পরাজয় এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংস। সাথে সাথে শ্রমিক-কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা। আমরা জানি, জার্মানীর জয় বা পরাজয়, অথবা ইংরেজের জয় বা পরাজয় মাত্রই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বহন করে আনবে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকেই যাবে। অবশ্য জরাগ্রস্ত দুর্বল ইংরেজ পরাজিত হলে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে জয়োল্লাসে উন্মত্ত প্রবল-প্রতাপী জার্মানীর কঠোর শাসন। জার্মানীর সঙ্গে আমরা ঘর করিনি। সে আমাদের কাছে অজ্ঞাত শয়তান। সুতরাং সেই বিখ্যাত প্রবাদ স্মরণ করে ভাবি, ইংরেজ আমাদের জানা শত্রু এবং তুলনায় গ্রাহ্য। অবশ্য দেশে এমন অযৌক্তিক ইংরেজ-বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদী হয়ত আছে যারা চায় যে-ই আসুক না কেন, ইংরেজ যেন যায়। যে কোন পরিবর্তনই এদের কাম্য। এরা যুক্তি-বিচারের ধার ধারে না এবং এমনি চিন্তাধারা যে একান্তই আত্মঘাতী তাতে কোন সন্দেহই নেই।

গত যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় সমগ্র ভারতে একমাত্র বিপ্লবীরাই অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছে। তখন ভারতব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেস ছিল নির্জীব মডারেটদের করতলগত। কংগ্রেস কি করে তা বন্দিশালায় বসে আমাদের গণনার মধ্যেই ছিল না। এজন্যই সেকালে আমরা বাইরের কারও কাছে কিছু আশাই করতাম না। আমাদের পরিকল্পিত উপায় ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের আর কোন উপায়ই ছিল না।

আজ অবশ্য কংগ্রেস একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের সাধারণ স্তরের মধ্যে সংগ্রাম-বিমুখতা নেই। নেতৃত্বের মধ্যে অবশ্য দ্বিধাগ্রস্ত ভাব আছে। কিন্তু তা থাকলেও মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যক্তিগত আন্দোলনের নিষ্ফলতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। তবুও আটটি প্রদেশের মন্ত্রী-পরিষদ গান্ধীজীর আদেশে গদী ছেড়ে কারাবরণ

করলেন। কাজেই আজ কারাগারে বসে কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর কার্য-কলাপ আগ্রহের সঙ্গে খবরের কাগজে পাঠ করি।

এখন কিন্তু আমরা আগের বারের মত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখছি না। তখনকার দিনে দেশব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছে। রিভলবার আর বোমার আক্রমণ প্রায় দৈনিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ কিন্তু দেশে এমন ঘটনা ঘটেও না, ঘটবার সম্ভাবনা আছে বলেও কেউ মনে করে না। আজ আমরা হিংসার পথ অবলম্বন করার কল্পনাও করি না।

বাস্তবিক পক্ষে গত যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় আর এই বারে কত প্রভেদ! এবার এখানে দু-শ'র উপর লোক বিপ্লবী সন্দেহে আবদ্ধ আছে। পরস্পর মেলামেশা অবাধ। খেলা-ধূলা, আমোদ-আহ্লাদ, পড়াশুনায় সময় কেটে যাচ্ছে। কিন্তু একটা প্রশ্ন সকলের মনেই উঁকি দিচ্ছে। কেন এবার জেলে এলাম? কি করেছি? আমরা বাইরে থাকলে সরকারের কি বিপদ ঘটত? আমাদের সাধ্যই বা কি ছিল? এমন অনেকে এসেছেন যাঁরা মধ্যপন্থী রাজ-নীতিও করেননি। ক্রমশ ঘর বাঁধছিলেন। পুরোপুরি গৃহী হওয়ার আর বাকী ছিল না। বিপ্লবীদের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় ছিল মাত্র। তাই এবার কারা-গারে। বাইরে এমন কিছুই ঘটছে না বা ঘটবার উপক্রম হয়নি যা সকলের মন সজীব রাখতে পারে। হৃদয় আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে। কেউ বা ভাবছি, হঠাৎ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু ঘটে যায়? ইংরেজ পরাজিত হলে সাম্রাজ্য ছত্র-ভঙ্গ হয়ে যাবে। তখন যদি আপনা থেকেই কিছু সুবিধা এসে যায়? কেউ বা ভাবছে আমাদের কিছু হোক না হোক, দেড়শ' বছরের উপর যারা প্রভুত্ব করে আসছে তাদের ধ্বংস হলেই মঙ্গল। কিন্তু ইংরেজ যুদ্ধে হেরে গেলে যে ভারত স্বাধীন হবে না, এও নিশ্চিত। নিজেদের চেষ্টায় সদর্থক কোন কিছু করায়ত্ত করার কথা কিন্তু প্রায় কেউ ভাবে না। সকলের মুখ-চোখ ম্লান দীপ্তিহীন। আশার ক্ষীণ জ্যোতিকণাটুকুও তাতে নেই। আর একদিকে দেখছি দেশের সমস্ত জেলের উচ্চতম কর্মচারী থেকে নিম্নতম সেপাই পর্যন্ত সকলেই আমাদের প্রতি, আমাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সকলেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। উচ্চতম দেশীয় রাজ-কর্মচারী পর্যন্ত নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী পরাধীনতার অপমান কতকটা অনুভব করে। এবার গ্রেপ্তার কারাবাস সবই আছে, নেই যেন কারুর মনে কোন বিদ্বেষ।

এবার এখন পর্যন্ত গোয়েন্দা পুলিসের আনাগোনা বড় একটা নেই। নেই

গ্রেপ্তারের পর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা। এমন কি দু'একজন মুক্তিলাভের জন্য গোয়েন্দা পুলিসের কৃপা প্রার্থনা করবার সুযোগ মিলবে এই আশায় তাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও দেখা পায়নি। গোয়েন্দা বিভাগ বন্দীদের দুর্বলতার সুযোগও যেন নিতে চাইছে না। কারণ বোধহয় এই, এতে ওদের কোন প্রয়োজনও নেই। দেশে এমন কিছুই ঘটেনি, যে খবর জানবার জন্য গোয়েন্দা পুলিসের আগ্রহ থাকতে পারে। অথচ গত যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় দেখেছি গোয়েন্দা পুলিসের আনাগোনা, বন্দীকে ঘন ঘন গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যাওয়া এবং স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করা। এমনকি রাজনৈতিক সচিব এবং গোয়েন্দা বিভাগের উপ-সাধারণ পরিদর্শক সপ্তাহে একবার কলকাতার দুই জেলে বন্দীদের সাথে দেখা করে তাদের চিন্তাধারা অনুধাবন করবার চেষ্টা করে যেত।

গত যুদ্ধের সময় আমরা থাকতাম ভিন্ন ভিন্ন কুঠরিতে আবদ্ধ। কোন কোন সময় কারুর সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। কোন কোন জেলে বাঙালী অফিসারের সঙ্গে দেখাই হ'ত না। হলেও বাংলায় কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি হিন্দুস্থানী সেপাই পর্যন্ত কোন কোন জেলে কাছেও আসতে পারত না। বছরখানেক তো ছিলাম পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী দেয়া অবস্থায়। তখন খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল যৎসামান্য এবং অখাদ্য। থাকতাম একক নির্জন কুঠরিতে।

অবস্থা যতই শোচনীয় হোক, প্রাণ ছিল আশায় ভরপুর। সমস্ত হিন্দুস্থানে বিপ্লববহ্নি ধূমায়িত। প্রচণ্ডবেগে জ্বলে উঠল বলে। তার সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখার রক্তিমাভা আকাশ ছেয়ে ফেলল বুঝি। আমাদের মন-প্রাণ এই মরণ-খেলায় মেতে ওঠবার জন্য আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। সে যে কি আনন্দ, কি উদ্দীপনা, কি আশা! যে কোন প্রভাতে স্বাধীন ভারতে মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেতাম। আমাদের পায়ের শেকল যেন বিদ্রোহের দামামার সাথে তাল রেখে বাজতে লাগল। বাইরে থেকে দিনের পর দিন সংবাদ আসতে লাগল সিঙ্গাপুর কেল্লায় বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন হয়েছে; পাঞ্জাবের সেনা-নিবেশগুলিতে সৈনিক-বিচারালয়ের কাজ শুরু হয়েছে; শিখ সৈনিকবৃন্দ 'শির দিয়া ত সর নহী দিয়া'র মর্যাদা রক্ষা করছে তোপের মুখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে; কোমাগাটামারু জাহাজে ভারত-প্রত্যাগত যাত্রীদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে; জার্মানী-প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জাহাজগুলি এসে পড়ল বলে। সেকালের কারাগারের দুঃখ-কষ্ট তখন কেউ গায়েই মাখল না। নৈরাশ্যের বাষ্পটুকুও মনে ছিল না।

শেষের দিকে আর এমনটা ছিল না। একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। যুদ্ধ-বিরতির পর জার্মানীর আত্মসমর্পণের সংবাদ (১১ নভেম্বর, ১৯১৮) আসামাত্র যখন আমাদের কারা-প্রাচীরের চতুর্দিকে আলোকমালায় সাজিয়ে ইংরেজের জয়ের আনন্দে দেওয়ালী উৎসব লেগে গেল। কিন্তু এত আলোর সজ্জা সত্ত্বেও সেদিনের সন্ধ্যা আমাদের কাছে ম্লান বিবর্ণ মনে হয়েছিল। সেদিন আমাদের মুখে আর খাওয়ার রুচি রইল না। কেউ বা নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল, কেউ বা জানালার বাইরে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। একটু পরে প্রথম স্তব্ধতা কাটবার পর আমাদের রাজবন্দীদের নিরাশভরা ক্ষীণ কণ্ঠ হতে আর্তনাদ উঠেছিল—

কত কাল পরে বল ভারতরে
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।

* * *

পর দীপমালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

তুমি আজও দুঃখে, তুমি কালও দুঃখে। এতকাল পরে সেই দিনের কথা লিখতে বসে আজও চোখ জলে ভরে উঠল, মনটা কেমন হয়ে গেল। সবই যেন শেষ হয়ে গেল। অবশ্য কোন আশাই ছিল না—কিছু ঘটার সম্ভাবনাও নয়। তবু নিমজ্জমান ব্যক্তির শেষ আশার মত মনের মধ্যে কিছু একটা যেন ছিল।

বাস্তবিক, দিনের কি পরিবর্তন! অবস্থা পালটাবার সঙ্গে মানুষের মনের ভাল-মন্দ লাগার মাপকাঠিরই বা কত হেরফের হয়ে যায়! আজকের দিনে এই বন্দী-নিবাসে রাজবন্দীদের টেবিলে একখানা গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণ-কথামৃত, সাধু-মহাত্মাদের জীবনীগ্রন্থ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী একখানাও পাওয়া যাবে না। আর, তখনকার দিনে এগুলিই ছিল প্রধান পাঠ্য। আজ দেখতে পাই সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে টেবিল পরিপূর্ণ। আজ একজনকেও দিনের বেলাতেও ধ্যানস্থ হয়ে বসতে দেখি না—ধ্যানস্থ হয়ে রাত্রি জাগরণ তো দূরের কথা। তখনকার দিনে ধর্মোপাসনায় অনেকের সময় অতিবাহিত হ'ত। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বা ধর্ম-সংগীত বন্দীদের কণ্ঠে শোনা যেত—প্রেমের গান শুনেছি বলে তো মনেই করতে পারি না। আর আজ, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সামনে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রেমের গান গাইছে।

আমাদের সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছি

এমন সময় একটি অজাতশ্মশ্রু বালক বন্দী Illustrated Times of India-য় প্রকাশিত অনাবৃত দেহ যুবতীদের পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলি দেখিয়ে আমাকে বলল, 'দেখুন, বিদেশী ব্যবসায়ীদের বাজার-চলন কারুশিল্প কি রকম উন্নতি করেছে, আর আমাদের দেশের বণিকরা কত পেছনে পড়ে আছে।' আবার একদিন, রাশিয়ায় আত্মরক্ষা কার্যে নিযুক্ত প্রায়-উলঙ্গ যুবতীদের ছবি দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, কি নিটোল স্বাস্থ্য আর কি সুগঠিত দেহ, অথচ রমণী-সুলভ মুখশ্রীও আছে।' আমার পুরাতন মন নিয়ে ঐ ছেলেটির ও উপস্থিত অন্য ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এদের মুখে-চোখে লালসার ইঙ্গিতটুকুও পেলাম না, লালসা-বিরহিত নিছক সৌন্দর্য বোধ ছাড়া যেন আর কিছুই নেই। সেকালে কিন্তু এমন ছবি দেখলে শিউরে উঠতাম। এরূপ ছবির দিকে তাকিয়ে দেখতে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হতাম। ছবির দিকে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো কল্পনাতীত। এখনও, যখন ঐ রকম ছবি, এমন কি চিত্র-তারকাদের ছবিও কাগজের পৃষ্ঠা ওলটাতে গিয়ে চোখে পড়ে, তখন চারদিকে লজ্জিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখি কেউ দেখে ফেলল নাকি!

গত ১৯৩০ থেকে '৩৮ সাল অবধি যাঁরা কারাগারে এসেছিলেন তাঁদের টেবিলে যে ধরনের বই, পত্র-পত্রিকা দেখতে পেতাম তার মধ্যে ছিল রুশ-বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ সম্বন্ধে অবশ্য যা জেলখানায় আনা যেত, ফ্রয়েডের রচনাবলী, হ্যাভলক এ'লসের যৌনতত্ত্ব বিষয়ের পুস্তকাবলী, এমনকি ম্যারী স্টোপস্-এর জন্মনিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত পুস্তক পর্যন্ত। এবার অবশ্য এ জাতীয় পুস্তকাদি বেশী চোখে পড়েনি। হয়ত পয়সার অভাব একটা কারণ হতে পারে। খরচ করার মত টাকা সমাজতন্ত্র বিষয়ক পুস্তকাদি কিনতেই ফুরিয়ে যেত।

এ যুগে যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় অকুণ্ঠিতভাবে আলোচনা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমস্ত বুঝে দেখবার আগ্রহ দেখা যায়। সেকালে ব্রহ্মচর্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব যৌনতত্ত্ব আলোচিত হ'ত। এইসব আলোচনায় মাধ্যমে যৌনতত্ত্বের বীভৎসতা ও কদর্যতার দিকটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত। আজ কিন্তু মনে হয় গোপনতা, অবদমন এবং অবৈজ্ঞানিক বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা মানসিক স্বাস্থ্য যতটা নষ্ট হয়, ততটা আর কিছুতেই হয় না। এলোমেলো ধ্যান-ধারণার চাইতে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

আধুনিকদের নিন্দা করবার জন্য এসব কথা বলছি না, বা তখনকার চাইতে

এখনকার ছেলেরা নৈতিক দোষে দুষ্ট তাও আমি মনে করি না। সময়ের পরিবর্তনে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কতটা বদলায় তারই একটা ইঙ্গিত মাত্র দিচ্ছি।

অবাক হয়ে ভাবি ছেলেরা কি ভাবে, কি চিন্তা করে, কি তাদের আলোচ্য বিষয়। কোন্ বস্তু, কোন্ আশা এদের প্রাণকে সঞ্জীবিত করে রাখছে। অদূর ভবিষ্যতের কোন সাফল্যের আশা এদের উদ্দীপিত করছে না সত্য, কিন্তু সুদূর হলেও ভবিষ্যতের কোন আশার আলোকের ইঙ্গিত এরা পেয়েছে। এরা আলোচনা করে মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার অত্যাচারের কথা, শ্রমিক কৃষকের শোচনীয় দুর্দশার কথা। বিপ্লবের দুর্যোগপূর্ণ তিমির রাত্রির অবসানে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার আশায়, নতুন জগৎ গড়বার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় এদের উজ্জ্বল মুখ আর বুক ফুলে ওঠে। এরা পরোপকার বা মানবতাবোধের কথা ভাবে না; শুধু ভাবে নির্যাতিত শ্রমিক-কৃষককে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

সেদিন আমরা কেউ নিজের পরিজনের অন্ন-বস্ত্রাভাবের কথা ভেবে মুহ্যমান হতাম না। প্রধান কারণ ছিল, কারুর বাড়িতে তেমন দারিদ্র্যদশা ছিল না। আর আজ এই জেলের অধিকাংশ বন্দীর বাড়িতে আর্থিক অনটনের কথা অবর্ণনীয়। এমন হৃদয়-বিদারক দারিদ্র্য-দশার সংবাদ এরা চিঠিতে পায় যে, মাঝে মাঝে তাদের সমস্ত প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। দেশব্যাপী শোচনীয় দারিদ্র্য এদের পরিবারগুলিকে গ্রাস করে ফেলছে। আমার নিজের কথাই বলি। আমরা ছিলাম অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। পিতৃদেব ব্যাঙ্কে প্রায় লাখ-খানেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন। কাজেই, দারিদ্র্যের কথা তখন কল্পনাও করিনি। আর আজ অর্থাভাবে আমার একমাত্র কন্যার বিয়ে দেয়ার জল্পনা-কল্পনাই ছেড়ে দিয়েছি।

তখনকার দিনে জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে দলাদলি ছিল না। বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা সত্ত্বেও কারাগারে এসে আমরা পরম মিত্রভাবে বাস করতাম। শত্রুর কাছে নিজেদের বিভিন্নতার কথা প্রকাশ করাটা কল্পনার অতীত ছিল। আর তারপর ১৯৩০ সালে ইংরেজ পরিচালকের সামনে বসে দল নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়েছে। বিদেশীর সাহায্য নিয়ে দলের ক্ষুদ্র স্বার্থ বজায় রাখতে ত্রুটি করেনি এমন লোকও দেখেছি। গত যুদ্ধের সময়ে আমাদের পরস্পরের পরিমেল বা মিশবার অধিকার ছিল না। পাশে নির্জন কারাকক্ষে অন্য বন্ধুর অস্তিত্ব অনুভব করতাম। কিন্তু দেখতে বা কথা বলতে পারতাম না।

তাই বুঝি লুকিয়ে ছাপিয়ে কোনদিন কোনও সুযোগে দেখা হয়ে গেলে আনন্দ-সাগরে ভেসে যেতাম। তখনকার দিনে জেলখানা ছিল নির্যাতনের জায়গা। সেখানে সব কিছুতে বঞ্চিত হয়ে সব রকমের লাঞ্ছনার মধ্যে বাস করতে হ'ত। প্রতি মুহূর্তে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকত। বিপদের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে যে ঐক্যবোধ থাকে, তাই বোধহয় আমাদের মধ্যে প্রবল ছিল।

সেকালে আমাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বিদ্বান তেমন কেউ ছিল না। গোপন সহানুভূতিশীলদের মধ্যে অবশ্য দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানরাও ছিলেন। কিন্তু সর্বত্যাগী হয়ে কারালাঞ্ছনা ও মৃত্যুবরণ করতে বিদ্বান লোকেরা তেমন কেউ আসতে চাইতেন না। দলের জন্য বি. এ. পাশ ছেলে সংগ্রহ করা কঠিন হ'ত। জেলখানায় যে কয়জন বিদ্বান বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা যে মুক্তির পর আর এপথে আসবেন না এ আমাদের জানাই ছিল। আজ কিন্তু ডিগ্রী-ধারী বিদ্বান ছেলের অভাব নেই। যাদের প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায়, বিদগ্ধ সমাজে উচ্চাসন পেতে পারে, এমন ছেলে এখানে একাধিক আছে। বি. এ. কি এম এ. পাশ ছেলে তো যথেষ্ট আছে। আজ দলের আদর্শ, পদ্ধতি, কৌশল বুঝিয়ে বলতেও এরাই, আবার লিখে প্রকাশ করতেও এরাই। তাই তো দেখি, কিছু জানতে বা শিখতে হলে ছেলেরা এদের কাছেই যায়। আমাদের নেতৃত্বের আজ অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। এরা একদিন প্রাতঃসূর্যের মত নিজের তেজে সকলের নিকট প্রকাশিত হবে। আশা করি, ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের নেতৃত্ব করবে এরাই। আমার আশা এই যে, একদিন বিশ্ব-বিপ্লবের চিন্তা-নায়কদের মধ্যে এদের স্থান থাকবে! তাই তো, এদের জয় আজ সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

আর একটা কথা, গত যুদ্ধের (১৯১৪-'১৮) সময় এবং তার পরপর যতবার জেলে এসেছি এই কথাটা সর্বদাই উপলব্ধি করেছি যে, বিপ্লবের নেতৃত্বভার আমার মত বয়োবৃদ্ধদেরই নিতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে এমন কোন প্রশ্নই জাগেনি, আমাদের মনেও না, সভ্যদের মনেও না, যে নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আজ একথাটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিপ্লবের আদর্শ ও পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে নেতৃত্বের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আজ এই কথাটা অর্থাৎ পুরাতন নেতৃত্বের অবসান হয়েছে, আমরা আর নেতৃত্ব করছি না—অস্বীকার করলে নিজের অন্ধত্ব ও নির্বুদ্ধিতাই শুধু প্রমাণিত হয়ে পড়ে।

চোখের সামনে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপুরাতন বিপ্লবী দলের মধ্যেই একটা মহৎ বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থাকলে বুঝতে পারব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সব কিছু ভারসাম্যে পৌঁছে যাচ্ছে এর। মধ্যে মূলতথ্য (thesis), প্রতিতথ্য (anti-thesis) এবং সংশ্লেষণ (synthesis) পর্যায়ক্রমে সবই এসে যাচ্ছে।

অনুশীলন আজ বদলে গেছে। এ যে হতে পেরেছে তার জন্য আমরা গর্বিত। আজ আনন্দের সঙ্গে নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে অনুশীলনের আজ অবসান হয়েছে। আজ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বিপ্লবীর জীবন যাপন করে পূর্ব সংস্কারমুক্ত হয়ে নবোদিত 'জবাকুসুম সঙ্কাশম…' সেই মহাদ্যুতিময় সূর্যকে যে বরণ করতে পারছি এটাই আমাদের সৌভাগ্য।

এ পর্যন্ত লিখে হঠাৎ চেয়ে দেখি পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কেন জানি না, মনটা বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। পুরাতনের অবসানে নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানাতে গিয়ে যে গর্ব ও সৌভাগ্য অনুভব করলাম তারই মধ্যে কোথায় যেন ব্যথা ও লজ্জা লুকানো ছিল। ভাবলাম, দিগন্তে সূর্যদেব কি শুধু নীরবে অস্তগামী হয়ে সমস্ত বিশ্ব ম্লান গোধূলি আলোকে ছেয়ে ফেলেন ? সমস্ত আকাশ কি রক্তরাঙা করে অস্ত যান না ? সমস্ত আকাশে, পৃথিবীতে অগ্নিবৃষ্টি করতে করতে কি তিনি পশ্চিম দিকচক্রবালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান না ? আজ যে নেতৃত্বের অবসান হচ্ছে তা কি অস্তগামী সূর্যের মত দিঙ্‌মণ্ডল রক্তিমাভায় উদ্‌ভাসিত করে অস্ত যাচ্ছে ? না কি ব্যর্থতার দুঃসহ লজ্জায় নীরবে মুখ লুকাচ্ছে ?

এবার ধৃত ও নিগৃহীত (restricted) মিলে পৌনে দু'শয়ের মত এবং এখানে আমাদের প্রায় একশ' পঁচিশের মধ্যে পুরানো বিপ্লবী আছে ডজন খানেক কি তার কিছু বেশী। আজ দ্রষ্টা হিসেবে এদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই। এমন দৃঢ়তা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা একালের বিপ্লবীদের আছে কিনা তার পরীক্ষা আজও হয়নি। এরা অত্যাচার, নির্যাতনের আগুনে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখ ভুলে নিজের দেশ এবং আদর্শকে এমন ভালবাসতে পারে তা এদের না দেখলে বোঝা যায় না। এমন আপনভোলা বে-হিসেবী এরা! যে কালে বিপজ্জনক কাজে কেউ আসতে চায়নি, যখন দেশাত্মবোধ সামান্যই জাগ্রত হয়েছে, সে হিসেব করে চললে এরাও

আসত না, আর এলেও এত বছর একই ব্রত পালন করতে পারত না। মহৎ জনের যে শেষ দুর্বলতা—যশাকাঙ্ক্ষা তাও এদের নেই।

আজ এই পলিত-কেশ বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়ে দেখি পঁয়ত্রিশ বছরের বিপ্লবের ইতিহাস এদের মুখে রেখাঙ্কিত হয়ে আছে। একাগ্রচিত্তে ইষ্টবস্তু লাভের জন্য বহুবর্ষব্যাপী তপস্যার যে কাহিনী আমাদের পুরাণ-ইতিহাসে পাঠ করি তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত এদের জীবন-ইতিহাসে পাই। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মত বিপ্লবের বহ্নিশিখা হাতে নিয়ে আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমাদের এই বহুশতবর্ষের পরাধীনতায় জীর্ণ শীর্ণ আত্ম-অবিশ্বাসী অবসাদগ্রস্ত জাতিকে পথ দেখিয়ে আসছেন। নতুন বিপ্লবীরা এঁদের পুত্রতুল্য। 'সর্বত্র জয়মিচ্ছন্তি পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্'! আজ এঁরা কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করছেন যে, তাঁদের পুত্রতুল্য নবাগত বিপ্লবী শিষ্যরা তাঁদেরই আরব্ধ ব্রত সাফল্যমণ্ডিত করুক। এরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও যশ লাভ করুক, গৌরবের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হোক।

সেকালের বিপ্লবী আর একালের বিপ্লবীতে কত প্রভেদ! ভাবনা, চিন্তা, আদর্শ, লক্ষ্য, জীবনযাত্রা প্রণালী—সমস্ত দিকেই কত প্রভেদ! সেই মানুষ, সেই সমিতিই তো আছে! ১৯০৫-৬ সালে যে ভাবরাশি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মত হঠাৎ উৎসারিত হয়ে উচ্ছলিত আবেগে বয়ে চলতে শুরু করেছিল, তাই আজ নতুন খাতে বয়ে চলেছে। নতুন ভগীরথ নতুন শঙ্খ বাজিয়ে এই ধারাকে সাগর-সঙ্গমে নিয়ে চলেছে।

১৪ নভেম্বর, ১৯৪১ ও রাজবন্দীর মানসিকতা

আজ এই হিজলী জেলে বন্দীদের মানসিক অবস্থা বিচার করে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। আজ এদের নিজের মনের কথা নিজেদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিপ্লবী সন্দেহে ধৃত। আজ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন করতে পারে এ আশঙ্কাতেই সরকার এদের কারারুদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু, এই অভিযোগে গ্রেপ্তারের ফলে বিপ্লবীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে?

আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সবার মনে একটা ব্যর্থতাবোধ, অবসাদ এবং নৈরাশ্য জেগে উঠেছে। এই ব্যর্থতাবোধ কেন? এমন তো কল্পনাতেই নেই

যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলাম! এসেছে এজন্য যে, বাইরে কিছু করিনি। সুস্পষ্ট মতবাদ, সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপন্থা বা সুনিয়ন্ত্রিত দল এসব কিছুই ছিল না। অথচ একটা দল যে ছিল না, তা তো নয়। পুরাতন ঐতিহ্য এবং ততোধিক পুরাতন কয়েকজন নেতার উপস্থিতিতে বর্তমানে একটা ক্ষীণ সূত্রে সবাই দলবদ্ধ হয়ে পড়েছিল মাত্র। কোন পরিকল্পনা বা কোন উদ্দেশ্য যে ছিল না একথাও সত্য নয়। কিন্তু এসব এত অস্পষ্ট, এত অনির্দিষ্ট ছিল যে, তা সার্থক হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

এখানে যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে দেখতে পাচ্ছেন যে, তাঁরা যেন বর্তমানের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারছেন না। দলের সঙ্ঘবদ্ধতা রক্ষার জন্যই বর্তমান মতবাদ মেনে চলছেন। কিন্তু মন তা গ্রহণ করেনি। বর্তমান মতবাদ তাঁদের কাছে একটা অস্পষ্ট সিদ্ধান্ত। এর কচকচি পুঁথিগত বিদ্যামাত্র এবং এর প্রচারকারীরা বাক্‌সর্বস্ব সিদ্ধান্তবাগীশ মাত্র। বর্তমান কর্মপন্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই সন্দিহান। কারণ, এর মধ্যে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক আছে বলেও মনে হয় না। এটা বুঝতেও বাকী নেই যে, নেতৃত্ব এ দের হাত থেকে প্রায় চলে গেছে। অধিকাংশ সভ্য যে মতবাদ ও কর্মপন্থায় বিশ্বাসী এঁরা তা বিশ্বাসও করে না, সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশও দিতে পারেন না। আজ দলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। আমাদের অবর্তমানে কোথাও কোন শূন্যতা বোধ করবে না দল। পুরনো সংস্কারবলে এখনও যা আছে তারও অবসান আসন্নপ্রায়।

তাই তো আজ এঁদের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হয়। মমতায় সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় যখন মাঝে মাঝে এঁদের কথা শুনি—আজ আমরা কোন্‌ অবস্থায় এসে পড়লাম! বয়সে পঙ্গু, রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে কোথা যাই? যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম তা কোথায় গেল? দল ছত্রভঙ্গ হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে? আমরা কি করব? এখন, জীবন-সায়াহ্নে বিয়ে করে সংসারী হওয়ারও আর উপায় নেই। ঘরে ফিরে ভাইপো, ভাগ্নে বা অন্য কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করতে হবে।

এঁরা ভাবেন, যে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে এগিয়ে চলছিলাম সে তারা যেন আকাশে মিলিয়ে গেল। কিশোর বয়সে যে পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম, আজ পঞ্চাশ বছর বয়সে দেখতে পাচ্ছি সে পথ যেন নিষ্ফলা মরুভূমিতে হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এঁরা সর্বত্যাগী, নির্ভীক, সংযতেন্দ্রিয় এবং নিরাসক্ত পুরুষ-সিংহ। একটা অতীতকালের বিরাট স্তম্ভ-স্বরূপ এঁদের দেখলে আমাদের দেশে পদ্মায় অধুনা লুপ্ত রাজবাড়ি মঠের কথা মনে পড়ে যায়। চাঁদ রায় কেদার রায়ের বিরাট কীর্তিস্তম্ভ সেই প্রকাণ্ড মঠ আজ জীর্ণ অবস্থায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মার খরস্রোতে মঠের ভিত্তিমূল অবক্ষয়ের মুখে। মঠটা বিরাট শব্দে ভেঙে পড়ল বলে!

এঁদের পরের স্তরে যাঁরা আছেন অর্থাৎ ৩৫ থেকে ৪০-৪২ পর্যন্ত যাঁদের বয়েস তাঁদের কথাও বলছি। এঁরা বর্তমান মতবাদ গ্রহণ করেছেন এবং এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাও আছে। নতুন কর্মপন্থায় এঁরা বিশ্বাসী। এঁদের বিদ্যা আছে। নতুন কর্মপন্থা এঁরা নিজেরাও বোঝেন, পরকেও বোঝাতে পারেন। এঁদের আগ্রহ আছে, কিন্তু উদ্যম নেই। প্রশ্ন জাগে, ভবিষ্যৎ বৈপ্লবিক রঙ্গমঞ্চে এঁরা কোন্ অংশ গ্রহণ করবেন? এঁদের মনেও এক প্রকারের ব্যর্থতাবোধ জেগেছে। যৌবনের প্রান্তে এসে বলিষ্ঠ আশাবাদী মনোভাব এঁদের মধ্যে আর নেই। যাঁরা সর্বত্যাগী হয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক তাঁদের মধ্যেও আজ সন্দেহ জেগেছে নতুন পথে চলার পাথেয় এঁদের আছে কিনা।

যারা বয়সে নবীন, সাধারণ শ্রেণীভুক্ত, তারাও আশাবাদী, এদের মধ্যে কিছু উৎসাহ আছে, উদ্যমেরও অভাব নেই। কিন্তু বোহিমেনী, বেপরোয়া, আত্মভোলা মনোভাব এদের আছে কি? ব্যক্তিগত ও সাংসারিক সুখ-দুঃখ তুচ্ছ করে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত বলিষ্ঠ মন এদের আছে কি? এ কথা কি আজ ভাবতে পারি, যেসব সত্য চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের অনেকেই সবত্যাগী হয়ে, সব সুখ সব দুঃখ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে কাজে আত্ম-নিয়োগ করবে? অথচ এ নাহলে তো সঙ্ঘ গড়ে ওঠে না। ত্যাগ, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং মমতা না থাকলে সঙ্ঘ গডে তোলা যায় না। শুধু বিদ্যা থাকলে চলবে না, আদর্শগত ধ্যান-ধারণা স্বচ্ছ থাকলেও না। সুবক্তা বা সু-লেখক হয়েও না। পরমহংসদেবের কথায় 'পাঁজীতে আছে বিশ আড়া জল কিন্তু নিংড়াইলে এক ফোঁটাও পড়ে না।' নেতৃত্বের যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও, এরা বা'রে যে সুযোগ পেয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করেছে কি? আগেকার দলের নেতাদের বয়েস কারুরই ১৮ থেকে ২৫ এর বেশী ছিল না। কিন্তু সেই বয়সে নানান প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও একটা বিরাট কিছু প্রায় সফল করে তুলেছিল। কি উৎসাহ, কি উদ্যম, কি ত্যাগ ছিল তখনকার সভ্যদের!

সাধারণভাবে বলতে গেলে আজ প্রায় সবার মনেই একটা ব্যর্থতা বোধ জেগে উঠেছে। এমন কেন হ'ল? কার্য-কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা মনে হয়েছে তারই কিছু আভাস দেয়ার চেষ্টা করছি।

আমাদের দেশ অল্পায়ুর দেশ। এখনকার যৌবনের পরমায়ু বোধ হয় ২৩-২৪। ২০ থেকে ২৫, খুব বেশী হলে ৩০, এর পরে আর কারুরই যৌবনোচিত উৎসাহ, উত্তম থাকে না। আমার মনে হয় বৈপ্লবিক বয়েস বলেও একটা বয়েস আছে। ৩০ কি ৩৫-এর পর আর তা থাকে না। এদেশে উপার্জনের পথ যদি সুলভ হ'ত, এবং বিয়ে করে সংসার প্রতিপালনের ক্ষমতা যদি সহজেই অর্জন করতে পারা যেত, তবে ২৫-এর উপরের সারির অধিকাংশই গৃহী হয়ে যেত। বৈপ্লবিক কাজে থাকত না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আমি শুধু যা সাধারণভাবে প্রযোজ্য তাই বলছি। এবং সেই হিসেবে এখানকার অনেকের বয়েস সেই সময়-সীমা পেরিয়ে গেছে।

এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশের পারিবারিক অবস্থা আজ শোচনীয়। অনেকের পরিবার-পরিজন এত দরিদ্র হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের দুবেলা পেটভরা খাবার জুটছে না। নিজের মা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এ সবের অন্নবস্ত্রাভাবের সংবাদে স্বভাবতই এঁদের হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু, গত যুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময় যাঁরা কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন বা অন্তরীণ, তাঁদের মধ্যে কদাচিত এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি ভাবতেন যে, তাঁর পরিবারে কেউ অনাহারে মারা যাবে। বিলাসিতার উপকরণ হয়ত মিলবে না, কিন্তু জল-ভাতের অভাব হবে একথা বড় কারুর মনে হয়নি। আজ কিন্তু অবস্থা বদলে গেছে। বিপ্লবীরা সকলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। এই শ্রেণী আজ দরিদ্ররূপে পরিগণিত। এদের অধিকারে জমি নেই, নেই এদের চাকুরি। ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পথও রুদ্ধ। একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। প্রিয়জনের দারিদ্র্যদশা এদের ব্যাকুল করে তুলেছে।

এখানকার অধিকাংশই আজ ভগ্নস্বাস্থ্য। নীরোগ বলিষ্ঠ দেহ বড় একটা দেখা যায় না। ভগ্নস্বাস্থ্য, রুগ্ন দেহের প্রভাব কেউ বড় একটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। মনকেও দুর্বল করে ফেলছে।

জেলে আসার অনেক আগে থেকেই আমাদের দল পুরানো আদর্শ এবং পন্থা পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু, তার জায়গায় নতুন কোন আদর্শও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়নি। সন্ত্রাসবাদ অনেক পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে গত

বিশ বছরে আমাদের দল কোন সন্ত্রাসবাদী কাজ করেনি। তেমন কোন নীতিও ছিল না। অথচ বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে সশস্ত্র বিদ্রোহের কোন সম্ভাবনা নেই বলেও কেউ মনে করেনি।

সত্য বটে যে, সমাজতন্ত্রবাদ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য গণ-আন্দোলন পরিচালনার কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছিল না। এখানে-সেখানে কিছু কিছু শ্রমিক, কৃষক-সভা হলেও এ দলের সুস্পষ্ট গণ-সংযোগ ছিল না।

গুপ্ত সমিতি নেই। প্রকাশ্য দলও গঠিত হয়নি। আমরা গুপ্ত বিপ্লবী হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছি ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে বন্দী আছি। কিন্তু কোন গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজ করে জেলে আসিনি। নতুন পথে চলার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত নেতাও ছিলেন না। যাদের খুব বেশী পড়াশুনা নেই তারাও নয়। মোট কথা, দলের কোন নেতৃত্বই ছিল না। তবে যা ছিল তা কিছু ভাসা-ভাসা ভাবাদর্শ, সব বিষয়ে যা চামড়ার গভীরতা ভেদ করে রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশে যায়নি, কেবল অসংলগ্ন গ্রন্থিযুক্ত একটা দল ছিল মাত্র।

আর একটা কথা, অবশ্য তা দেশের সব দলের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য, এরা বাইরে এমন কিছুই করে আসেনি যার ইতিহাস বন্দী-জীবনে উদ্দীপনা আনতে পারে। বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরাও এমন কিছু করছেন না যার খবর কারা-প্রাচীর ভেদ করে আশার আলো ছড়িয়ে দিতে পারে।

এসব তো গেল বন্দীরা কেন ব্যর্থতা-বোধের শিকার হয়েছিল। তবে আমাদের কেন কারাগারে বন্দী করেছিল তারও একটা কারণ পুলিস প্রতিবেদন থেকে জানতে পারা যায়। যুদ্ধের সুযোগে অনুশীলন সমিতি নাকি একটা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেছিল। দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র এবং সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রকাণ্ড দল গড়ে উঠছিল। ১৯৪০-এর পুলিস প্রতিবেদনে একথাও বলছে যে, ভারতব্যাপী সন্ত্রাসবাদের পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছিল। ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অনুশীলন সমিতির সবাইকে কারাগারে নিক্ষেপ না করতে পারলে কি যে ঘটে যেত তা বলা শক্ত। এ সবই অবশ্য সরকারের ভিত্তিহীন কল্পনা এবং তার ফলে আতঙ্কিত হয়ে সাবধানতা অবলম্বন মাত্র।

অথচ, আমি নিঃসন্দেহ যে, আজ যদি এই জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে যুবা-বৃদ্ধ কেউ পালিয়ে যাবে না। যারা সরকারী মতে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য তৈরী হচ্ছিল, তারাও না। বিপ্লবী যত দীর্ঘদিনই

জেলে আটক থাক না কেন, বিপ্লবের পরিকল্পনা থাকলে সে সুযোগমত জেল থেকে পালিয়ে যাবে না, এ কি করে সম্ভব হয়! আসল কথা, সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লব—এসবের কোন পরিকল্পনাই ছিল না।

আমি তখন অনশন ধর্মঘটে রত। মরে যাওয়ার মত অবস্থা দেখে সরকার আমাকে বিনাশর্তে অস্থায়িভাবে মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু, একদিনের জন্যও পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি। এমনকি সুভাষবাবুর নিরুদ্দেশের খবর পেয়েও পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা জাগেনি। তাঁর অন্তর্ধানের পরও অন্তত পাঁচ-ছয়দিন বাইরে ছিলাম এবং নিশ্চিতরূপেই জানতাম যে, আমাকে খুব শীঘ্রই আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য জেলে পুরবে। তবু পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি। কারণ বলছি:

কিছু সভ্য ১৯৪০-এর সেপ্টেম্বরে ধরা পড়েননি। তাঁরা তখন পলাতক অবস্থায় ছিলেন। আর এঁদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। দলের কোন কাজেই এঁরা নিজেদের নিযুক্ত করতে পারছিলেন না। কেন না, এমন কোন গোপনীয় কাজই ছিল না যাতে পলাতকরা নিযুক্ত হতে পারেন। দলের সব কাজই ছিল প্রকাশ্যে। কংগ্রেস, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এদের নিয়ে গোপনে কাজ করা সম্ভব নয়। প্রকাশ্যে দল গঠন করা প্রয়োজন। কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ভোটের জোর যাদের বেশী তারাই জয়ী হয়। কিন্তু, এসব কাজই দলের কাজে পলাতকদের প্রয়োজনীয় করে গড়ে তুলতে পারেনি। তাদেরই যখন কোন কাজ নেই তখন জেল থেকে পালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গা-ঢাকা অবস্থায় কি কাজ সম্ভব হবে?

বাইরের সভ্যদের সাথে ভিতরের সভ্যদের কোন সম্পর্কই নেই। কোন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করারও কোন প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কারা-কর্তৃপক্ষের সহস্র প্রকার সতর্কতা সত্বেও বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কোন-কালে কোথাও বন্ধ হয়নি। কিন্তু আজ আমরা এর কোন আবশ্যকতা বোধ করি না।

যুদ্ধের সুযোগে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা থাকলে আজ ভারতের বাইরে এদলের লোক থাকত। ইংরেজের শত্রু জার্মানী এবং ইতালীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হ'ত। বিদেশে যেসব ভারতীয় বিপ্লবী আছেন তাঁদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হ'ত। কিন্তু, আজ পর্যন্ত তার কিছুই হয়নি। ১৯৩৮-এ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অনেক সুযোগ এসেছিল। বর্তমান যুদ্ধ ঘোষণার পরও

একবছর কারাগারের বাইরে ছিলাম। অথচ বিদেশে লোক পাঠাবার কোন চেষ্টাই হয়নি।

আজ কংগ্রেস, শ্রমিক, কৃষক কোন বিভাগেই দল দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এই জেলে আটক বিভিন্ন বয়েসের অনেক বন্দীকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি সবাইকে ছেড়ে দিলে বাইরে গিয়ে তাঁরা কি করবেন তার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আমার তো মনে হয় অস্পষ্টরূপেও কোন ধারণা নেই। সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনাও আমাদের নেই।

গ্রীস দেশে আবদ্ধ ইতালীয় সৈন্যদের অবরোধ শিবিরে নাকি জার্মান ছত্রী-বাহিনী প্রতিজনে তিনটি করে যন্ত্র-চালিত কামানসহ অবতরণ করেছিল। পরে প্রত্যেক বন্দী ঐ কামানের সাহায্যে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছিল। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজ যদি আমাদের জেলে তেমনি কোন ঘটনা ঘটে, তবে কি করবে? অনেকেই বললেন, যন্ত্র-চালিত কামান নিয়ে আমরা শুধু বিব্রতই হব। কামানগুলি আমাদের হাতে এসে একটা লাঠির কাজও করতে পারবে না।

বাইরে সভ্যদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তৈরী হচ্ছেন। দল তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছে। জেলে এসে কিন্তু তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁরা প্রস্তুত হনই নি, তাঁদের পরিকল্পিত কোন কার্যক্রমও ছিল না। নিজের সংসারের কাজও করেননি, স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকেও কিছু হয়নি। তাই আজ নৈরাশ্যের কুজ্ঝটিকা তাঁদের এগিয়ে চলার পথের রেখা মুছে ফেলেছে। তাঁরা আজ দিশেহারা।

এই আলোচনা আজকের দিনের একটা রেখাচিত্র আঁকার চেষ্টা মাত্র। এ অবস্থা সব সময় থাকবে বা দীর্ঘদিন ধরে চলবে, তা বলতে চাইছি না। আজ অবসর গ্রহণের কাছাকাছি এসে যে প্রশ্ন মনে জাগরিত হচ্ছে তা হল, এই দিশেহারাদের পথ দেখাবার জন্য কিছু নায়ক আলোহাতে এগিয়ে আসছেন কী? ওঁদের জ্ঞানের আলোয় কুহেলি-ঢাকা পথ স্পষ্ট হয়ে উঠছে কী?

নিজের মনের অবস্থা ভাবতে গিয়ে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংস্কার-বশে কথাটা লিখতে সংকোচ বোধ করছি। তবুও তা প্রকাশ করাই প্রয়োজন। এমন একটা ধারণা আছে যারা অত্যন্ত আদর্শবাদী তাদের মনের আসল কথাটা স্পষ্ট করে জানালে হয়তো বিপদের সম্ভাবনা আছে। নিজেকে

তো দোষী করবই, বিপ্লবীর আদর্শও ক্ষুণ্ণ হবে। এরূপ আলোচনা লোককে অনুপ্রাণিত না করে বরং নিরুৎসাহ করে দেবে। এ প্রসঙ্গে একদিনের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। সেদিনটি ছিল রাশিয়ার নভেম্বর-বিপ্লবের বার্ষিকী অনুষ্ঠান। একজন বক্তা বলেছিলেন যে, রুশ-বিপ্লবের অল্প পূর্বেও লেনিন দুঃখ করে বলেছিলেন—সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের পরে যাঁরা আসবেন তাঁরা যদি সব সার্থক করতে পারেন। আমার এক পুরাতন বন্ধু বললেন—এসব কথা বলা ঠিক নয়। এতে বিপ্লবীর আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, আদর্শ বিপ্লবী লেনিনের দুর্বলতার কথা বললে ছেলেদের বলিষ্ঠ আশাবাদী মনে নৈরাশ্য এসে পড়বে। আমি একথায় সায় দিতে পারলাম না। বললাম—লেনিনকে মানুষরূপে দেখাই ভাল, এতেই ছেলেদের প্রকৃত কল্যাণ হবে। অননুকরণীয়, অলৌকিক লেনিন আমাদের দেশের দেবতাদের মত শুধু পূজাই পাবেন, কেউ তাঁর অনুকরণ করবে না।

আমার মনে একটা কথা বাইরেও মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে। জেলে এসে তা আরও স্পষ্ট করে অনুভব করছি—আগামী বিপ্লবের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা আমাদের পুরাতনদের নেই। আমার নিজের কথা বলতে পারি, মনের কোণে অবসর গ্রহণের একটা ইচ্ছা যেন জেগে উঠছে। ভয়ে নয়, কিংবা কোন দুর্বলতার বশবর্তী হয়েও নয়। ১৩-১৪ বছর বয়েস একটা আঁট-সাঁট অবস্থার মধ্যে বাস করে, ১৭-১৮ বছর বয়েস থেকে বিপ্লবী দলের নেতৃত্বের গুরু-দায়িত্ব বহন করে, কারাগারে এবং বাইরে সব সময় একটা ঝড়ো জীবনের মধ্য দিয়ে এসে দেহ-মন যেন বিশ্রাম চাইছে। তাই, নবাগত তরুণ নেতাদের হাতে নেতৃত্বের ভার তুলে দিয়ে, তাদের জয় কামনা করতে করতে অবসর গ্রহণ করতে চাই। তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর ধরে উত্তাল তরঙ্গ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে যে তরণী বেয়ে চলেছি তার হাল আজ তরুণের নিপুণ হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হতে চাইছি। স্বদেশী যুগের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিমজ্জমান একটি নৌকার ছবি ও তার নীচে লেখা দুটি লাইন চোখের সামনে ভেসে উঠছে :

"হউক ভগ্ন জলধি মগ্ন
তবু তরী বাহি মরিবি কে।"

আর একটা আশার বাণী আপন হৃদয়ে কান পেতে শুনতে পেতাম। তাও মনে পড়ছে :

"ওরে ডুবছে নাও,
ডুবিয়াই যা।"

কিন্তু, যে তেজস্বী নাবিকের হস্তে ভার অর্পণ করিতে চাইছি সে কোথায়! সামনা-সামনি দৃষ্টির সীমায় তো তাদের দেখতে পাচ্ছি না। এদের যে কত ভালবাসি তা এরা জানে না। এরা সার্থক হোক, জয়ী হোক, এ প্রার্থনা করছি সর্বান্তঃকরণে। এদের কারুর স্বাস্থ্য নষ্ট হলে চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ি, যদিও প্রকাশ করতে লজ্জিত হই। যাই হোক, আমাকে বিচার করবে অপরে, আমি নই। তাই নিজের মনের কথা অকপটে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

এমনি ধারা অকপট প্রকাশ করার কথায় বহুদিন পূবের একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না। সেদিন প্রথম পরিচয় ঘটেছিল বাংলাদেশের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নেতা পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কে না জানে উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বরে পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধে বীরের মত মৃত্যুবরণের কাহিনী। যাই হোক, আমি কথায় কথায় সামাজিক বর্ণভেদের অপকারিতার কথা বলেছিলাম। তিনি প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত দৃপ্তভাবে বললেন—'দেখুন, আপনি গঙ্গোপাধ্যায়, আমি মুখোপাধ্যায়। আমরা কুলীন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আমরা উপাধ্যায়—সকলের শিক্ষাগুরু। ব্রাহ্মণের দাবী আমরা ছাড়ব না। আমরা আবার ব্রাহ্মণকে পূর্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত করব। বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে আমি গর্ব অনুভব করি।'

আন্তরিক যা বিশ্বাস করতেন তাই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ হয়ত আমার এ কথায় আপত্তি তুলতে পারেন; কেননা, তাঁরা ভক্তের পাত্রকে আধুনিক মনের সাথে মিলিয়ে দেখতে চাইবেন। পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমি কোন অশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে এসব লিখিনি। কারণ, তাঁর মত এমন শ্রদ্ধাবান, এমন তেজস্বী, এমন নির্ভীক দৃঢ়কল্প গতিবান নেতা ভারতবর্ষে ক'টা আছে?

জাপানী-আক্রমণ

গতকালের (৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১) খবরের কাগজে দেখলাম জাপান আমেরিকা অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে, পৃথিবী-বিখ্যাত নৌঘাটি পার্ল হারবার, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ম্যানিলা এবং অন্যান্য স্থানে আক্রমণ শুরু করেছে। অথচ তখনও জাপানের দুই প্রতিনিধি কুরুসু এবং নৌ-সেনাপতি নমুরা আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালের সঙ্গে মীমাংসার কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এ খবরে এখানে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল এই ভেবে যে, ভারতের কাছেই প্রাচ্য দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল! আমি কিন্তু আশা করেছিলাম যে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধবে না। আমেরিকানরা ধনকুবের, বিলাসী, আরামপ্রিয় এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ। তারা হয়ত একটা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শেষ পর্যন্ত সব সয়ে যাবে—যেমন তারা করেছে হিটলারের বেলায় প্রতিটি জাহাজডুবিকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া জাপানও হয়ত যুদ্ধ চায় না। কারণ, জার্মানী মিত্র হলেও অনেক দূরে। সুতরাং প্রায় এককভাবে আমেরিকা, ইলংণ্ড, রাশিয়া, চীন—এতগুলি শক্তির সাথে যুদ্ধে নামতে সাহসী হবে না। কিন্তু, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪১-এর খবরে প্রকাশ ইংরেজ আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদিকে শ্যামদেশ জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তার কাছে নতি স্বীকার করেছে, জাপানী সেনারা ব্রিটিশ অধিকৃত মালয় উপদ্বীপে অবতরণ করেছে, সাংহাই-এর ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান জাপানের করতলগত ; হংকং অবরুদ্ধ ; সিঙ্গাপুরের উপর বিমান-আক্রমণ শুরু হয়েছে, আমেরিকার অধিকৃত ওয়েক দ্বীপ জাপানীরা দখল করে নিয়েছে ; এবং অনেক ব্রিটিশ-আমেরিকান রণতরী সহ নানা জাতের জলযান ধ্বংস করে দিয়েছে। কলকাতা বিমান-আক্রমণের আওতায় এসে গেল। এই সংবাদে জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল। সে কি কলরব, উল্লাস ও হৈ-চৈ শুরু হ'ল! আমি কিন্তু এ সংবাদে মোটেই সুখী হতে পারিনি। আর এ মনোভাব অনেককে পরিষ্কারভাবে বলতে কুণ্ঠিত হইনি। কেন এমন ভেবেছিলাম তাই বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করছি :

চোখের সামনে যে চিত্র ভেসে উঠছে তা সংক্ষেপে বলতে গেলে এমনি দাঁড়ায়—জয়োল্লাসে উন্মত্ত জাপানী সেনাবাহিনী ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বীরদর্পে মার্চ করে চলেছে। দেশ নররক্তে প্লাবিত। শহর বন্দর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র ভারতবাসীর পর্ণকুটির ভস্মীভূত। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সর্বস্ব লুণ্ঠিত—কৃষকের গোলা, বণিকের বিপণি, কিছুই বাদ যাবে না। সমগ্র দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়।

দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি লড়াই করবে, আর সেই পৈশাচিক ধ্বংস-লীলায় লাঞ্ছিত হবে নির্দোষ নিরুপায় জনসাধারণ। ইউরোপে তো এই ধ্বংসলীলা অনেকদিন ধরেই চলছে নির্দোষ, নির্যাতিত এবং নির্বোধ সৈন্যদলভুক্ত এক জাতির জনসাধারণ তাদেরই মত আর এক জাতির সৈন্যদলভুক্ত জনসাধারণকে

হত্যা করছে। যুধ্যমান দেশগুলির শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা নেই। নেই কোন প্রকার স্বার্থ-সংঘাত। তাদের শ্রেণী-স্বার্থ এক। তারা সকলেই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের শিকার। যুদ্ধে যে পক্ষেরই জয় হোক, গরীবের দুঃখ তাতে ঘুচবে না। যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিনই অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে বড়লোকেরা আরও বড় হবে। আর বিজয়ী শক্তি লাভ করবে বৃহত্তর এলাকায় নিজেদের কাজ-কারবার প্রসারিত করার সুযোগ —অর্থাৎ সেই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরা। যে পোল্যাণ্ড বা ডানজিগকে কেন্দ্র করে সমরানলে একরকম সারা বিশ্বের মানুষ পুড়ে মরছে, তাদের অনেকেই পোল্যাণ্ড বা ডানজিগের নাম পর্যন্ত শোনেনি। জাপানের সাথে আমাদের শত্রুতা কেন, তা কি কেউ জানে? এও কি কেউ জানে, কেন জাপান প্রাচ্য-অঞ্চলে লড়াই শুরু করল? অথচ জাপানী জনসাধারণ (সৈন্য শ্রেণীভুক্ত) এক অলীক স্বজাতি-প্রেম এবং ততোধিক অলীক পরজাতি-বিদ্বেষ-এ প্রণোদিত হয়ে হত্যালীলায় এগিয়ে আসছে। এসব কথা ভেবেই আজ মন ব্যথিত হয়ে উঠছে।

ইউরোপে তো একটার পর একটা দেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। এমনকি সমস্ত শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর আশা-ভরসাস্থল সোভিয়েট রাশিয়া পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না। রাত্রির পর রাত্রি বিমান-আক্রমণে বিধ্বস্ত ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিদারুণ লাঞ্ছনার কথা ভেবে ব্যথিত হই। তবে এসব তো সবই খবরের কাগজ পড়ে। কিন্তু, আজ যে যুদ্ধ একেবারে ঘরের দোরে এসে পড়েছে! আজ যে আমার দেশের নির্দোষ, নির্বিরোধ, শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ অকারণে বিপন্ন হবে, অশেষ-ভাবে লাঞ্ছিত হবে—একথা ভাবতেও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে, আজ হিটলারই আসুক আর জাপানই আসুক, আমাদের মঙ্গল কিছুতেই হবে না। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাব; বরং সেই তিমিরান্ধকার আরও বেড়ে যাবে। বিদেশী শাসক-শক্তি ইংরেজের প্রতি কোন অনুরাগবশে এসব কথা বলছি না। শয়তান ইংরেজের নাড়ি-নক্ষত্র আমাদের জানা, কিন্তু আর সব শয়তান তো অজ্ঞাত কুলশীল। ফ্যাসিবাদী হিটলার, মুসোলিনী বা জাপানী আগ্রাসী শক্তি যদি ভারত অধিকার করে, তবে আমাদের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং আজ এটা সবারই বোঝা দরকার যে, হিটলার, মুসোলিনী বা জাপানী শক্তি যদি পৃথিবীর শত্রু হয়ে থাকে তবে তারা কিছুতেই ভারতের মিত্র হতে পারে না।

আমেরিকা, ইংলণ্ড, হিটলার, মুসোলিনী বা জাপান—এদের সাম্রাজ্যলোভ এবং শোষণ করবার ইচ্ছাই আজ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের কারণ। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ ধ্বংস না হলে জগতের মঙ্গল নেই। কেবলমাত্র যদি পরাধীন জাতির শাসনকর্তা বদলায় তাতে লাভ তো হবেই না, বরং নতুন শক্তির বন্ধন এবং শোষণ আরও তীব্র হবে। আজ যারা জাপানকে স্বাগত জানাবে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তারা ধিকৃত হবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিবাদের ধ্বংস অবশ্যই চাই। তা সাধন করতে হবে বৈপ্লবিক শ্রমিক-কৃষক শক্তি দ্বারাই

একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে যে অরাজতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তার মাঝেই বিপ্লব জন্ম লাভ করবে। ধ্বংসলীলা দেখে বিপ্লবী উল্লসিত হয়। বিষাদগ্রস্ত হয় না।

গত ৩৬ বছর বৈপ্লবিক জীবন যাপন করে আজ অকপটে কবুল করছি, পৃথিবীব্যাপী এই তাণ্ডব-লীলা এবং আমাদের দেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমার মন ব্যথিত। ভাবি, এ ধ্বংসলীলার কি প্রয়োজন! এতে বিশ্বের কোন্ মঙ্গল সাধিত হবে! মানুষ অনেকদিন নরখাদকের পর্যায় অতিক্রম করেছে। তবে কেন এই নরহত্যা! ধরিত্রী মাতা অফুরন্ত সম্পদের অধিকারিণী। অন্যায় আত্মসাৎ না করে একটু শ্রম-স্বীকার করলে পৃথিবীর কোথাও অন্ন-বস্ত্রের অভাব হতে পারে না। গণশক্তি এ বিষয়ে সচেতন হয়ে সংঘবদ্ধ না হতে পারলে সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে তাদের বলিদান কেউ ঠেকাতে পারবে না, এবং যতদিন না পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততদিন তাদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগেই থাকবে। দুনিয়ার সব মানুষের দুঃখ, বিশেষ করে আমাদের দেশের জন-সাধারণের দুর্দশার চিত্র চোখের সামনে দেখে এতটা আকুল হয়ে পড়েছি!

In Jails (P. C. Ganguly)

1st Period = 1914 to 1920

1.	Ferrick Bazar Police Station—	Four days
2.	Lalbazar Lock up—	one day
3.	Barishal District Jail—	Sept.' 14 to Nov '15
4.	Presidency Jail, Calcutta—	Nov. '15 to July '16
5.	Alipore Central Jail, Calcutta—	Aug. '16 to Nov '17
6.	Raipur Central Jail, Central Provinces	Nov. '17 to Mar. '18
7.	Rajshahi Central Jail—	Mar. '18 to Sept. '19
8.	Alipore Central Jail—	Sept. '19 to Dec. '19
9.	Hoogly District Jail—	Dec. '19 to 28 Feb. 1920

2nd Period = 1924 to 1928

1.	Alipore Central Jail—	Aug. '24 to Sept. 1924
2.	Midnapore Central Jail—	Sept. '24 to Dec. 1925
3.	Trichinopolly Central Jail, Madras	Dec. '25 to Mar. 1927
4.	Penitentiary Jail, Madras—	Mar. to April 1927
5.	Trichinopolly Central Jail, Madras—	Apr. '27 to Sept. 1927
6.	Peniltenttary Jail, (Madras)	5 days
7.	Rangoon Central Jail (Burma)—	Sept. 1927 for 15 days
8.	Myrigyan Central Jail (Burma)—	Sept. 1927 to March 1928
9.	Insein Central Jail (Burma)—	March. 1928 to July. 1928
10.	Alipore Central Jail—	One day
11.	Polia Station Rampul Dist. Khulna detained—	July 1928 to Sept. 1928
12.	Detained at Home—	Sept. & Oct. 1928

3rd Period = 1930—1938.

1.	Rasjhahi Central Jail—	April. 1930 to Aug. 1930
2.	Baharampur District Jail—	Aug. 1930 to Oct. 1930
3.	Buxa Fort Detention Camp—	Oct. 1930 to Nov. 1931
4.	Vellore Central Jail, Madras—	Nov. 1931 to Jan. 1932
5.	Trichinopolly Central Jail, Madras—	Jan. 1932 to 1935
6.	Vellore Central Jail, Madras—	1935 to Jan. 1937
7.	Hijli Special Jail for State Prisoners—	1937 to 1938 (June)
8.	Presidency Jail—	Two days in 1938 +10 days

4th Period = 1940 + 1946.

1.	Presidency Jail—	Sept. '40 to 10/12/40 and 31 Jan. '41 to May '41
2.	Hijli Jail—	May '41 to Feb '42
3.	Midnapore Central Jail-	Feb. '42 to 2 June 1943
4.	Alipore Central Jail—	2nd June 43 to Nov. 45
5.	Dum Dum Central Jail-	Nov. '45 to May 46

Dates of some events in my life (P. C. Ganguly)

Date of warrant for waging war against the British King and Emperor under section 121A I. P. C. & Absconded	... 13- 5-1913
Arrested	... 15- 9-1914
Tried and cenvicted for ten years transporation rigorous imprisonment	... October, 1915

Acquitted by Calcutta High Court ...	10-7-1916
Re-arrested at the Jail Gate and Detained ...	10-7-1916
State Prisoner under Reg. III of 1818 ...	9-8-1916
Released ...	29-2-1920
Warrant under Reg. III of 1818 and Absconded ...	19-9-1923
Arrested and made State Prisoner ...	15-8-1924
Released from Jail and Re-arrested and detained in Village Police Station ...	14-7-1928
Detained at Home ...	September 1928
Released from Detention but movement restricted ...	24-10-1928
Arrested under Section 151 ...	20-4-1930
Made a Detenue in the Jail ...	Last week of April, 1930
State Prisoner under Reg. III of 1818 ...	Nov. 1931
Released ...	9-6-1938
Arrested under Security Rules ...	15-9-1940
Temporary release due to Hunger Strike ...	10-12-1940
Arrested and taken Jail ...	31-1-1941
Released by High Court under Habeus Corpustent ...	3-6-1943
Arrested and made State Prisoner ...	3-6-1943
Released ...	19-5-1946

1. Elected in the Legislative Council, Bengal in 1929.
2. Elected in the Legistative Assembly, Bengal in 1939.

Hunger Strikes

1. Nov,-Dec. 1917 in Alipore Central Jail and Raipur Central Jail— 45 days
2. 1918 Rajshahi Central Jail—

3.	1925 Midnapore Central Jail	7 days
4.	1925 Trichinopoly Central Jail—	2 „
5.	1930 to '31 Buxa Detention Camp—	8-5-3-2 days (Total 18 days)
6.	1932 to '31 Trichinopoly Central Jail (Taken half Diet. i.c. One meal only)	1 year
7.	1940—'41 Presidency Jail	16 days
8.	1944 Alipore Central Jail	4 „

———